10 MINUTE SCHOOL

অর্থনীতি

শর্ট সিলেবাস

HSC 2021



শেখ সিদরাতুল মুনতাহা

Economics 1st Paper

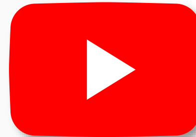


এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ১ম পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো



Economics 2nd Paper

এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ২য় পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো



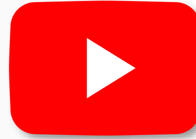






Economics 1st Paper

এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ১ম পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো







DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

সুচিপত্র

এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ১ম পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো



ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ





উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়





বাজার






মুদ্রা ও ব্যাংক





মডেল টেস্ট ও সলিউশন







ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ





ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

শিখনফল

- উপযোগ এবং উপযোগের ধারণা
- মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
- চাহিদা ও চাহিদা বিধি
- চাহিদা সূচি

২.১ উপযোগ(Utility)

কোনো দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচনের ক্ষমতাকে অর্থনীতিতে উপযোগ বলা হয়।

দ্রব্য বা সেবা যাই হোক না কেনো তা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারলেই তার উপযোগ আছে বলে মনে করতে হবে । যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, কলম, কাগজ প্রভৃতিদ্রব্য উপযোগবিশিষ্ট।

অতি সহজভাবে বলতে পারি, দ্রব্য বা সেবার যে ক্ষমতা মানুষের অভাব মেটাতে সক্ষম,সে ক্ষমতাকেই অর্থনীতিতে উপযোগ বলে।

অধ্যাপক মেয়ার্স (Professor Meyars) বলেন, **"উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের ওই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।"**

২.১ উপযোগ(Utility)

উপযোগ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে :

1) উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থ্যাৎ কোনো দ্রব্য ভালো বা মন্দ যাই হোক তা যদি কোনো মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে তার উপযোগ আছে। যেমন : মাদক দ্রব্য ক্ষতিকর হলেও যেহেতু এটি কোনো না কোনো মানুষের অভাব পূরণ করে সেহেতু এর উপযোগ আছে।

2) ভোক্তার রুচি, অভ্যাস,আয়, প্রভৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো দ্রব্যের উপযোগেরও পরিবর্তন ঘটে।

3) ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপর দ্রব্যের উপযোগ নির্ভর করে। পর্যায়গত উপযোগ ধারণায় এর সংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভব নয়।

4) ভোক্তার কাছে কোনো দ্রব্যের পরিমাণ বা ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.১ উপযোগের পরিমাপ (Measurement of Utility)

একটি দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে দ্রব্যটি নিঃশেষ করা হলে ভোক্তা ওই দ্রব্য থেকে উপযোগ লাভ করে। এই উপযোগ পরিমাপকে অর্থনীতিবিদরা সাধারণত দুটি দিক থেকে বিবেচনা করেন। যথা :

1) সংখ্যাগত বা পরিমাণবাচক উপযোগ **(Cardinal Utility)**

2) পর্যায়গত বা উপযোগ **(Ordinal Utility)**

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.১ উপযোগের পরিমাপ (Measurement of Utility)

1) সংখ্যাগত উপযোগ (Cardinal Utility):

অধ্যাপক মার্শালের মতে, "সংখ্যাগত উপযোগ পদ্ধতিতে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে পরস্পর যোগ করে মোট উপযোগ পরিমাপ করা হয়।" উপযোগ পরিমাপের একক (Util)।

আপেল	টাকা
১	২৫
২	২০
৩	১৫
৪	১০
৫	৫

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.১ উপযোগের পরিমাপ (Measurement of Utility)

2) পর্যায়গত পরিমাপ (Ordinal Utility): অধ্যাপক জে. আর. হিকস (J. R. Hicks), আর. জি. ডি. অ্যালেন (R.G.D. Allen) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের মতে,

"উপযোগ হলো একটি মানসিক ধারণা।" তাই ব্যক্তি একটি দ্রব্য ভোগ করে কী পরিমাণ উপযোগ পেলো তা সংখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা যায় না।

হিকস-অ্যালেনের মতে, "উপযোগ পর্যায়গতভাবে পরিমাণযোগ্য, সংখ্যাগতভাবে নয়।"

পর্যায়গত উপযোগ ভোক্তার পছন্দক্রমকে নির্দেশ করে। পছন্দক্রমের ভিত্তি হলো ১ম, ২য়, ৩য় এবং এ পছন্দক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগের মধ্যে তুলনা করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ থেকে পর্যায়গতভাবে (I, II, III) উপযোগ পরিমাপ করা হলে তাকে পর্যায়গত উপযোগ বলে।

❖ সংখ্যাগত উপযোগের ধারণা কে প্রদান করেন?

i) হিকস

ii) মার্শাল

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.২ উপযোগের ধারণা (Concepts of Utility)

উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। ক্লাসিকার অর্থনীতিবিদ মার্শাল **(Marshall)** তাঁর "Principles of Economics" গ্রন্থে সর্বপ্রথম উপযোগ ধারণাটি ব্যবহার করেন। মার্শাল উপযোগের ধারণাকে গাণিতিকভাবে তুলনাযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন। কোনো দ্রব্য ভোগের উপর ভিত্তি করে উপযোগের ধারণাসমূহ নিম্নরূপভাবে ব্যখ্যা করা যায়। যথা-

ক) প্রাথমিক উপযোগ **(Initial Utility)**

খ) প্রান্তিক উপযোগ **(Marginal Utility)**

গ) মোট উপযোগ **(Total Utility)**

২.১.৩ প্রাথমিক উপযোগ (Initial Utility)

যখন একজন ভোক্তা কোনো প্রথম একক ভোগ করে যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রাথমিক উপযোগ বলা হয়।

(Initial Utility means derived from the consumption of its first unit) এ উপযোগ সর্বদাই ধণাত্মক।

- ১ টা মিষ্টি কিনে খেলে ২০ টাকা দেয়। তাহলে ১ টা যেহেতু খেলো ২০ টাকা খরচ পড়লো, তাই উপযোগ ২০ ইউটিলস হবে।

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.৪ মোট উপযোগ (Total Utility)

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। (Total Utility is the total level of satisfaction of wants and needs obtained from the consumption of goods and services.)

মিষ্টি	টাকা
১	২৫
২	২০
৩	১০
৪	৫

২.১ উপযোগ(Utility)

২.১.৫ প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)

একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ একককটিকে বলা হয় প্রান্তিক একক।

এক প্রান্তিক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। অর্থ্যাৎ, বাড়তি বা অতিরিক্ত এক একক ভোগ থেকে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায় সেটিকে প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উপযোগ বলা হয়।

প্রান্তিক উপযোগ (MU) $= \frac{\Delta TU}{\Delta Q} = \frac{\text{মোট উপযোগের পরিবর্তন}}{\text{Q দ্রব্যের পরিবর্তন}}$; যেখানে MU=প্রান্তিক উপযোগ, TU=মোট উপযোগ।

প্রান্তিক উপযোগের প্রকারভেদঃ ৩ প্রকার-

- ধনাত্মক প্রান্তিক উপযোগ
- শুন্য প্রান্তিক উপযোগ
- ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য

সুতরাং, n এককের উপযোগ থেকে (n-1) এককের মোট উপাযোগ বাদ দিলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) পাওয়া যায়। প্রতীক চিহ্নে

$MU_{(n)}=TU_{(n)}-TU_{(n-1)}$

বিষয়	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
সংজ্ঞা	একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বোলে।	শেষ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
ধারণাগত	ভোগ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই মোট উপযোগ।	ভোগের সাপেক্ষে মোট উপযোগের পরিবর্তনের হার নির্দেশকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
প্রতীক চিহ্নে প্রকাশ	মোট উপযোগ = TU দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	প্রান্তিক উপযোগ = MU দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য

সুতরাং, n এককের উপযোগ থেকে (n-1) এককের মোট উপাযোগ বাদ দিলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) পাওয়া যায়। প্রতীক চিহ্নে

$MU_{(n)}=TU_{(n)}-TU_{(n-1)}$

বিষয়	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
সূত্র	$TU = \sum(MU1 + MU2 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + MUn)$	$(MU) = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$
মান	মোট উপযোগ ঋণাত্মক হয় না।	প্রান্তিক উপযোগ শুন্য হবার পর ঋণাত্মক ও হতে পারে।
ভোগের সাথে সম্পর্ক	পরপর ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়।	ভোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

❖ উপযোগ একটি-

ক) সার্বিক ধারণা

খ) মনস্তাত্ত্বিক ধারণা

কোনটি সঠিক?

i) $\mathrm{MU} = \frac{\Delta Q}{\Delta TU}$

ii) $\mathrm{MU} = \frac{\Delta \mathrm{TU}}{\Delta Q}$

২.১ উপযোগ(Utility)

তালিকার সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

দ্রব্যের একক (আপেল)	মোট উপযোগ (TU) (টাকায়) ইউটিলস	প্রান্তিক উপযোগ (MU) (টাকায়) ইউটিলস
১	৪০	৪০
২	৭০	৭০-৪০ = ৩০
৩	৯০	৯০-৭০ = ২০
৪	১০০	১০০-৯০ = ১০
৫	১০০	১০০-১০০ =০
৬	৯০	৯০-১০০ = -১০

প্রান্তিক উপযোগ (১-৩): হ্রাস পায়

প্রান্তিক উপযোগ (৪-৬): হ্রাস পায়, ঋণাত্মক

মোট উপযোগ (৪-৬): স্থির

২.১ উপযোগ(Utility)

প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

ক) মোট উপযোগ (TU) ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) হ্রাস পায় (১-৩ একক পর্যন্ত)

খ) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়।(৩-৪ একক পর্যন্ত)

গ) TU যখন সর্বাধিক,MU তখন শূণ্য হয়। (৫ম একক)

২.১ উপযোগ(Utility)

প্রান্তিক ও মোট উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

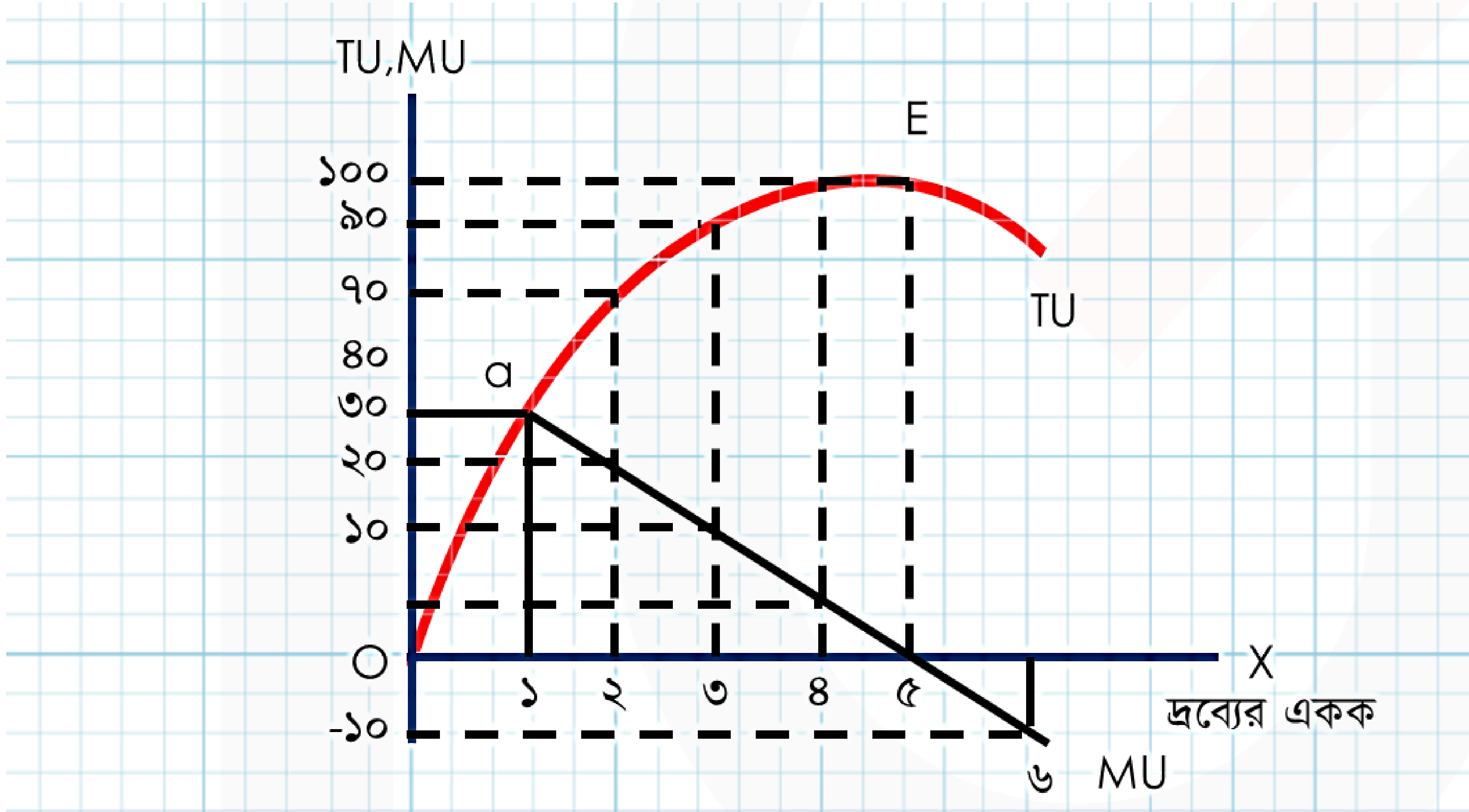
ঘ) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়। (৪র্থ এককে)

ঙ) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। (৬ষ্ঠ এককে)

চ) TU ঋণাত্মক হতে পারে না, MU ঋণাত্মক হয়। (৬ষ্ঠ একক থেকে)

ছ) মোট উপযোগ চাহিদা নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে না। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ চাহিদা ও দাম নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে।

চিত্রের মাধ্যমে পার্থক্য :



চিত্রের মাধ্যমে পার্থক্য :

উপরের চিত্রে লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU) নির্দেশিত এবং ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যাচ্ছে,দ্রব্যের ৩য় একক পর্যন্ত মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে সেই সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। ৩য় এককের পরে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে সেই সাথে MU রেখা নিম্নগামী হয়। TU যখন ৫ম এককের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হয় তখন MU শূণ্য হয় এবং এর পরবর্তি স্তরে TU কমে এবং সেটির সাথে সম্পর্ক রেখে MU ঋণাত্মক হয়। সুতরাং,ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে তার মোট উপযোগ বাড়ে (TU সর্বোচ্চের পূর্বে) কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

সামাজিক বিজ্ঞানে উপযোগবাদ হিসেবে উপযোগ তত্ত্বের অবতারণা করে ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham,1748-1831)। পরবর্তীকালে উইলিয়াম স্টেনলি জেভন্স (William Stanley Jevons, 1835-1882) বেনথামের উপযোগের ধারণাকে সম্প্রসারিত করে অর্থনীতিতে প্রয়োগ করেন। এরপর অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা যদি একটি দ্রব্যে ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তাহলে ওই দ্রব্যের অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে উপযোগ পায় তা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল 1890 সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Priniple of Economics' এ বলেন, "কোনো বিশেষ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে একজন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ কমতে থাকে। "

অর্থনীতিবিদ কে. ই. বোল্ডিং-এর মতে "অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ কোনোরূপ পরিবর্তন না করে ভোক্তা যদি বিশেষ কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করে তাহলে পরির্বতনীয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরিশেষ হ্রাস পাবেই। "

অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান বলেন, "আমরা কোনো দ্রব্য যতবেশী ভোগ করি,ততোই দ্রব্যটির কম পরিমাণ ভোগ করতে বা এর অতিরিক্ত ভোগ করতে চাই না"। সুতরাং, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে বলা হয়,একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা যদি একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তাহলে অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে উপযোগ পায় তা আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

বিধিটির অনুমিত শর্ত:

১. দ্রব্যের প্রতিটি এককের উপযোগ সংখ্যাগতভাবে (Cardinal Measurement) পরিমাপযোগ্য;

২. অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির;

৩. দ্রব্যের সকল একক সমজাতীয়;

৪. ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সময় বিরতি বা ব্যবধান নেই;

DOWNLOAD THE APP

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

10 MINUTE SCHOOL

বিধিটির অনুমিত শর্ত:

৫. ভোক্তার আচরণ যুক্তিশীল;

৬. ভোক্তার রুচি,আর্থিক আয় এবং পছন্দ স্থির থাকবে;

৭. উপযোগকে অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়;

৮. ভোগকৃত দ্রব্যের উপযোগ স্বাধীন বা অন্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না।

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

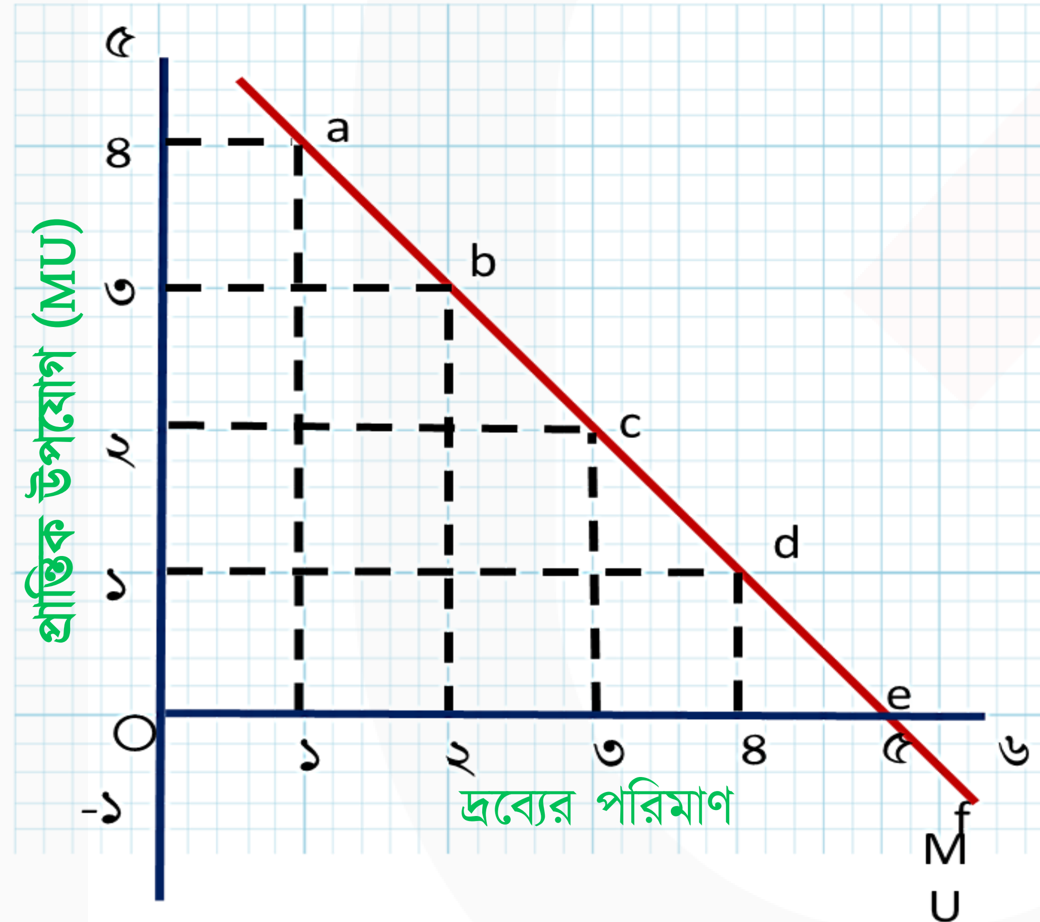
তালিকার সাহায্যে ব্যাখ্যা :

দ্রব্যের একক (আপেল)	মোট উপযোগ ইউটিলস	প্রান্তিক উপযোগ ইউটিলস
১	৪	৪
২	৭	৭ – ৪ = ৩
৩	৯	৯ – ৭ = ২
৪	১০	১০ – ৯ = ১
৫	১০	১০ – ১০ = ০
৬	৯	৯ – ১০ = -১

হ্রাস

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:



২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ (Q)এবং OY অক্ষে MU নির্দেশ করা হয়েছে। MU হলো প্রান্তিক উপযোগ রেখা। এ রেখার নিম্নগামীতাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। MU রেখা নিম্নগামী হওয়ায় অর্থই হলো দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

দ্রব্য ভোগের পরিমাণ 1 একক হলে MU হয় 4 ইউটিল,2 একক হলে MU হয় 3 ইউটিল,3 একক হলে MU হয় 2 ইউটিল,4 একক হলে MU হয় 1 ইউটিল এবং 5 একক হলে MU হয় 0 ইউটিল। ৬ষ্ঠ এককে অতৃপ্তি পায় অর্থ্যাৎ তারপর MU ঋণাত্মক হওয়ায়, MU রেখা আনুভূমিক অক্ষের নিচে অবস্থান করে। প্রাপ্ত a,b,c,d,e,f বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ MU পাওয়া যায়। এভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

বিধিটির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the law)

১. আয় ও রুচির পরিবর্তন

২. দ্রব্যের পরিমাণ

৩. শখের দ্রব্য

৪. পরিবর্তক দ্রব্য

৫. পরিপূরক দ্রব্য

২.২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)

বিধিটির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the law)

৬. অনুকরণপ্রীয়তা

৭. কৃপণ ব্যক্তি

৮. নেশাজাতীয় দ্রব্য

৯. সময়ের ব্যবধান

১০. দ্রব্যের গুণগত বিভিন্নতা

২.৩ চাহিদা(Demand)

সাধারণত কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে।

কিন্তু অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা চাহিদা হিসেবে ধরা হয় না।

চাহিদার সংজ্ঞায় বলা যায়, উপযুক্ত ক্রয় ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা সম্পর্কিত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে।

২.৩ চাহিদা(Demand)

অর্থনীতিতে কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে চাহিদা বলে গণ্য করতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত পালন করতে হয়। যথা-

ক) কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা (Willingness)।

খ) আকাঙ্ক্ষার পিছনে ক্রয়ের সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা (Ability of Purchasing Power)।

গ) অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা (Willingness to spend Money)।

২.৩ চাহিদা(Demand)

অর্থনীতিবিদ বেনহাম (Benham) বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাই হলো ওই দ্রব্যের চাহিদা।"

অধ্যাপক পেনসন (Penson) বলেন, "কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে।"

অধ্যাপক র‍্যাগন এবং থমাস (Ragan & Thomas) বলেন, "চাহিদার পরিমাণ হলো সে পরিমাণ দ্রব্য বা ভোক্তা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক ।"

অতএব,অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার সেই পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে চাহিদা বলে।

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.১ চাহিদা বিধি (Law of Demand)

সকল দ্রব্যের চাহিদা দামের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এই বিপরীত সম্পর্ক যখন কোনো বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে চাহিদা বিধি বলে।

অপেক্ষকের মাধ্যমে চাহিদা বিধির প্রকাশ: $Q(d) = f(d)$

যেখানে, Q(d) = চাহিদার পরিমাণ (Quantity of Demand), f = অপেক্ষক (Function), P = দাম(price)

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.১ চাহিদা বিধি (Law of Demand)

অধ্যাপক ডোমেনিক স্যালভেটর (Dominick Salvatore)-এর মতে, দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক হলো চাহিদা বিধি,যা চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির (Ceteris Paribus) বলতে ক. ভোক্তার আয়,রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তিত, খ. ভোক্তার যুক্তিশীল আচরণ, গ. বিবেচিত দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্থির, ঘ. ভোক্তার সংখ্যা স্থির, ঙ. সময় স্থির ইত্যাদিকে বোঝায়।

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.২ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demands)

১. রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন,

২. আয়ের পরিবর্তন,

৩. বিকল্প ও পরিপূরক পণ্য,

৪. জাঁকজমক বা ভেবলেন(Veblen) পণ্য,

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.২ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demands)

৫. গিফেন দ্রব্য,

৬. ভবিষ্যত আশঙ্কা,

৭. ঋতু বা সময় ,

৮. নিত্যপ্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ভোগ,

৯. ক্রেতার অজ্ঞতা।

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.৩ চাহিদা সূচি (Demand Schedule)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা একটি দ্রব্যেত বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা তালিকা বা চাহিদা সূচি বলে। অর্থ্যাৎ চাহিদা বিধিকে যখন গাণিতিক উপায়ে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটিকে চাহিদা সূচি বলে

দ্রব্যের দাম (P) টাকায়	চাহিদার পরিমান (Q_d) (একক)
৮	৪
৬	৮
৪	১২

২.৩ চাহিদা(Demand)

সাধারণত কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে।

চাহিদার সংজ্ঞায় বলা যায়, উপযুক্ত ক্রয় ক্ষমতা ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা সম্পর্কিত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে।

অর্থনীতিতে কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে চাহিদা বলে গণ্য করতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত পালন করতে হয়। যথা-

ক) কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা (Willingness)।

খ) আকাঙ্ক্ষার পিছনে ক্রয়ের সামর্থ্য বা ক্রয় ক্ষমতা (Ability of Purchasing Power)।

গ) অর্থ ব্যয় করে ক্রয়ের ইচ্ছা (Willingness to spend Money)।

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.১ চাহিদা বিধি (Law of Demand)

অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এই বিপরীত সম্পর্ক যখন কোনো বিধির মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে চাহিদা বিধি বলে।

অপেক্ষকের মাধ্যমে চাহিদা বিধির প্রকাশ:

$$Q_d = f(p)$$

যেখানে, Q(d) = চাহিদার পরিমাণ (Quantity of Demand), f = অপেক্ষক (Function), P = দাম(price)

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.১ চাহিদা বিধি (Law of Demand)

অধ্যাপক ডোমেনিক স্যালভেটর (Dominick Salvatore)-এর মতে, দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক হলো চাহিদা বিধি,যা চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির (Ceteris Paribus) বলতে –

ক. ভোক্তার আয়,রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তিত,

খ. ভোক্তার যুক্তিশীল আচরণ,

গ. বিবেচিত দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্থির,

ঘ. ভোক্তার সংখ্যা স্থির,

ঙ. সময় স্থির ইত্যাদিকে বোঝায়।

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.২ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demands)

১. রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন,

২. আয়ের পরিবর্তন,

৩. বিকল্প ও পরিপূরক পণ্য,



কফির দাম বাড়লে চাহিদা কমবে,অন্যদিকে বিকল্প দ্রব্য হিসেবে চায়ের চাহিদা তখন বাড়বে।
[কেননা কফির পরিপূরক চা]

৪. জাঁকজমক বা ভেবলেন(Veblen) পণ্য,



থর্সটেইন অর্থনীতিবিদ



জাঁকজমক ভোগ (Conspicuous Consumption)

২.৩ চাহিদা(Demand)

২.৩.২ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demands)

৫. গিফেন দ্রব্য, → নিত্য ব্যবহার্য (চাল,কাপড়,তেল) → দামের সাথে সাথে চাহিদা ও বেড়ে যায়।

৬. ভবিষ্যত আশঙ্কা,

৭. ঋতু বা সময় ,

৮. নিত্যপ্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ভোগ, → লবন,ঔষধ

৯. ক্রেতার অজ্ঞতা।

২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৩ চাহিদা সূচি (Demand Schedule)

কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা তালিকা বা চাহিদা সূচি বলে।

চাহিদা সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো—

দ্রব্যের দাম (P) (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q) (একক)
৮	৪
৬	৮
৪	১২



২.৩ চাহিদা (Demand)

চাহিদা সূচির ব্যাখ্যা:

সূচিতে লক্ষণীয় যে, দাম কমার কারণে চাহিদার পরিমাণ বেড়েছে। দাম যখন ৪ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 4 একক। দাম কমে 6 টাকা হলে চাহিদা বেড়ে 8 একক হয়। আবার দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদা বেড়ে 12 একক হয়। এভাবে দাম কমতে থাকলে চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ে। আবার দাম বাড়তে থাকলে চাহিদা ক্রমান্বয়ে কমে। এভাবেই চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।



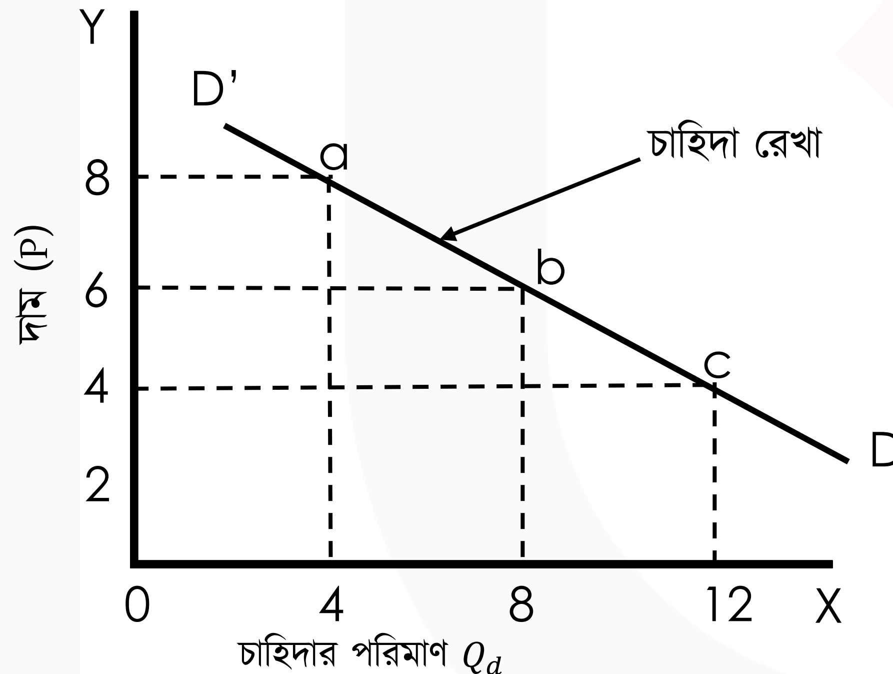
২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৪ চাহিদা রেখা (Demand Curve)

বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে তা যে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা রেখা বলে। চাহিদা সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলে চাহিদা রেখা। বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের কী পরিমাণ ক্রয় করে তা নির্দেশিত হয়। **(A demand curve is the graphical representation of the relationship between price and quantity of demand.)**

নিচে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কনের পদ্ধতি দেওয়া হলো—

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	বিন্দু
৮	৪	a
৬	৮	b
৪	১২	c



চিত্র: চাহিদা রেখা।



২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৪ চাহিদা রেখা (Demand Curve)

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ও OY অক্ষে b দাম (P) দেখানো হয়েছে। a বিন্দুতে ৪ টাকা দামে দ্রব্যটির। চাহিদা 4 একক। b ও c বিন্দুতে 6 টাকা ও 4 টাকা দামে চাহিদা যথাক্রমে ৪ একক ও 12 একক হয়। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD' রেখা পাওয়া যায়। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা। দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে। বিপরীতমুখী সম্পর্ক অর্থাৎ ঢাল ঋণাত্মক থাকায় চাহিদা রেখা। বামদিক থেকে ডানেদিকে নিম্নগামী হয়।

২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৫ কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

Draw a Demand Curve from an Imaginary Demand Schedule

১৮৩০ সালে অ্যান্টোনি আগস্টিন (Antoine Augustin Cournot) প্রথম চাহিদা রেখা অঙ্কন করেন। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা সূচি বলে একই তথ্য রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হলে তাকে চাহিদা রেখা বলে।



২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৫ কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

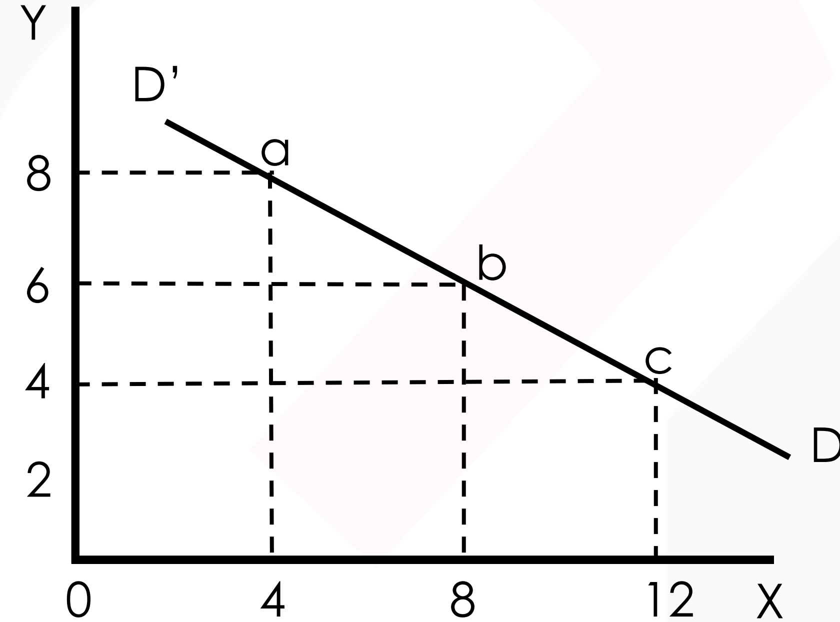
চাহিদা সূচি:

আমের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) (একক)
৮	৪
৬	৮
৪	১২

সূচিতে দেখা যায়, আমের দাম যখন 8 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 4 একক। দাম কমে 6 টাকা ও 4 টাকা হলে। চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে 8 একক ও 12 একক হয়। এ চাহিদা সূচিকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে একটি চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

২.৩.৫ কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

আমের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d) (একক)
8	4
6	8
4	12



চিত্র: সূচি থেকে চাহিদা রেখা।

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং OY অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করা হয়েছে। আমের দাম ৪ টাকা হলে চাহিদা 4 একক। হয়। এখন OY অক্ষের ৪ এবং OX অক্ষের ও সূচক বিন্দু থেকে লম্ব। আঁকলে এরা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হবে। দ্রব্যের দাম কমে 6 টাকা ও 4 টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 8 একক ও 12 একক হয়। এখান থেকে b ও c বিন্দু পাওয়া যায়। দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করলে DD' চাহিদা। রেখা পাওয়া যায়। চাহিদা রেখা সাধারণত বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। এভাবে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা আঁকা যায়।

২.৩ চাহিদা (Demand)

চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ
Reasons for Downward Sloping of Demand Curve to the Right

চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণসমূহ:

চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ হলো চাহিদা বিধি। চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দ্রব্য ও সেবার দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে। এ সম্পর্কের কারণেই চাহিদা বেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। তবে এ সম্পর্কে যেসব কারণ রয়েছে, তা হলো:

- **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি:** এ বিধি অনুযায়ী কোন দ্রব্যের ভোগ বাড়লে ভোক্তার নিকট তার প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগে দামের সমান হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগে বা দাম হ্রাস পাওয়ার কারণে তার ভোগে বা চাহিদা বাড়ে। আবার দাম বা প্রান্তিক উপযোগ বেশি হলে দ্রব্যের ভোগে বা চাহিদা কম হয়। এজন্য চাহিদা রেখা ডানে নিম্নগামী হয়।

২.৩ চাহিদা (Demand)

চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ
Reasons for Downward Sloping of Demand Curve to the Right

- **আয় প্রভাব:** দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতা একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য আগের চেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে। ফলে কতা তার উদ্বৃও অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় করে। পক্ষান্তরে, দাম বাড়লে ক্রেতার প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় তার চাহিদাও কমে যায়।

- **পরিবর্তক প্রভাব:** ধরি, গুড় ও চিনি দুটি পরিবর্তক দ্রব্য। গুড়ের দাম কমে গেলে ক্রেতা চিনির পরিবর্তে গুড় বেশি। কয় করে। এর ফলে সস্তা পণ্যটির চাহিদা বাড়ে। এজন্য দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক। সৃষ্টি হয় তা নিম্নগামী চাহিদা রেখার দ্বারাই প্রকাশ পায়।



২.৩ চাহিদা (Demand)

চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ
Reasons for Downward Sloping of Demand Curve to the Right

- **ক্রয়ক্ষমতা বা সামর্থ্য:** কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে তা অনেক ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে তার সামগ্রিক চাহিদা কমে। আবার দাম কমলে অনেক ক্রেতা সেটি ক্রয় করতে সমর্থ হয়। এভাবে দাম ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যায়- যা নিম্নগামী চাহিদা রেখার দ্বারা প্রকাশ হয়।

- **ঢাল ঋণাত্মক:** চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক; ফলে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন- কোন দ্রব্যের দাম 2 টাকা থেকে 4 টাকায় বৃদ্ধি পেলে, চাহিদার পরিমাণ ৪ একক থেকে হ্রাস পেয়ে 6 একক হলো।

সুতরাং, চাহিদা রেখার ঢাল $= \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} = \frac{d(Q_d)}{dP} = \frac{6-8}{4-2} = \frac{-2}{2} = -1 < 0,$ ঢাল ঋণাত্মক।

ফলে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৭ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা
Comparison between Demand Schedule and Demand Curve

চাহিদা সূচি এবং চাহিদা রেখা উভয়ই চাহিদা বিধির বহিঃপ্রকাশ। এদের মধ্যে পদ্ধতিগত তুলনা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. সংজ্ঞাগত: অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় সেটিকে চাহিদা সূচি বলে। অন্যদিকে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, সেটিকে চাহিদা রেখা বলে।

২. প্রকাশগত: চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা সূচি। আবার, চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা।

২.৩ চাহিদা (Demand)

২.৩.৭ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা
Comparison between Demand Schedule and Demand Curve

৩. নির্ভরশীলতা: চাহিদা সূচি, চাহিদা অপেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। চাহিদা রেখা, চাহিদা সমীকরণের ওপর নির্ভরশীল।

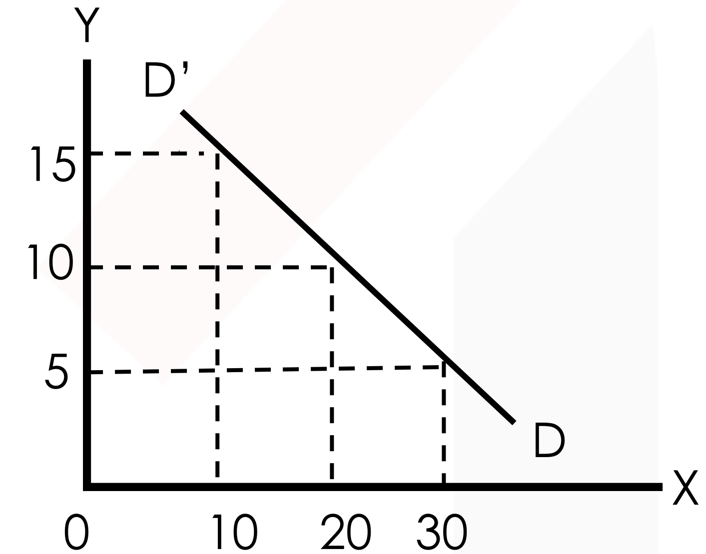
৪. উপস্থাপন পদ্ধতিগত: চাহিদা সূচিতে সাধারণত বামদিকে দাম এবং ডানদিকে চাহিদার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। চাহিদা রেখায় x বা ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (Q) এবং Y বা লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করা হয়।



২.৩.৭ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে তুলনা
Comparison between Demand Schedule and Demand Curve

৫. উদাহরণগত চাহিদা সূচি:

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৫	৩০
১০	২০
১৫	১০



চিত্র: চাহিদা রেখা।

সুতরাং, বলা যায় চাহিদা সুচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা— যা চাহিদা বিধির একই তথ্য প্রকাশের দুটি কৌশল আলোচনা করে থাকে।

২.৩.৮ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা
Individual Demand & Market Demand

ব্যক্তিগত চাহিদা (Individual Demand): একজন ভোক্তার চাহিদাকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে একজন ভোক্তার চাহিদার পরিমাণকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে।
এ অবস্থায় অনুমিত শর্ত হলো- ভোক্তার আয়, রুচি, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির ইত্যাদি। ব্যক্তিগত চাহিদা। সাধারণ চাহিদা বিধিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বাজার চাহিদা (Market Demand): বাজারের সকল ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিকে বাজার চাহিদা বলে। বাজার চাহিদা সুচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদার সমষ্টি দেখানো হয়। তাই বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ভোক্তার চাহিদার সমষ্টিকে বাজার চাহিদা বলে। এ অবস্থায় অনুমিত শর্ত হলো—ভোক্তাদের আয়, রুচি, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম স্থির। ভোক্তা একটি দ্রব্য বিভিন্ন দামে কী পরিমাণ ক্রয় করে সেটি তার ব্যক্তিগত চাহিদা সচি
থেকে জানা যায়।

বাজার চাহিদা সূচি: বাজারের সকলভোক্তার সমষ্টিগত চাহিদাকে সারণিতে উপস্থাপন করলে তাকে বাজার চাহিদা সূচি। বলে। নিচে দুইজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদা সূচি তৈরি করা হয়েছে তা দেখানো হলো

২.৩.৮ ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা
Individual Demand & Market Demand

দ্রব্যের দাম	১নং ভোক্তার চাহিদা (Q_1)	২নং ভোক্তার চাহিদা (Q_2)	বাজার চাহিদা (Q) $(Q = Q_1 + Q_2)$ (টাকায়)। দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
২০	৫	২০	৩৫
১৫	১০	১৫	২৫
১০	১৫	১০	১৫

উদাহরণ: দ্রব্যটির দাম যখন 2 টাকা তখন ১ম ভোক্তার চাহিদা 15 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 20 একক। ফলে। বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (15 + 20) = 35$ একক। আবার, দ্রব্যটির দাম বেড়ে 4 টাকা হলে ১ম ভোক্তার চাহিদা 10 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 15 একক, ফলে বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (10 + 15) = 25$ একক। একইভাবে দ্রব্যটির দাম আরও বেড়ে 6 টাকা হলে ১ম ভোক্তার চাহিদা 5 একক এবং ২য় ভোক্তার চাহিদা 10 একক, ফলে বাজার চাহিদা হলো $D = D_1 + D_2 = (5 + 10) = 15$ একক।

২.৩.৯ চাহিদার নির্ধারক
Determinants of Demand

একজন ক্রেতা কোন দ্রব্য কী পরিমাণ ক্রয় করবে তা কতকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলোকে চাহিদার নির্ধারক বলে। অর্থাৎ যেসব বিষয় বা অবস্থা একটি দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে, সেগুগুলোকে একত্রে চাহিদার নির্ধারক বলে। নিচে চাহিদার নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো-

- **দব্যের দাম:** দ্রব্যের দামের ওপর তার চাহিদা বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্রব্যের দাম কমলে সাধারণত চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে।
- **বিকল্প দ্রব্যের দাম:** বিকল্প দ্রব্যের দাম চাহিদাকে প্রভাবিত করে।
- **পরিপূরক দ্রব্যের দাম:** কোন দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হলে তার চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। যেমন— গাড়ি ও পেট্রোলের ক্ষেত্রে পেট্রোলের দাম বাড়লে, গাড়ির চাহিদা কমে
- **ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস:** ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তিত হলে চাহিদা প্রভাবিত হয়। কোন কারণে রুচির পরিবর্তন ঘটলে, আলোচ্য দ্রব্যটি ভোক্তার কাছে বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠলে তার চাহিদা বাড়ে।

২.৩.৯ চাহিদার নির্ধারক
Determinants of Demand

- **ক্রেতার আয়:** চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে আয় অন্যতম । আয় বাড়লে ক্রেতার চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমলে চাহিদা কমে।
- **জনসংখ্যার পরিবর্তন:** দেশে জনসংখ্যা বাড়লে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে। ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে।
- **ঋতুর পরিবর্তন:** ঋতু পরিবর্তনের ফলে চাহিদা প্রভাবিত হয়। গরমের দিনে বৈদ্যুতিক পাখা, পাতলা কাপড়, ঠাণ্ডা পানীয় এবং শীতের দিনে গরম কাপড়, লেপ, তোশকের চাহিদা বাড়ে।
- **সম্পদ বণ্টনের পরিবর্তন:** সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর চাহিদা বাড়ে। ফলে সুষম বণ্টনে চাহিদা বাড়ে এবং অসম বণ্টনে চাহিদা কমে।
  সঞ্চয়: সঞ্চয় প্রবণতার পরিবর্তন হলে চাহিদা প্রভাবিত হয়
- **জীবনযাত্রার মান**
- **দামের ভবিষ্যৎ গতি**

২.৩.১০ অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক
Function, Variable and Constant

অপেক্ষক (Function): সাধারণভাবে ফাংশনের অর্থ হলো কোন কাজ বা কর্মকাণ্ড। দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলে।

দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক প্রকাশের গাণিতিক পদ্ধতিকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলে।

অন্যভাবে, যে সমীকরণের সাহায্যে নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের সম্পর্ক দেখানো হয় তাকে অপেক্ষক বলে।

যদি একটি আওতা বা এলাকার (domain) মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কোন একটি চলকের মানের জন্য বিবেচ্য নির্ভরশীল চলক Y এর পাল্লা (range) পাওয়া যায় তবে Y কে X এর ফাংশন বলে। যেমন-Y চলক, X এর ওপর নির্ভরশীল।
হলে Y = f (X)।

- ❑ ঠিক কেনটা?

✔ 1. $Q = f(p)$ 2. $Q = f(D)$ 3. $Q = f(x)$

২.৩.১০ অপেক্ষক, চলক এবং ধ্রুবক
Function, Variable and Constant

অন্যভাবে দুটি চলক বা রাশি X ও Y যদি এরূপ সম্পর্কযুক্ত হয় যে, X এর প্রতিটি মানের জন্য Y এর অনুরূপ একটি। মান পাওয়া যায়, তবে Y কে X এর অপেক্ষক বা ফাংশন বলে। তখন Y =f(X) হয়।

চাহিদার পরিমাণ (Q), দামের (P) ওপর নির্ভরশীল হলে Q = f(P), একটি চাহিদা অপেক্ষক। ব্যয় (C), উৎপাদনের (Q) ওপর নির্ভরশীল হলে C = f(Q), একটি ব্যয় অপেক্ষক। অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে।

$Q = f(P)$ এখানে কোনটা স্বাধীন?

উত্তর : P



চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

চলক (Variable) : যে প্রতীক বা রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তাকে চলক বলে। অর্থাৎ যে সাংকেতিক চিহ্নের মান পরিবর্তনশীল অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান ধারণ করে, তাকে চলক বলে। সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার শেষের দিকের বর্ণগুলো চলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন- P, Q, R, X, Y, Z, তবে অন্য ভাষার বর্ণও চলক হতে পারে;
যেমন— গ্রিক বর্ণ-

অর্থনৈতিক চলক (Economic Variable): অর্থনীতিতে ব্যবহৃত যেসব বিষয় ও রাশি পরিবর্তনশীল, সেসব বিষয়কে অর্থনৈতিক চলক বলে। অর্থাৎ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত চলকসমূহকে অর্থনৈতিক চলক বলে। যেমন- D = চাহিদা,
S =যোগান, P = দাম, Q = পরিমাণ, Y = আয়, C= ভোগ, I =বিনিয়োগ, π = মুনাফা, L= শ্রম, K = মূলধন ইত্যাদি।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

চলকের প্রকারভেদ (Types of Variable):

নির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে চলক দুই প্রকার। যথা—

১. স্বাধীন চলক (Independent Variable): যে চলক অন্য চলকের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করতে সক্ষম, তাকে স্বাধীন চলক বলে। যেমন দাম = P স্বাধীন চলক।

২. নির্ভরশীল চলক (Dependent Variable): যে চলক অন্য চলকের ওপর নির্ভরশীল এবং নিজেই নিজের মান। নির্ধারণ করতে পারে না, তাকে নির্ভরশীল বা অধীন চলক বলে।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

$Q = f(P)$

স্বাধীন চলক কোনটি?

=p

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

স্বাধীন চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে তুলনা:

- অপেক্ষকে যে চলকের ওপর ইচ্ছা মতো মান আরোপে করা হয় তাকে স্বাধীন চলক বলা হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন চলকের বিভিন্ন মানের ওপর যে চলকের মান নির্ভর করে তাকে নির্ভরশীল চলক বলে।
- স্বাধীন চলক অন্য চলকের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু নির্ভরশীল চলক তা পারে না।
- $Q = f(P)$, এখানে P স্বাধীন চলক এবং Q নির্ভরশীল চলক।
- স্বাধীন চলক সাধারণত সমান (=) চিহ্নের ডানদিকে থাকে কিন্তু অধীন চলক সমান (=) চিহ্নের বাম দিকে থাকে।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

স্বাধীন চলক ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে তুলনা:

- একটি অপেক্ষকে এক বা একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে পারে কিন্তু একটি অপেক্ষকে একটি মাত্র অধীন চলক থাকে।
- স্বাধীন চলক স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু অধীন চলক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।
- গণিতে স্বাধীন চলককে সাধারণত ভূমি অক্ষে দেখানো হয় এবং অধীন চলককে লম্ব অক্ষে দেখানো হয়।
- অর্থনীতিতে স্বাধীন চলককে সাধারণত লম্ব অক্ষে দেখানো হয় কিন্তু অধীন চলককে ভূমি অক্ষে দেখানো হয়।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

ধ্রুবক (Constant)

একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে বস্তু বা বিষয়ের মান পরিবর্তিত হয় না, অর্থাৎ স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে তাকে ধ্রুবক বলে। সংক্ষেপে, যার মান পরিবর্তিত হয় না তাকে ধ্রুবক বলে।
যেমন: 1, 5, 7, e, π এবং a, b, c ইত্যাদি। ধ্রুবক দুই প্রকার। যেমন—

i. সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক: যাদের মান স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক বলে। যেমন: 5, 7, π , e

ii. ইচ্ছামূলক ধ্রুবক: যাদের মান ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য সেগুলোকে ইচ্ছামূলক ধ্রুবক বলে। যেমন: a, b, c

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য

1. পরিবর্তনশীল কোন তথ্য বা বৈশিষ্ট্যকে চলক বলে। অন্যদিকে, ধ্রুবক হলো চলকের বিপরীত অবস্থা। যে মান বা রাশির পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলে।

2. চলক যেকোন মান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ধুবক একটি মাত্র মান গ্রহণ করে।

3. চলক সাধারণত স্বাধীন চলক ও অধীন চলক, বাহ্যিক চলক ও অভ্যন্তরীণ চলক হতে পারে। অন্যদিকে, ধ্রুবক দুই প্রকার। সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক ও ইচ্ছামূলক ধ্রুবক ।

4. সাধারণত চলক ইংরেজি বর্ণমালা X, Y, Z, P, K ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অপরপক্ষে, ধ্রুবককে 1, 2, 3, e প্রভৃতি গাণিতিক সংখ্যা এবং গ্রিক বর্ণমালা α, β, γ ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

5. চলক গতিশীল রাশি। অন্যদিকে ধ্রুবক স্থিতিশীল রাশি।

6. চলক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান গ্রহণ করে বলে এর গড় মানও বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু ধ্রুবক সর্বদা একই মান গ্রহণ করে বলে এর গড় মান এবং প্রাথমিক মান একই থাকে।

7. চলক অপেক্ষকে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে কিন্তু ধ্রুবক চলকের সাথে সহগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

8. চলক তথ্যসারির গুণ বা পরিমাণ প্রকাশ করে কিন্তু ধ্রুবক প্রাকৃতিক সংখ্যা প্রকাশ করে।

চলক এবং ধ্রুবক
Variable and Constant

পরামিতি (Parameter)

গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলে। কোন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় স্থির কিন্তু কখনো পরিবর্তনশীল হিসেবে বিবেচিত হয় তাকে পরামিতি বলে। যেমন— অর্থনীতিতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাকে পরামিতি হিসেবে ধরা হয়। পরামিতিকে সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার আদ্যন্তর a, b, c অথবা গ্রিক বর্ণমালা α, β, γ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চাহিদা অপেক্ষক
Demand Function

যে অপেক্ষক বা সমীকরণের সাহায্যে চাহিদার পরিমাণের সাথে দামের বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা অপেক্ষক বলে।

চাহিদা বিধির বীজগাণিতিক রূপকে চাহিদা সমীকরণ বলে।

চাহিদা অপেক্ষক $D = Q_d = f(P)$. যেখানে, D = চাহিদা, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, f = ফাংশন বা অপেক্ষক, P = দাম।

চাহিদা অপেক্ষক থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন: ধরি, চাহিদা সমীকরণ $D = a - bP$, বা, $Q_d = 10 - 2P$

যেখানে, $D = Q_d$ = চাহিদার পরিমাণ, $a = 10$ (ছেদক), $b = -2$ (চাহিদা রেখার ঢাল)

চাহিদা অপেক্ষক
Demand Function

অন্তরকলনের সাহায্যে, চাহিদা রেখার ঢাল $\frac{dD}{dp} = \frac{d}{dp}(a - bp) = 0 - b = -b < 0$

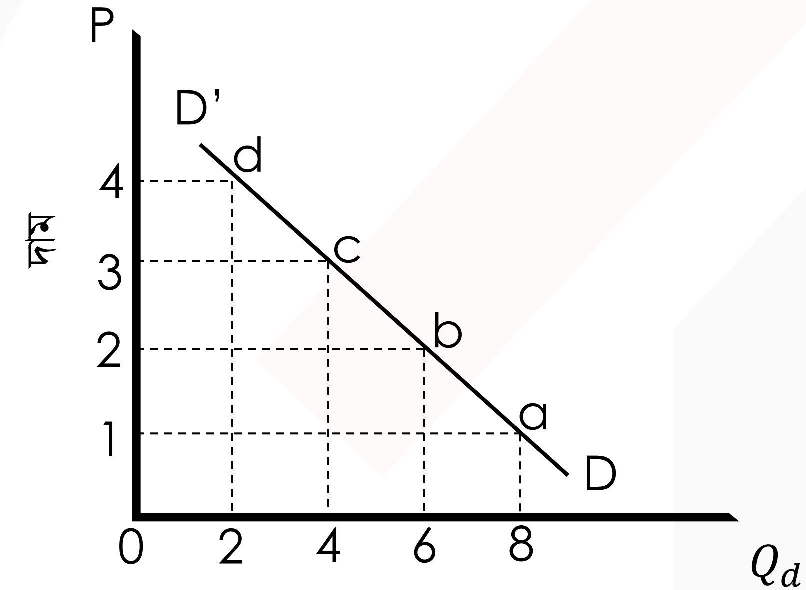
সংখ্যামানের অপেক্ষকের সাহায্যে $\frac{d(Q_d)}{dp} = \frac{d}{dp}(10 - 2p) = 0 - 2 = -2 < 0$

চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক, ফলে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এটিই চাহিদা বিধি । উপরের সমীকরণে ($Q_d = 10 - 2P$) P এর বিভিন্ন মানে Q_d এর বিভিন্ন মান পাওয়া যায়। যেমন—

p	১	২	৩	৪
Q_d	৮	৬	৪	২

চাহিদা অপেক্ষক
Demand Function

উপরের সূচি থেকে পাশে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো।



চিত্র: চাহিদা রেখা।

দ্রব্যটির দাম যখন 1 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 8 একক হয়। যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এরপর দাম বেড়ে 2, 3, 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 6, 4, 2 একক হয়। যা চিত্রে যথাক্রমে b, c, d বিন্দু দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে DD' চাহিদা রেখা পাওয়া যায়, যা বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী, ফলে চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব, বিধি, উপসিদ্ধান্ত আলোচনা করা হয়। যেমন- সাধারণ ধারণা ও বিধি হিসাবে চাহিদা যোগান, ভারসাম্য, উৎপাদন, আয়, ব্যয়, মুনাফা,ভোগ, সঞ্চয় বিনিয়োগ ইত্যাদি। এসব ধারণা ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রেখাচিত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ থেকেই এসব রেখাচিত্র পাওয়া যায়।
নিচে এসব সমীকরণ আলোচনা করা হলো ।

ক. সরলরৈখিক বা একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ ও রেখা:

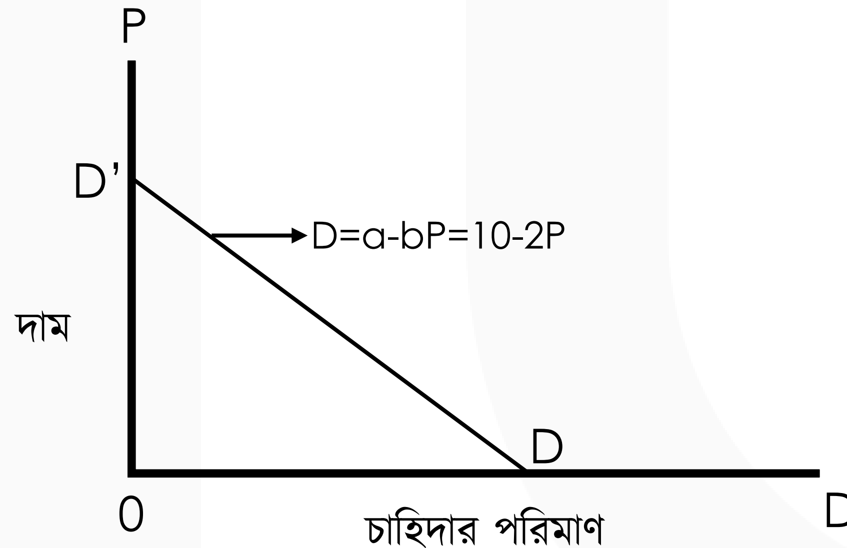
সাধারণত দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ $D = a - bP$.
এখানে D = দ্রব্যের চাহিদা, P = দ্রব্যের দাম, a = ধনাত্মক ছেদকমান (পরামিতি), b = ঢাল।
সংখ্যামানে চাহিদা সমীকরণ $D = 10-2P$

অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

খ. বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রেখার ব্যাখ্যা: বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রেখার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

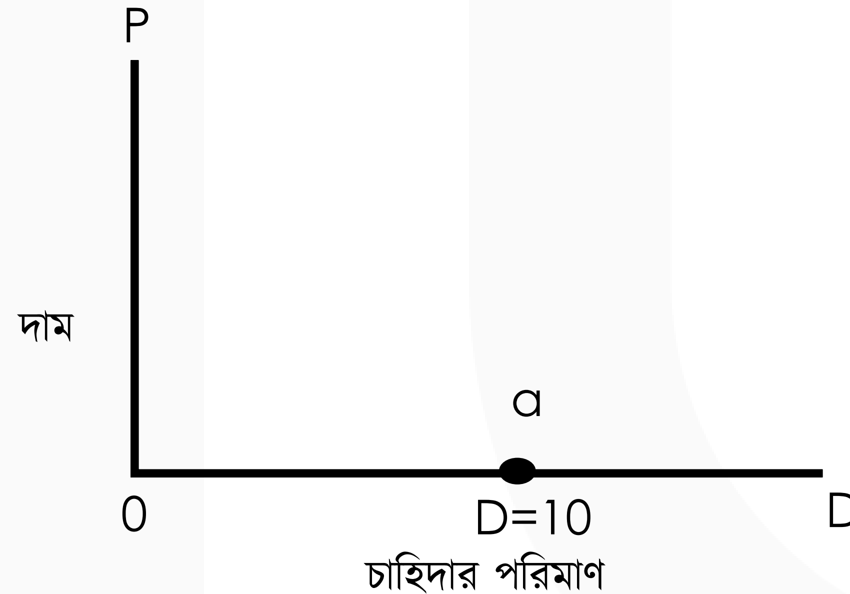
i. $D = a - bP$ বা, $D = 10\text{-}2P$

স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখা হয়ে থাকে।



অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

ii. $D = a$ অর্থাৎ দাম $P = 0$ হলে $D = 10$, স্বাধীন বা মুক্ত দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা থাকে। তখন চাহিদা রেখা DD' ভূমি অক্ষের সাথে মিশে থাকে।

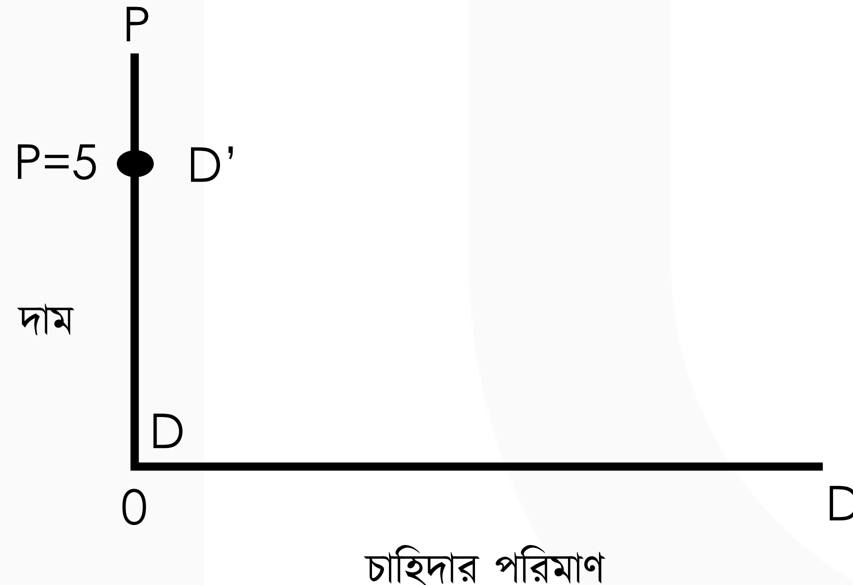


অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

iii. $D = 10 - 2P = 0$ অর্থাৎ চাহিদা পরিমাণ শূন্য।

বা, $-2P = -10 \quad \therefore P = \frac{10}{2} = 5$

দাম P = 5 টাকা হলে চাহিদা শূন্য হবে। অর্থাৎ ভোক্তা আর দ্রব্যটি কিনবে না। ফলে রেখাটি লম্ব অক্ষের সাথে মিশে থাকবে।

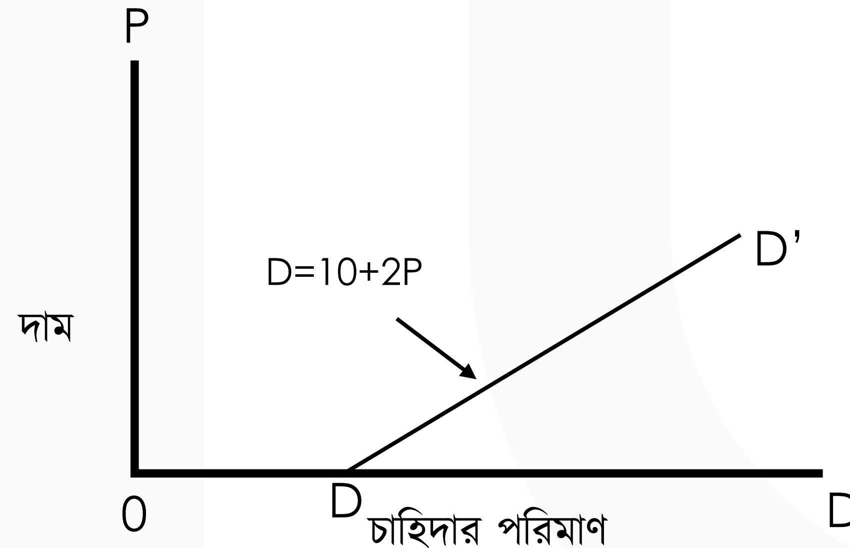


অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

iv. $D = a + bp$ বা, $D = 10 + 2P$

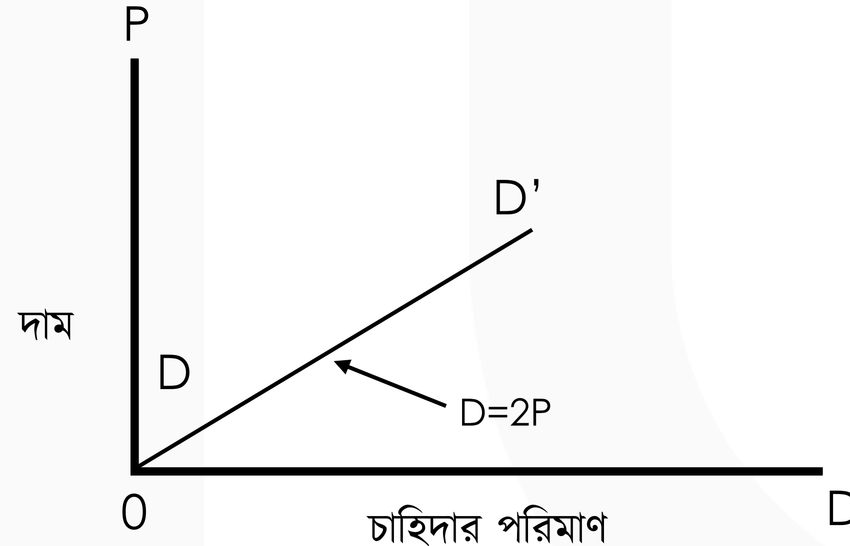
ছেদক মান ও ঢাল ধনাত্মক।

ব্যতিক্রমধর্মী চাহিদা রেখা, যা বিলাসজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়।



v. $D = bP$;

ছেদক মান শূন্য, কিন্তু ঢাল ধনাত্মক, যা নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা মূল বিন্দু থেকে উর্ধ্বগামী হয়।



অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

গ. অ-একমাত্রিক চাহিদা সমীকরণ ও রেখা: বিপরীত অপেক্ষক তথা সমপরাবৃত্তাকার চাহিদা রেখার সমীকরণ নিম্নরূপ:

i. $Q = \frac{C}{P^a}$;

ii. $D = \frac{10}{P}$;

iii. $PQ = 10$;

iv. $PQ = 15$;

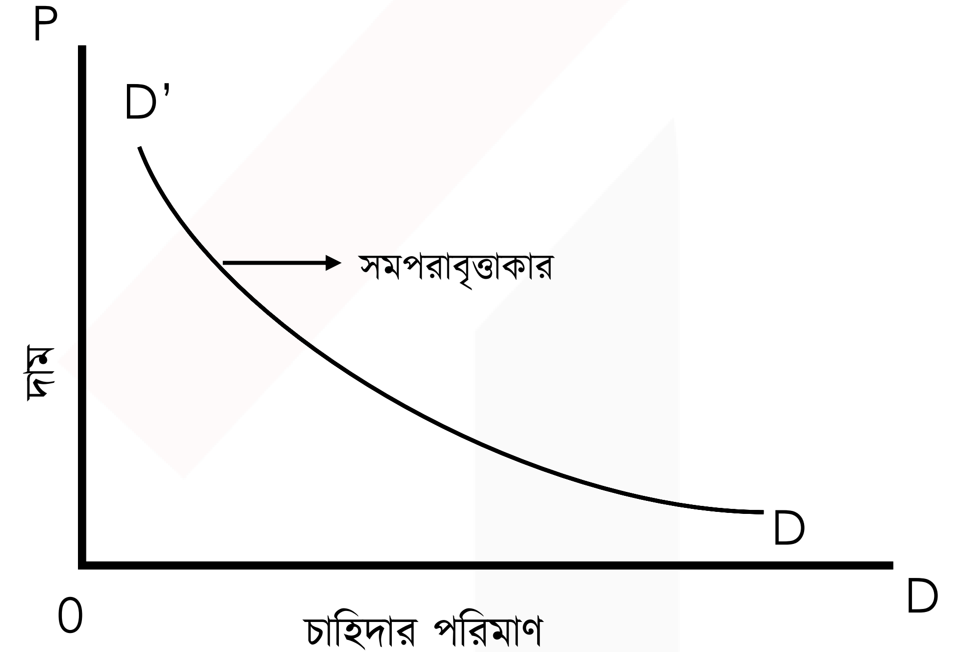
v. $X = \frac{16}{p}$;

vi. $D = \frac{10}{P^2}$;

vii. $D = \frac{1}{2p}$;

অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে সচরাচর ব্যবহৃত রেখার সমীকরণসমূহ
Equation of Different Curves Normally Used in Economic Theory

এসব চাহিদা অপেক্ষকসমূহ বিপরীত অপেক্ষক; ফলে চাহিদা রেখাসমূহ সমপরাবৃত্তাকার হবে। যার চিত্ররূপ পাশে দেখানো হলো।



জেনে রাখো:

অত্যন্ত নিম্ন আয়সম্পন্ন পরিবারের মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক বিরাজ করে, যা স্যার গিফেনের নামানুসারে এ নিম্নমানের দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। যেমন— চাল, ডাল, লবণ, কাপড় ইত্যাদি।

রেখার ঢাল।
(Slope of a Line)

অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান সর্বদাই পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যায় ঢালের গুরুত্ব অপরিসীম। ঢাল মূলত স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের কতটুকু পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করে। একটি রেখার ঢাল স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের (ΔX) ফলে নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তনের (ΔY) অনুপাত নির্দেশ করে। সংক্ষেপে

কোন রেখার উল্লম্ব বা উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঢাল বলে।

অধ্যাপক জে, এফ র‍্যাগান এবং এল বি থমাস এর মতে, “একটি চলকের এক একক পরিবর্তনের ফলে অন্য চলকটির কতটুকু পরিবর্তন হয় ঢাল সেটা দেখায়। সুস্পষ্টভাবে ঢাল হলো কোন লেখচিত্রের আনুভূমিক পরিবর্তন ও উল্লম্ব পরিবর্তনের অনুপাত।”

২.৩.১৪ রেখার ঢাল। (Slope of a Line)

ঢালের ত্রিকোণমিতিক ব্যাখ্যা:

কোণের পরিমাণ θ হলে tangent $\theta = \tan\theta = \dfrac{\text{সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব}}{\text{সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি}}$ = কে বোঝায়।

অর্থাৎ, $\tan\theta = \dfrac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$

২.৩.১৪ রেখার ঢাল।
(Slope of a Line)

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা:

স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে ঢাল বলে। একটি সূত্রের সাহায্যে সরলরেখার ঢাল নির্ণয় করা যায়। যেমন—

$$\text{ঢাল} = \frac{\text{নির্ভরশীল চলকের পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}} = \frac{\text{লম্ব দূরত্ব}}{\text{ভূমির দূরত্ব}} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{OY_2 - OY}{OX_2 - OX}$$ ভূমির দূরত্ব

$$= \frac{\text{Y এর বর্তমান অবস্থান থেকে পূর্বের অবস্থান}}{\text{X এর বর্তমান অবস্থান থেকে পূর্বের অবস্থান}}$$

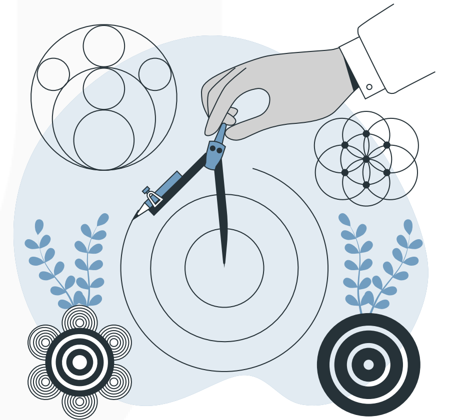


২.৩.১৪ রেখার ঢাল। (Slope of a Line)

কোন অপেক্ষককে স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে অধীন চলকের পরিবর্তনের হার নির্ণয়কে ঢাল বলে।

যদি $Y = f(X)$ হয় তবে, ঢাল (slope)= $\frac{dY}{dX} = \frac{\text{Y অক্ষগত পরিবর্তন}}{\text{x অক্ষগত পরিবর্তন}}$

গাণিতিকভাবে, কোন অপেক্ষকের বিবেচ্য চলকের সাপেক্ষে প্রথম অন্তরকলনের মানকে ঢালের মান বলে।



বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল (ঋণাত্মক ঢাল)
Slope of Downward linear Curve (Negative Slope)

কোন সরল রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হলেও ঢাল নির্ণয়ের সূত্র একই। তবে এক্ষেত্রে শুধু ঢালের মানের চিহ্ন হবে ঋণাত্মক (negative)। ধরা যাক, AB রেখা ডানদিকে নিম্নগামী একটি সরল রেখা যার P বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে হবে। আরও ধরা যাক, AB সরল রেখার সমীকরণ $Y = 20 - 4X$। এক্ষেত্রে X এর বিভিন্ন মানে Y এর যে বিভিন্ন মান পাওয়া যায় তা নিচের তালিকায় দেখানো হলো—

X	০	১	২	৩	৪	৫
Y	২০	১৬	১২	৮	৪	০
সংমিশ্রণ বিন্দু	M	N	P	Q	R	S

বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখার ঢাল (ঋণাত্মক ঢাল)
Slope of Downward linear Curve (Negative Slope)

তালিকায় প্রাপ্ত জোড়া মান গুলো চিত্রে উপস্থাপন করে AB সরল রেখা পাওয়া যায়। AB সরল রেখা বামদিকে থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। কেননা x এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে Y এর মান হ্রাস পাচ্ছে। ধরা যাক, P বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করতে হবে। এখন AB রেখার উপর আরও একটি বিন্দু Q নেওয়া হলো ।

P বিন্দুর স্থানাঙ্ক = (X_1, Y_1) বা $(2, 12)$

এবং Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক $=$ $(3,8)$ বা (X_2, Y_2)

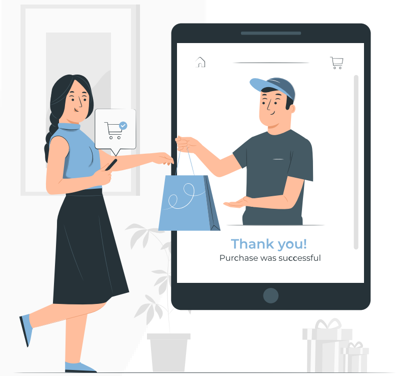
সুতরাং, P বিন্দুতে ঢাল $= \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{8-12}{3-2}$

$$= \frac{-4}{1} = -4 < 0$$

$\therefore$ AB সরলরেখার ঢাল ঋণাত্মক।

স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity

চাহিদা বিধি দ্রব্য বা সেবার দাম ও পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখায়। কিন্তু দামের শতাংশিক পরিবর্তনে চাহিদার কত পরিবর্তন হয় তা চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা করতে পারে না, যা করা হয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে। চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা মূল্যতত্ত্বে, কর ধার্যে, রপ্তানি ও আমদানি শুল্ক নির্ধারণে, বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয়ে এবং কৃষিপণ্যের দাম উঠানামার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত স্থিতিস্থাপকতা বলতে, চলকের পরিবর্তনের মাত্রা বা হারকে বোঝায়। **অর্থনীতিতে কোন অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।** অর্থনীতিতে স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত অন্যান্য অবস্থা (দ্রব্যের নিজ দাম, আয় ও সম্পর্ক দ্রব্যের দাম প্রভৃতি) স্থির থেকে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করে।



স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity

ধরি, চালে দাম শতকরা ১০% বাড়লো তা হলো চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো:

১. চাহিদা কি শুধু ১০% কমবে?

২. চাহিদা কি ১০% এর চেয়ে বেশি কমবে?

৩. চাহিদা কি ১০% এর চেয়ে কম কমবে? এগুলো অর্থাৎ দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন, কেমন হবে তা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করে। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়। যেমন- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, যোগান স্থিতিস্থাপকতা, আয় স্থিতিস্থাপকতা, ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা, পরিবর্তক স্থিতিস্থাপকতা ও আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Demand

চাহিদা বিধি অনুযায়ী দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তনের হার সব সময় সমান হয় না। তাই

দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক (%) পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক (%) পরিবর্তন ঘটে, তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কখন বেশি, কম, সমান বা শূন্য ও অসীম হতে পারে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে সাধারণত E_d অথবা E_p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Demand

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪) এর মতে, 'দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে দ্রুত বা ধীরগতিতে পরিবর্তিত হয় তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন-এর মতে, "দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ কীভাবে সাড়া দেয় চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা তা পরিমাপ করে।" অর্থনীতিবিদ লিপসি এর মতে, ''কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের সাথে চাহিদা যে পরিমাণে সাড়া দেয়, তাকেই চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা বলে।''

$$\text{চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা } (E_d) = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ}}$$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Demand

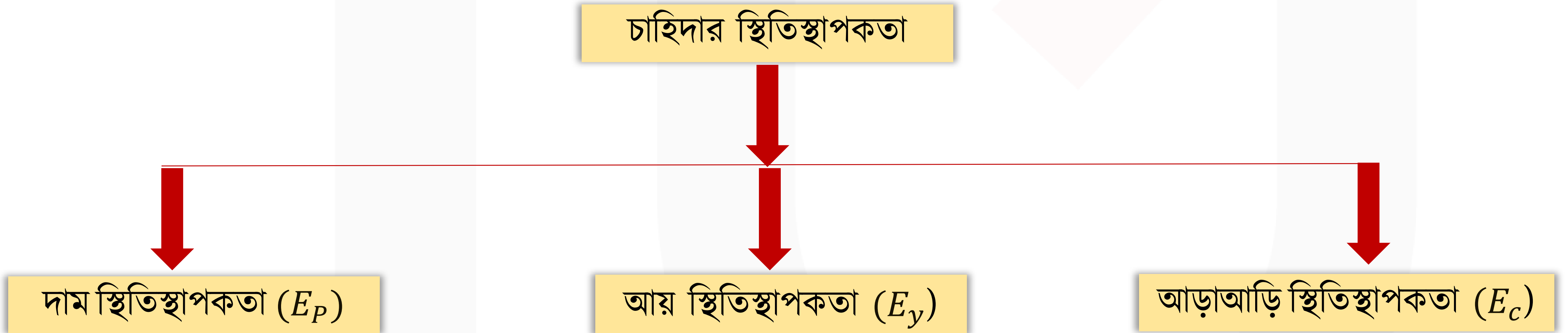
চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা (E_d)= $\frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}} \times \frac{\text{প্রাথমিক দাম}}{\text{প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ}}$

$$\therefore\ E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q};$$

যেখানে, ΔQ= চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ, ΔP = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ, P = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ, E_d = চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

কোন দ্রব্যের চাহিদা তার নিজ দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয় ও সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দামের ওপর নির্ভর করে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

১. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand বা E_P): কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয়, তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ **দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতই হলো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা।**

অর্থনীতিবিদ রিচার্ড জর্জ লিপসি বলেন, চাহিদার শতকরা পরিবর্তনকে দামের শতকরা পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতাকেই বোঝায়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

$$\text{চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা } (E_P) = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তন } (\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক চাহিদা } (Q)}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন } (\Delta P)}{\text{প্রাথমিক দাম } (P)}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P}$$

যেখানে,

E_d = E_P = চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা।

Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ।

P = প্রাথমিক দাম।

ΔQ = চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন।

ΔP = দামের পরিবর্তন।

$$\therefore E_d = E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

উদাহরণ:

একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 8 টাকা হলে চাহিদা 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 24 একক হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত?

এখানে, P = 10, P_1 = 8, Q= 20, Q_1 = 24, $\Delta Q = Q_1 - Q = 24 - 20 = 4$

$\Delta P = P_1 - P$ = 8 - 10 $= -2$,

সুতরাং $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{4}{-2} \times \frac{10}{20} = -1$

$\therefore E_P = |-1| = 1$ (পরম মান ধরে)

- ✓ নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।
- ✓ চাহিদার প্রকারভেদ ৫ টি অর্থাৎ ৫ প্রকার।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

২. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand বা E_y) :

দ্রব্যের দাম স্থির থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। **ক্রেতার আয়ের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদা শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুইয়ের অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।**

অর্থনীতিবিদ **রিচার্ড জর্জ লিপসি** বলেন, “আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।”

অর্থনীতিবিদ **স্যামুয়েলসন ও নরধাউস** বলেন, এ পদ চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তনের আয়ের শতকরা পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করা বোঝায় যখন অন্য বিষয় স্থির থাকে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা } (E_y) = \frac{\text{চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্ধ্তন } (\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক চাহিদা } (Q)}}{\dfrac{\text{আয়ের পরিবর্তন } (\Delta Y)}{\text{প্রাথমিক দাম } (Y)}}$$

$$= \frac{\dfrac{\Delta Q}{Q}}{\dfrac{\Delta Y}{Y}} \qquad = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{Y}{\Delta Y}$$

$$\therefore E_y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q}$$

যেখানে,

E_y = চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।
Q = প্রাথমিক চাহিদা।
Y = প্রাথমিক আয়।
ΔQ = চাহিদার পরিবর্তন।
ΔY = আয়ের পরিবর্তন।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

তাৎপর্য: আয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

1. আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হলে $(E_y > 0)$ দ্রব্যটি হবে স্বাভাবিক বা সাধারণ দ্রব্য।
2. আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হলে $(E_y < 0)$ দ্রব্যটি হবে নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্য।

উদাহরণ: এক ব্যক্তির আয় 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হলো এবং এর ফলে দ্রব্যের চাহিদা 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 একক হলো। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর। এখানে,

$Y = 100$, $Y_1 = 200$, $Q = 20$, $Q_1 = 25$, $\Delta Q = Q_1 - Q = 25 - 20 = 5$, $\Delta Y = Y_1 - Y = 200 - 100 = 100$

$$\therefore \; E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \times \frac{Y}{Q} = \frac{5}{100} \times \frac{100}{20} = 0.25 > 0$$

এখানে E_Y ধনাত্মক, তাই দ্রব্যটি স্বাভাবিক বা সাধারণ দ্রব্য।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

৩. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity of demand) : দুটি সম্পর্কযুক্ত (পরিবর্তক বা পরিপূরক) দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন ঘটে এ দুয়ের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা অথবা চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হলো, দুটি দ্রব্য X ও Y এর মধ্যে Y দ্রব্যের দামের আনুপাতিক পরিবর্তনের ফলে X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে আনুপাতিক পরিবর্তন। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

$$\text{চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা } (E_C) = \frac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{Y দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন } (\Delta Q_X)}{\text{X দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা } (Q_X)}}{\dfrac{\text{Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন}(\Delta P_Y)}{\text{Y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম } (P_Y)}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta Q_X}{Q_X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}} = \frac{\Delta Q_X}{Q_X} \times \frac{P_Y}{\Delta P_Y}$$

$$\therefore E_C = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X}$$

যেখানে,

E_C = চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।

ΔQ_X = X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন।

Q_X = X দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ।

ΔP_Y = Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন।

P_Y = Y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

তাৎপর্য: আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

১. $E_C > 0$ (ধনাত্মক) হলে পরিবর্তক দ্রব্য যেমন: চা, কফি।

২. $E_C < 0$ (ঋণাত্মক) হলে পরিপূরক দ্রব্য যেমন: চা, চিনি।

৩. $E_C = 0$ (শূন্য) হলে সম্পর্কহীন বা মুক্ত দ্রব্য যেমন: চাল ও আপেল।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
Classification of Elasticity of Demand

উদাহরণ :

ধরি, X (চা) এবং Y (কফি) দুটি পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য। Y দ্রব্যের দাম 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 200 টাকা হওয়ায় X দ্রব্যের চাহিদা 10 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 একক হয়। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর

$$E_C = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X} = \frac{15-10}{200-100} \times \frac{100}{10} = \frac{5}{100} \times \frac{100}{10} = \frac{1}{2}$$

$\therefore E_C = \frac{1}{2} = 0.5 > 0$ যেহেতু $E_C > 0$, তাই x (চা) এবং Y (কফি) দ্রব্য দুটি পরস্পরের বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও

২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

1. **স্থিতিস্থাপক চাহিদা:** সাধারণত দ্রব্যের দামের সামান্য পরিবর্তন হলে চাহিদার যদি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তলে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যভাবে, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার যদি বেশি হয়। তবে এদের পরিবর্তনের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 8 টাকা হলে, এর চাহিদা 100 একক থেকে 200 এককে বৃদ্ধি পায়।

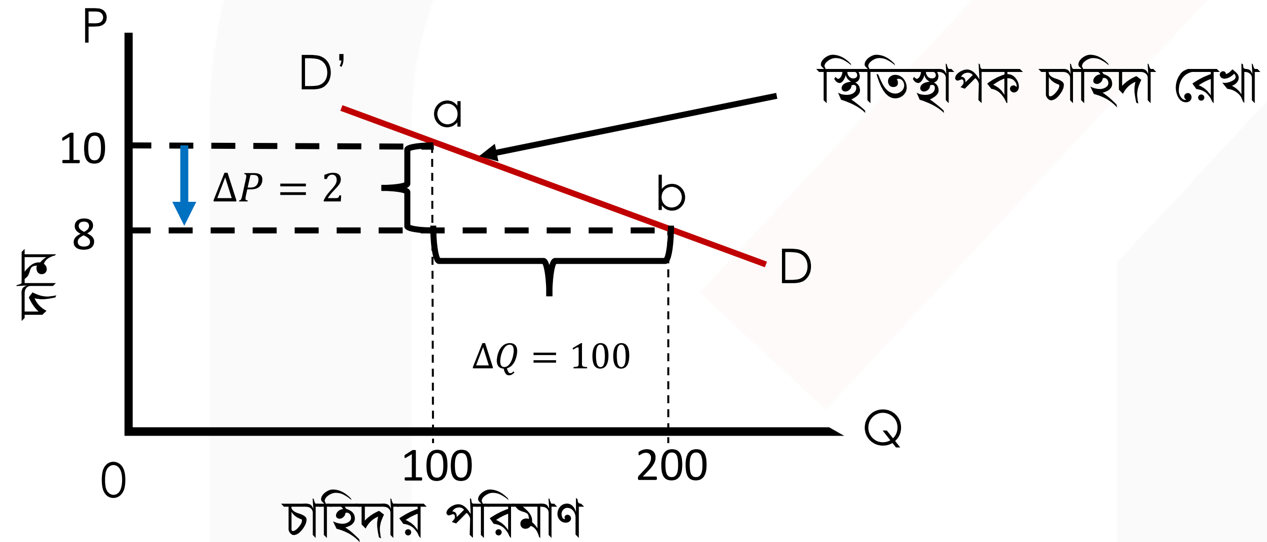
ফলে দামের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta P}{P} \times 100 = \frac{(8-10)}{100} \times 100 = -2\%$

চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta Q}{Q} \times 100 = \frac{(200-100)}{100} \times 100 = 100\%$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_P = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{100\%}{-2\%} = |-50| = 50$ (পরম মান ধরে)।

যেহেতু চাহিদা অধিক হারে পরিবর্তিত হয়েছে তাই $E_P = 50 > 1$ তাই এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে।
যেমন— টিভি, মূল্যবান গহনা, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদি (P) | বিলাসজাত দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তাই এসব দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। এককের চেয়ে অধিক হয় অর্থাৎ $E_P > 1$ হয়।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand



চিত্রের ব্যাখ্যা: ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে চাহিদার দাম নির্দেশিত হয়েছে। দাম 10 টাকা থেকে 8 টাকায় হ্রাস পাওয়ায়, চাহিদা 100 একক থেকে 200 একক হয়। ফলে দামের পরিবর্তন ΔP = 2% এবং চাহিদার পরিবর্তন ΔQ = 100%। ফলে $E_P > 1$, তাই এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

2. **অস্থিতিস্থাপক চাহিদা:** কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে, যদি চাহিদার বিশেষ বা তেমন কোন পরিবর্তন না হয়, তবে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি চাহিদার পরিবর্তনের হার কম হয়, তবে তাদের পরিবর্তনের অনুপাতকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে 5 টাকা হলে, চাহিদা 100 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 110 একক হয়।

ফলে দামের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta P}{P} \times 100 = \frac{(5-20)}{20} \times 100 = -75\%$

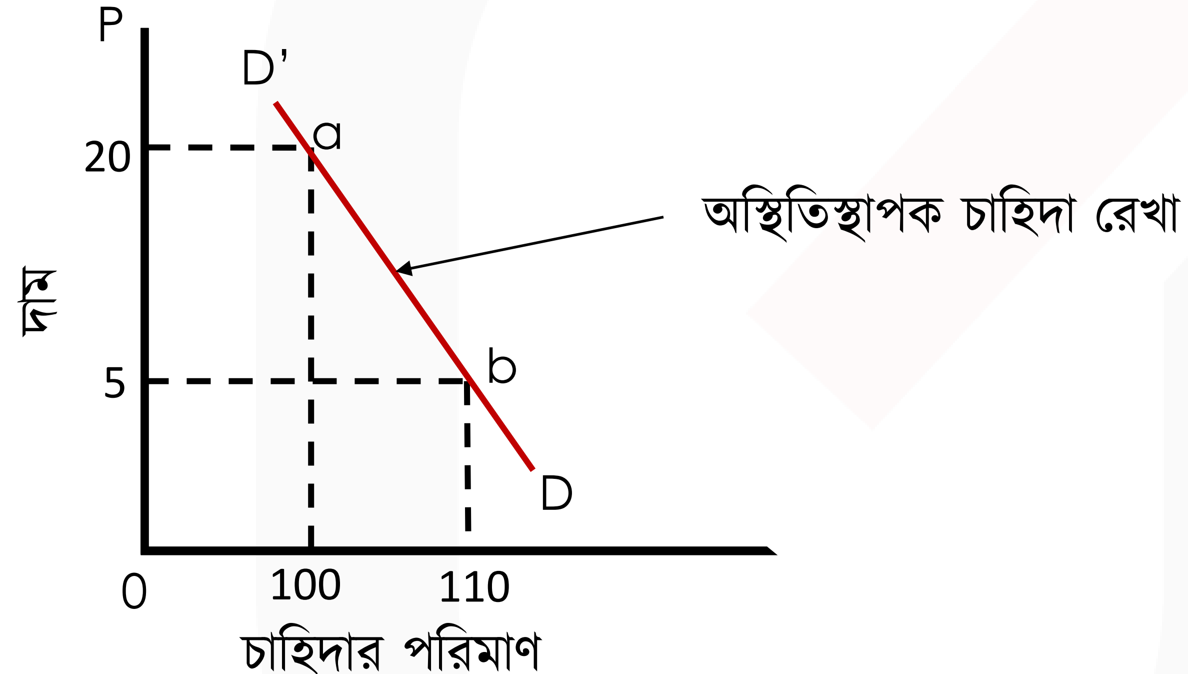
চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta Q}{Q} \times 100 = \frac{(110-100)}{100} \times 100 = 10\%$

$\therefore E_d = E_P = \frac{10\%}{75\%} = |-0.13| = 0.13$ (পরম মান ধরে)।

যেহেতু $E_P = 0.13 < 1$, তাই এটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে

যা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস চাল, লবণ, তেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঘটে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand



চিত্রের ব্যাখ্যা: ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম 20 টাকা থেকে 5 টাকায় হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা 100 একক থেকে 110 একক হয়েছে, ফলে দামের শতকরা পরিবর্তনের হার -75% এবং চাহিদায় শতকরা পরিবর্তনের হার 10% যা $E_P = 0.13 < 1$, তাই এখানে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা প্রকাশ পেয়েছে।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো–

১. সংজ্ঞাগত : দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণ পরিমাণের পরিবর্তনের হার অধিক হলে, তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। অন্যদিকে, দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

২. স্থিতিস্থাপকতাগত : স্থিতিস্থাপক চাহিদার মান $(1 < E_d < \infty)$ এককের অধিক কিন্তু অসীমের চেয়ে কম। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মান $(0 < E_d < 1)$ শূন্যের বেশি কিন্তু এককের চেয়ে কম।

৩. দ্রব্যের প্রকারভেদগত : বিলাস দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন- গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন— চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে তুলনা
Comparison between Elastic and inelastic Demand

৪. দামপ্রভাবগত : স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব অধিক হয়। অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব কম হয়।

৫. চাহিদার ঢালের দিক থেকে : স্থিতিস্থাপক চাহিদার ঢাল কম হয়। আর অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ঢাল অধিক হয়।

৬. নিকট পরিবর্তক দ্রব্যগত: কোন দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য হলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। কোন দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য না হলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ:

1. মোট ব্যয় পদ্ধতি
2. সংখ্যাসূচক পদ্ধতি
3. মোট আয় পদ্ধতি
4. জ্যামিতিক পদ্ধতি:
    i. **বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পদ্ধতি**
    ii. **বৃত্তচাপ স্থিতিস্থাপকতা পদ্ধতি**

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

নিচে মোট ব্যয় পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো:

মোট ব্যয় পদ্ধতি (Total Outlay Method) : অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল মোট ব্যয় পদ্ধতির প্রবক্তা। এ পদ্ধতি অনুযায়ী, কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির ওপর ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিবর্তন তুলনা করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

i. একক স্থিতিস্থাপকতা,

ii. এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা,

ii. এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা,

iv. শূন্য স্থিতিস্থাপকতা ও

v. অসীম স্থিতিস্থাপকতা।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

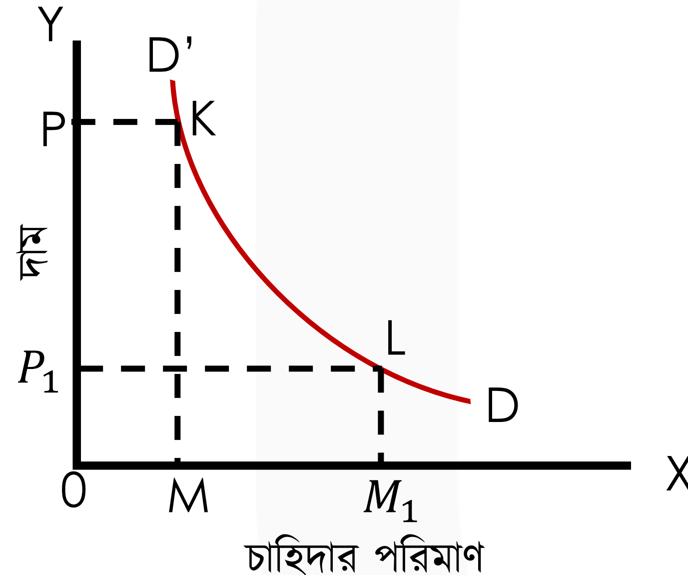
i. **একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity, $E_P = 1$) :** কোন দ্রব্যের দাম বাড়া বা কমার ফলে ক্রেতার মোট ব্যয়ের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তবে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয়।

নিচের সূচি ও চিত্রে তা দেখানো হলো–

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় ($TC = P \times Q$)	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	12	$4 \times 12 = 48$	$\frac{48}{48} = 1$ অর্থাৎ এককের সমান $\therefore E_P = 1$
3	16	$3 \times 16 = 48$	

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

উপরের তালিকায় দেখা যায় দ্রব্যের দাম 4 টাকা থেকে কমে 3 টাকা হলে তার চাহিদা 12 একক থেকে বেড়ে 16 একক হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয় 48 টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান।



চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন OP তখন OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয়। এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হলো OP x OM = OPKM আয়তক্ষেত্রের সমান। দাম কমে OP_1 হলে চাহিদা বেড়ে হয় OM_1। এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ আয়তক্ষেত্রের $OP_1 \times OM_1 = OP_1LM_1$ সমান। এক্ষেত্রে OPKM $= OP_1LM_1$ হওয়ায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান এবং চাহিদা রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার হয়।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

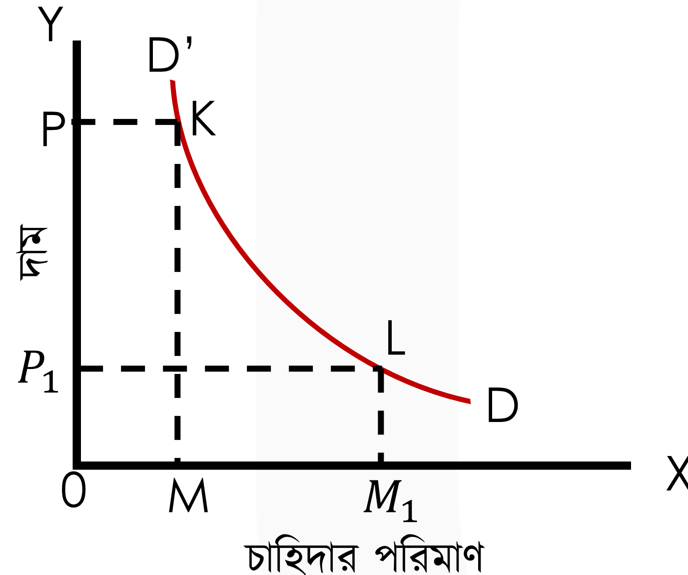
i. **একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity, $E_P = 1$):** কোন দ্রব্যের দাম বাড়া বা কমার ফলে ক্রেতার মোট ব্যয়ের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তবে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয়।

নিচের সূচি ও চিত্রে তা দেখানো হলো–

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় $(TC = P \times Q)$	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	12	$4 \times 12 = 48$	$\frac{48}{48} = 1$ অর্থাৎ এককের সমান $\therefore E_P = 1$
3	16	$3 \times 16 = 48$	

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

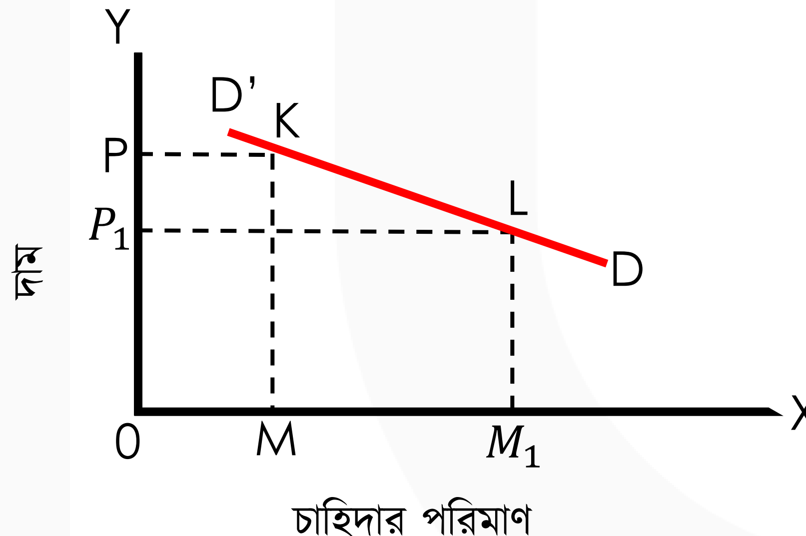
উপরের তালিকায় দেখা যায় দ্রব্যের দাম 4 টাকা থেকে কমে 3 টাকা হলে তার চাহিদা 12 একক থেকে বেড়ে 16 একক হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয় 48 টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান।



চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন OP তখন OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হয়। এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হলো OP x OM = OPKM আয়তক্ষেত্রের সমান। দাম কমেমোটহলে চাহিদা বেড়ে হয় OM_1এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ আয়তক্ষেত্রের $OP_1 \times OM_1 = OP_1LM_1$ সমান। এক্ষেত্রে OPKM $= OP_1LM_1$ হওয়ায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান এবং চাহিদা রেখাটি সমপরাবৃত্তাকার হয়।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

ii. এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity Greater Than Unit, $E_P > 1$) : কোন দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে তা ক্রয়ের জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে বাড়ে অথবা দাম বাড়ার ফলে মোট ক্রয় যদি আগের চেয়ে কমে, তাহলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয়।



OP দামে চাহিদার পরিমাণ OM

মোট ব্যয়ের পরিমাণ $OPKM$ আয়তক্ষেত্রের সমান ।

দাম কমে OP_1 হওয়ায় চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় OM_1

ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ OP_1LM_1 আয়তক্ষেত্রের সমান ।

এখন, $OP_1LM_1 > OPKM$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় ($TC = P \times Q$)	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	20	$4 \times 20 = 80$	$\frac{120}{80} = 1.5$ অর্থাৎ এককের চেয়ে বেশি Ep > 1
3	40	$3 \times 40 = 120$	

তালিকায় দেখা যায়, দ্রব্যের দাম 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক এবং মোট ব্যয় হয় ৪০ টাকা। দাম কমে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 40 একক এবং মোট ব্যয় দাড়ায় 120 টাকা। এভাবে দাম কমার দরুন মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদি আগের চেয়ে বাড়ে এবং দাম বাড়ার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে বেশি হয়।

❑ $E_C = 0$ হলে কোন দ্রব্য ?

১। মুক্ত দ্রব্য ✓ ২। সাধারণ দ্রব্য

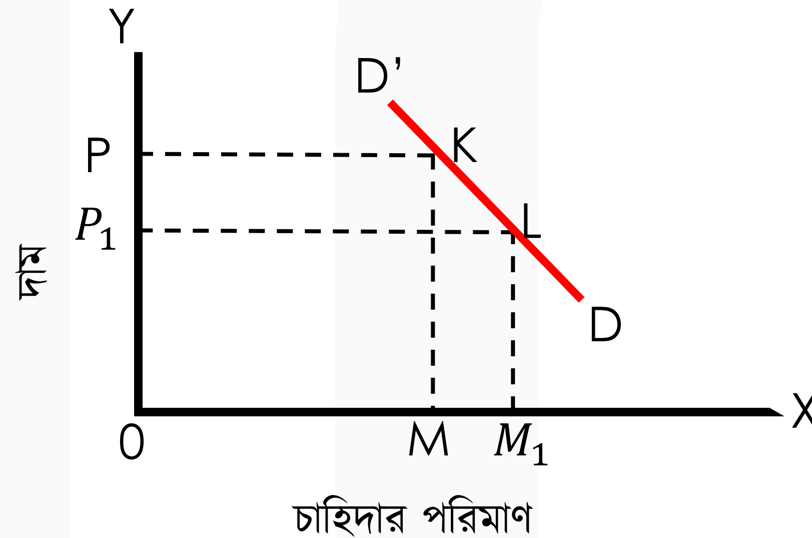
দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

iii. এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity Less than Unit, $E_P < 1$) : কোন দ্রব্যের দাম কমার ফলে তা ক্রয়ের জন্য ক্রেতার মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে কমে এবং দাম বাড়ার ফলে মোট ব্যয় যদি আগের চেয়ে বাড়ে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম হয়। সূচিতে দেখা যায়, 4 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক এবং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 80 টাকা। দাম কমে 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 22 একক হলে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় 66 টাকা। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম হয়।

প্রতি এককের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় $(TC = P \times Q)$	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (E_P)
4	20	$4 \times 20 = 80$	$\frac{66}{80} = 0.83$ অর্থাৎ এককের চেয়ে বেশি । $\therefore E_P < 1$
3	22	$3 \times 22 = 66$	

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো—



OP দামে চাহিদার পরিমাণ হল OM এবং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ OPKM আয়তক্ষেত্রের সমান হয়। দাম কমে OP_1 হওয়ায় চাহিদার পরিমাণ হয় OM_1। এক্ষেত্রে ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ OP_1LM_1 আয়তক্ষেত্রের সমান। এখন $OP_1LM_1 < OPKM$। তাই এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের চেয়ে কম।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

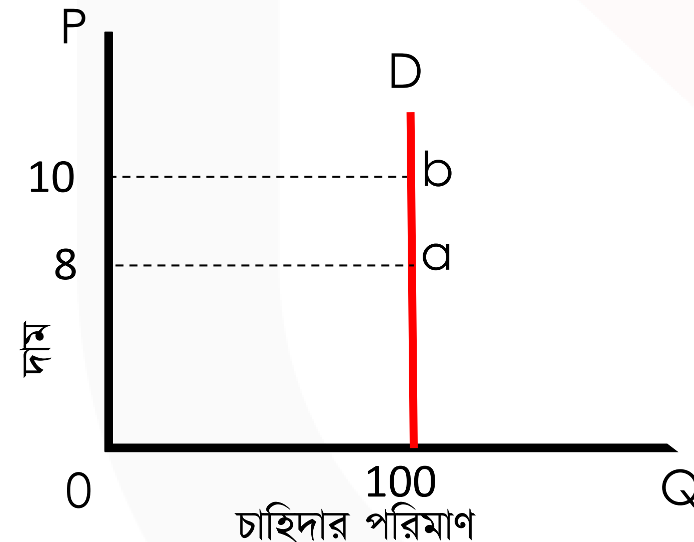
iv. শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero Elasticity, $E_P = 0$) : দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার শতকরা কোন রকম পরিবর্তন না হয় তবে তাকে শূন্য বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের পরিবর্তনে চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, ফলে চাহিদা রেখা দাম বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।

ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 8 টাকা থেকে 10 টাকা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু চাহিদার পরিমাণ 100 এককে স্থির থাকে।

$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{100-100}{10-8} \times \frac{8}{100} = \frac{0}{2} \times \frac{8}{100} = 0$ দাম বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

iv. শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero Elasticity, $E_P = 0$) : দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার শতকরা কোন রকম পরিবর্তন না হয় তবে তাকে শূন্য বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এখানে দামের পরিবর্তনে চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, ফলে চাহিদা রেখা দাম বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।

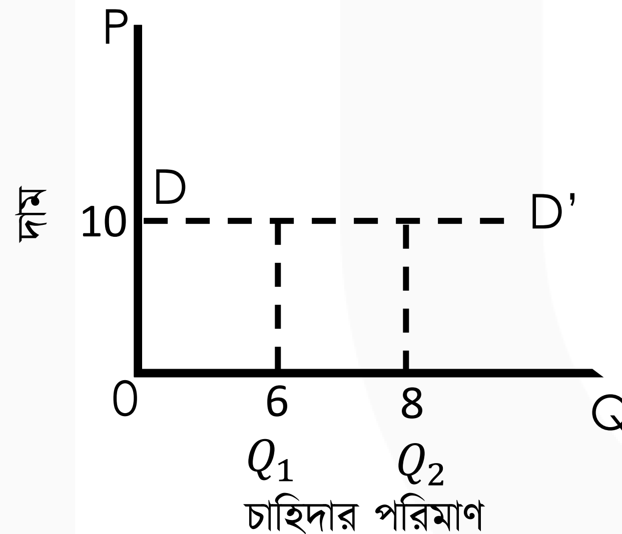


দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different Methods of Measuring Price Elasticity

V. অসীম স্থিতিস্থাপকতা (Infinite Elasticity $E_P = \propto$) : দ্রব্যের দাম স্থির থেকে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। তখন চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় D এবং দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। যেমন: দাম 10 টাকায় স্থির অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 6 একক এবং 8 একক হলে।

স্থিতিস্থাপকতা, $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{8-6}{10-10} \times \frac{10}{6} = \frac{2}{0} \times \frac{10}{6} = \frac{20}{0} = \propto$

শুধু পূর্ণ প্রতিযোগিতা ফার্মের ক্ষেত্রে বাজারে দ্রব্যের দামের সূক্ষ্ম হ্রাস বৃদ্ধির ফলে চাহিদার সীমাহীন পরিবর্তন ঘটলে, এ রকম চাহিদা রেখার সৃষ্টি হয়।



চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
Price of Elasticity Demand

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাঁচ প্রকার। যথা :

i. এককের সমান চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ($E_P = 1$) ;

ii. একক অপেক্ষা অধিক চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ($E_P > 1$) ;

iii. একক অপেক্ষা কম চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ($E_P < 1$) ;

iv. শূন্যের সমান চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ($E_P = 0$) ;

v. অসীমের সমান চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ($E_P = \propto$) ;

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য
Difference between Elastic and Inelastic Demand

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	স্থিতিস্থাপক চাহিদা	অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
১. সংজ্ঞা	দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার অধিক হলে এদের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।	দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হলে এদের অনুপাতকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।
২. স্থিতিস্থাপকতা	স্থিতিস্থাপক চাহিদার মান $(1 < E_d < \propto)$ একের অধিক কিন্তু অসীমের চেয়ে কম	অস্থিতিস্থাপকতা চাহিদার মান $(0 < E_d < 1)$ শূন্যের বেশি কিন্তু এক অপেক্ষা কম।

৩. তালিকা

স্থিতিস্থাপক: দাম (P)	স্থিতিস্থাপক: চাহিদার পরিমাণ (Q)	অস্থিতিস্থাপক: দাম (P)	অস্থিতিস্থাপক: চাহিদার পরিমাণ(Q)
10	100	10	100
9	120	9	105
পরিবর্তন 10%	20%	পরিবর্তন 10%	5%

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য
Difference between Elastic and Inelastic Demand

পার্থক্যের বিষয়	স্থিতিস্থাপক চাহিদা	অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
৪. মোট ব্যয়	দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে মোট ব্যয় হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়	দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে মোট ব্যয় হ্রাস পায়
৫. রেখাচিত্র	দামের পরিবর্তন (ΔP) অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন (ΔQ) অধিক।	দামের পরিবর্তন (ΔP) অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন (ΔQ) কম।
৬. দ্রব্যের প্রকারভেদ	বিলাসজাতীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে এটা ঘটে। যেমন—এসি, ভি.সি.আর. ইত্যাদি।	নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে এটা ঘটে। যেমন—চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি।
৭. দাম প্রভাব	স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব অধিক	স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব কম
৮. নিকট পরিবর্তক	কোন দ্রব্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য হলে এক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।	অন্যদিকে নিকট পরিবর্তক দ্রব্য সহজলভ্য না হলে, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য
Difference between Elastic and Inelastic Demand

স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সার-সংক্ষেপ :

স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান	দ্রব্যের শ্রেণি	উদাহরণ
এককের সমান চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা $E_d = 1$ (চিহ্ন অবজ্ঞা করে)	সাধারণ দ্রব্য	মাছ, মাংস, বস্ত্র; যেগুলোর ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন প্রায় সমান।
একক অপেক্ষা কম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, $E_d < 1$ (চিহ্ন অবজ্ঞা করে)।	নিত্য প্রয়োজনীয়।	চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা প্রভৃতি। দামের পরিবর্তন অপেক্ষা একক অপেক্ষা অধিক চাহিদার চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা কম।
একক অপেক্ষা কম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, $E_d > 1$ (চিহ্ন অবজ্ঞা করে)।	বিলাস দ্রব্য বা আরামপ্রদ	ভালো ব্রান্ডের রঙ্গিন টেলিভিশন, ভালো ফ্রিজ, এয়ারকুলার, গহনা, দামি গাড়ি প্রভৃতি। এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয়।
শূন্যের সমান চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, $E_d = 0$	অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য	ঔষধ, লবণ, দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হবে না।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য
Difference between Elastic and Inelastic Demand

স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান	দ্রব্যের শ্রেণি	উদাহরণ
অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা, $E_d = \alpha$	বিশেষ অবস্থা (গুজব/সিন্ডিকেট) (অসাধু ব্যবসায়ীরা অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হলে)	বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে। যেকোন দ্রব্যের চাহিদা অসীম হতে পারে।
আয় স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান বা অধিক,$E_y \geq 1$	সাধারণ দ্রব্য	চিকন চাল, বড় মাছ, উন্নত মানের বস্ত্র; ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদাও বাড়ে।
আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক, বা $E_y < 0$	নিকৃষ্ট দ্রব্য	মোটা চাল, মোটা সুতার বস্ত্র, ছোট মাছ; আয় বাড়লে চাহিদা হ্রাস পায়।
চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা, | $E_c > 0$ ('+' হবে)	পরিবর্তক দ্রব্য	চা-কফি, চিনি-গুড়; একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য
Difference between Elastic and Inelastic Demand

স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান	দ্রব্যের শ্রেণি	উদাহরণ
চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা, $E_c < 0$ ('-' হবে)	পরিপূরক দ্রব্য	চা-চিনি, জ্বালানি ও গাড়ির ব্যবহার; একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।
চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা, $E_c = 0$	সম্পর্কহীন বা স্বাধীন দ্রব্য।	রঙ্গিন টেলিভিশন ও আটা। একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে অন্য দ্রব্যের উপর প্রভাব পড়বে না।
স্থিতিস্থাপক চাহিদা : $E_d > 1$ দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন অধিক	তুলনামূলক আলোচনায়	অস্থিতিস্থাপক চাহিদা : $E_d < 1$, দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কম হবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল :

1. **দ্রব্যের প্রকৃতি:** সাধারণত অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন— লবণ ও ওষুধ । আবার বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। বিলাসজাত ও আরামপ্রদ দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন— শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, উন্নতমানের আসবাব।

2. **বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি:** আলোচ্য দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য যদি বাজারে না থাকে, তবে সে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আর যদি বিকল্প দ্রব্য বাজারে থাকে, তবে সে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে। যেমন: চিনির দাম বাড়লে চিনির চাহিদা কমবে এবং গুড়ের চাহিদা বাড়বে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

3. **আয়ের পরিমাণ:** সমাজে ধনীদের নিকট দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের নিকট দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন: গাড়ির দাম বাড়লেও ধনী ব্যক্তিদের কাছে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হবে। অন্যদিকে, গাড়ির দাম খুব কমলেও গরিবের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, ফলে তার নিকট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হবে।

4. **ব্যক্তি বা পরিবারের বাজেটের অনুপাত:** চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো একজন ব্যক্তির বা পরিবারের আয়ের শতাংশিক ব্যয়ের রূপ। যখন ব্যয়িত আয়ের অনুপাত কম হয়, তখন চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। উদাহরণ হিসেবে লবণের চাহিদা বিবেচনা করা যায়। খাবার লবণের ক্ষেত্রে দাম যদি ৫০% বাড়ে সেই লবণের জন্য একটি পরিবারের আয়ের ব্যয়িত অংশ সামান্য হবে। এমতাবস্থায় খাবার লবণের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

5. **ভোগে স্থগিতকরণ:** যদি কোন দ্রব্যের ভোগে স্থগিত (Postponement of Consumption) রাখা যায়, তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, উলসামগ্রীর ভোগে স্থগিত রাখা সম্ভব। নতুন উলের পোশাক ক্রয় না করেও পুরনো উলসামগ্রীর চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি) ভোগে স্থগিত রাখা যায় না, তাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

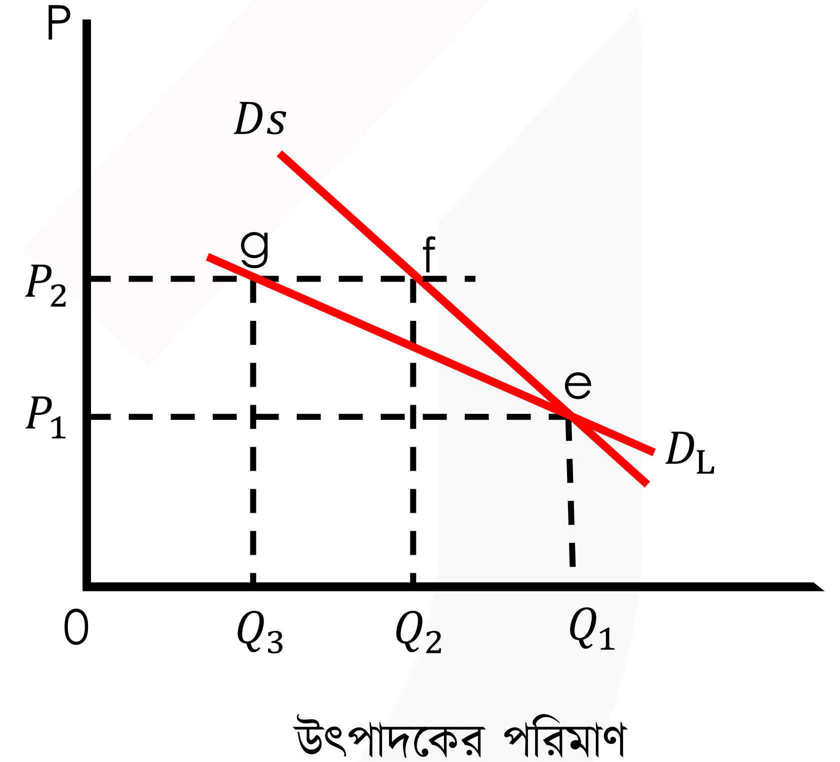
6. **প্রান্তিক উপযোগে :** সব দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগে কমার হার এক রকম হয় না। যেমন, লবণের প্রান্তিক খুব তাড়াতাড়ি কমে। এক্ষেত্রে দাম কমলেও ক্রেতা বেশি লবণ কিনতে চায় না। আবার বিলাসদ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগে ধীরে ধীরে কমে। তাই বলা যায়, যখন কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগে দ্রুত কমে, তখন তার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং যে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগে ধীরে ধীরে কমে, সে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

7. **সময়কাল:** চাহিদার স্থিতিস্থাপতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হলো সময়। নতুন দামের সঙ্গে ভোক্তা যদি সামঞ্জস্য। বিধান করতে চায়, তবে তার সময়ের প্রয়োজন পড়তে পারে। সময়ের পরিধি যদি বড় হয়, তবে চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হয়। যদি সামঞ্জস্য বিধানের সময় খুব কম পাওয়া যায়, তবে সেখানে চাহিদা আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক হবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

পাশের চিত্রে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল সম্পর্কিত দুটি চাহিদা রেখা। যথাক্রমে D_S ও D_L অঙ্কন করা হয়েছে। পেট্রোলের দাম P_1 থেকে P_2 তে বাড়লে স্বল্পকালীন চাহিদা রেখা হিসেবে D_S বরাবর চাহিদার পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 তে কমে। স্বল্পকালে ভোক্তারা তাদের যে মোটর গাড়ি আছে সেগুলো কম ব্যবহার করবে। তবে দীর্ঘকালে ভোক্তা এমন ধরনের গাড়ি কিনবে যার ইঞ্জিন ছোট, যাতে কম পেট্রোল খরচ হয়। কাজেই দীর্ঘকালে পেট্রোলের চাহিদা D_L রেখা বরাবর Q_1থেকে Q_3 তে কমে। সুতরাং পেট্রোলের দাম P_1 থেকে P_2 তে বাড়লে স্বল্পকালীন চাহিদা হ্রাসের তুলনায় দীর্ঘকালীন চাহিদা হ্রাস বেশি হয় বলে দীর্ঘকালে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি।



চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

৪. **দ্রব্যের ব্যবহার:** একই দ্রব্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত রান্নার কাজে বিদ্যুৎ ও গ্যাস যেমন লাগাতে পারে, তেমনি লাগাতে পারে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায়। দাম বাড়লে রান্নার কাজে তাদের চাহিদা অবস্থা বিশেষে স্থিতিস্থাপক হতে পারে। অপরদিকে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া হয়তো এমনই যে, বিদ্যুৎ বা গ্যাসের চাহিদা সেখানে অত্যাবশ্যক তথা অস্থিতিস্থাপক হয়।

9. **ভোক্তার অভ্যাস:** কোন দ্রব্য ভোগে করতে করতে ভোক্তা নেশাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন। ঐ সকল ভোক্তার চাহিদা সে দ্রব্যের ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক। যেমন— পান, সিগারেট ইত্যাদি।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

10. **বিকল্প দ্রব্য:** যে দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য যত বেশি তার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি।

11. **পরিপূরক দ্রব্য:** পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

12. **দ্রব্যের দাম:** দ্রব্যের দাম খুব বেশি বা কম হলে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Elasticity of Demand

13. **যুক্ত চাহিদা :** যুক্তভাবে ব্যবহৃত দ্রব্যের চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক। যদি কলমের দাম স্থির থেকে কালির দাম কিছু কমে, তবে কালির চাহিদা তেমন বাড়বে না।

14. **স্থানভেদে :** বিভিন্ন স্থানে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রকম হয়। শীতপ্রধান দেশে কফি ও কোকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

15. **সময়ভেদে :** স্থিতিস্থাপকতা সময়ের ওপর নির্ভরশীল। শীতকালে গরম কাপড়ের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং গ্রীষ্মকালে ঐ দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। সুতরাং বলা যায় যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। কেননা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ কারণে বিভিন্ন দ্রবের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

যোগানের সংজ্ঞা
Defination of Supply

ধরা যাক, কৃষক মোট ১০০ মণ ধান উৎপাদন করে। ১০০ মণ ধানের মধ্যে সে ৫০ মণ ধান নিজের পরিবারের খাবারের জন্য রাখে। ফলে বাকি ৫০ মণ ধান সে বিক্রি করতে পারে। এ ৫০ মণ ধানই হলো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা মজুদ। এখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি মণ ধানের দাম ৫০০ টাকা হলে, সে যদি ২০ মণ ধান বিক্রি করতে রাজি থাকে তা হলে ঐ ২০ মণ ধানই হলো যোগানে। সাধারণত কোন দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে যোগানে ধারণাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে সে দ্রব্যের যোগান বলে। মূলত দামের ওপর দ্রব্যের যোগানে নির্ভর করে। দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সমমুখী। এজন্য দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলেও যোগান কমে। অর্থনীতিবিদ **র‍্যাগান (Ragan)** ও **থমাস (Thomas)**- এর মতে, "একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে তাকেই যোগান বলে।

অধ্যাপক **মেয়ার্স** বলেন, "কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা হয় তার তালিকাকে যোগান বলে।"

যোগানের সংজ্ঞা
Defination of Supply

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোন বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক থাকে, তাকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে।

ক. যোগান ও মজুদ: অর্থনীতিতে যোগান (Supply) ও মজুদ (Stock) ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে, তাকে মজুদ বলে। অর্থনীতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা মজুদ দ্রব্যের যে মোট অংশ বা পরিমাণ বিক্রির জন্য রাজি থাকে, তাকে যোগান বা সরবরাহ বলা হয়।

খ. মজুদ ও যোগানের তুলনা: কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে মোট পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বর্তমান থাকে, তাকে মজুদ দ্রব্য বলে। কিন্তু সরবরাহ হলো মজুদ দ্রব্যের অংশবিশেষ যা বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করে থাকে। উদাহরণ: বাজারে একজন বিক্রেতার নিকট মোট ৭০ টন চাল আছে। বাজারে প্রতি টন চালের মূল্য ১০,০০০ টাকা। যদি উক্ত দামে বিক্রেতা ৩০ টন চাল বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে, তবে সে অবস্থায় ৭০ টন চাল মজুদ এবং ৩০ টন চাল হবে তার যোগান বা সরবরাহ । সুতরাং, যোগান হলো মজুদের একটি অংশ।

যোগান বিধি
Law of Supply

চাহিদা বিধির মতো যোগানেরও একটি বিধি রয়েছে। প্রতিটি পণ্যের বিনিময় মূল্য আছে। বিনিময় মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে চাহিদা যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি যোগানও প্রভাবিত হয়। যোগান বিধি অনুসারে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (ceteris paribus) থেকে কোন পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। অন্যান্য অবস্থা বলতে বিভিন্ন উপকরণের দাম, কারিগরি অবস্থা, প্রাকৃতিক অবস্থা, সময়, কর ও ভর্তুকি ইত্যাদিকে বোঝায়। অতএব, **দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক যে বিধির মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে যোগান বিধি বলে।**

যোগান বিধি
Law of Supply

যোগান বিধিকে তীর চক্ষের সাহায্যে নিম্নভাবে দেখানো যেতে পারে

$p \uparrow s \uparrow$ যখন অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকে।
$p \downarrow s \downarrow$ যখন অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকে।

এখানে, P = দাম, S = যোগান, = ঊর্ধ্বগতি, = নিম্নগতি।

অধ্যাপক মার্শাল (Prof. Marshall)-এর মতে, "অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থেকে যদি কোন দ্রব্যের দাম বাড়ে তবে তার যোগান বাড়বে, দাম কমলে যোগান কমবে।"

যোগান বিধির ব্যাখ্যা: যোগান বিধিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—১. যোগান সূচি (Supply Schedule) ২. যোগানে রেখা (Supply Curve)।

যোগান সূচি
Supply Schedule

বিভিন্ন দামে প্রাপ্ত বিভিন্ন যোগানের পরিমাণকে যখন তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে যোগান সূচি বা যোগান তালিকা বলে। অর্থাৎ **দাম ও যোগানের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে তথা যোগান বিধিকে গাণিতিকভাবে বা সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করলে, তাকে যোগান সূচি বলে।** এ সূচির মাধ্যমে কোন বিক্রেতা কোন দ্রব্যের কতটুকু বিক্রি করতে ইচ্ছুক তা তালিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। নিচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হলো ধরি, s = 10 + 5P যোগান সমীকরণ।

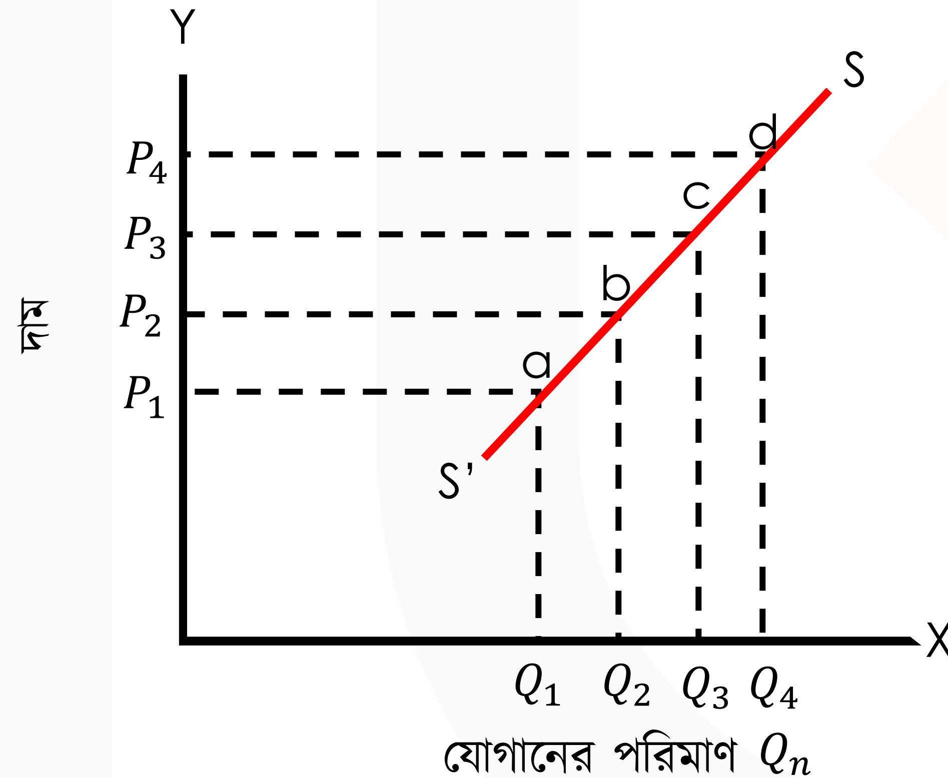
এ সমীকরণে বিভিন্ন দামে প্রাপ্ত যোগানের বিভিন্ন পরিমাণকে তালিকায় বসিয়ে যোগান সূচি তৈরি করি:

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (P)		**যোগানের** পরিমাণ Q_S	
1	P_1	15	Q_1
2	P_2	20	Q_2
3	P_3	25	Q_3
4	P_4	30	Q_4

যোগান সূচি
Supply Schedule

সূচিতে লক্ষ করা যায় যে, 1 টাকা দামে বিক্রেতা কোন দ্রব্যের 15 একক বিক্রি করতে রাজি। এখন দাম 1 টাকা থেকে বেড়ে যথাক্রমে 2 টাকা, 3 টাকা এবং 4 টাকা হলে যোগানের পরিমাণও 15 একক থেকে বেড়ে যথাক্রমে 20 একক, 25 একক এবং 30 একক হয়। অর্থাৎ দামের বৃদ্ধি হলে যোগান ও বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে, দাম কমে 4 টাকা থেকে 3 টাকা হলে যোগানে পরিমাণ কমে 30 একক থেকে একক হয়। অর্থাৎ দাম ও যোগান পরস্পর সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ। এটিই যোগান বিধি।

যোগান রেখা
Supply Curve



যোগান রেখা
Supply Curve

যোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই যোগান রেখা। দাম ও যোগানের সমমুখী সম্পর্ককে যখন রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে। চিত্রের সাহায্যে যোগান রেখা বিশ্লেষণ করা হলো চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q_S) এবং OY অক্ষে দাম (P) দেখানো হয়েছে। দাম যখন P_1 তখন যোগানের পরিমাণ Q_1 যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন দাম বেড়ে P_2, P_3 ও P_4 হলে যোগানের পরিমাণও বেড়ে Q_2, Q_3ও Q_4 হয়, যা b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগে করে যোগান রেখা SS' পাওয়া যায়। দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Hypothetical Supply Schedule

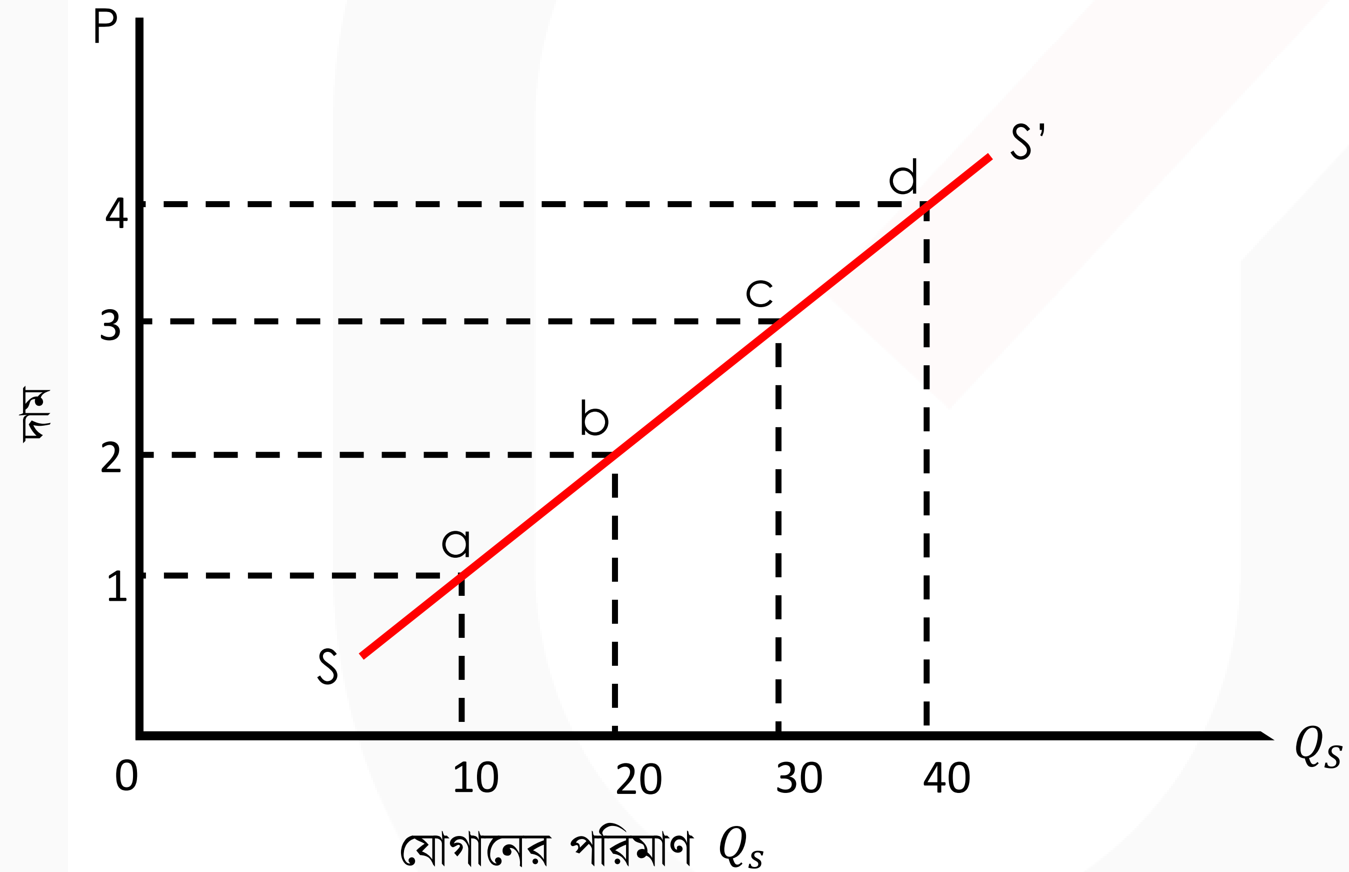
যোগান সূচি হলো এমন একটি তালিকা, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোন বিক্রেতা কোন দ্রব্যের কী পরিমাণ বিক্রি করতে ইচ্ছুক তা গাণিতিকভাবে প্রকাশ পায়। কোন দ্রব্যের যোগান সূচি জানা থাকলে সে দ্রব্যের যোগান রেখা। অঙ্কন করা যায়। নিচে একটি কাল্পনিক যোগান সূচি দেখানো হলো :

কাল্পনিক যোগান সূচি

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (P)	যোগানের পরিমাণ দাম(QS)
1	10
2	20
3	30
4	40

সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে আবার দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। অর্থাৎ দাম ও যোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Hypothetical Supply Schedule



কাল্পনিক যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Hypothetical Supply Schedule

যোগান রেখা অঙ্কন: যোগান সূচির জ্যামিতিক রূপই যোগান রেখা। যোগান রেখার প্রতিটি বিন্দু দামের সাথে যোগানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রকাশ করে। উপরের কাল্পনিক যোগান সূচির ভিত্তিতে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো উপরের চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q) এবং OY অক্ষে দাম (P) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রানুযায়ী দাম যখন 1 টাকা, তখন যোগানের পরিমাণ 10 একক। আবার দাম যখন 2 টাকা, তখন যোগানের পরিমাণ 20 একক। এভাবে দাম বেড়ে যখন 3 ও 4 টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণও বেড়ে 30 ও 40 একক হয়। দাম ও যোগানের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দু পাওয়া যায়। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে SS' যোগান রেখা পাওয়া যায়। দাম ও যোগানের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায়, যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে ।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

কোন দ্রব্যের যোগান কতকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ বিষয় গুলোই হলো যোগানের নির্ধারক। সুতরাং, যেসব বিষয়ের ওপর কোন দ্রব্যের যোগান নির্ভরশীল ঐসব বিষয়কে যোগানের নির্ধারক বলে। নিচে যোগানের নির্ধারকসমহ আলোচনা করা হলো—

- **পণ্যের দাম:** পণ্যের নিজস্ব দামের ওপর যোগান অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণত কোন পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কারণ দাম বাড়লে মুনাফা বাড়ে, দাম কমলে মুনাফা কমে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।
- **অন্যান্য পণ্যের দাম:** সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম বিবেচ্য দ্রব্যের যোগান কে প্রভাবিত করে। যেমন- চিনির বিকল্প গুড়ের দাম কমলে চিনির যোগান কমবে।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

- **পণ্যের চাহিদা:** পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে যোগান ও বৃদ্ধি পাবে।
- **উৎপাদনকারীর ভোগে :** উৎপাদনকারী নিজের উৎপাদিত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগে করলে বাজারে সেসব দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। বিপরীতভাবে, উৎপাদনকারী কম ভোগ করলে সেসব দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়।
- **কৌশলের পরিবর্তন:** উৎপাদনে নতুন নতুন কৌশল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ কমে এবং একই দামে পূর্বের চেয়ে বেশি যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।
- **সময়:** পর্যাপ্ত সময় দেওয়া না হলে অনেক সময় চাহিদানুযায়ী যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

- **আবহাওয়ার প্রভাব:** আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে এবং প্রতিকূলে থাকলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। যেমন— ধানের মৌসুমে একেবারেই যদি বৃষ্টি না হয় তবে ধান উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে আবহাওয়া যোগানর ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

- **কর ও ভর্তুকির প্রভাব:** দ্রব্যের যোগান, কর ও ভর্তুকির দ্বারা প্রভাবিত হয় । কর আরোপ করলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। অন্যদিকে, কোন দ্রব্যের উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান করলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। তাই যোগান বৃদ্ধি পায়।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

❖ **যুক্ত যোগান :** যেসব পণ্য যুক্তভাবে উৎপাদিত হয় তাদের একটির যোগান বাড়লে অপরটির যোগানও বাড়ে। যেমন— তুলার যোগান বাড়লে দামের পরিবর্তন ছাড়াই তুলা বীজের যোগান বাড়ে।

❖ **বাজারের ভিন্নতা:** যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি, সে বাজারে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কম, সে বাজারে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়।

অতএব বলা যায়, কোন দ্রব্যের যোগান উপরের নির্ধারকসমূহ বা উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

যোগান বিধির ব্যতিক্রম (Exceptions to the law of supply): সবক্ষেত্রে এবং সবসময় যোগান বিধি কার্যকর হয় না। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটে।

- **উৎপাদনের উপকরণের স্বল্পতা:** যেহেতু যোগান উৎপাদনেরই একটি অংশ সেহেতু ঐ পণ্য উৎপাদনের উপকরণের স্বল্পতা থাকলে উৎপাদন বাড়ানো যায় না। এজন্য যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

- **ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা:** বিক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা করলে যোগান বাড়ে না। কারণ সে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় পণ্য মজুদ করে।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

➢ **সীমাবদ্ধ যোগান :** কিছু কিছু পণ্য আছে যেগুলোর উৎপাদন বাড়ার আর সম্ভাবনা নেই। যে সকল পণ্যের বেলায় যোগান বিধি কার্যকর হয় না। যেমন— জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম, পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ডাকটিকেট এগুলো দাম যতই বাড়ুক না কেন তার যোগান বাড়বে না।

➢ **শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে :** একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরির পর মজুরি বাড়লেও শ্রমের যোগান না বেড়ে বরং কমে। কারণ মজুরি অত্যধিক বাড়লে অনেক সময় কাজ করেই শ্রমিক তার সকল অভাব পূরণ করতে পারে এবং আরাম আয়েশ ভোগে করে। বিষয়টি নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

চিত্রে দেখা যায় যে, মজুরি OW_1হলে শ্রমের যোগান হয় OL_1। এবং মজুরি বেড়ে OW_2 হলে শ্রমের যোগান বেড়ে OL_3 হয়। কিন্তু মজুরি OW_3 হলে শ্রমের যোগান কমে OL_2হয়। সুতরাং শ্রমের যোগান রেখা S_L পশ্চাৎমুখী (Backward supply curve for labor) হয় বলে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

- **কৃষিপণ্য :** কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। কারণ কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় লাগে। তাই একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঘটে।

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন যোগান ব্যাহত হয়। ফলে অনেক কৃষিপণ্যের দাম বাড়লেও। তার যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না।

যোগানের নির্ধারকসমূহ Determinants of Supply

- **পরিবহন সমস্যা:** পরিবহন সমস্যার কারণে কোন পণ্যের দাম বাড়লেও অনেক সময় যোগান বাড়ানো যায় না। ফলে যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

- **করনীতি :** কোন পণ্যের ওপর কর আরোপ করলে এমনিতেই দাম বাড়ে। এক্ষেত্রে ঐ পণ্যের দাম বাড়লেও যোগান বাড়ে না।

যোগানের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Supply

- **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন :** প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে শিল্প পণ্যের গড় উৎপাদন খরচ কমে যায়। ফলে এসব পণ্যের দাম কমলেও যোগান কমে না বরং বাড়ে।

- **অর্থনৈতিক মন্দা:** মন্দার সময় যোগান বিধি কার্যকর হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সর্বক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। অর্থাৎ যোগান রেখা সর্বদা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয় না।

যোগান অপেক্ষক
Supply Function

যে অপেক্ষকের সাহায্যে দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের পরিমাণের সরাসরি সম্পর্ক দেখানো হয়, তাকে যোগান অপেক্ষক বলে। $Q_S = \mathrm{F(P)}$; এখানে, Q_S = যোগানের পরিমাণ (Quantity of Supply), P = দাম (Price), f= অপেক্ষক (Function), এ চিহ্নটি দামের সাথে যোগানের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

অন্তরকলনের সাহায্যে, $\frac{d(Q_S)}{dP} = \mathrm{f}'(\mathrm{p}) > 0$,

অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের সাথে (dP), যোগানের পরিবর্তনের $d(Q_S)$ সম্পর্ক $\mathrm{f}'(\mathrm{p}) > 0$ বা ধনাত্মক। তাই দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক ধনাত্মক বা সরাসরি, যা যোগান বিধিকে প্রকাশ করে।

যোগান সমীকরণ
Supply Equation

যে সমীকরণের সাহায্যে দ্রব্য বা সেবার দামের সাথে যোগানের পরিমাণের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাকে যোগান সমীকরণ বলে। যেমন: Q_S বা $S = c + dP$, এখানে Q_S বা S = যোগানের পরিমাণ, P = দাম, c = ধ্রুবক (স্থিরমান), d = ধনাত্মক ঢাল।

অন্তরকলনের সাহায্যে $\frac{ds}{dP} = \frac{d}{dp}(\mathrm{c} + dp) = 0 + \mathrm{d}(1) = \mathrm{d} > 0$

যেহেতু দামের পরিবর্তনে (dP) সাথে, যোগানের পরিবর্তনের (dS) সম্পর্ক ধনাত্মক বা সরাসরি, তাই যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

যোগান সমীকরণ
Supply Equation

জেনে রাখো:

যোগান সমীকরণ তিনভাবে প্রকাশ করা যায় :

$i. S = C + DP$

$ii. S = -C + dP$

$iii. S = dP$

যেখানে, S = যোগানের পরিমাণ,

C = ধ্রুবক, S = ধনাত্মক ঢাল,

P = স্বাধীন চলক

যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Supply Equation

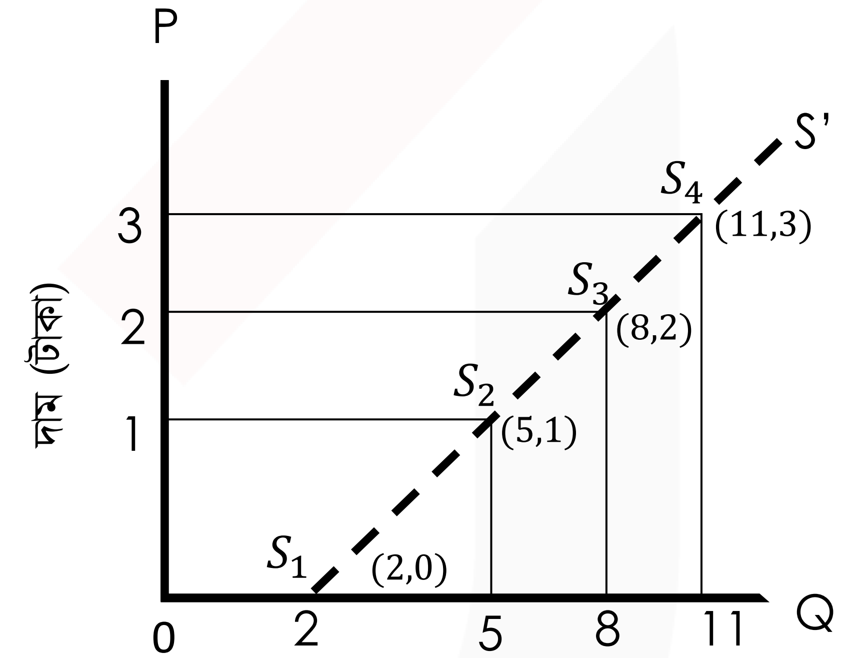
যে সমীকরণে চলকের ঘাত (Power) বা মাত্রা এক এর সমান তাকে একঘাত বা একমাত্রিক বা সরলরৈখিক সমীকরণ (Linear Equation) বলা হয়।

ধরি, একঘাত বিশিষ্ট যোগান সমীকরণ হলো S = 2 + 3P। এখানে, যোগান (S) = অধীন চলক, দাম (P) = স্বাধীন চলক, 2 = ছেদক মান। চলকদ্বয়ের মাত্রা বা শক্তি এক-এর সমান। তাই এটি একটি একমাত্রিকবা লিনিয়ার বা সরলরৈখিক অপেক্ষক। প্রদত্ত সমীকরণ S =2+3P -এ P এর বিভিন্ন মান ধরে নিয়ে একটি তথ্যসূচিতে সাজানো হলো—

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (একক)	বিন্দু
0	2	S_1
1	5	S_2
2	8	S_3
3	11	S_4

যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Supply Equation

চিত্রের বিশ্লেষণ: চিত্রে, ভূমি অক্ষে যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) পরিমাপ করা হয়েছে। দাম 0 (শূন্য) অবস্থায় যোগানের পরিমাণ ২ একক ; তখন প্রাপ্ত বিন্দু S (2,0)। দাম বেড়ে 1, 2 ও 3 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে 5, 8 ও 11 একক। তখন প্রাপ্ত বিন্দু হলো S_2 (5,1), S_3 (8,2) ও S_4 (11,3)। এখন দাম ও যোগানের পরিমাণ নির্দেশক বিন্দুসমূহ (S_1, S_2, S_3ও S_4) যোগ করে SS' যোগান রেখা পাওয়া যায়। যার ঢাল ধনাত্মক এবং যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।



যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Supply Equation

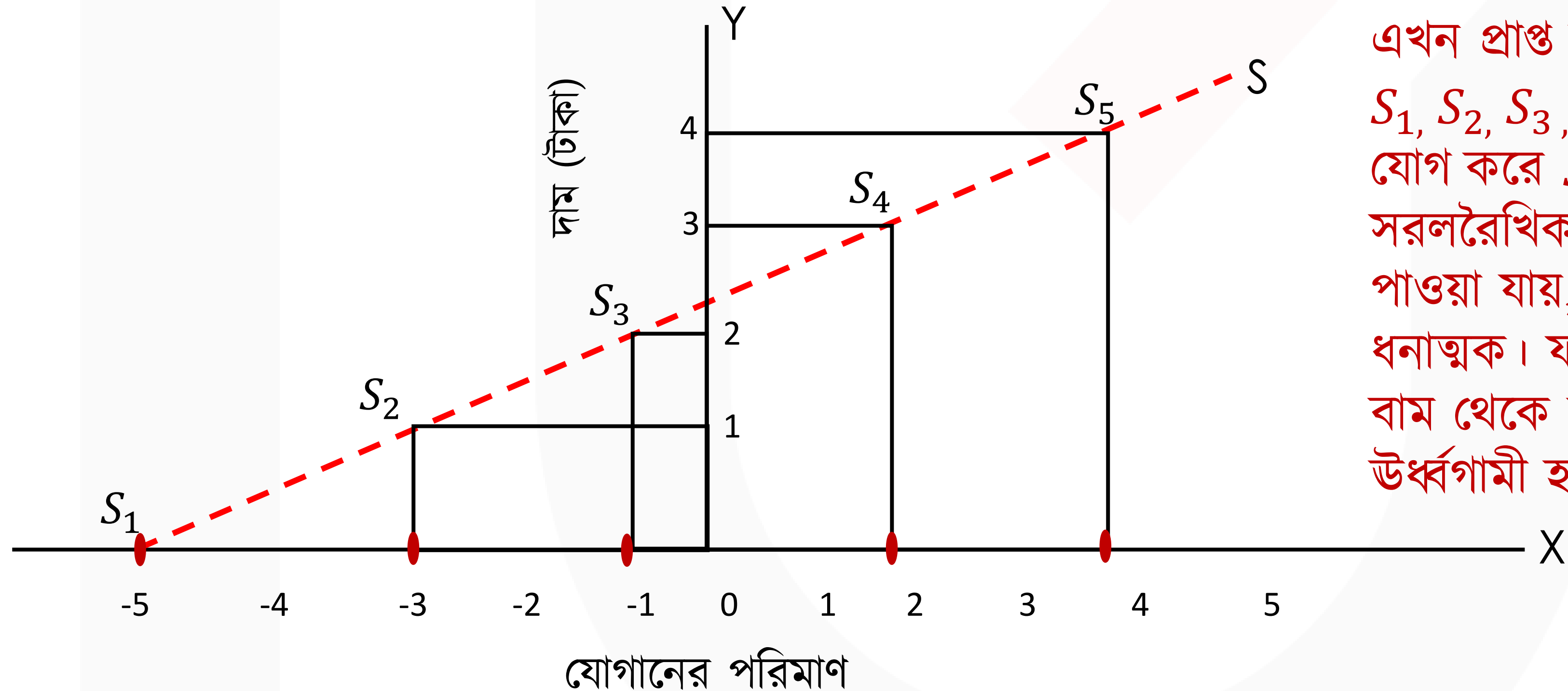
যোগান সমীকরণ ও যোগান রেখা: সরলরৈখিক বা একমাত্রিক যোগান সমীকরণ ও রেখার ক্ষেত্রে দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই একমাত্রিক যোগান সমীকরণ: S = -c + dP; এখানে, S = যোগান, P = দ্রব্যের দাম – c = ঋণাত্মক ছেদক (পরামিতি) d = ধনাত্মক সহগ (ঢাল)। সংখ্যা মানে যোগান সমীকরণ S = -5+ 2P

P এর বিভিন্ন মান নিয়ে যোগান সূচি বা তালিকা তৈরি করে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো।

দাম (টাকা)	যোগানের (S) পরিমাণ (একক)	বিন্দু
0	-5	S_1
1	-3	S_2
2	-1	S_3
3	1	S_4
4	3	S_5

যোগান সমীকরণ থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
Draw a Supply Curve from a Supply Equation

ভূমি অক্ষে (X) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (Y) দাম নির্দেশিত। শূন্য দামে যোগানের পরিমাণ -5 একক তখন প্রাপ্ত বিন্দু S_1, দাম 1 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ -3 একক, তখন প্রাপ্ত বিন্দু S_2। এভাবে দাম বেড়ে যথাক্রমে 2 টাকা, 3 টাকা এবং 4 টাকা হলে যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে -1 একক, 1 একক এবং 3 একক হয়। ফলে প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ S_3 , S_4, এবং S_5 পাওয়া যায়।



এখন প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ S_1, S_2, S_3, S_4 এবং S_5 যোগ করে S_1S সরলরৈখিক যোগান রেখা পাওয়া যায়, যার ঢাল ধনাত্মক। ফলে রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Supply

যোগান বিধিতে, কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কিন্ত দ্রব্যের দামের কতটুকু পরিবর্তনে যোগানের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা জানা যায় না। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব, যে নিয়মের মাধ্যমে দাম এবং যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা জানা যায়, তাকে যোগানর স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ রিচার্ড জর্জ লিপসি এর মতে, "যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হলো, দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণ কীভাবে সাড়া দেয় তার পরিমাপ।"

অধ্যাপক কেয়ার্নসক্রস বলেন, "দামের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ যে হারে সাড়া দেয় তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।"

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Supply

যোগান বিধিতে, কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। কিন্তু দ্রব্যের দামের কতটুকু পরিবর্তনে যোগানের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা জানা যায় না। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব, যে নিয়মের মাধ্যমে দাম এবং যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা জানা যায়, তাকে যোগানর স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ রিচার্ড জর্জ লিপসি এর মতে, "যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হলো, দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণ কীভাবে সাড়া দেয় তার পরিমাপ।"

অধ্যাপক কেয়ার্নসক্রস বলেন, "দামের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ যে হারে সাড়া দেয় তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।"

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা Elasticity of Supply

অন্যভাবে, **কোন দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের যোগানের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।** যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা } (E_S) = \frac{\text{যোগানের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{প্রাথমিক যোগানের পরিমাণ}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক দাম}}$$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Supply

প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করলে,
এখানে,

$$E_S = \frac{\frac{\Delta Q_S}{Q_S}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q_S}{Q_S} \times \frac{P}{\Delta P}$$

$$\therefore E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S}$$

যেখানে,
E_S = যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।
Q_S = প্রাথমিক যোগান।
P = প্রাথমিক দাম।
ΔQ_S = যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ ।
ΔP = দামের পরিবর্তন।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of Supply

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 30 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 40 একক হলো। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

সমাধান: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S}$$

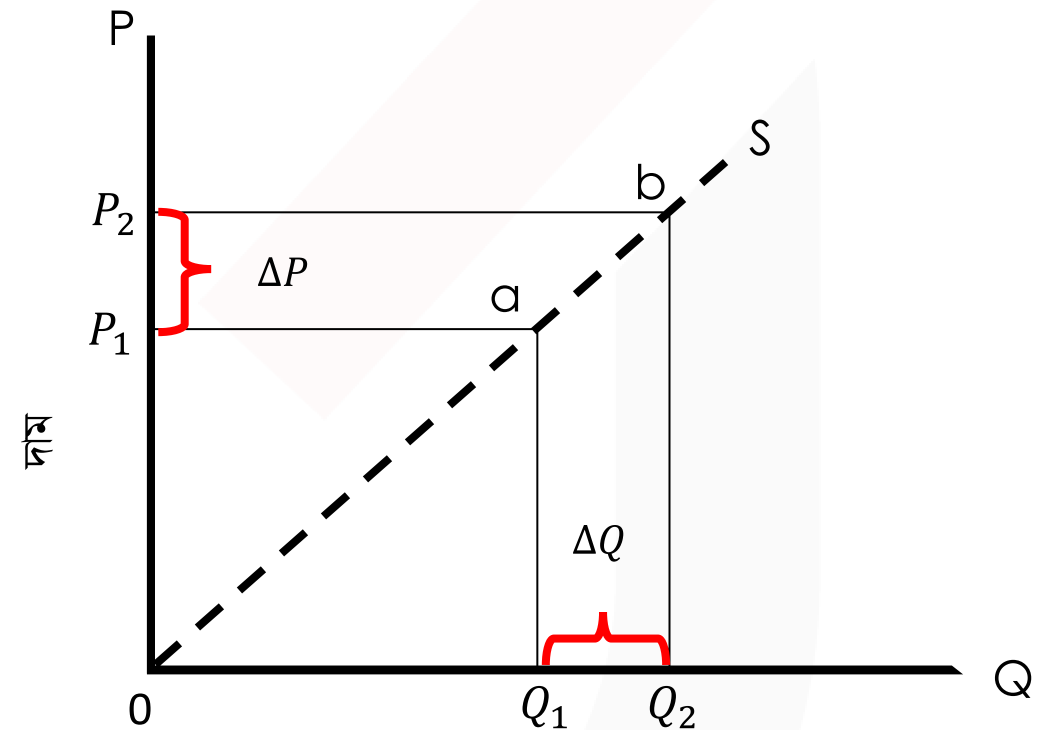
$$= \left(\frac{40-30}{25-20}\right) \times \frac{20}{30} = \frac{10}{5} \times \frac{20}{30} = \frac{4}{3} = 1.33 \;\therefore\; E_S = 1.33$$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতো যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity, $E_S = 1$): দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগানের পরিমাণও ঠিক একই হারে পরিবর্তিত হলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয়। এক্ষেত্রে দাম এবং যোগানের শতকরা পরিবর্তন একই হয়ে থাকে। যদি যোগান রেখা মূলবিন্দু হতে 45° কোণ তৈরি করে উপরে উঠে, তাহলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হবে।

চিত্রে, OS যোগান রেখা মূলবিন্দু o থেকে উপরে উঠেছে। এক্ষেত্রে $E_S = 1$, এখানে দাম ও যোগানের পরিবর্তনের হার সমান। কেননা এক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন (P_1, P_2) এবং যোগানের পরিবর্তন (Q_1, Q_2) এর সমান।



চিত্র: একক স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 20 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 30 একক হলো। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো।

সমাধান:

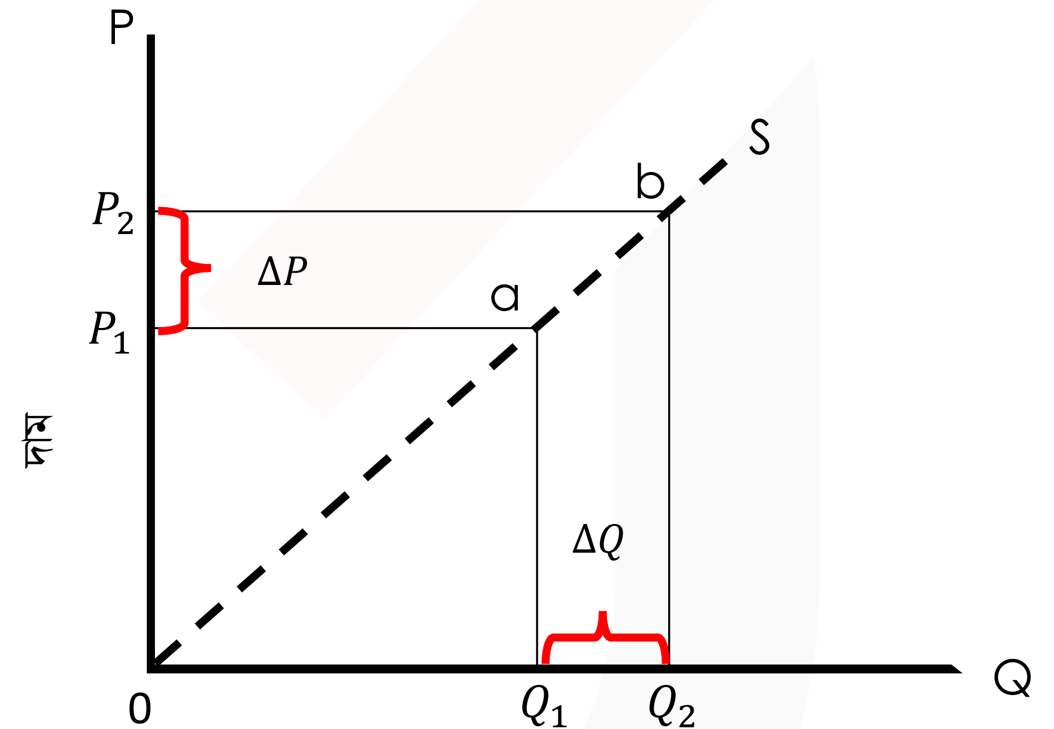
$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S} = \left(\frac{30-20}{15-10}\right) \times \frac{10}{20} = \frac{10}{5} \times \frac{10}{20} = \frac{100}{100} = 1\,;$$

এখানে, $P_1, P_2 = \Delta P = Q_1 Q_2 = \Delta Q\,;$

জ্যামিতিকভাবে $P_1, P_2 = Q_1 Q_2$

$$E_S = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1 Q_2}{P_1, P_2} = 1$$

∴ যোগানের স্থিতিস্থাপকা, $E_S = 1$ এর সমান।



চিত্র: একক স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা

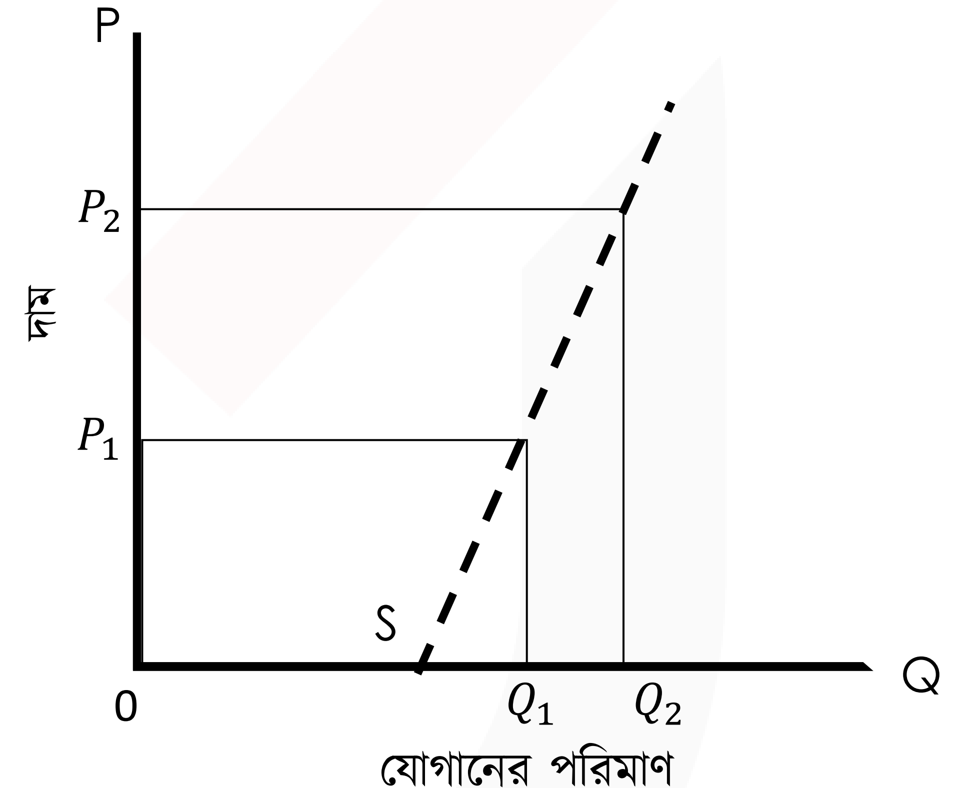
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

একককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity greater than one, $E_S > 1$): কোন দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগান তা অপেক্ষা অধিক হারে পরিবর্তিত হলে, P যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একককের চেয়ে বেশি হবে। এখানে চিত্রে,

$\Delta P = P_1P_2$, $\Delta Q_s = Q_1Q_2$; কিন্তু, $Q_1Q_2 > P_1,P_2$

তাই , $E_S = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1Q_2}{P_1,P_2} > 1$ যেহেতু $Q_1Q_2 > P_1,P_2$

চিত্রে SS যোগান রেখা লম্ব অক্ষ OP কে ছেদ করে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এখানে দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের হার অধিক। সুতরাং, এক্ষেত্রে $E_S > 1$



চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s < 1$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

উদাহরণ:

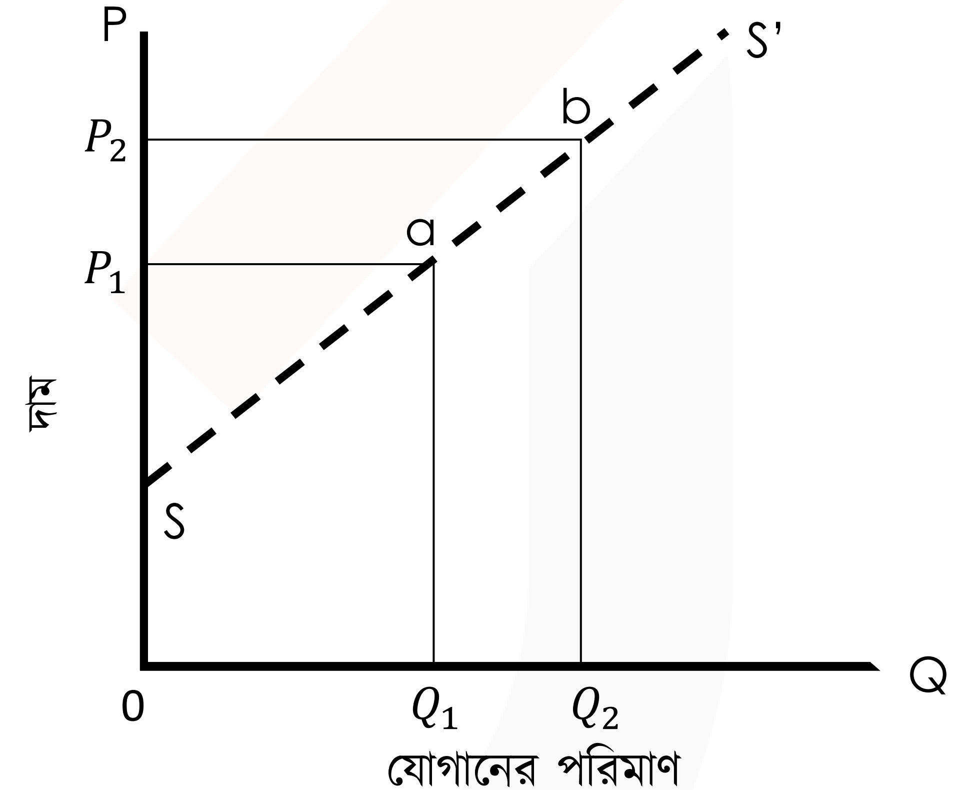
ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 25 যোগানের পরিমাণ টাকা হলো এবং এর ফলে যোগান 30 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 40 একক হলো । যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

সমাধান:

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ,

$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S} = \left(\frac{40-30}{25-20}\right) \times \frac{20}{30} = \frac{10}{5} \times \frac{20}{30} = \frac{4}{3} = 1.33 > 1$;

$\therefore E_S = 1.33$



চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s > 1$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

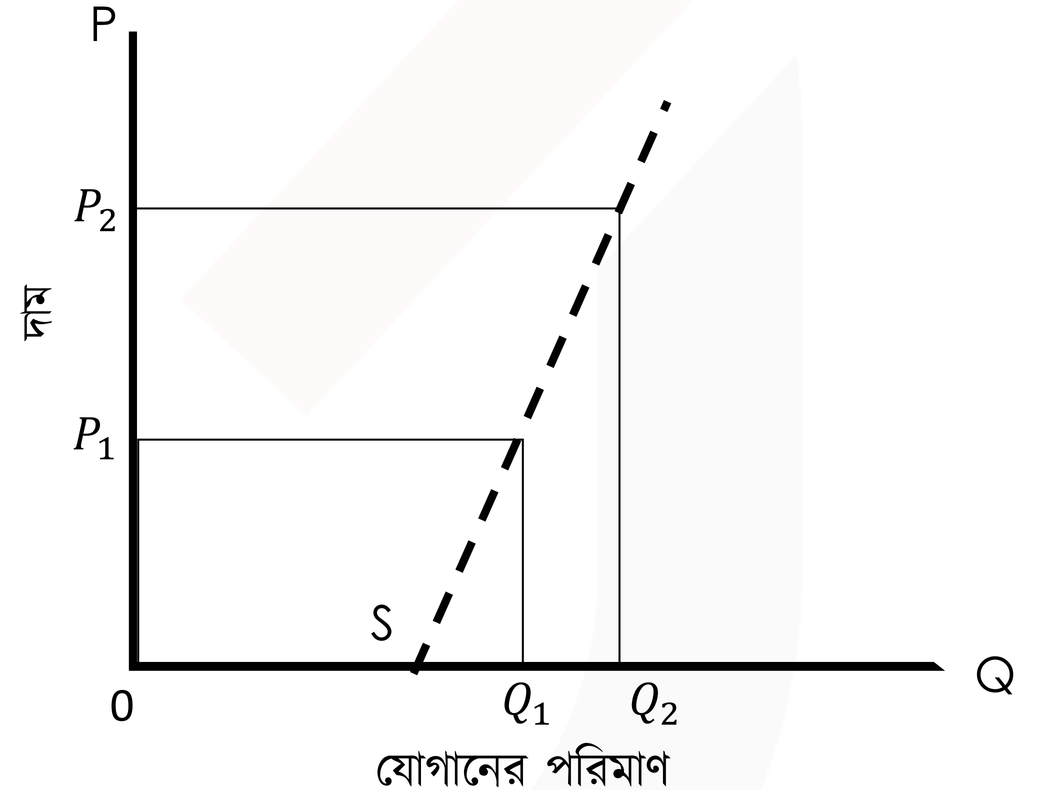
একককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity less than one, $E_S < 1$): কোন দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় যোগান তার চেয়ে কম হারে পরিবর্তিত হলে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একককের চেয়ে কম হবে।

চিত্রে SS' যোগান রেখা ভূমি অক্ষ OQ কে ছেদ করে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে । এখানে দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের হার কম।

এক্ষেত্রে $E_S < 1$

$\Delta P = P_1, P_2$, $\Delta Q_s = Q_1 Q_2$;

তাই , $E_S = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1 Q_2}{P_1, P_2} < 1$; যেহেতু $Q_1 Q_2 < P_1, P_2$



চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s < 1$

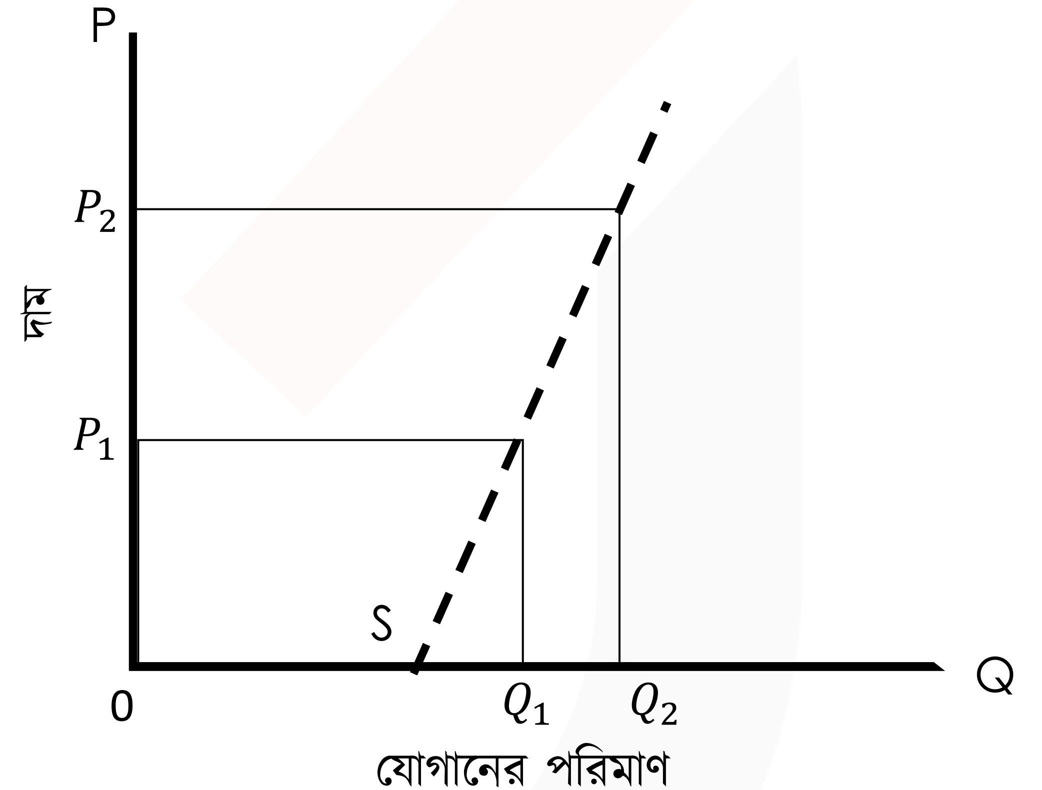
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

উদাহরণ: ধরি, একটি দ্রব্যের দাম 5 টাকা থেকে 10 টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে যোগান 4 একক থেকে 6 এককে বৃদ্ধি পায়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

সমাধান: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ,

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S} = \left(\frac{6-4}{10-5}\right) \times \frac{5}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore E_S = \frac{1}{2} < 1$$



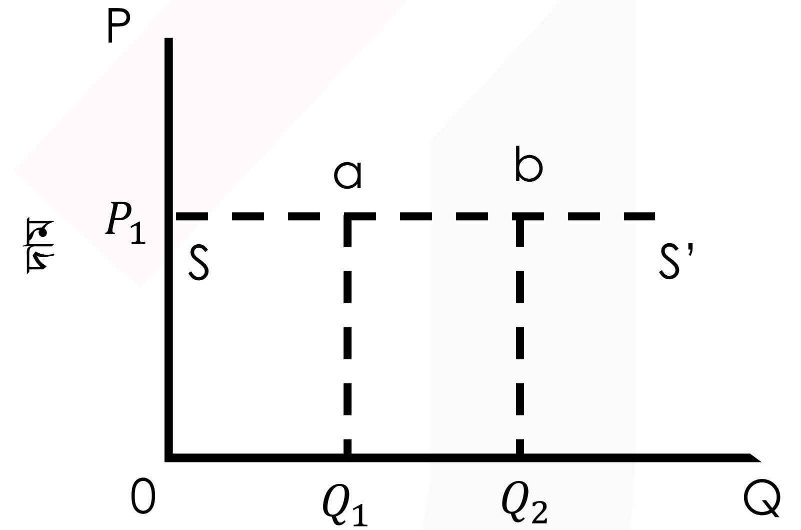
চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s < 1$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

অসীম স্থিতিস্থাপকতা (Infinite Elasticity, $E_S = \propto$):
দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ছাড়াই যদি যোগানের ব্যাপক পরিবর্তন হয়, তাহলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়।
এখানে, $\Delta P = OP_1 - OP_2 = 0$

$$\Delta Q_s = OQ_2 - OQ_1 = Q_1 Q_2$$

$$\therefore E_S = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} = \frac{Q_1 Q_2}{0} = \propto \;;$$



যোগানের পরিমাণ

চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s = x$

চিত্রে SS' যোগান রেখায় দামের কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই অর্থাৎ দাম P_1 এ স্থির থেকে যোগানের পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 তে স্থানান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়। এক্ষেত্রে $E_S = \propto$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

উদাহরণ: একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট স্থির দাম 5 টাকায় দুটি ভিন্ন যোগান $Q_1 = 10$ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত যোগান $Q_2 = 20$ একক পাওয়া যায়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

সমাধান: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_S} = \left(\frac{20-10}{5-5}\right) \times \frac{5}{10} = \frac{10}{0} \times \frac{5}{10} = \frac{50}{0} = \infty$$

$$\therefore E_S = 0$$

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকারভেদ
Types of Elasticity of Supply

শূন্য স্থিতিস্থাপকতা (Zero Elasticity, $E_S = 0$):

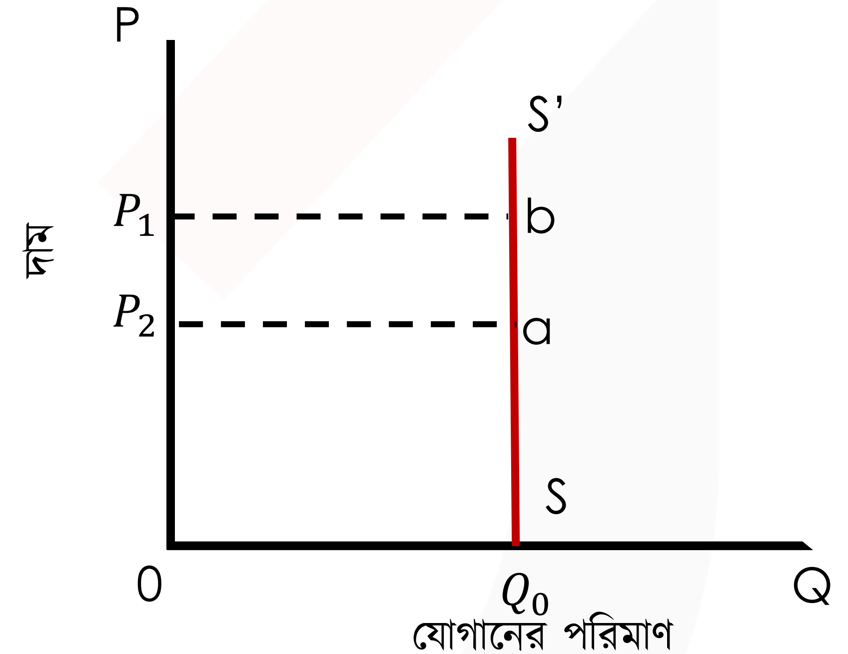
দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের কোন পরিবর্তন না হলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়।

এখানে , $\Delta P = OP_1 - OP_2 = P_1, P_2$,

$$\Delta Q_s = OQ_0 - OQ_0 = 0$$

$$\therefore E_S = \frac{\Delta Q_S\%}{\Delta P\%} = \frac{0}{P_1, P_2} = \propto \;;$$

চিত্রে দামের পরিবর্তন P_1 থেকে P_2 হয় কিন্তু যোগানের কোন পরিবর্তন হয় না। । অর্থাৎ যোগান Q_0 এ স্থির রয়েছে। এখানে $E_S = 0$ যোগান রেখা দাম অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।



চিত্র: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_s = 0$

ভারসাম্য Equilibrium

ভারসাম্য অর্থ স্থিতাবস্থা বা সাম্য অবস্থা। ভারসাম্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ **'Equilibrium'** এসেছে ল্যাটিন শব্দ। **Acquas** এবং **libra** থেকে। 'Acquas' অর্থ সমান (equal) এবং 'libra' অর্থ অনড় অবস্থা (balance)। নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে অর্থনীতিতে বিভিন্ন নির্ধারণী শক্তি বা চলক তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা একটি স্থির অবস্থায় উপনীত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারী চলকগুলো বিশ্রাম নেয়। এরূপ বিশ্রামসূচক অবস্থাকে (state of rest) বলা হয় ভারসাম্য। কাজেই **অর্থনীতিতে ভারসাম্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে পরস্পর বিরোধী শক্তি সমতাসূচক অবস্থায় (a state of balance) পৌঁছায় এবং তা থেকে কারোরই সরে যাওয়ার কোন প্রবণতা থাকে না।**

ভারসাম্য
Equilibrium

অর্থনীতিবিদ লাইভাস্কি -এর ভাষায়, "যে অবস্থা থেকে পরিবর্তনের কোন প্রবণতা থাকে না তাই হচ্ছে ভারসাম্য অবস্থা।
অধ্যাপক A. C. Chiang-র মতে, ভারসাম্য হলো কতকগুলো নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চলকের এমন এক সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত অবস্থা যেখানে উক্ত চলকসমূহের দ্বারা গঠিত মডেলের কোনরূপ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত প্রবণতা থাকে না।

কাজেই ভারসাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশকে বোঝায় যেখানে কার্যকরী শক্তিসমূহ (চলকসমূহ) এমন ভাবে মিলিত হয় যেন আর নড়াচড়া করার কোন প্রবণতা থাকে না। যে অবস্থায় দুই বা ততোধিক শক্তি মিলিত হয় এবং সে অবস্থান থেকে কোন শক্তিরই সরে যাবার কোন প্রবণতা থাকে না তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলা হয়।
পক্ষান্তরে, যখন দুই বা ততোধিক শক্তি অসম অবস্থায় অবস্থান করে সে অবস্থাকে অ-ভারসাম্য (DisEquilibrium) বলা হয়।

ভারসাম্য
Equilibrium

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর পর এ অবস্থার কোন পরিবর্তন কখনও হবে না এ কথা ঠিক নয়। বরং কোন কারণে যদি অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ চলকসমূহের পরিবর্তন হয় তাহলে ভারসাম্য অবস্থারও পরিবর্তন হয়। এক বা একাধিক চলকের মান পরিবর্তন হলে কিভাবে একটি স্থিতাবস্থা প্রভাবিত হয় তা নির্ণয় করাই ভারসাম্য বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিতে ভারসাম্য ধারণাটি নানাভাবে একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: বাজার ভারসাম্য, উৎপাদনকারীর ভারসাম্য, ফার্মের ভারসাম্য, ভারসাম্য আয়স্তর, ভারসাম্য নিয়োগস্তর, ভারসাম্য বিনিয়োগস্তর ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় বাজার ভারসাম্য।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর মতে, “যখন সবকটি (দরদস্তুর ও কেনাবেচার) প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য মিলে যায়, তখন বেচাকেনা, দাম ইত্যাদির পরিবর্তনের আর কোন অভ্যন্তরীণ কারণ থাকে না। সে অবস্থাকে বলা হয় **Equilibrium** বা সমস্থিতি।” – অমর্ত্য সেন, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি।

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্যের মোট চাহিদার পরিমাণ (Q_d) এবং মোট যোগানের পরিমাণ (Q_s) পরস্পর সমান হলে তাকে বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium) বলে।

ভারসাম্য দাম: যে দামে বাজারে কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামকে $\bar{P}$ বা P_0 দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

ভারসাম্য পরিমাণ : যে পরিমাণে কোন দ্রব্যের বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতা অর্জিত হয়, তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে। ভারসাম্য পরিমাণকে $\bar{Q}$ বা q অথবা Q_0 বা q_0 দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

একটি ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ সংমিশ্রণ দ্বারা চাহিদা ও সরবরাহ সমীকরণদ্বয় অবশ্যই প্রমাণ বা সিদ্ধ হবে, ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটবে।

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

জ্যামিতিকভাবে ভারসাম্য ও ভারসাম্যের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা : রেখাচিত্রে চাহিদা ও যোগানের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

ধরি, চাহিদা সমীকরণ, D = Q_d = a – bP এবং

যোগান সমীকরণ, S = Q_S=– c+ dP

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, a = ইন্টারসেপ্ট বা ছেদক, b = চাহিদা রেখার ঢাল (ঋণাত্মক), d = যোগান রেখার ঢাল (ধনাত্মক) P = দাম এবং a, b, c, d,> 0।

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

বাজার ভারসাম্যের ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত: দ্রব্য ও সেবার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ, চাহিদা = যোগান $D = s$ বা, $Q_d = Q_S$ বা $, a - bP = -c + Dp$ বা $, -bP - dP = -c - a$ বা $, -P(b + d) = -(c + a)$

$\therefore \bar{p} = \frac{c+a}{b+d}$

এখন, ভারসাম্য দাম $\bar{p}$ কে চাহিদা সমীকরণ অথবা যোগান সমীকরণে বসাই,

$D = Q_d = a - bP = \mathrm{a} - \frac{b(c+a)}{(b+d)} = \frac{-bc-cd+cd+ad}{b+d}$

বা, $D = Q_d = \bar{Q} = Q_0 = \frac{ad-bc}{b+d}$

সুতরাং, বাজার ভারসাম্য দাম $\bar{p} = p_0 = \frac{c+a}{b+d}$

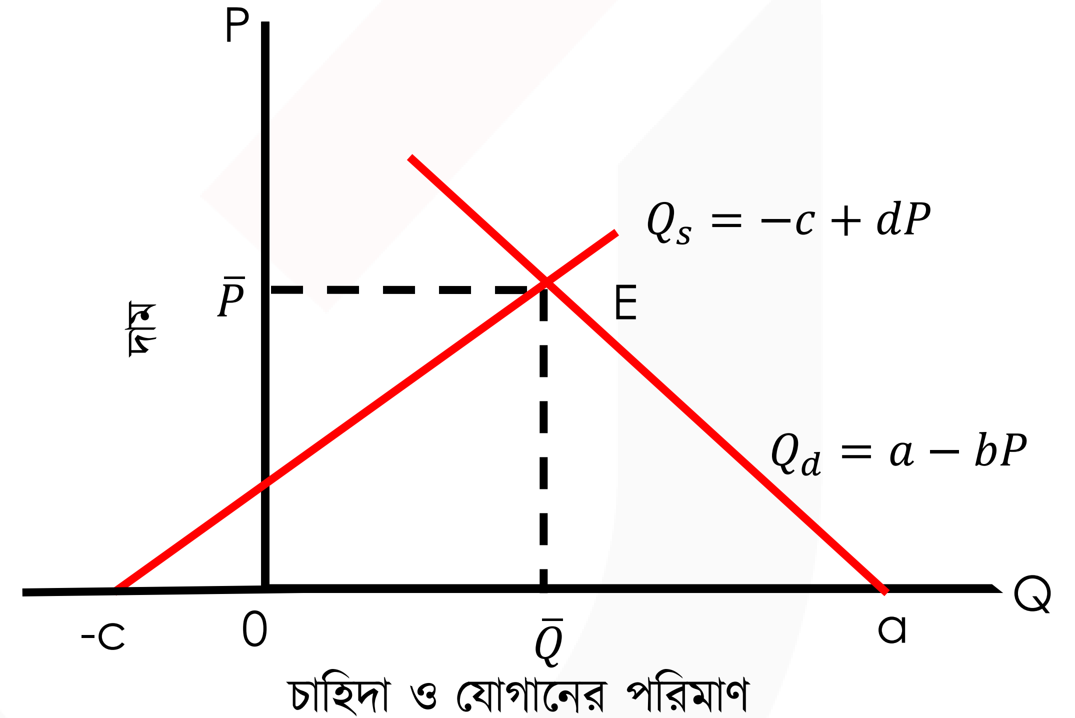
ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = Q_0 = \frac{ad-bc}{b+d}$

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত: চাহিদা রেখার ঢাল (Slope) < যোগান রেখার ঢাল (Slope)। অর্থাৎ যোগান রেখা (Q_s), চাহিদা রেখা (Q_d) কে নিচের দিক থেকে ছেদ করে ডানে উপরের দিকে যাবে। চিত্রে E বিন্দুতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেখানে, ভারসাম্য দাম, $O\bar{P} = \bar{P} = \frac{c+a}{b+d}$

এবং ভারসাম্য পরিমাণ $O\bar{Q} = \bar{Q} = \frac{ad-bc}{b+d}$ নির্ধারিত হয়েছে।



ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ:

ধরি চাহিদা সমীকরণ, D = $Q_d = 15 - 3P$; যোগান সমীকরণ, s = $Q_s = -3 + 6P$;

ভারসাম্য অবস্থায়, D = S বা, $Q_d = Q_S$

চাহিদা ও যোগান সমীকরণের মান বসিয়ে পাই, $15 - 3P = -3 + 6P$

বা, $-3P - 6P = -3 - 15$ বা, $(-)\, 9P = (-)\, 18$

$\therefore \bar{p} = \frac{18}{9} = 2$ $\quad$ ∴ভারসাম্য দাম $\bar{p} = 2$ টাকা

$\bar{p} = 2$ মান চাহিদা ও যোগান সমীকরণে বসাই, $D = Q_d = 15 - 3(2) = 15 - 6 = 9$

$S = Q_S = -3 + 6(2) = -3 + 12 = 9$

∴ ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = Q_0 = D = S = 9$ একক

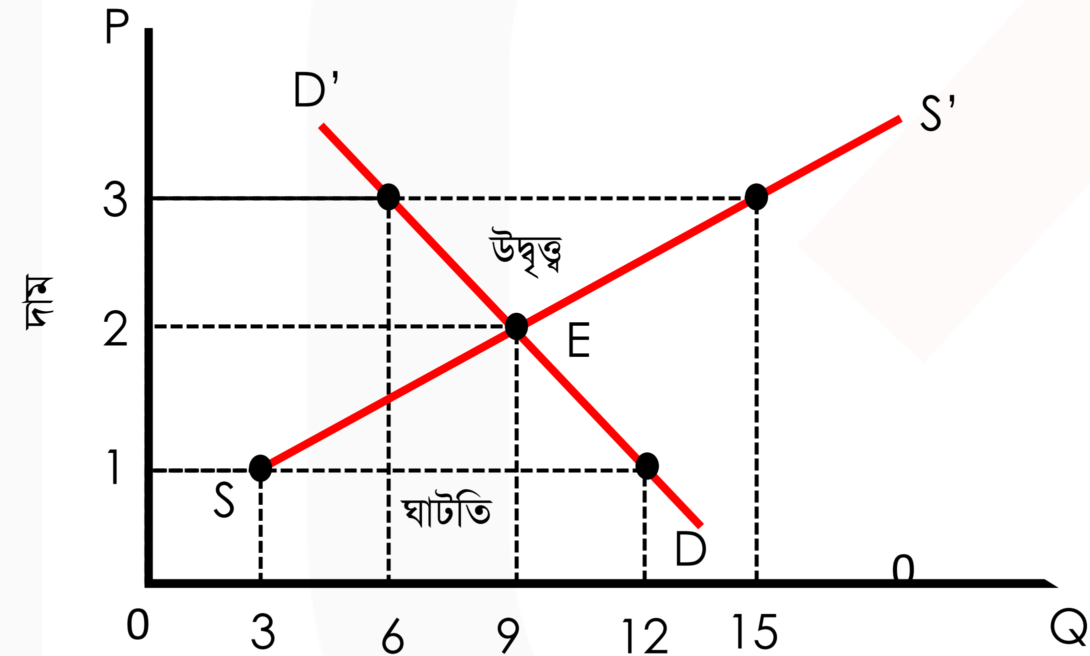
অর্থনীতিতে বাজারে এভাবে চাহিদা ও যোগান সমান হলে তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

সূচির সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় : চাহিদা ও যোগান সমীকরণে P-এর বিভিন্ন মানে চাহিদা (Q_d) এবং যোগান (Q_S)-এর যে বিভিন্ন মান পাওয়া যায়, তা নিচের সূচিতে দেখানো হলো —

দ্রব্যের দাম P (টাকা)	চাহিদা পরিমাণ, D = $Q_d = 15 - 3P$(একক)	যোগান পরিমাণ, = $Q_s = -3 + 6P$(একক)	চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক	বাজার অবস্থা	দামের প্রবণতা
1	12	3	D>S	ঘাটতি	দাম বাড়বে
2	9	9	D = S	ভারসাম্য	ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ স্থির
3	6	15	D < S	উদ্বৃত্ত	দাম কমবে

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity



চিত্র: ভারসাম্য দাম পরিমাণ নির্ধারণ

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় :

সূচি থেকে প্রাপ্ত মানসমূহ রেখাচিত্রে উপস্থাপন করি। দ্রব্যের দাম (P) যথাক্রমে 1 টাকা, 2 টাকা এবং 3 টাকা হলে, চাহিদার পরিমাণ (Q_d) যথাক্রমে 12 একক, 9 একক এবং 6 একক হয়। এসব বিন্দু যোগ করে চাহিদা রেখা DD' পাই। আবার দাম (P) যথাক্রমে 1 টাকা, 2 টাকা এবং 3 টাকা হলে, যোগানের পরিমাণ (Q_s) যথাক্রমে 3 একক, 9 একক এবং 15 একক হয়। এসব বিন্দু যোগ করে যোগান রেখা SS' পাই।

দ্রব্যের দাম, $P = 1$ টাকা হলে চাহিদা $(D) = 12 >$ যোগান $(S) = 3$, ফলে বাজারে ঘাটতি দেখা দিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাবে।

দ্রব্যের দাম $P = 2$ টাকা হলে, চাহিদা $(D) =$ যোগান $(S) = 9$ একক। ফলে বাজারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price and Quantity

দ্রব্যের দাম, $P = 3$ টাকা হলে চাহিদা $(D) = 6 < 9$ যোগান $(S) = 15,$ ফলে বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে এবং দাম কমবে।

চিত্রের E বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম শর্তানুযায়ী $D = S = 9$ হওয়ায় যোগান রেখা (SS') এবং চাহিদা রেখা (DD') কে ছেদ করে উপরে উঠায় বলা যায় যে, ভারসাম্যের দুটি শর্তই পালিত হয়েছে। অর্থাৎ E হলো ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = 9$ একক এবং ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 2$ টাকা।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, এভাবে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য অর্জিত হয়।

ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব

Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

বাজারে চাহিদা ও যোগানের যেকোন একটি অথবা উভয়ের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন হতে পারে।

নিচে এসব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হলো :

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম তিনভাবে পরিবর্তন হতে পারে। যথা :

১. যোগান স্থির থেকে, চাহিদার পরিবর্তন $(\bar{S}, \Delta D)$

২. চাহিদা স্থির থেকে, যোগানের পরিবর্তন $(\bar{D}, \Delta S)$

৩. চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন $(\Delta D,\ \Delta S)$

ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব
Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

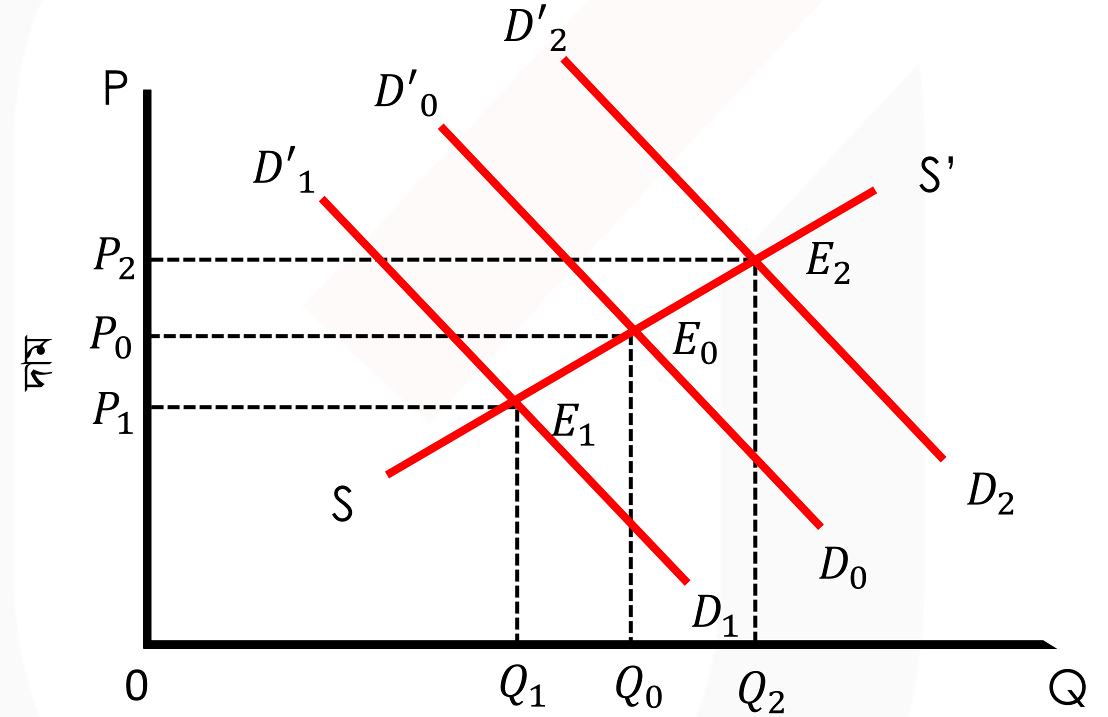
যোগান স্থির থেকে, চাহিদার পরিবর্তন $(\bar{S}, \Delta D)$: কোন দ্রব্যের যোগান স্থির থাকা অবস্থায়ও তার চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তন দুইভাবে হতে পারে। যথা— চাহিদার বৃদ্ধি এবং চাহিদার হ্রাস। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

i. **চাহিদা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব :** বিবেচ্য দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যটির দাম এবং চাহিদা উভয়ই বাড়ে। যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে চাহিদার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব বলে। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়, ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

ii. **চাহিদা হ্রাসজনিত প্রভাব:** দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস হ্রাস পেলে দ্রব্যটির দাম এবং চাহিদা উভয়ই কমে। যোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পেলে ভারসাম্যে যে পরিবর্তন হয়, তাকে চাহিদার হ্রাসজনিত প্রভাব বলে। চাহিদা হ্রাস পেলে, চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয় এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়েই হ্রাস পায়।

ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব
Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা: চিত্রের ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে প্রাথমিক চাহিদা রেখা $D_0D'_0$ এবং যোগান রেখা SS' পরস্পর E_0 বিন্দুতে ছেদ করায় অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান সমান হওয়ায় E_0 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। তাই E_0 হলো প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু। এখন যোগান স্থির থেকে কোন কারণে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে $D_2D'_2$ হয়। তাই $D_2D'_2 = SS'$ দ্বারা E_2 বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে OP_2 এবং OQ_2 হয়। এক্ষেত্রে $OP_2 > OP_0$ এবং $OQ_2 > OQ_0$ হওয়ায় বলা যায়, কোন দ্রব্যের যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।



ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব
Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

অনুরূপভাবে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়ে $D_1D'_1$হয়। ফলে E_1 বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_1 এবং OQ_1 হয়। চিত্রানুযায়ী $OP_1 < OP_0$ এবং $OQ_1 < OQ_0$ হওয়ায় বলা যায়, কোন দ্রব্যের যোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পেলে ভারসাম্য দাম এ পরিমাণ উভয়ই হ্রাস পায়।

ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব
Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

চাহিদা স্থির থেকে, যোগানের পরিবর্তন ($\bar{D}, \Delta S$) : চাহিদা স্থির থেকে কর ব্যবস্থা, আবহাওয়া, পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদির কারণে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে, এটিকে যোগানজনিত প্রভাব বলে। কোন দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে তার যোগানের পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে। যথা—যোগানের বৃদ্ধি এবং যোগানের হ্রাস।
নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো —

- **যোগান বৃদ্ধিজনিত প্রভাব:** চাহিদা স্থির থেকে অনুকূল প্রভাবের জন্য যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে, ফলে ভারসাম্য দাম হ্রাস পাবে কিন্তু ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

- **যোগান হ্রাসজনিত প্রভাব:** চাহিদা স্থির থেকে প্রতিকূল প্রভাবের কারণে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পেলে যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হবে, ফলে ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ভারসাম্য পরিমাণ হ্রাস পাবে।

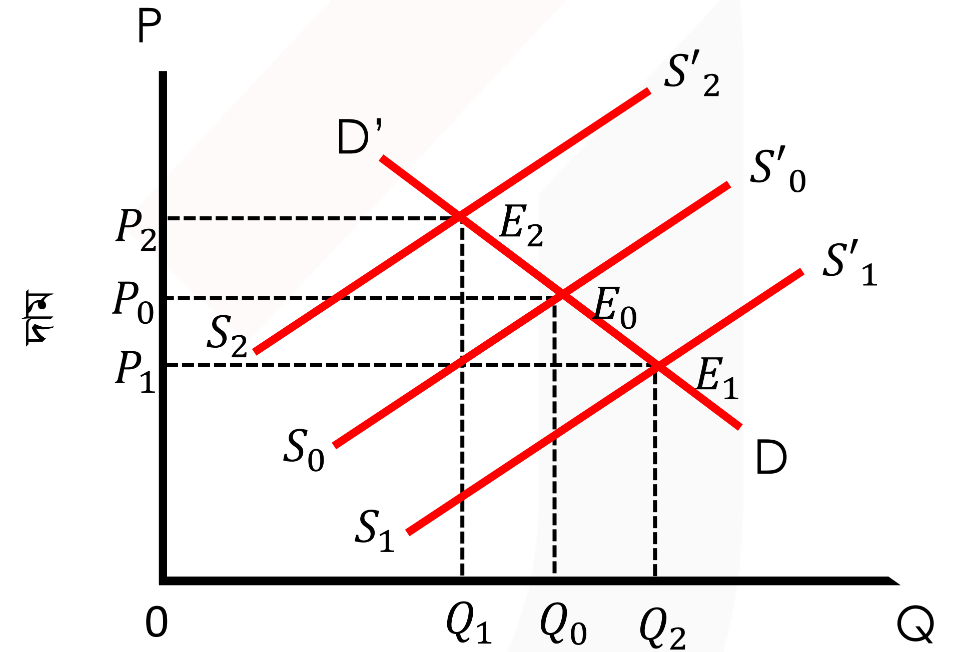
ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের প্রভাব
Effects of the changes in Determination and supply Equilibrium Price

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা: চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশিত হয়েছে।

E_0= প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু।

DD' = প্রাথমিক চাহিদা রেখা।

$S_0S'_0$= প্রাথমিক যোগান রেখা।



চাহিদা স্থির থেকে যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা ডানদিকে সরে $S_1S'_1$ হয় এবং নতুন ভারসাম্য E_1 বিন্দুতে অর্জিত হয়, ফলে দাম হ্রাস পেয়ে OP_1 হয় এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হয়। এবার যোগান হ্রাস $S_2S'_2$হলে, নতুন ভারসাম্য E_2 বিন্দুতে অর্জিত হয়, ফলে দাম বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হয় এবং পরিমাণ হ্রাস পেয়ে OQ_1 হয়।
সুতরাং, যেকোন দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম হ্রাস পায়, কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার যোগান হ্রাস পেলে দাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।



উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়





শিখনফল

- উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ
- উৎপাদনের উপকরণ
- উৎপাদনের অপেক্ষক
- উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
- মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা

ভূমিকা
Introduction

মানুষের বহুবিধ অভাব মোচনের মৌলিক উপায় হচ্ছে উৎপাদন, অর্থাৎ নতুন উপযোগ সৃষ্টি।

উৎপাদককে দক্ষতার সাথে কম ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন দ্বারা সর্বোচ্চ মুনাফা আহরণ করতে হয়।

সেবারও অর্থমূল্য রয়েছে, তাই সেটিও বৃহত্তর পরিসরে উৎপাদনের আওতাভুক্ত। তাই বলা যায়, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎপাদনকর্মে নিয়োজিত।

এ অধ্যায়ে উৎপাদন ধারণার সাথে উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন অপেক্ষক, উৎপাদনবিধি, উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উৎপাদন
Production

সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'উৎপাদন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর রূপ ও অবস্থার পরিবর্তন এবং স্থানান্তারের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটাই অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসেবে পরিচিত।

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়।

উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে।

আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

যেমন: আটা, লৰণ, পানি ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই ।

অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ রুটির বিনিময় মূল্য আছে। অর্থনীতিবিদরা বিভিন্নভাবে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন—

উৎপাদন
Production

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের (Alfred Murshall) মতে,

“এ বস্তুজগতে মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে এরূপ পুনর্বিন্যাস করে যাতে, তাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করা যায়।”

অস্ট্রেলীয় অর্থনীতিবিদ বার্নার্ড উইলিয়াম ফ্লেজার বলেন,

“যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায়, তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করা বোঝায়।"

অতএব উৎপাদনকে একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, যার মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, উৎপাদিত পণ্যের উপযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিনিময় মূল্য থাকাও আবশ্যক।

উৎপন্ন

অর্থনৈতিক কার্যাবলির ফলাফলই হলো উৎপন্ন। মোট উৎপন্নের মধ্যে আছে দ্রব্য ও সেবা। দ্রব্য আবার দুভাগে বিভক্ত- ভোগ্য দ্রব্য ও উৎপাদকের বিনিয়োগ দ্রব্য।

উপযোগ বা উৎপাদনের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Utility or Production

একজন উৎপাদক বস্তুর রূপ, স্থান, সময়, সেবা এবং মালিকানার পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করে। ফলে উপযোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে উপযোগের শ্রেণিবিন্যাসের সারণি দেওয়া হলো—

উপযোগের নাম	পরিবর্তন	উদাহরণ
১. স্থানভিত্তিক	বস্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি করা।	গ্রাম থেকে চাল, ডাল, ফলমূল শহরে এনে উপযোগ বৃদ্ধি।
২. রূপভিত্তিক	বস্তুর আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগের সৃষ্টি করা।	গাছ থেকে তুলা, তুলা থেকে কাপড় তৈরি।
৩. সময়ভিত্তিক	উৎপাদিত দ্রব্য কিছু সময় মজুদ রেখে বেশি দামে বিক্রি করে উপযোগ বৃদ্ধি করা।	ধান, ডাল, আলু কিছুকাল মজুদ রেখে সংকটকালে বিক্রি।
৪. সেবাভিত্তিক	শ্রম ও সেবাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি করা।	শিক্ষক, ডাক্তার, সেবিকার সেবা।
৫. মালিকানা/স্বত্বভিত্তিক	বস্তুর মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরিত করে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়।	বাড়ি, গাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তর।

সুতরাং উৎপাদন হলো তৈরিকৃত বস্তু বা সেবাতে উপযোগ সৃষ্টি করা।
অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুগত উপকরণকে বস্তুগত উৎপাদনে রূপান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাকে উৎপাদন (Production) বলে।

উৎপাদনের উপকরণ
Factors of Production

উৎপাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত সীমিত যোগানবিশিষ্ট যেকোনো বস্তু বা সেবাকে উৎপাদনের উপকরণ (Resource) বলা হয়। প্রকৃতির উপাদান (বাতাস, সূর্যের আলো ইত্যাদি) ছাড়া মাটি, খনিজ ও জলজ পদার্থ, মানুষের শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যা কিছু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাকেই উৎপাদনের উপকরণ বলে অর্থনীতিতে বিবেচনা করা হয়। উৎপাদনের চারটি প্রধান উপকরণ রয়েছে। যেমন- ১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন ও ৪. সংগঠন।

১.ভূমি (Land):

উৎপাদনে সাহায্য করে এমন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি,খনিজদ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত।

২. শ্রম (Labour):

উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

এ অর্থে জেলে বা ঠেলাগাড়ির চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি ডাক্তার বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রম ।

উৎপাদনের উপকরণ
Factors of Production

৩. মূলধন (Capital):

যেসব দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত এবং সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় অর্থনীতিতে সেগুলোকে মূলধন বলে। অর্থাৎ, মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান ।

মূলধন প্রকৃতির দান নয়, এটি মনুষ্যসৃষ্ট। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কলকারখানা প্রভৃতি হলো মূলধন।

৪. সংগঠন (Organization):

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মুলধন একত্রিত করে ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে।

এ কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে।

তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ইত্যাদি।

উৎপাদনের উপকরণ
Factors of Production

কোনো কিছু উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন— এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অভাব হলে উৎপাদন সম্ভব নয়।

অবশ্য উৎপাদনক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি।

আবার যুক্তরাষ্ট্র শিল্পপ্রধান দেশ বলে সেখানে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধন ও সংগঠনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Production

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য:

১. উৎপাদনে বস্তুগত উপকরণ বা উপাদান ব্যবহৃত হয়,

২. কারিগরি জ্ঞান যুক্ত হয়,

৩. যন্ত্রপাতি যুক্ত হয়,

৪. সময় যুক্ত থাকে,

৫. বস্তুগত উৎপাদন যা চূড়ান্ত ফল নির্দেশ করে,

৬. বিনিময় মূল্য প্রযোজ্য হয়,

৭. উপযোগ সৃষ্টি হয়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Production

একটি দেশের উৎপাদন যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেগুলো হলো-

১. সম্পদের পরিমাণ ও উৎকর্ষ,

২. উৎপাদন পদ্ধতি,

৩. মৌলিক সুবিধা তথা অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ওপর,

৪. আবহাওয়া, পর্বত, নদী, বন্যা, সাইক্লোন ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক অবস্থা এবং

৫. দেশের রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি।

জেনে রাখো: উৎপাদনের উপকরণ হলো-

১. ভূমি (Land): প্রাকৃতিক সম্পদ

২. শ্রম (Labour): দৈহিক ও মানসিক কর্ম প্রচেষ্টা

৩. মূলধন (Capital): উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান

৪. সংগঠন (Organization): বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব
Comparative Importance of Fcators of Production

কোনো দ্রব্য উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-এ চারটি উপাদানই অপরিহার্য।

এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব নয়।

তবে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদানের গুরুত্বে খানিকটা তারতম্য লক্ষ করা যায়।

ভূমির গুরুত্ব:

ভূমি হলো উৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রকৃতি প্রদত্ত যত সম্পদ বা ঐ রয়েছে এবং যা মানুষের কল্যাণে অকাতরে দান করেছে তাই ভূমি।

যেমন— মাটি, খনি, বনভূমি, মাছ ধরার জলাশয় গোচারণ ভূমি, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি।

ভূমিকে বাদ দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয়। বর্তমানকালে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসেবে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব
Comparative Importance of Fcators of Production

শ্রমের গুরুত্ব:

শ্রম উৎপাদনের দ্বিতীয় উপকরণ।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

তবে শুধু আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করা হলে, তাকে শ্রম বলা হয় না।

এ কারণে যে নিজের আনন্দের জন্য গান গায়, ছবি আঁকে তার পরিশ্রম, শ্রম নয়।

কিন্তু যে গায়ক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গান গায়, তার গান শ্রম হিসেবে গণ্য হবে।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব
Comparative Importance of Fcators of Production

মূলধনের গুরুত্ব:

উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে মূলধন অন্যতম।

সাধারণ অর্থে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থকে মূলধন বোঝায়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন বলতে, মানুষের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত এমন উপাদানকে বোঝায় যা ভোগের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না বরং পুনরায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থায়ী উপাদান হিসেবে কাজ করে উৎপাদন কার্যক্রমকে চালু এবং অধিক উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

আধুনিক সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে মূলধনের প্রয়োজন অত্যধিক এবং মূলধনকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ধরা হয়।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব
Comparative Importance of Fcators of Production

সংগঠনের গুরুত্ব:

সংগঠন বলতে জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয়সাধন বা সংযোগ স্থাপনের কাজকে বোঝায়।

অসংখ্য বিশেষীকৃত উপাদানের সাহায্যে বর্তমানকালের বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ফলে বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব
Comparative Importance of Fcators of Production

জেনে রাখো:

উৎপাদনের উপকরণের বিবর্তন—

১. শিল্প বিপ্লবের পূর্বে কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

২. শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পভিত্তিক সমাজে ভূমির পাশাপাশি মূলধন ও সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৩. আদিম সভ্যতা ও সামন্ত যুগে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমের গুরুত্ব ছিল বেশি।

৪. পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

৫. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়সাধন করে উৎপাদন কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে প্রত্যেকটি উপকরণই একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

উৎপাদনের প্রযুক্তির প্রকারভেদ
Types of Technology of Production

উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদান স্থির ধরে সমাজে প্রচলিত কারিগরি জ্ঞানের সহায়তায় শ্রম ও মূলধনের একটি অনুপাত ব্যবহারের মাধ্যমে যে উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ করা হয়, তাকে উৎপাদনের প্রযুক্তি বলে।

অধ্যাপক হিকস তিন ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. মূলধননিবিড় প্রযুক্তিগত কৌশল (Capital Intensive Technology): মূলধন > শ্রম অর্থাৎ $K > L$
২. শ্রমনিবিড় প্রযুক্তিগত কৌশল (Labour Intensive Technology): শ্রম মূলধন> অর্থাৎ $L > K$
৩. নিরপেক্ষ প্রযুক্তিগত কৌশল (Neutral Technology): মূলধন = শ্রম অর্থাৎ $K = L$

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শ্রম বেশি কিন্তু মূলধন কম।
আবার উন্নত দেশে মূলধন বেশি কিন্তু শ্রম কম ব্যবহৃত হয়।
তাই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শ্রমনিবিড় কৌশল বেশি উপযুক্ত এবং উন্নত দেশে মূলধননিবিড় কৌশল বেশি প্রয়োগ করা হয়।

উৎপাদনের অপেক্ষক
Production Function

Function শব্দটির অর্থ কাজ। তবে গণিতশাস্ত্রে এর অর্থ অপেক্ষক।

দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর কৌশলকে ফাংশন বা অপেক্ষক বলে।

যেমন, Y চলক X চলকের ওপর নির্ভরশীল হলে, $Y = f(x)$।

আবার X ও Y চলকদ্বয়ের ওপর যদি $Z=f(X,Y)$ অর্থাৎ চলকের ব্যবহার অনুযায়ী অপেক্ষকের পরিধিও পরিবর্তিত হয়েছে।

এখন যদি L, K, P, R ,S , T চলকগুলোর ওপর Q চলক নির্ভরশীল হয় তবে $Q = f\ (L, K, P, R, S, T)$ হবে।

উৎপাদনের উপাদানগুলোর পরিমাণের ওপর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে।

উৎপাদনের অপেক্ষক
Production Function

উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলে, কারিগরি কৌশল অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের সর্বাধিক পরিমাণ কত হবে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি (Land), শ্রম (Labour) মূলধন (Capital) সংগঠন (Organization)।

সাধারণভাবে উৎপাদনের উপাদানের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

অধ্যাপক পল. এ. স্যামুয়েলসন বলেন,

"উৎপাদন অপেক্ষক হলো এমন একটি কৌশলগত সম্পর্ক যা উৎপাদনের প্রত্যেক উপকরণ এবং একগুচ্ছ নির্দিষ্ট উপকরণসমূহ কী পরিমাণ উৎপাদন করতে সক্ষম তা প্রকাশ করে।"

বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপাদানের সাথে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কারিগরি বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক (Production Function) বলে।

উৎপাদনের অপেক্ষক
Production Function

উৎপাদন অপেক্ষক হলো Q= f(Land,Labour, Capital, Organization)

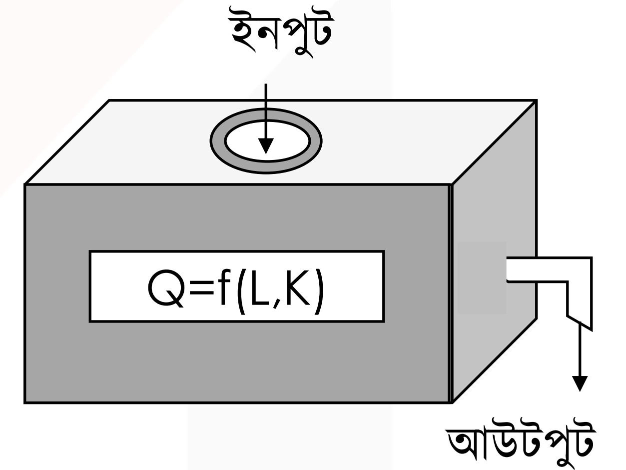
বা, Q= f(L_a,L_b,K,O,A)

এখানে Q = উৎপাদন, f = অপেক্ষক, L_a = ভূমি, L_b= শ্রম, K= মুলধন,O= সংগঠন, A = দক্ষতার সহগ বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান।

সরল বিশ্লেষণের জন্য দুটি উপাদান L (শ্রম) ও K (মূলধন) বিবেচনা করা হয়।

ধরি, দুটি উপাদান শ্রম (L), মুলধন (K) এবং উৎপন্ন দ্রব্য (Q) তাহলে, উৎপাদন অপেক্ষক Q=f(L, K)

লক্ষ কর: ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনকে উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চিত্রে black box-এ প্রচলিত প্রযুক্তি স্থান পায়। সেই প্রযুক্তির ভিত্তিতে উপকরণগুলো সমন্বিত হয়ে উৎপাদন সৃষ্টি করে। এভাবে উৎপাদন অপেক্ষকের সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা যায়



চিত্র: উপকরণকে উৎপন্নে রূপান্তর প্রক্রিয়া

উৎপাদনের অপেক্ষক
Production Function

উৎপাদন অপেক্ষকের তাৎপর্য:

একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে L ও K এর সাথে Q কীভাবে সম্পর্কিত রয়েছে তা উক্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব কারিগরি তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

ধরি, একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K) = 5 \times L \times K$, যদি উপাদান $L = 4$ একক এবং $K = 5$ একক ব্যবহৃত হয়, তবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হবে $Q = 5 \times 4 \times 5 = 100$ একক। উৎপাদন $Q = 100$ একক পাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কৌশল (শ্রমনিবিড় অথবা মূলধননিবিড়) প্রয়োজন হয়।

লক্ষ কর: উপাদান দুটির যেকোনো সংমিশ্রণ ব্যবহার করে কতটুকু উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া সম্ভব তা উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা জানা যায়।

উৎপাদনের অপেক্ষক
Production Function

উপাদান ও ইনপুট (Input) কি একই?

উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরুতে যেসব বস্তু বা সেবা ব্যবহারযোগ্য হিসেবে বিরাজ করে তাদেরকে ইনপুট বলে।

উৎপাদনের সাথে ইনপুট মিশে যায়, কিন্তু উপাদানগুলো উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

যেমন— জমিতে যখন ফসল ফলে তখন ঐ জমির ফসলে জমির সেবা প্রবেশ করে ঠিকই, তবে জমি পড়ে থাকে।

মোটকথা চাষির শ্রম কেবল কাজে আসে, চাষি নয়।

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

ক. সময়ভিত্তিক:

সময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার।

যথা- ১. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক এবং ২. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।

১। স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক:

স্বল্পকালে উৎপাদনের উপকরণের সাথে উৎপাদনের পরিমাণের যে প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষেত্রে স্থির ও পরিবর্তনীয় উভয় উপকরণ বিদ্যমান থাকে।

যেমন- $Q = f(L, \bar{K}) = 4L+3$ একটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক। এখানে L=শ্রম, K= মূলধন, K=3 স্থির এবং L কে পরিবর্তনশীল ধরা হয়েছে। উৎপাদন Q এর মান শ্রম L এর মানের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন ঘটে।

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

ক. সময়ভিত্তিক:

২. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক:

দীর্ঘকালে উৎপাদনের উপকরণের সাথে উৎপাদনের পরিমাণের যে প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাকে দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

দীর্ঘকালে উৎপাদনের কোনো উপকরণই স্থির নয়, সব উপকরণই পরিবর্তনীয়।

যেমন Q=f(L, K); এখানে L = শ্রম, K= মূলধন উভয় উপকরণই পরিবর্তনশীল।

ফলে, অপেক্ষকটি একটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক।

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

খ. সমভিত্তিক:

সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার।

যথা- ১. সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক এবং ২. অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক।

১। সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক:

যে উৎপাদন অপেক্ষক স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বিধি মেনে চলে অর্থাৎ উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনও যদি সেই নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

যেমন: কব ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক, $Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$,(এখানে $\alpha + \beta = 1$)

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

খ. সমভিত্তিক:

২। অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক:

যে উৎপাদন অপেক্ষক স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বিধি মেনে চলে না অর্থ উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না তাকে অসমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

যেমন: $Q = L^{\alpha} K^{\beta} + 10$

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

গ. খাতভিত্তিক:

খাতভিত্তিক উৎপাদন অপেক্ষক দুই প্রকার। যেমন—

১। কৃষিখাতে উৎপাদন অপেক্ষক:

স্পিলম্যান উৎপাদন অপেক্ষক: $Y=m-ar^{x}$

এখানে, Y = উৎপাদন,

x = পরিবর্তনীয় উপকরণ,

m = সর্বাধিক উৎপন্ন,

r = উৎপাদন হার বা অনুপাত,

a = সর্বাধিক উৎপন্নের পরিমাণ যা, পরিবর্তনীয় উপকরণ দ্বারা যোগ করা যায় ।

উৎপাদনের অপেক্ষকের প্রকারভেদ
Types of Production Function

গ. খাতভিত্তিক:

২। শিল্পখাতে উৎপাদন অপেক্ষক:

কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক **Q=A$L^{\alpha}K^{\beta}$**,

এখানে, Q = উৎপাদন,

L = শ্রম, K = মূলধন,

A = কারিগরি জ্ঞান,

α = শ্রম (L) এর পরামিতি,

B = মূলধন (K) এর পরামিতি। $\alpha + \beta = 1$, একমাত্রার সমজাতীয় উৎপাদন বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

* যে সমস্ত ধ্রুবকের মান অজানা থাকে, তাকে পরামিতি বলে।

উৎপাদনের অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ
Production Function Showing in a Diagram

সল্পকালে একটি উপকরণ স্থির থাকে। যদি Q f(L, $\bar{K}$) এ উৎপাদন অপেক্ষকে K স্থির ও L পরিবর্তনশীল ধরা হয়, তবে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকেরা রূপ দাড়ায়: Q=f(L, $\bar{K}$) ।

যেখানে K'র উপর হার (bar) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, $\bar{K}$ এর পরিমাণ স্থির।

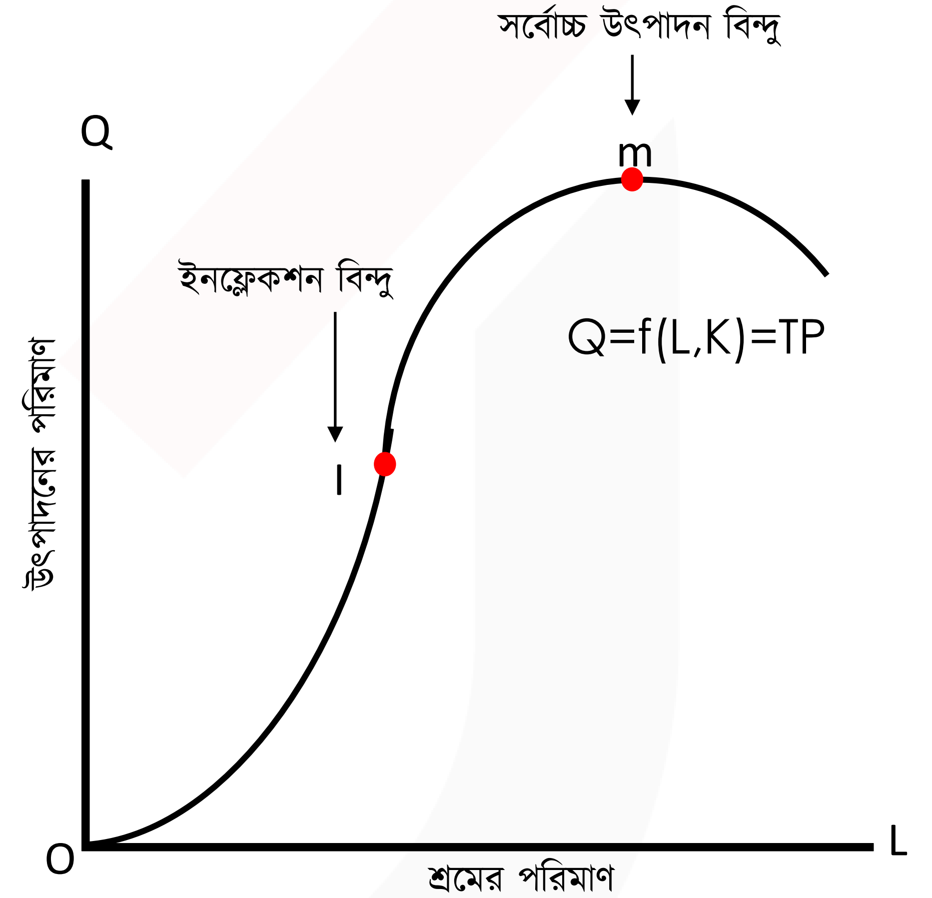
K স্থির থেকে পরিবর্তিত হলে L ও K নিয়োগের অনুপাত পরিবর্তিত হয় এবং তার প্রভাবও উৎপাদনের ওপর পড়ে।

স্থির উপাদান উহ্য রেখে একক পরিবর্তনীয় উপাদান সম্পন্ন উৎপাদন অপেক্ষককে অনেক সময় দেখানো হয়: Q = f(L) দ্বারা একটি পরিবর্তনীয় উপাদান ও একটি উৎপাদন দ্রব্য সম্বলিত উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ করা হলো—

উৎপাদনের অপেক্ষককে চিত্রে প্রকাশ
Production Function Showing in a Diagram

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) বিবেচনা করা হয়েছে।

চিত্রে শ্রম (L) বাড়লে m বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদন (Q) বাড়ে। তবে *I* বিন্দু পর্যন্ত উৎপাদন (Q) ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এবং I'র পরে m-এর পূর্ব পর্যন্ত Q বাড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে। m বিন্দুতে উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। তবে m বিন্দুর পরে উৎপাদন কমতে থাকে। উল্লেখ্য, শ্রম (L) এর ওপর উৎপাদন (Q) এর নির্ভরশীলতা নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে পরিচালিত হয়। এভাবে উৎপাদন অপেক্ষককে চিত্রে দেখানো যায়।



চিত্র: উৎপাদনের অপেক্ষক

উৎপাদনের অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Production Function

উৎপাদন অপেক্ষক শুধুমাত্র শ্রম ও মূলধন উপকরণের ওপরই নির্ভর করে না; বরং মাত্রাগত উৎপাদন, উপকরণসমূহের দক্ষতা, কৃতকৌশলের পরিবর্তন, সময়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

সবদিক বিবেচনা করে উৎপাদন অপেক্ষকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়:

ক. উৎপাদন অপেক্ষক একটি বস্তুগত ধারণা এবং কারিগরি ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট।

খ. উৎপাদন অপেক্ষক বস্তুগত দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রবাহ ধারণা।

উৎপাদন ধারায় এক বস্তু অপর বস্তুতে পরিবর্তন হয় এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে।

উৎপাদনের অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Production Function

গ. উৎপাদন সুবিধার জন্য অনেক সময় উৎপাদন অপেক্ষকে ব্যবহৃত উপকরণ স্থির ও পরিবর্তনশীল উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. উৎপাদনের পরিবর্তনের ধারায় কম-বেশি প্রকৌশলগত আচরণ অব্যাহত থাকে।

ঙ.উৎপাদনের উপকরণ প্রকৃতি পপ্রদত্ত ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। উপকরণ আবার মাধ্যমিক পণ্য বা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

চ. উৎপাদনক্ষেত্রে অপেক্ষক বলতে উপকরণের পরিমাণগত রূপান্তর বোঝায়।

যেমন— লোহা পরিবর্তিত হয়ে লৌহজাত দ্রব্য সৃষ্টি হয়। আবার সেবা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– রাস্তা, ব্রিজ, ট্রেন, ইত্যাদি।

ছ. উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা উৎপাদন কৌশলটি শ্রমনিবিড় না মূলধননিবিড় তা বোঝা যায় ।

জ. এটি উপাদানের পরিবর্তনের ফলে মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে।

মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা
Concepts of Total Product, Average Product and Marginal Product

১। মোট উৎপাদন (Total Product):

উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

তাই উপকরণের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের সমষ্টিকে মোট উৎপাদন বলে।

ব্যাপকার্থে বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের ফলে যে পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন (TP) বলে।

ধরি, শ্রম (L) ও মূলধন (K) দুটি উপাদান। এদের সাহায্যে উৎপাদন অপেক্ষক হবে $Q = f(L, \bar{K})$, এখানে k যেহেতু স্থির, তাই পরিবর্তনশীল চলক L এর সাপেক্ষে অপেক্ষকটিকে লেখা যায়, $Q = f(L)$।

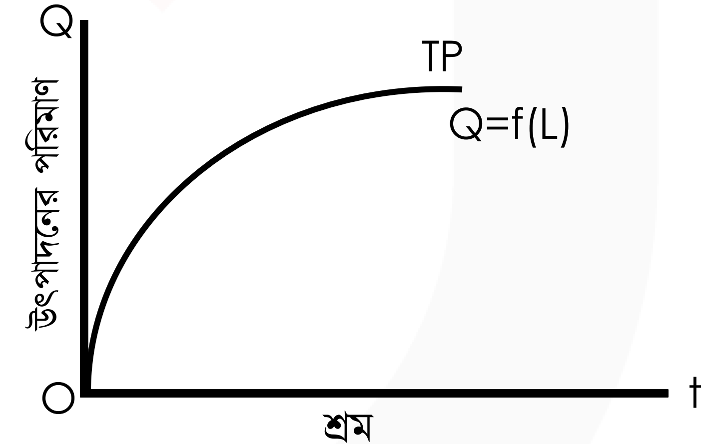
এখন উৎপাদক যদি শ্রম (L) নিয়োগকে বৃদ্ধি করে তাহলে মোট উৎপাদন (Q)- তে যে পরিবর্তন আসবে এটিই মোট উৎপাদন।

মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা
Concepts of Total Product, Average Product and Marginal Product

তালিকা ও চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (Q)
10	100
12	110
14	120

উপরের তালিকায় দেখা যায়, শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ 10 থেকে 12 এবং 14 পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট উৎপাদনও 100 থেকে 110 এবং 120 পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পাশের চিত্রে এ তথ্যগুলোর আলোকে একটি TP রেখা আঁকা হলো। চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদন দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যায়, শ্রম ব্যবহারের সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে; তাই TP রেখা ক্রমবর্ধমান ।



চিত্র: মোট উৎপাদন

২. গড় উৎপাদন (Average Product):

অন্যান্য উপকরণকে স্থির ধরলে পরিবর্তনীয় উপকরণের একক প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণকে গড় উৎপাদন বলে। ফলে দেখা যায়, মোট উৎপাদনের পরিমাণ (TP)-কে পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন (AP) পাওয়া যায়।

$$\text{গড় উৎপাদন (AP)} = \frac{\text{মোট উৎপাদন(TP)}}{\text{পরিবর্তনশীল উপকরণ(L)}}$$

$$TP = AP \times L$$

বা, $AP = \frac{TP_L}{L}$

মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা
Concepts of Total Product, Average Product and Marginal Product

তালিকার সাহায্যে ব্যাখ্যা:

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP=Q)	গড় উৎপাদন$(\frac{Q}{L})$
10	100	$\frac{100}{10} = 10$
12	132	$\frac{132}{12} = 11$
14	168	$\frac{168}{14} = 12$

উপরের তালিকায় দেখা যায়, শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোট উৎপাদনকে শ্রম নিয়ে ভাগ করে গড় উৎপাদন 10, 11 ও 12 একক পর্যন্ত পাওয়া যায়।

মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণা
Concepts of Total Product, Average Product and Marginal Product

৩.প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) :

অন্যান্য উপাদান স্থির ধরে পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তন সাপেক্ষে মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বলে।

ব্যাপকার্থে, অতিরিক্ত এক একক উপকরণ নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক উৎপাদন।

শ্রমকে পরিবর্তনশীল উপাদান ধরলে প্রান্তিক উৎপাদন নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়:

$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$ । যেখানে,

MP_L =শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন

ΔQ=উৎপাদনের পরিবর্তন এবং

ΔL= শ্রমের পরিবর্তন

উৎপাদন বিধি
Law of Production

একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে উপকরণ তথা ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনের প্রয়োজন হয়।

ফলে এসব উপকরণের জন্য খরচ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকরণ খরচ বৃদ্ধি পায়, কখনও কখনও সমান থাকে আবার কখনো খরচ হ্রাস পায়। অর্থাৎ উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং, উপকরণগুলোর নিয়োগ পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণে নিয়ম অনুযায়ী যে পরিবর্তন হয়, তাকে উৎপাদন বিধি (law of Production) বলে।

অন্যভাবে, যে বিধির সাহায্যে উপকরণসমূহের নিয়োগ বা উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদনের অনুপাত জানা যায় তাকে উৎপাদন বিধি বলা হয়।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ. কুটসোয়ানিস (A. Koutsoyiannis) এর মতে, "উৎপাদনস্তর বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারিগরি প্রক্রিয়াকে উৎপাদন বিধি বলে।"

উৎপাদন বিধি
Law of Production

এ বিধির তাৎপর্য:

এ বিধিটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ এবং উৎপাদনের পরিমাণের আপেক্ষিক সম্পর্ক নির্দেশ বা প্রকাশ করে। একজন উৎপাদক বা উদ্যোক্তা এ বিধি অনুসরণ করে তার উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

উৎপাদন বিধিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

২. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Marginal Returns) এবং

৩. স্থির বা সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Constant Marginal Returns)

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

ক্লাসিক্যাল, নিওক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টারগো (Turgo) সর্বপ্রথম এ বিধিটি সম্পর্কে ধারণা দেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক এডওয়ার্ড ওয়েস্ট, মার্শাল, রিকার্ডো এবং ম্যালথাস ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে এ বিধির বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা প্রদান করেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদ স্টিগলার ও পি.এ. স্যামুয়েলসন এ বিধি সমর্থন করেন।

মূলত অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের হাতে এ বিধিটি পরিশালিত রূপ লাভ করে এ তত্ত্বটির প্রধান প্রবক্তা মূলত একজন স্কটিশ কৃষক। তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেন যে, একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে তিনি যতই নিবিড়ভাবে শ্রম এবং পুঁজি নিয়োগ করেন ততই উৎপাদন কমতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

এ বক্তব্যকে কতকগুলো অনুমিতি নিয়ে মার্শাল বলেন,

“কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষের জন্য অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

অধ্যাপক বেনহাম-এর মতে,

“অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে উপাদানের একটি সংমিশ্রণের মধ্যে যদি কোনো একটির অনুপাত বৃদ্ধি করা হয়, তবে এরূপ বৃদ্ধির ফলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পর, প্রথমে সে উপাদানের প্রান্তিক এবং পরে গড় উৎপাদন হ্রাস পাবে।”

An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general less than proportionate increase in the amount of produced raised.-A Marshall.

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটির নিয়োগ বাড়লে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এ বিধিটি কার্যকর হয়।

উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়তে পারে।

মনে করি, আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। এ কারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

মূল বক্তব্য:

অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিবর্তনে, মোট উৎপাদনের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে ব্যাখ্যা করা হয়।

১. পরিবর্তনীয় উপাদান বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, এ অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে।

২. দ্বিতীয় অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে কমতে থাকলে, মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। আবার প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য অবস্থায় মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়।

৩. আবার তৃতীয় পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হলে, মোট উৎপাদন কমতে থাকে। এই তিনটি অবস্থাই এ বিধিতে ব্যাখ্যা করা হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

অনুমিত শর্তসমূহ:

এ বিধিটি নিম্নলিখিত অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত –

১. ভূমির যোগান এবং উর্বরতা স্থির।
২. দুটি উপকরণের মধ্যে একটি স্থির রেখে অন্যটি পরিবর্তন করা হয়
৩. পরিবর্তনশীল উপকরণের এককগুলো সমজাতীয়।
৪. উপাদানগুলোর অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য।
৫. উৎপাদনে নিয়োজিত কারিগরি জ্ঞানের মাত্রা অপরিবর্তিত।
৬. উৎপাদনের পরিমাণ বস্তুগত এককে পরিমাপযোগ্য। যেমন- কুইন্টাল, কেজি ইত্যাদি।
৭. স্বল্পকালীন সময়ে বিধিটি কার্যকর হয়।

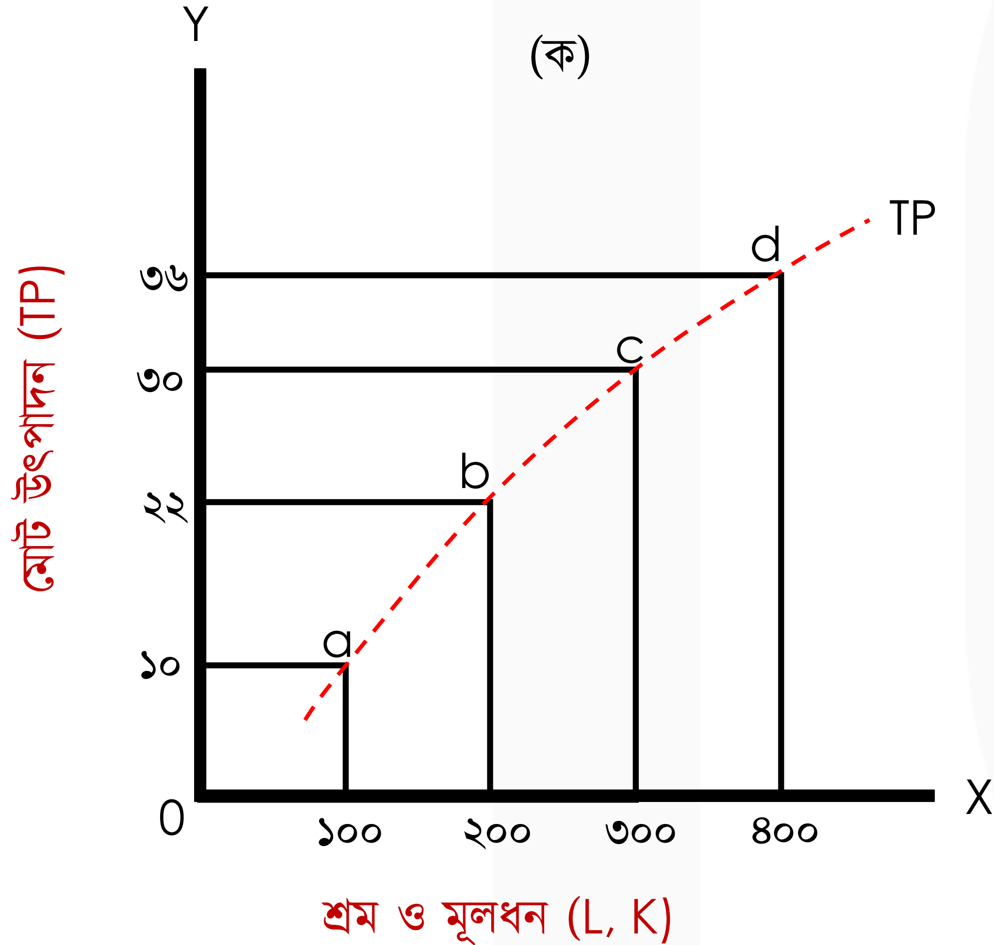
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

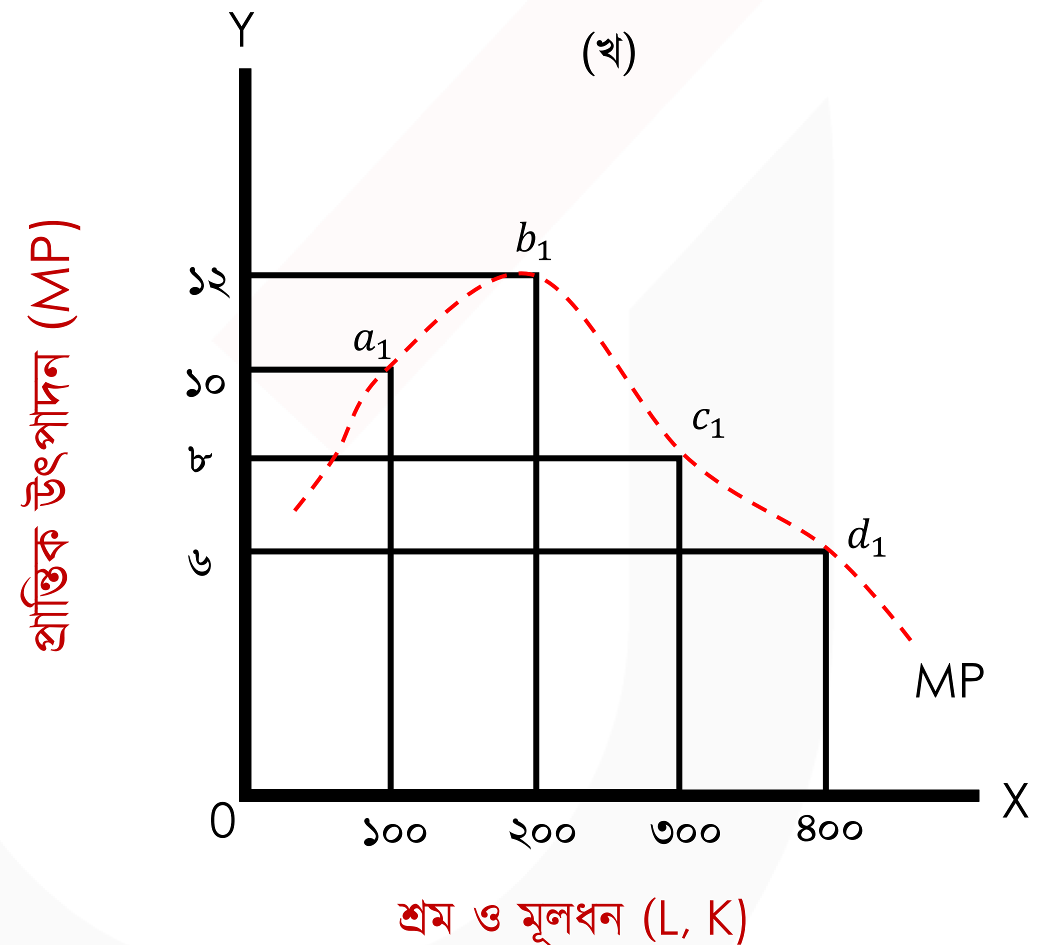
উদাহরণের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা:

একটি গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নের তালিকায় দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট ১ বিঘা জমিতে ১০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করলে ১০ মণ ধান উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় বার ঐ ১ বিঘা জমিতে ২০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ২২ মণ। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১২ মণ। এক্ষেত্রে খরচ বাড়ার তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হারে বেড়েছে। তবে তৃতীয় বার সংমিশ্রণ অনুযায়ী ঐ একই পরিমাণ জমিতে ৩০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ মণ। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৮ মণ। চতুর্থ বার ঐ ১ বিঘা জমিতে ৪০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ মণ। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ৬ মণ।

উপাদান সংমিশ্রণ	ভূমি (বিঘা)	শ্রম ও মূলধন (টাকা)	মোট উৎপাদন(মণ)	প্রান্তিক উৎপাদন(মণ)
A	১	১০০	১০	১০
B	১	২০০	২২	১২
C	১	৩০০	৩০	০৮
D	১	৪০০	৩৬	০৬

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns





ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Diminishing Marginal Returns

উপরের গাণিতিক উদাহরণটি রেখাচিত্রের মাধ্যমেও দেখানো যায়। পাশের চিত্রে OX অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং OY অক্ষে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো।

'ক' চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন TP নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় উপকরণ নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে (১০ মণ, ২২ মণ, ৩০ মণ ও ৩৬ মণ) বৃদ্ধি পায়। চিত্রে a,b,c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন (TP-Total Product) রেখাটি পাওয়া যায় ।
পাশের 'খ' চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমের পরিমাণ যখন ১০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন ১০ মণ। শ্রমের পরিমাণ যখন ২০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন ১২ মণ। যখন শ্রমের পরিমাণ ৩০০ প্রান্তিক উৎপাদন তখন ৮ মণ এবং শ্রমের পরিমাণ যখন ৪০০ তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় ৬ মণ। এভাবে দেখা যায় যে, শ্রমের পরিমাণ ২০০ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকে। এরপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রমের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। $a_1b_1c_1d_1$রেখাটি প্রান্তিক উৎপাদন MP (Marginal Product) রেখা যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করে।

বিধিটির ব্যতিক্রম বা সীমাবদ্ধতা
Limitations of this Law

নিচে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সমালোচনা /সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হলো :

১. জমির আয়তন: একটি নির্দিষ্ট জমিতে অধিক শ্রম বা মূলধন নিয়োগ করা হলে এ বিধি কার্যকর হবে। তবে জমির আয়তন বৃদ্ধি পেলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

২. উৎপাদন পর্যায়: উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে উপকরণসমূহ নতুন তাই উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৩. অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ: জমিতে অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের সাথে সাথে যদি বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় তবে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৪. জমির অবস্থা: উৎপাদনের মাঝে জমির কোন উন্নতি বা অবনতি ঘটলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৫. প্রাকৃতিক কারণ: প্রাকৃতিক কারণে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

বিধিটির ব্যতিক্রম বা সীমাবদ্ধতা Limitations of this Law

৬. উৎপাদন কৌশল পরিবর্তন: উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনে এ বিধি কার্যকর হয় না। কৃষিক্ষেত্রে সনাতনি পদ্ধতিতে চাষাবাদের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ করলে উৎপাদন না কমে বরং বেড়ে যায়।

৭. শ্রমের দক্ষতা: উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে অথবা উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে অদক্ষ এবং পরবর্তী সময়ে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের কারণে এ বিধি কার্যকর হয় না। সাধারণত জমিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৮. উপাদানের কাম্য সংমিশ্রণ: স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে কাম্য সংমিশ্রণ ঘটার পর এ বিধিটি কার্যকর হয়, তবে তার আগে নয়।

এসব ব্যতিক্রম ছাড়া দীর্ঘকালে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয়। এ বিধিটি চাষিদের বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাই স্যামুয়েলসন-এর মতে, “এ বিধি অর্থনীতি ও কারিগরি বিদ্যার একটি মৌলিক নিয়ম।"

কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
Application of Law of Diminishing Marginal Returns in Agriculture

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুসারে উৎপাদনের অন্যান্য সকল উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে যেকোনো একটি উপাদানের ব্যবহার বাড়াতে থাকলে মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। নিম্নোক্ত কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১. উর্বরশক্তি: ভূমির উর্বরশক্তি সব সময় সমান থাকে না। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরশক্তি হ্রাস পায়। যার দরুন উৎপাদনও হ্রাস পায়।

২. ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ: ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ভূমির ওপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে যে উপকরণ ব্যয় করা হয় উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না।

৩. যন্ত্রপাতির ব্যবহার: শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে তার তুলনায় নিম্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
Application of Law of Diminishing Marginal Returns in Agriculture

৪. প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ: কৃষিকাজ হলো এমন এক ধরনের কাজ, যা প্রজনন সম্বন্ধীয় আবহাওয়া, তাপমাত্রা, প্রকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি দ্বারা ভূমির উৎপাদনক্ষমতা প্রভাবিত হয়। যান্ত্রিক কলাকৌশল যেটি শিল্পে ব্যবহার করা হয় তা ভূমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।

৫. শ্রমবিভাগ: উন্নত ধরনের উৎপাদন কৌশল এখানে উপযুক্তভাবে ব্যবহার হয় না বিধায় শ্রমবিভাগে পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৬. ঋতুভিত্তিক পেশা: কৃষিকাজ সারা বছর ধরে হয় না, ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ হয় বলে এ বিধি কৃষিতে বেশি প্রযোজ্য।

সুতরাং বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ বিধি প্রয়োগ করা যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
Application of Law of Diminishing Marginal Returns in Other Fields

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি শুধু কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্য, খনিজ ক্ষেত্রসহ সকল উৎপাদন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

ক. শিল্পক্ষেত্র: শিল্প ক্ষেত্রে বিলম্বে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়। কেননা প্রথম দিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্পে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা পাওয়ার কারণে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (AC) হ্রাস পায়। তখন উৎপাদন ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত সুবিধা অর্জন করে। কিন্তু কোনো কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে না; বরং ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে।

খ. খনিজক্ষেত্র: খনিজ পদার্থ যেমন- কয়লা, লৌহ ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য যত গভীরে যেতে হয়, এর জন্য তত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে খরচ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু খরচের অনুপাতে উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। এক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ
Application of Law of Diminishing Marginal Returns in Other Fields

গ. মৎস্যক্ষেত্র: নদী, বিল, পুকুর যে কোনো মৎস্য ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই যত খুশি মাছ ধরা যায় না। ক্রমাগত অধিক সংখ্যক মাছ ধরর জন্য বেশি পরিমাণ শ্রম, নৌকা, জাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে ধৃত মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মাছ সংগ্রহের হার উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কম হবে।

ঘ. বনজ সম্পদ: বনজ সম্পদ আহরণের জন্য যতই গভীর অরণ্যে যেতে হয় ততই আহরিত সম্পদ হতে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কেবল কৃষিক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না, উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা— শিল্প, খনিজ, মৎস্য ক্ষেত্রেও এটি কার্যকরী।

ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Increasing Marginal Returns

উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয় মোট উৎপাদন যদি উপকরণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এখানে উপকরণ নিয়োগের হারের চেয়ে উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা: শিল্পক্ষেত্রে অধিকহারে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে অন্যান্য উপকরণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান অবস্থায় উপকরণের অতিরিক্ত নিয়োগের ফলে গড় ও প্রান্তিক খরচ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

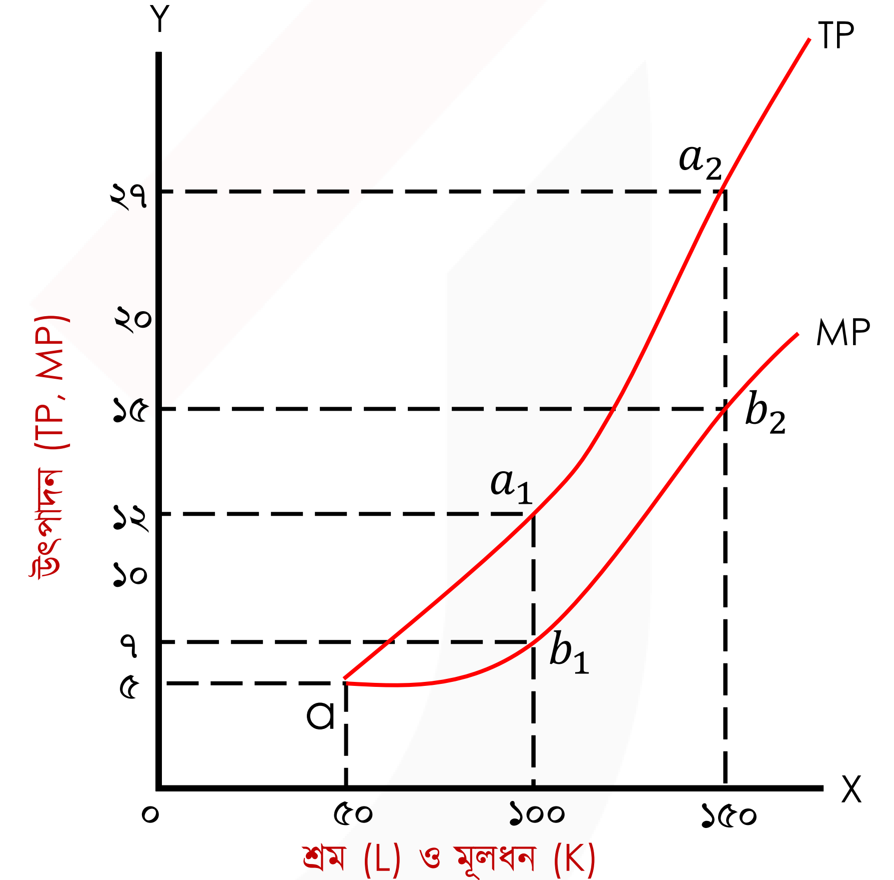
ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Increasing Marginal Returns

জমির পরিমাণ	শ্রম (L) ও মূলধন (K) উপকরণ ব্যয়	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একর	৫০	৫ মণ	৫ মণ
১ একর	১০০	১২ মণ	৭ মণ
১ একর	১৫০	২৭ মণ	১৫ মণ

সূচিতে দেখা যায় যে, শ্রম ও মূলধন একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করার পর মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Increasing Marginal Returns

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব (OY) অক্ষে মোট উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, শ্রম ও মূলধন ৫০ একক থেকে ১০০ একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন (TP) বেড়ে ৫ মণ থেকে ১২ মণ হয় তথা a থেকে a_1। বিন্দু পর্যন্ত। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বেড়ে ৫ মণ থেকে ৭ মণ হয় যা MP রেখা বরাবর a ও b_1 বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।আবার, শ্রম ও মূলধন ১০০ থেকে ১৫০ একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন (TP) বেড়ে ১২ মণ থেকে ২৭ মণ হয় তথা a_1 থেকে a_2 বিন্দু পর্যন্ত। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বেড়ে ৭ মণ থেকে ১৫ মণ হয় যা MP রেখা বরাবর b_1 থেকে b_2 বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখানে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

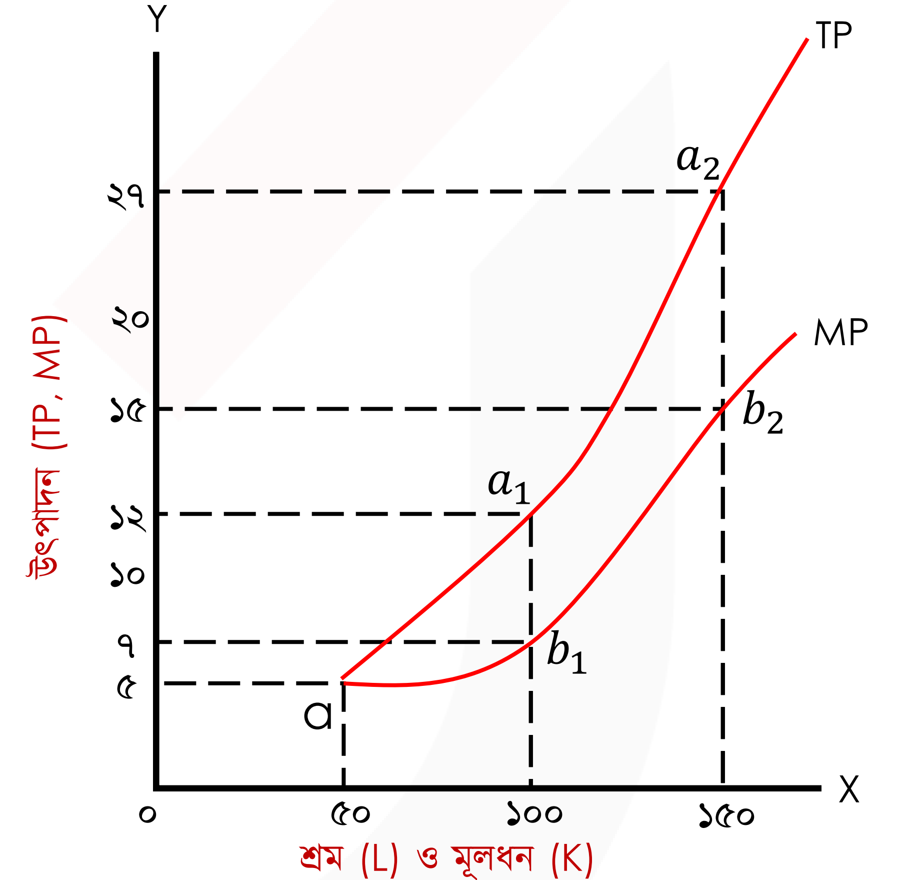


চিত্র: ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Increasing Marginal Returns

চিত্র ও সূচিতে লক্ষ করা যায়, শ্রম ও মূলধন একই হারে (৫০ একক) বৃদ্ধি করলেও মোট উৎপাদন প্রথমে ১২ একক ও পরে ২৭ একক বৃদ্ধি পায়। আবার, প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে ৭ একক ও ১৫ একক বৃদ্ধি পায়। যা ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করেছে। এক্ষেত্রে MP রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

প্রয়োগ ক্ষেত্র: এ বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হয়। তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রথম দিকে উন্নত চাষ পদ্ধতি চালু কর হলে এ বিধিটি কার্যকর হতে পারে।



চিত্র: ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Constant Marginal Returns

উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো একটি নির্দিষ্ট উপকরণ তথা শ্রম অথবা মূলধন যে হারে নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির এ হার বা প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

অন্যভাবে, উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি উপাদান নিয়োগ এবং উৎপাদন সমান হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে সমহার উৎপাদন বিধি বলা হয়। এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে সমান থাকে। সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা :

জমির পরিমাণ	শ্রম (L) ও মূলধন (K) উপকরণ ব্যয়	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একর	৫০	৫ মণ	৫ মণ
১ একর	১০০	১০ মণ	৫ মণ
১ একর	১৫০	১৫ মণ	৫ মণ

সূচিতে দেখা যায় যে, শ্রম ও মূলধন একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করার পর মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়ে।

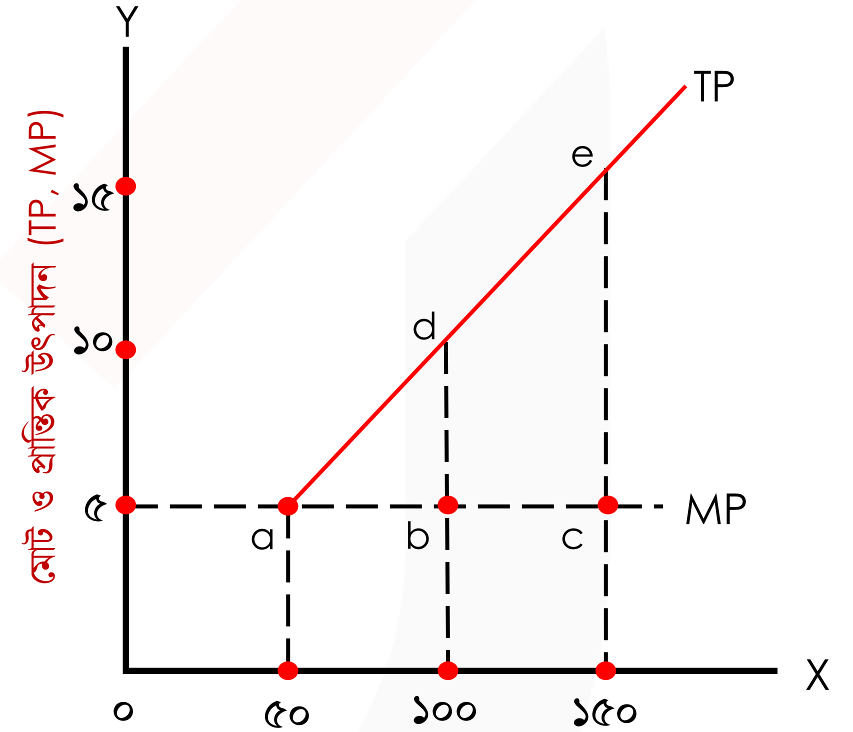
সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
Law of Constant Marginal Returns

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব (OY) অক্ষে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, মোট উৎপাদন (TP) বাড়ে a থেকে d তে অর্থাৎ ৫০ মণ থেকে ১০০ মণ হয়। প্রান্তিক উৎপাদন (MP) স্থির থাকে যা সকল ক্ষেত্রে MP = ৫ মণ।

আবার শ্রম ও মূলধন ১০০ একক থেকে ১৫০ একক বৃদ্ধি পেলে TP রেখা d থেকে e বিন্দুতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ মোট উৎপাদন (TP) ১০ মণ থেকে ১৫ মণ বাড়ে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন (MP) স্থির থাকে যা সকল ক্ষেত্রে MP = ৫ মণ বজায় থাকে।

এখানে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ একই হারে বৃদ্ধি করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন স্থির (৫ মণ) থাকে এবং মোট উৎপাদন একই হারে (৫ একক করে) বৃদ্ধি পায়। যা স্থির বা সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করছে।

প্রয়োগ ক্ষেত্র: বাস্তবে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। তবে শিল্পক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হতে পারে।



চিত্র: সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন

সম-উৎপাদন রেখা
Iso-Quant Curve

অর্থনীতিতে 'সম-উৎপাদন' এর প্রতিশব্দ Iso-Quant একটি গ্রিক শব্দ।

গ্রিক ভাষায় Iso এর অর্থ (Equal) এবং Quant এর অর্থ পরিমাণ (Quantity)।

সুতরাং পারিভাষিক দিক থেকে বলা যায় সম-উৎপাদন রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে সম পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশিত হয়।

সম-উৎপাদন রেখা হলো বিভিন্ন বিন্দু নিয়ে গঠিত সঞ্চার পথ (locus of points), যার প্রত্যেক বিন্দুতে দুটি উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায় এবং সেই সংমিশ্রণগুলো থেকে।

উৎপাদক সম (একই) পরিমাণ উৎপাদন লাভ করে। প্রতিটি সংমিশ্রণ থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন লাভ করে বলে।

উৎপাদক সংমিশ্রণগুলোর প্রতি নিরপেক্ষ থাকে। তাই সম-উৎপাদন রেখাকে অনেক সময় উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখাও (Producer Indifference Curve) বলে।

অর্থাৎ, যে রেখার সকল বিন্দু দুটি উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণে সমান সমান উৎপাদন নির্দেশ করে, তাকে সম-উৎপাদন রেখা বলে। মনে করি, একজন উৎপাদনকারী শ্রম ও মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে।

সম-উৎপাদন রেখা
Iso-Quant Curve

উৎপাদন অপেক্ষক, Q = f(L,K)

এখানে Q = উৎপাদন, L= শ্রম, K= মূলধন।

উৎপাদনকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন লাভ করার জন্য L ও K এর একাধিক বিকল্প সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে। তবে L এর পরিমাণ বাড়ালে K এর পরিমাণ কমাতে হয়। আবার K এর পরিমাণ বাড়ালে L এর পরিমাণ কমাতে হয়। এক কথায়, L এবং K এর বিভিন্ন মিশ্রণ থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। তাই উপকরণের কোন সংমিশ্রণটি ব্যবহার করা দরকার এ ব্যাপারে উৎপাদনকারী নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে।

এজন্য সম-উৎপাদন রেখাকে আবার উৎপাদন নিরপেক্ষ রেখাও (Production Indifference Curve) বলা হয়।

উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন
Drawing Iso-Quant Curve From Production Function

মনে করি, $Q = f(L,K)$

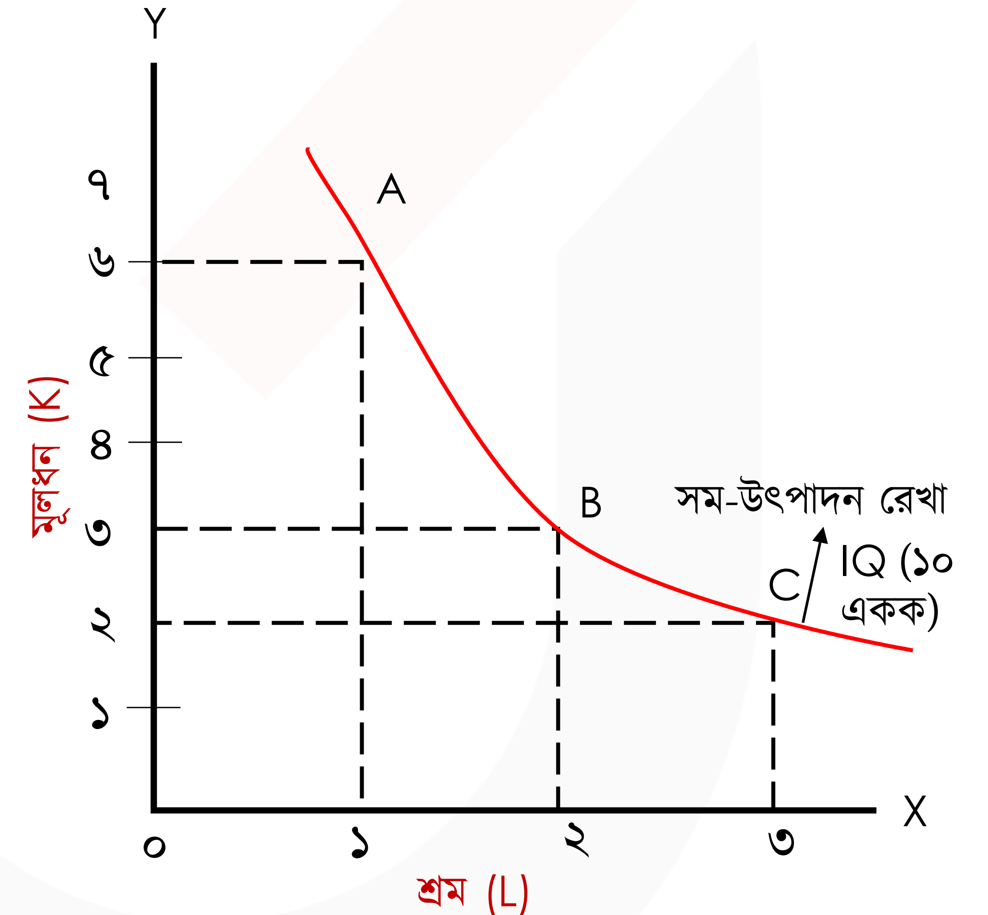
এখানে L এবং Kএর সংমিশ্রণের পরিবর্তন হলেও মোট উৎপাদন (Q) স্থির থাকবে। অর্থাৎ $\Delta Q = 0$। উৎপাদন প্রদত্ত অবস্থায় L এবং K এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন করা যায়।

নিম্নে L এবং K এর বিভিন্ন মিশ্রণের একটি কাল্পনিক তালিকা দেয়া হলো:

শ্রম (L)	মূলধন (K)	মিশ্রণ	উৎপাদন (Q)
১ একক	৬ একক	A	১০ একক
২ একক	৩ একক	B	১০ একক
৩ একক	২ একক	C	১০ একক

উৎপাদন অপেক্ষক থেকে সম-উৎপাদন রেখা অংকন
Drawing Iso-Quant Curve From Production Function

তালিকানুসারে L এবং K এর ৩টি সংমিশ্রণ A, B এবং C বিন্দুতে ১০ একক উৎপাদন তথা সমান পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে। তালিকা থেকে পাশে একটি সম-উৎপাদক রেখা অংকন করা হলো- চিত্রে OX এবং OY অক্ষে যথাক্রমে শ্রম (L) এবং মূলধন (K) উপকরণ পরিমাপ করা হয়েছে। ১ একক L এবং ৬ একক K-কে A বিন্দু দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, ২ একক Lও ৩ একক K এবং ৩ একক L ও ২ একক K-কে যথাক্রমে B এবং C বিন্দু দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। A, B ও C প্রতিটি বিন্দু সমান পরিমাণ উৎপাদন ১০ একক নির্দেশ করে। সুতরাং A, B ও C বিন্দু যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটি সম-উৎপাদন রেখা (IQ)।



সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য
Characteristics Iso-Quant Curve

১. সম-উৎপাদন রেখার সকল বিন্দু সমান উৎপাদন নির্দেশ করে।

২. সম-উৎপাদন রেখা সাধারণত বাম থেকে ডানে নিম্নগামী হয়ে থাকে। কারণ সমান পরিমাণ উৎপাদন লাভ করার জন্য একটি উপকরণ বেশি ব্যবহার করলে অপরটির ব্যবহার কমাতে হয়। তাই সম-উৎপাদন রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সম-উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী বা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল বা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না।

৩. সম-উৎপাদন রেখা সাধারণত মূল বিন্দুর দিকে উত্তল (Convex) হয়। এর কারণ হলো একটি উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তে অন্য উপকরণ বদলের হার বা প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার (MRTS) কমতে থাকে।

সম-উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য
Characteristics Iso-Quant Curve

৪. নিচের সম-উৎপাদন রেখার তুলনায় উপরের সম-উৎপাদন রেখা অধিক উৎপাদন নির্দেশ করে।
২টি বা ৩টি সম-উৎপাদন রেখা অংকন করলে নিচের রেখার তুলনায় উপরের রেখার কোন বিন্দুতে উপকরণ বেশি ব্যবহৃত হয়। বেশি উপকরণ নিয়োগ করে অবশ্যই বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

৫. দুটি সম-উৎপদন রেখা পরস্পর ছেদ করতে পারে না। কারণ ছেদক বিন্দুতে দুটি রেখা সমান উৎপাদন নির্দেশ করে যা ৪ নং বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুটি সম-উৎপদন রেখা ছেদ করলে গাণিতিক অসামঞ্জস্যতা (Mathematical Inconsistency) দেখা দেয়।

সম-উৎপাদন মানচিত্র
Map of Iso-Quant

যখন দুটি অক্ষের মধ্যে একাধিক সম-উৎপাদন রেখার সন্নিবেশ ঘটে তাকে সম-উৎপাদন মানচিত্র বলে। সম-উৎপাদন মানচিত্রে উপরের দিকে সম উৎপাদন রেখায় উৎপাদকের উৎপাদন বেশি হয়। মনে করা যাক IQ_1, IQ_2, IQ_3 তিনটি সম-উৎপাদন রেখা। চিত্রের তিনটি রেখাতে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে Q_1 , Q_2, ও Q_3 নির্দেশ করে। অবস্থানগত দিক থেকে $IQ_3 > IQ_2 > IQ_1$ হওয়ায় IQ_3 তে বেশি উৎপাদন নির্দেশ করে। সূচিভিত্তিক চিত্রে তা দেখানো হলো-

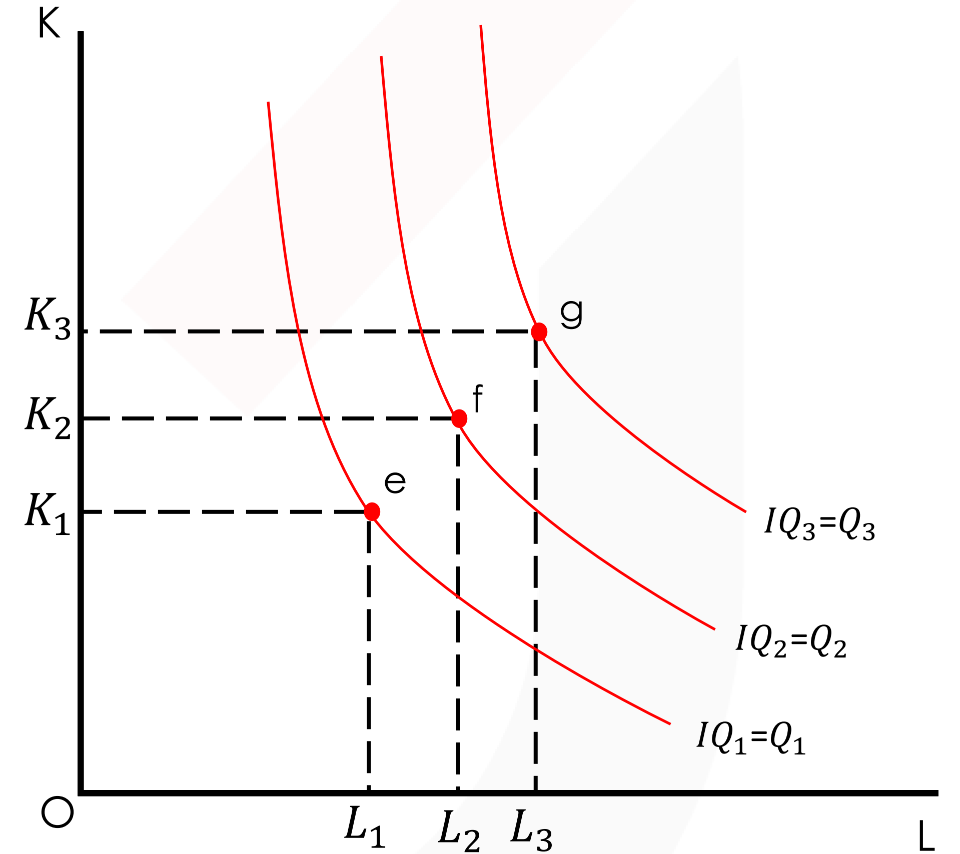
IQ	বিন্দু	উপাদান সংমিশ্রণ	প্রাপ্ত উৎপাদন
IQ_1	e	OL_1 ,OK_1	Q_1
IQ_2	f	OL_2 ,OK_2	Q_2
IQ_3	g	OL_3, OK_3	Q_3

সম-উৎপাদন মানচিত্র
Map of Iso-Quant

উপাদান সংমিশ্রনের পরিমাণগত দিক থেকে (OL_3, OK_3) > (OL_2 ,OK_2) > (OL_1 ,OK_1) পাশের চিত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদনের দিক থেকে IQ_1'র তুলনায় IQ_2 তে এবং IQ_2'র তুলনায় IQ_3 তে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি।

সম-উৎপাদন মানচিত্রের যতই উপরের দিকে যাবে ততই উৎপাদকের উৎপাদন বাড়বে।

কারণ দুটি উপকরণের কম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা নিশ্চয় উৎপাদন বাড়বে। আর বেশি উৎপাদন উৎপাদকের নিকট অধিক কাম্য।



চিত্র: সম-উৎপাদন মানচিত্র

মাত্রাগত উৎপাদন
Returns to Scale

দীর্ঘকালে সকল উপাদান পরিবর্তনশীল। ফলে দীর্ঘকালে সকল উপাদানকে সমানভাবে বাড়ানো যায়। মাত্রাগত উৎপাদন দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত পরিবর্তন বা মাত্রাগত উৎপাদন (Returns to scale) বলে।

অন্যভাবে, কোনো উৎপাদন অপেক্ষকের সমস্ত উপাদানের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনে যে পরিবর্তন আসে বা সাড়া দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে। আরও সহজভাবে বলা যায়,

উপাদান পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় এবং এ পরিবর্তন যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে মাত্রা রেখা বলে। এ মাত্রা রেখায় যে ধরনের উৎপাদন পরিলক্ষিত হয় তাই হলো মাত্রাগত উৎপাদন রেখা।

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

মাত্রাগত উৎপাদন তিন প্রকার।

যেমন—

১. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন

২. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন

৩. সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন।

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

১। ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন (Decreasing Returns to Scale):

উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন যদি তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

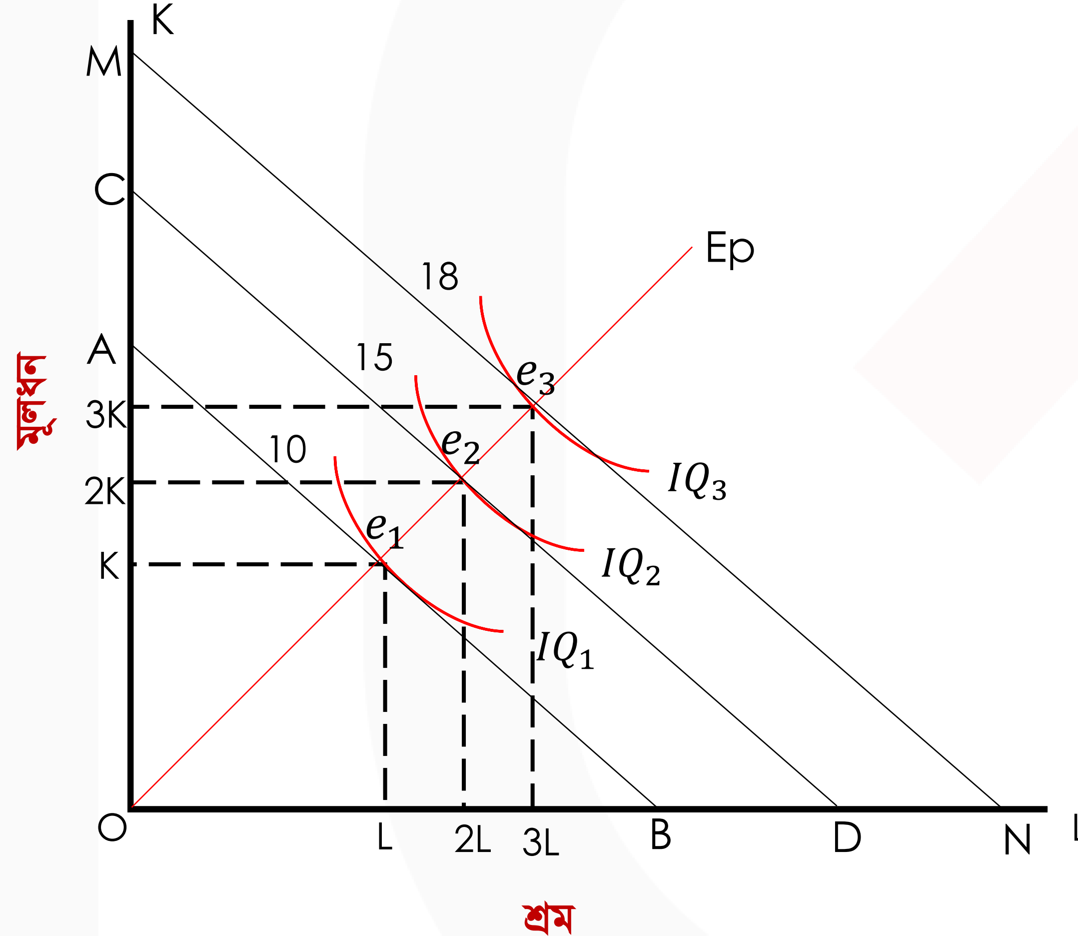
যেমন, $Q = f(L, K)$ হলে $(\lambda L, \lambda K) = \frac{1}{2}\lambda Q$।

অর্থাৎ L ও K কে এক একক λ হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বাড়ে $\frac{1}{2}\lambda$ হারে।

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত হয়েছে। AB, CD এবং MN তিনটি হলো সমখরচ রেখা এবং IQ_1, IQ_2 , IQ_3, তিনটি হলো সম-উৎপাদন রেখা।

L এবং K দ্বারা IQ_1 = 10 একক উৎপাদন হয় যা ভারসাম্য বিন্দু e_1 দ্বারা প্রকাশ পায়। 2L এবং 2K দ্বারা IQ_2 = 15 একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু e_2 হয়।



চিত্র: ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

3L এবং 3K দ্বারা IQ_3 = 18 একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু হয় e_3। এখন e_1, e_2, e_3, ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে Ep একটি মাত্রাগত রেখা পাওয়া যায়। যা ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন (DRS) নির্দেশ করে

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

২. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন (Increasing Returns to Scale):

উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন যদি তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন: উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$

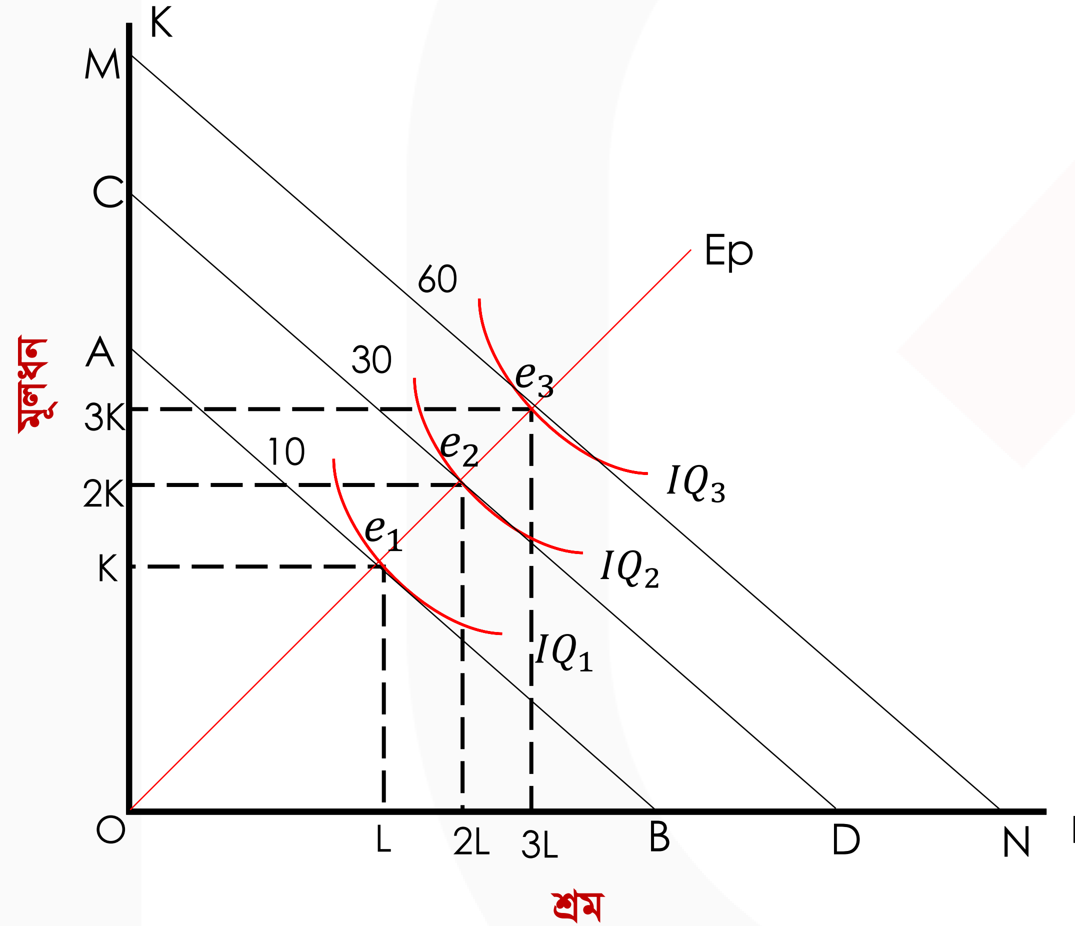
$(\lambda L, \lambda K) = 3\lambda Q > \lambda Q$

এখানে এক একক λ অনুপাতে উপাদান বৃদ্ধির পর উৎপাদন তার চেয়ে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এটি ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত হয়েছে। AB, CD & MN তিনটি সম-খরচ রেখা এবং IQ_1, IQ_2 , IQ_3 তিনটি সম উৎপাদন রেখা।

L এবং K দ্বারা Q = 10 একক উৎপাদন হয় যা e_1 ভারসাম্য বিন্দু দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।



চিত্র: ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

2L এবং 2K দ্বারা 3Q = 30 একক উৎপাদন হয় যা e_2 দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। 3L এবং 3K দ্বারা 6Q =60 একক উৎপাদন হয় এবং ভারসাম্য বিন্দু । এখন e_1, e_2, e_3 ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে Ep একটি মাত্রা রেখা পাওয়া যায়, যা ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে, কারণ

$IQ_1 > IQ_2 > IQ_3$ বা

60 > 30 > 10.

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

৩. সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন (Constant Returns to Scale):

নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনও যদি একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে সমানুপাতিক বা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন— উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, K)$.

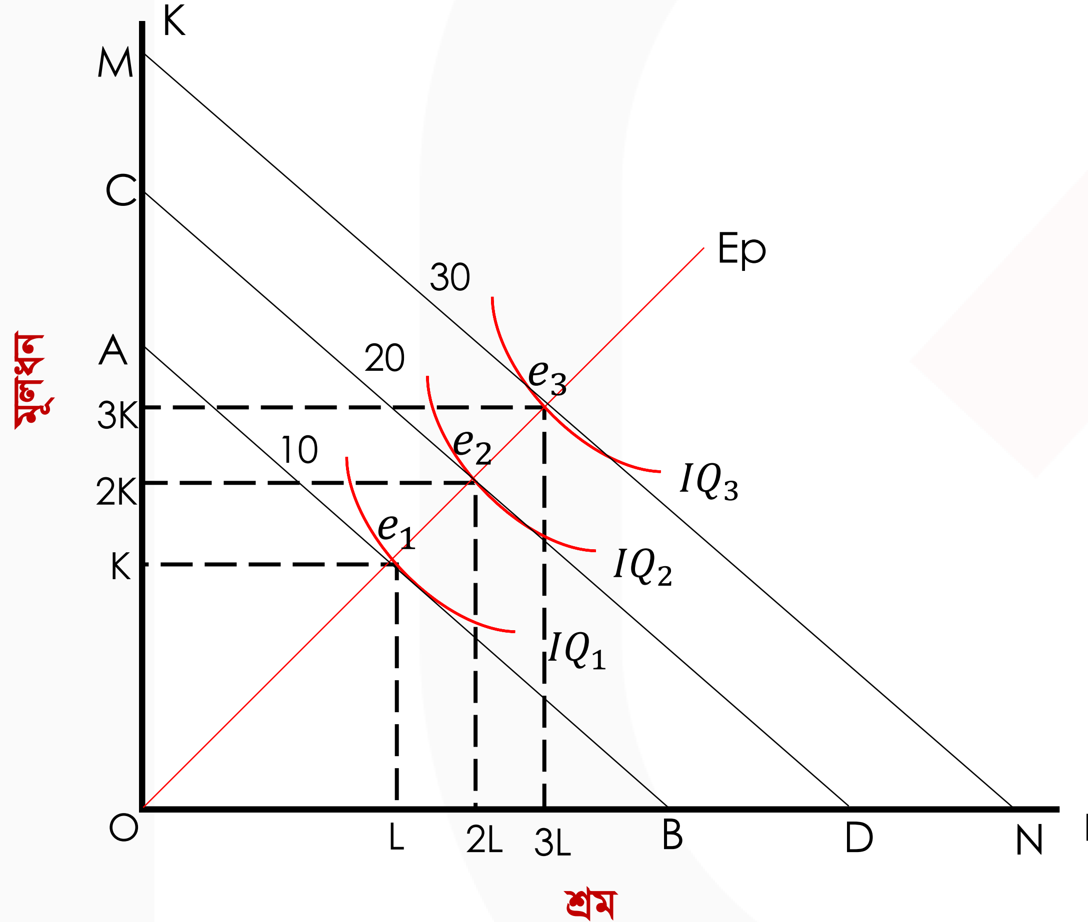
উপাদান L এবং K কে λ হারে বাড়ানো হলে, উৎপাদনও (Q) λ হারে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

যেমন, $(\lambda L, \lambda K) = \lambda Q$

L এবং K কে λ হারে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদনও λ হারেই বৃদ্ধি পায়। তাই এটি স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

মাত্রাগত উৎপাদনের প্রকারভেদ
Types of Returns to Scale

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এবং লম্ব অক্ষে মূলধন (K) নির্দেশিত। AB, CD এবং MN তিনটি সম খরচ রেখা এবং IQ_1, IQ_2 , IQ_3 তিনটি সম উৎপাদন রেখা। L এবং K দ্বারা IQ = 10 একক উৎপাদন হয়।



চিত্র: সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন রেখা

2L এবং 2K দ্বারা IQ_2 = 20 একক উৎপাদন হয়। 3L এবং 3K দ্বারা IQ_3 = 30 উৎপাদনের সাথে সম-খরচ রেখাসমূহের স্পর্শক বিন্দুগুলো e_1, e_2, e_3 যোগ করে Ep একটি scale বা মাত্রা রেখা পাওয়া যায়। এখানে L এবং K কে যে হারে বাড়ানো হয়েছে উৎপাদনও সেই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এটি স্থির মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে।

উৎপাদন ব্যয়
Production Cost

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়।

এ সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে যে ব্যয় হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।

কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণের যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।

একজন উৎপাদনকারীকে সাধারণত কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে কারখানা-ঘর নির্মাণ বা ভাড়ায় গ্রহণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ, দ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করে।

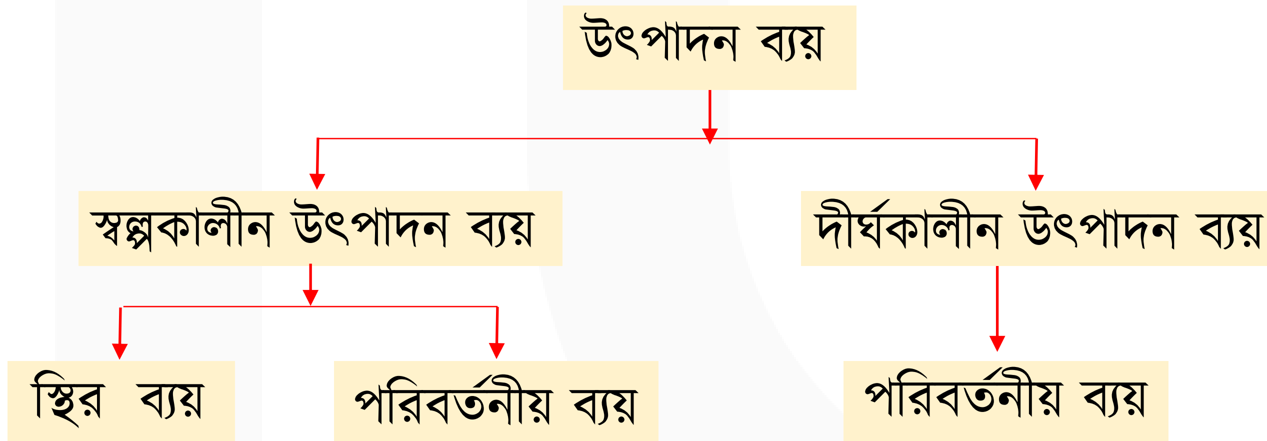
এই অর্থ ব্যয়ই মূলত উৎপাদন ব্যয় হিসেবে অভিহিত।

উৎপাদন ব্যয়
Production Cost

সংক্ষেপে উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বা উৎপাদন খরচ বলে।

গাণিতিকভাবে, $C = g(Q)$ এখানে, C= উৎপাদন ব্যয়, Q = উৎপাদনের পরিমাণ, g = ফাংশন বা অপেক্ষক, ব্যয় অপেক্ষক C এর মান Q এর ওপর নির্ভরশীল।

নিচে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো:



উৎপাদন ব্যয়
Production Cost

স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল কী?

অর্থনীতিতে **স্বল্পকাল** বলতে সেই সময় বা মেয়াদকে বোঝানো হয়, যেখানে ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে।

দীর্ঘকাল হলো এমনই একটি সময় মেয়াদ, যেখানে নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে সকল উপকরণই পরিবর্তনযোগ্য।

সুতরাং স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কোনো সুনির্দিষ্ট বা ক্যালেন্ডার সময়কে বোঝানো হয় না, বরং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া বা উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ভিত্তিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল চিহ্নিত হয় ।

স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়
Short Run Production Cost

স্বল্পকালে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন) ক্রয়ের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে যে বায় (খাজনা, মজুরি, সুদ) নির্বাহ করতে হয় তাকে বলা হয় স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়।

স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়ের দুটি অংশ রয়েছে। যথা:

i. স্থির ব্যয় ও

ii. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

i. স্থির ব্যয় (Fixed Cost):

স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে কিছু স্থির উপাদান বিবেচিত হয় যেগুলো ক্রয় বাবদ সংগঠন কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই ব্যয়িত অর্থকে উৎপাদনের স্থির ব্যয় বলে।

যেমন- জমি ক্রয়, কারখানা ঘরের ভাড়া, দীর্ঘকালীন ঋণ বা মূলধনের সুদ ইত্যাদি। উৎপাদন পরিচালনার জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত এ সকল ব্যয়ই হলো স্থির ব্যয়।

স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয়
Short Run Production Cost

ii. পরিবর্তনশীল/পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost):

উৎপাদন ক্ষেত্রে কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো উৎপাদনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এসকল উপাদানকে পরিবর্তনশীল উপাদান বলে।

উৎপাদন কার্য পরিচালনায় উদ্যোক্তা কর্তৃক সংঘটিত পরিবর্তনশীল উপকরণ বাবদ যে ব্যয় হয় তাকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।

যেমন— কাঁচামাল ক্রয়, অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ, হালকা যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়
Long Run Production Cost

দীর্ঘকাল বলতে এমন সময় কালকে নির্দেশ করা হয় যে সময়ের মধ্যে উৎপাদনের সকল উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব।

আর এই দীর্ঘকালে উৎপাদন পরিচালনায় সকল পরিবর্তনশীল উপাদান ক্রয়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যে ব্যয় নির্বাহ করে তাই দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় ।

যেমন- গুদাম নির্মাণ, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎপাদন কৌশল ও কাঠামোগত উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি ।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Fixed Cost and Variable Cost

দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।

এ উৎপাদন ব্যয় দুটি সময় বা মেয়াদের ওপর নির্ভর করে।

যেমন- ১. স্বল্পকাল ২. দীর্ঘকাল

স্বল্পকাল হলো সেই সময় যখন ফার্মের পক্ষে কেবল পরিবর্তনশীল উপকরণ বাড়ানো বা কমানো যায়, কিন্তু স্থির উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না।

তাই স্বল্পকালে ফার্মের জন্য দুই ধরনের ব্যয় হয়। যথা—

১। মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও

২। মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)

এ দুই ধরনের ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Fixed Cost and Variable Cost

১। ফার্মের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাসের সাথে সেসব ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন না হলেও বা শূন্য হলেও যেসব ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না; তাদের সমষ্টিকে মোট স্থির ব্যয় বলে।

ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যেসব ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে, তাদের সমষ্টিকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।

২। সাংকেতিকভাবে, TFC = মোট স্থির ব্যয়, TVC = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

৩। সময় বিবেচনায়, শুধু স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় প্রযোজ্য। কিন্তু স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ে TVC প্রযোজ্য।

৪। ক. কারখানার ভাড়া খ. স্থায়ী মূলধনের সুদ গ. স্থায়ী কর্মচারীর বেতন ঘ. সম্পত্তির ওপর কর ঙ. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় এর উদাহরণ।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Fixed Cost and Variable Cost

৪। অপরদিকে, ক. কাঁচামালের জন্য ব্যয় খ. অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, গ. চলতি মূলধনের জন্য দেয় সুদ, ঘ. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বিজ্ঞাপন ব্যয়, ঙ. প্যাকিং ব্যয় ইত্যাদি হলো মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ।

৫। উৎপাদন যাই হোক না কেন, এমন কি উৎপাদন না হলেও (Q = 0) ফার্মকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয়। তাই লম্ব অক্ষের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে TFC শুরু হয়।

কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে, পরিবর্তনশীল ব্যয়ও শূন্য হয়। তাই TVC রেখা মূল বিন্দু থেকে উৎপত্তি হয়।

মোট মোট স্থির ব্যয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

TVC রেখা প্রথমে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে এবং পরে তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে ।

৬। TFC-এর ঢাল শূন্য। TVC-এর ঢাল ধনাত্মক তবে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ উৎপাদন বাড়লে TVC বাড়ে।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Short Run and Long Run production Cost

স্বল্পকালে তথা পরিবর্তনশীল ও স্থির উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত মোট অর্থ বা সম্পদকে স্বল্পকালীন ব্যয় বলে। আর দীর্ঘকালে নির্দিষ্ট প্রযুক্তি সাপেক্ষে সকল পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যয়কে দীর্ঘকালীন ব্যয় বলে। নিচে স্বল্পকালীন উপাদান ব্যয় ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো:

১. স্বল্পকালীন উৎপাদন ব্যয় হলো মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি। অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয় হলো, শুধু মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

২. $STC = TFC + TVC$ অন্যদিকে, $LTC = TVC$

৩. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় অপেক্ষক $C = f(Q) + b$ এখানে, C = মোট ব্যয়, Q = উৎপাদন, f = অপেক্ষক, b = স্থির ব্যয়। অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় অপেক্ষক $C = f(Q)$, C = মোট ব্যয়, Q = উৎপাদন।

৪. স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা বক্র আকৃতির হয়। দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা প্রায় সরলাকৃতির হয়।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Short Run and Long Run production Cost

৫. স্বল্পকালে SAC > SMC অর্থাৎ TC=aQ + b হলে

$$SAC = \frac{TC}{Q} = \frac{aQ+b}{Q} = a + \frac{b}{Q},$$

$$SMC = \frac{d(TC)}{dQ} = \frac{d}{dQ}(aQ + b) = a$$

$$\therefore SAC > SMC$$

দীর্ঘকালে, $LAC = \frac{aQ}{Q} = a,$

$$LMC = \frac{d(TC)}{dQ} = \frac{d}{dQ}(aQ) = a$$

$$\therefore LAC = LMC$$

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Short Run and Long Run production Cost

৬. স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা U আকৃতির হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা এনভেলাপ বা খাম আকৃতির হয়।

৭. স্বল্পকালে উৎপাদন পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থির ব্যয় পরিবর্তন হয় না।
অন্যদিকে, দীর্ঘকালে প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে।

৮. স্বল্পকালীন মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় পাওয়া যায়, $SAC = \frac{TC}{Q}$ ।
অপরপক্ষে, স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের সমষ্টি হলো দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়, $LAC = \Sigma(SAC)$.

৯. স্বল্পকালে উৎপাদনক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাত বিধি (Law of Variable Proportion) কার্যকর থাকে।
অন্যদিকে, দীর্ঘকালে সকল খরচ পরিবর্তনশীল হওয়ায় উৎপাদনক্ষেত্রে মাত্রাগত উৎপাদন বিধি (Law of Returns to Scale) কার্যকর থাকে।

মোট ব্যয় বা খরচ Total Cost

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের জন্য যে খরচ হয়, তাকে মোট খরচ বলা হয়।

সময়ের প্রেক্ষিতে মোট খরচ দুই প্রকার। যথা—

ক. স্বল্পকালীন মোট খরচ (Short Run Total Cost)

খ. দীর্ঘকালীন মোট খরচ (Long Run Total Cost)

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Short Run Total Cost

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় দুই ধরনের। যথা- ১. স্থির ব্যয় এবং
২. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

১. স্থির ব্যয় (Fixed Cost):

উৎপাদন কার্যে যেসব উপকরণ নিয়োগ করা হয় তাদের মধ্যে কতকগুলো উপকরণ অপরিবর্তিত থাকে এবং তাদের জন্য যে ব্যয় করা হয় তা সর্বদা স্থির থাকে। ঐ ব্যয়ের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলা হয়।

অপরিবর্তনীয় বা স্থির উপকরণের জন্য স্বল্পকালে যে খরচ বহন করতে হয়, তাকে স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় বলে।

যেমন— কারখানার ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন মূলধনের জন্য সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, সম্পত্তির ওপর দেয়া কর, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হোক না কেন ঐ ব্যয়গুলো মূলত চুক্তিবদ্ধ থাকে, তাদের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Short Run Total Cost

পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost):

উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস পেলে যেসব ব্যয় হ্রাস পায়, তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।

যেসব উপকরণ পরিবর্তন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে হয় সেসব উপকরণের জন্য যে খরচ হয়, তাকে স্বল্পকালীন মোট পরিবর্তনীয় খরচ বলে। যেমন- কাঁচামালের খরচ।

এ ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয়ও (Primary Cost) বলা হয়।

উৎপাদন শুরু হলে এ ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে এ ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

যেমন- কাঁচামালের জন্য ব্যয়, অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, চলতি মূলধনের সুদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়, সরকারকে দেয় উৎপাদনমূলক ও বিক্রি করা পণ্যের জীবন বিমা, প্যাকিং খরচ ইত্যাদি হচ্ছে পরিবর্তনশীল ব্যয়।

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Short Run Total Cost

উৎপাদনের একক	মোট স্থির ব্যয় TFC (টাকা)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় TVC (টাকা)	মোট ব্যয় TC = TFC +TVC
০	১০	০	১০+০=১০
১	১০	১০	১০+১০=২০
২	১০	১৮	১০+১৮=২৮
৩	১০	২৫	১০+২৫=৩৫
৪	১০	২৮	১০+২৮=৩৮
৫	১০	৩৫	১০+৩৫=৪৫

তালিকায় দেখা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে কোনোরূপ পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে না।

তবে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয়ও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদনের একক হলে ০, ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তনীয় ব্যয় যথাক্রমে ০, ১০, ১৮, ২৫, ২৮, ৩৫ টাকা। এই মোট স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যোগফল হতে উৎপাদনের স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) পাওয়া যায়। তালিকায় ১০, ২০, ২৮, ৩৫, ৩৮ ও ৪৫ টাকা উৎপাদনের মোট ব্যয় নির্দেশ করছে যা উৎপাদনের একক বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost

STC = Short Run Total Cost

TFC = Total Fixed Cost

TVC = Total Varible Cost

LTC = Long Run Total Cost

LAC = Long Run Average Cost

SMC = Short Run Marginal Cost

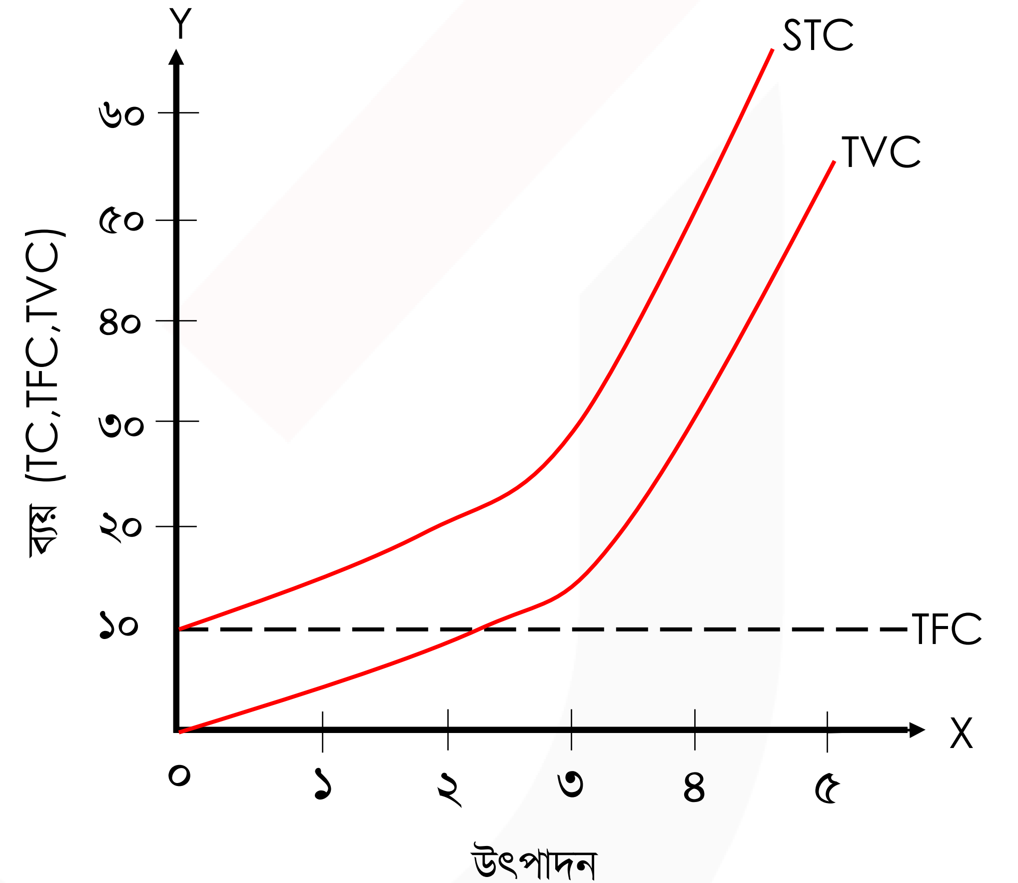
SAC = Short Run Average Cost

Q = Production

স্বল্পকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Short Run Total Cost

চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা:

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদন ব্যয় (TC, TFC ও TVC) দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট স্থির ব্যয় (TFC = ১০) স্থির থাকায় TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) প্রথমে ক্রমহ্রাসমান হারে এবং পরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়; যা চিত্রে TVC রেখা দ্বারা নির্দেশিত। আবার যেহেতু স্বল্পকালীন মোট ব্যয় (STC) হলো মোট স্থির খরচ (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC) এর যোগফল (STC =TFC + TVC)। সেহেতু STC ও প্রথমে ক্রমহ্রাসমান ও পরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং STC রেখা TVC এর উপরে অবস্থান করে।

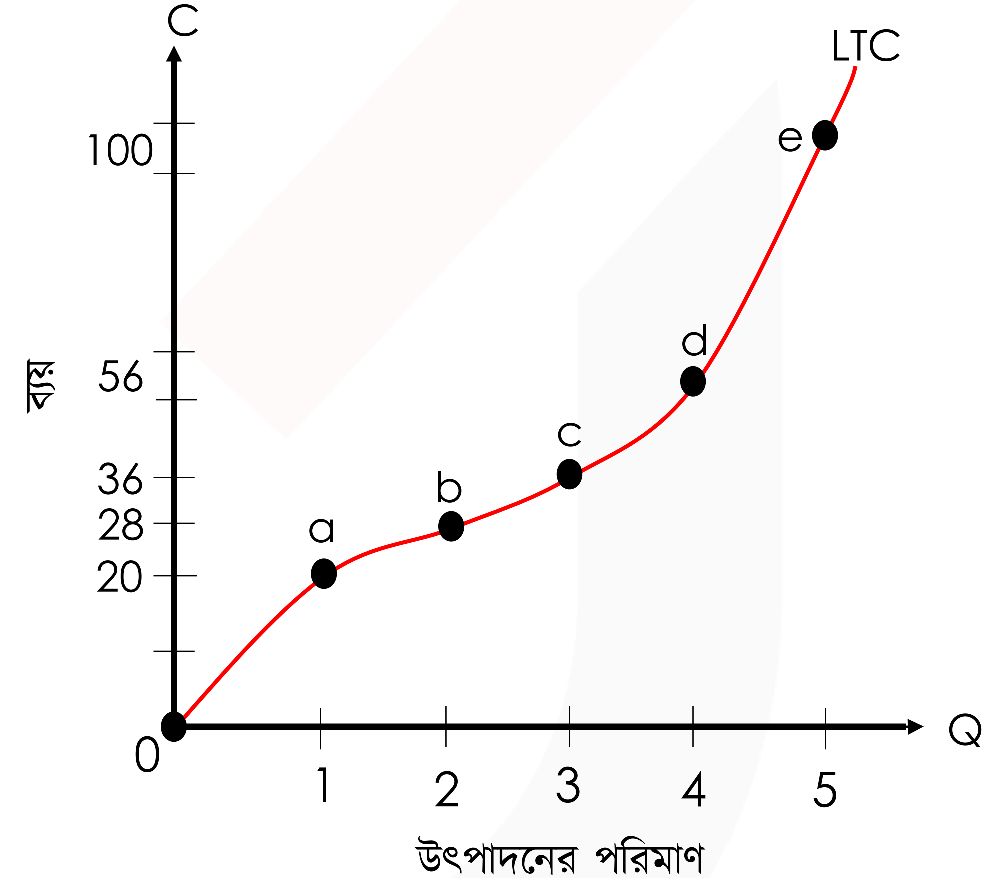


চিত্র: স্বল্পকালীন মোট খরচ রেখা

দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Long Run Total Cost

দীর্ঘকাল হলো এমন একটি সময়, যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায়। তখন স্থির উপকরণ বলতে আর কোনো উপকরণ থাকে না। সব উপকরণই পরিবর্তন হয়। সুতরাং, দীর্ঘকালে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যে খরচ বহন করতে হয়, তার সমষ্টিকে দীর্ঘকালীন মোট খরচ বলা হয়। দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা: নিম্নে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়ের একটি সূচি তৈরি করা হলো-

Q	0	1	2	3	4	5
C	0	20	28	36	56	100



চিত্র: দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা

দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বা খরচ
Long Run Total Cost

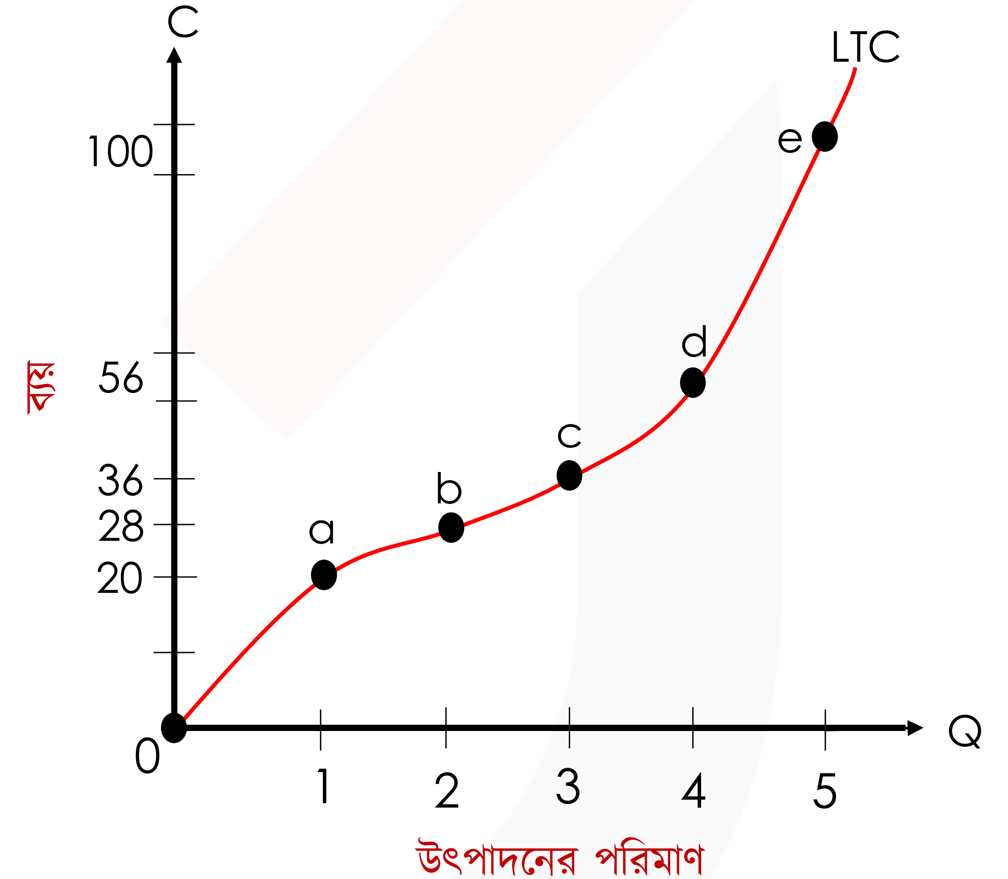
Q	0	1	2	3	4	5
C	0	20	28	36	56	100

এখন সূচির ভিত্তিতে রেখাচিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো-

পাশের চিত্রে, উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন বিন্দুর a, b, c, d, e সংমিশ্রণে গঠিত LTC রেখাটি দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা প্রকাশ করে।

চিত্রের LTC রেখাটি ঊর্ধ্বগামী এবং তার ঢাল ধনাত্মক।

ধনাত্মক ঢাল হওয়াতে উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়ে।



চিত্র: দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা

গড় ব্যয়
Average Cost

কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয় বা খরচকে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় বা খরচ পাওয়া যায়। অর্থাৎ

$$\text{গড় ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}},$$

প্রতীক চিহ্নে; $AC = \frac{TC}{Q}$

এখানে, AC = গড় ব্যয় (Average Cost)

TC = মোট ব্যয় (Total Cost)

Q = উৎপাদনের পরিমাণ (Quantity of Production)



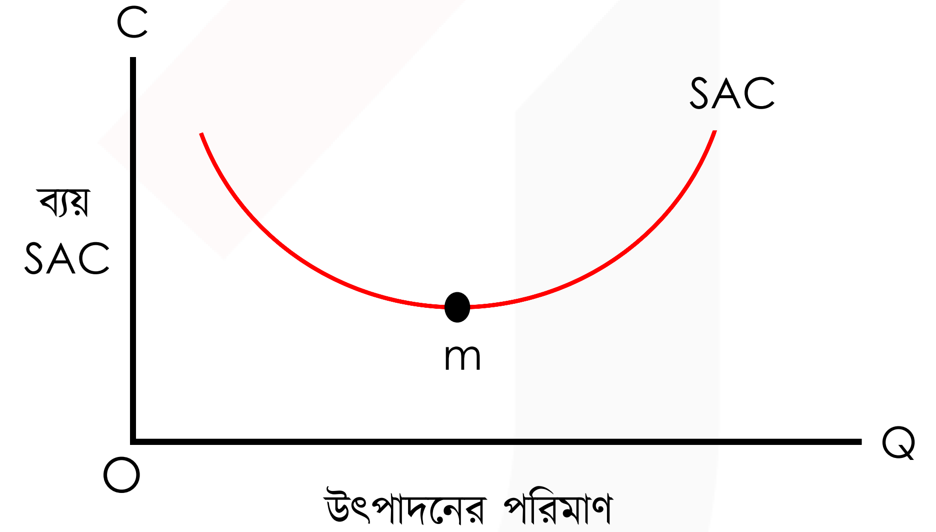
চিত্র: স্বল্পকালীন গড় ব্যয়

উদাহরণ: ২০টি কলম উৎপাদনে মোট উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা।

গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q} = \frac{১০০}{২০} = ৫$ টাকা

গড় ব্যয়
Average Cost

উৎপাদনের প্রথমদিকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গড় ব্যয় হ্রাস পায়। একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, তারপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে (কাম্য m বিন্দুর পর) গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (SAC) রেখা ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতির হয়।



চিত্র: স্বল্পকালীন গড় ব্যয়

গড় ব্যয়
Average Cost

স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয়ের দুটি অংশ থাকে।

যথা i. গড় স্থির ব্যয় ও ii. গড় পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয়

i. গড় স্থির ব্যয় (Average Fixed Cost AFC):

মোট স্থির ব্যয়কে, মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়।

গড় স্থির ব্যয় কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হয় না।

কারণ দুটি ধনাত্মক সংখ্যার ভাগফল কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না।

গড় স্থির ব্যয়কে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{গড় স্থির ব্যয় } (AFC) = \frac{\text{মোট স্থির ব্যয় (TFC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$$

গড় ব্যয়
Average Cost

ii. গড় পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনশীল ব্যয় (Average Variable Cost- AVC):

স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়।

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ,

$$\text{গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়}\ (AVC) = \frac{\text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)}}{\text{মোট উৎপাদন (Q)}}$$

গড় ব্যয়
Average Cost

স্বল্পকালে মোট ব্যয় বিশ্লেষণ করে AC, AFC এবং AVC নির্ণয়:

স্বল্পকালে $STC = TFC + TVC$

স্বল্পকালীন গড় ব্যয় $SAC = \frac{STC}{Q} = \frac{STFC+STVC}{Q} = \frac{STFC}{Q} + \frac{STVC}{Q}$

এখানে, Q = উৎপাদনের পরিমাণ, STC = স্বল্পকালীন মোট ব্যয়, TFC = মোট স্থির ব্যয়,

TVC = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়, SAC = স্বল্পকালীন গড় ব্যয়, AFC = গড় স্থির ব্যয়, AVC = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

দীর্ঘকালীন গড় খরচ LAC নির্ণয়:

$$LAC = \frac{LTC}{Q} = \frac{TVC}{Q} = AVC.$$

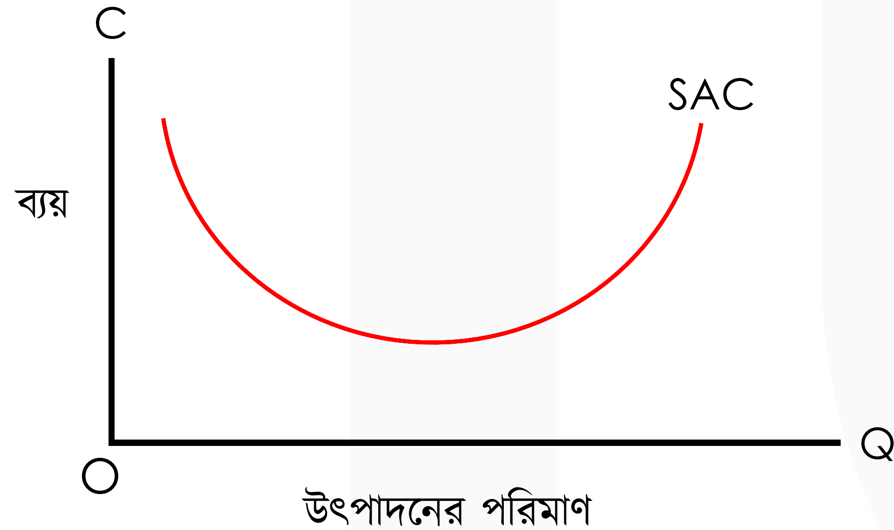
দীর্ঘকালে TFC = 0, ফলে AFC = 0 হয়, তখন LAC = AVC হয় ।

গড় ব্যয়
Average Cost

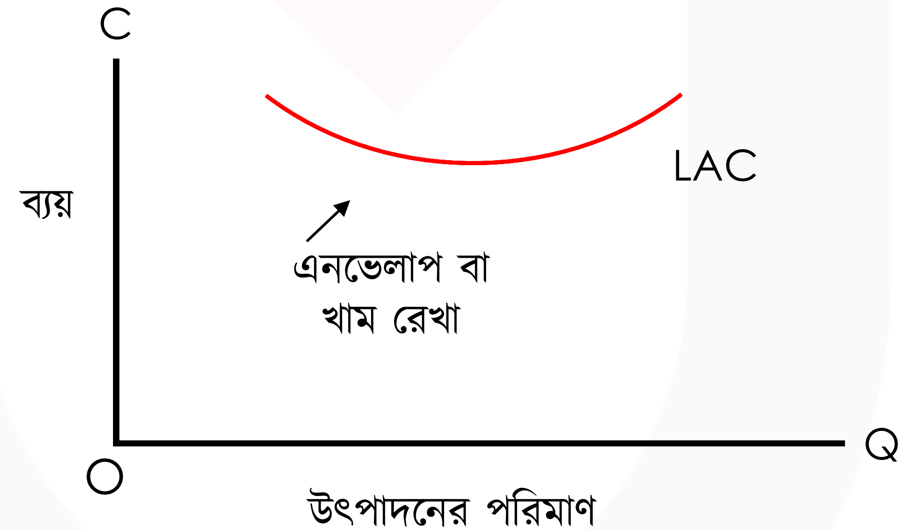
গড় ব্যয় রেখার পরিচিতি: স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = স্বল্পকালীন গড় স্থির ব্যয় + স্বল্পকালীন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

অর্থাৎ SAC =SAFC + SAVC, যা ইংরেজি বর্ণ ইউ (U) আকৃতির হয়।

তবে দীর্ঘকালীন বড় ব্যয় LAC এনভেলাপ এর মতো হয়, যা নিচের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র: স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা



চিত্র: দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা

গড় ব্যয়
Average Cost

SAC রেখা 'U' আকৃতির হওয়ার কারণ—

মোট খরচকে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যে খরচ পাওয়া যায় তাকে গড় খরচ বলে।

উৎপাদনের বিভিন্ন গড় খরচের বিভিন্নতার জন্য যে রেখা পাওয়া যায় তা ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

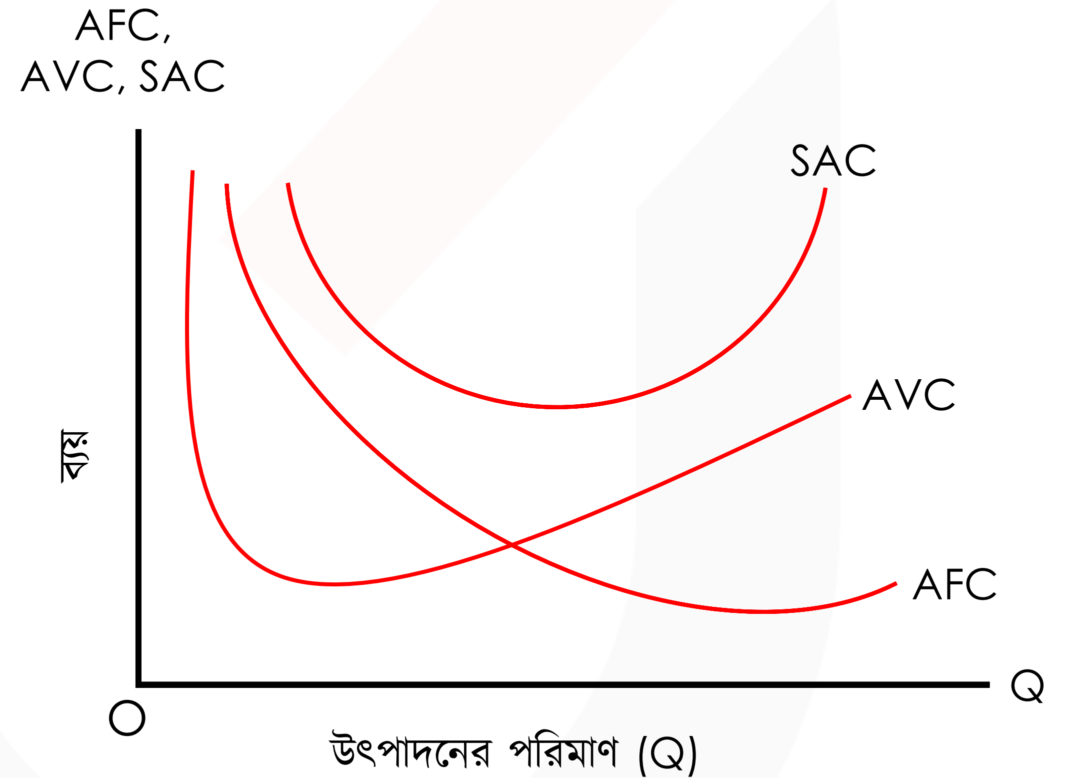
ক. উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে গড় খরচ (AC) হ্রাস পায় এবং পরবর্তীতে গড় খরচ (AC) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির হয়।

খ. স্বল্পকালে প্লান্ট অকাম্যস্তরে ব্যবহার করা হলে গড় খরচ হ্রাস পায়। যখন কাম্যস্তরে ব্যবহার হয় তখন গড় খরচ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে। অন্যদিকে প্লান্ট অতিরিক্ত ব্যবহার হলে গড় খরচ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এতে করে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতি ধারণ করে।

গ. পরিবর্তনীয় উপকরণ অনুপাত বিধি কার্যকর থাকে বলে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতির হয়।

গড় ব্যয়
Average Cost

ঘ. গড় খরচের দুটি অংশ; একটি গড় স্থির খরচ (AFC) অপরটি গড় পরিবর্তনীয় খরচ (AVC)। উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় উভয় খরচ কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে গড় স্থির খরচ ও গড় পরিবর্তনশীল খরচ সমান হয়। এরপর উৎপাদন আরও বাড়তে থাকলে গড় স্থির খরচ কমতে থাকলেও গড় পরিবর্তনীয় খরচ বৃদ্ধি পায়। এই খরচের সম্মিলিত প্রভাবে গড় খরচ রেখা 'U' আকৃতি ধারণ করে। চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় খরচ (AC), গড় স্থির খরচ (AFC) ও গড় পরিবর্তনশীল খরচ (AVC) দেখানো হয়েছে। চিত্রানুসারে, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে AFC এবং AVC এর সম্মিলিত প্রভাবে ইংরেজি বর্ণ "U' আকৃতির SAC রেখা পাওয়া যায়।



চিত্র: U আকৃতির SAC রেখা

গড় ব্যয়
Average Cost

LAC রেখা এনভেলাপ আকৃতির হওয়ার কারণ:

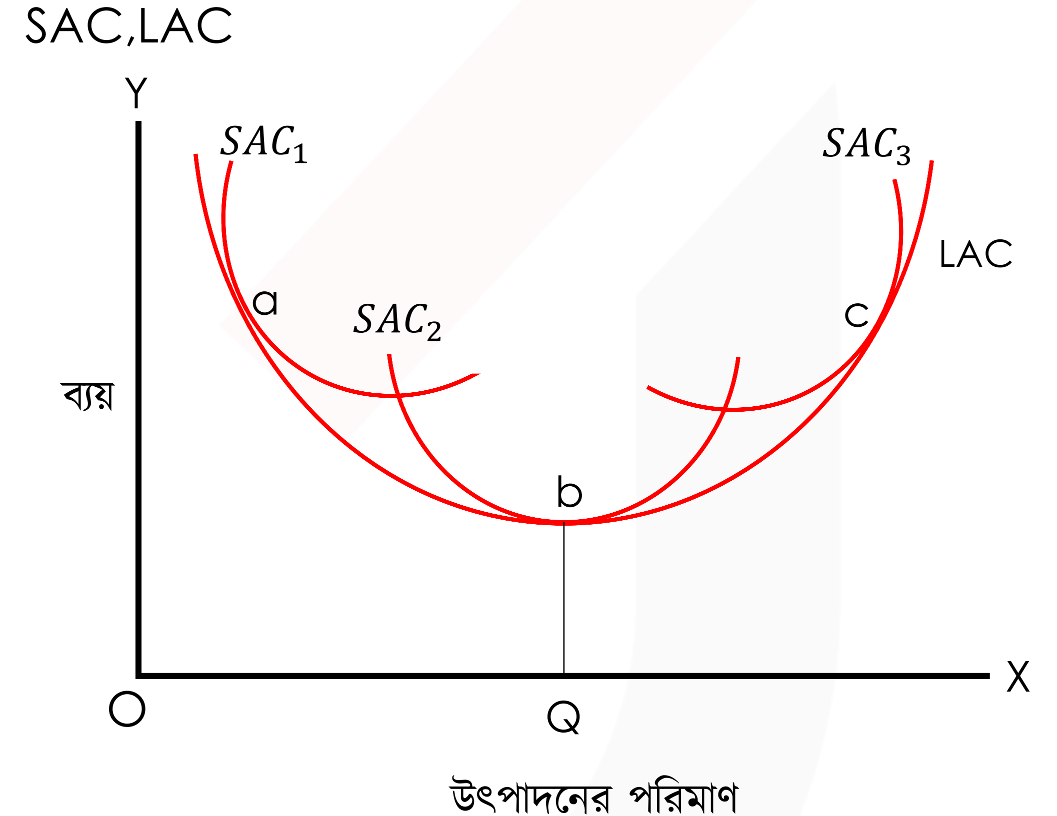
দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা (LAC) পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালে ফার্মে ব্যবহৃত সকল উপাদানই পরিবর্তনশীল। এখানে স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সময়ে ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করতে চাইলে উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কারখানার আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদি পরিবর্তন করে।

ফার্মের আয়তন স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা (SAC) দ্বারা নির্দেশিত। প্রতিটি ফার্ম ব্যবহৃত আয়তন তথা স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করতে চায়। এ সকল বিন্দুসমূহ যোগ করে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার (LAC) এনভেলপ আকৃতির কারণ নিচে ব্যাখ্যা করো হলো -

গড় ব্যয়
Average Cost

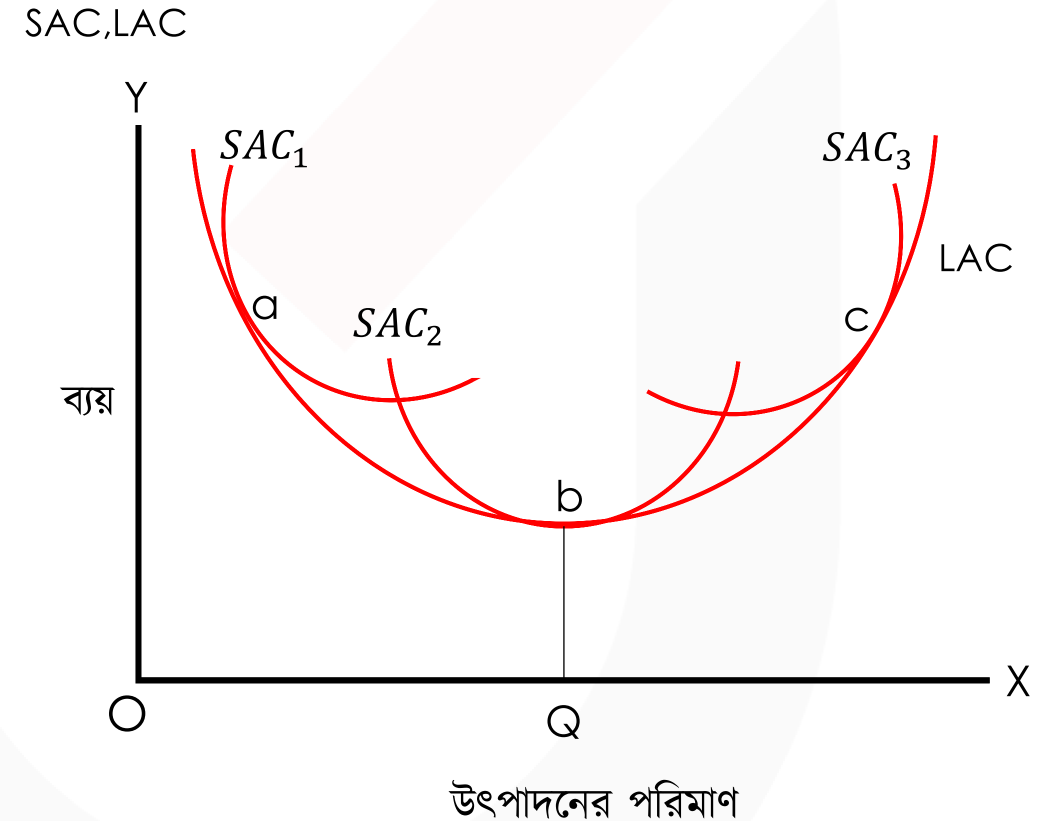
ক. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর থাকে বলে দীর্ঘকালে গড় খরচ (LAC) হ্রাস পায়। একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পর স্থির মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হওয়ায় LAC ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হওয়ায় LAC বৃদ্ধি পায়। ফলে LAC রেখা এনভেলাপ বা সম্প্রসারিত 'U' আকৃতির হয়।



গড় ব্যয়
Average Cost

খ. দীর্ঘকালে ফার্মের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সুবিধার কারণে খরচ কমে ফলে LAC নিম্নগামী হয়। যখন এ সুবিধা সর্বোচ্চ হয় তখন LAC সর্বনিম্ন হয়। কাম্যস্তরের পর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় অসুবিধা হেতু LAC ঊর্ধ্বগামী হয়। ফলে LC রেখা এনভেলাপ বা সম্প্রসারিত 'U' আকৃতির হয়।

গ. প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা একেকটি প্লান্টের আয়তন নির্দেশ করে যার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ফার্ম উৎপাদন করতে চায়। এরূপ বিন্দুগুলোকে বাহ্যিক বেষ্টন করে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা যাওয়া যায়। ফলে এটি এনভেলাপ আকৃতি ধারণ করে।

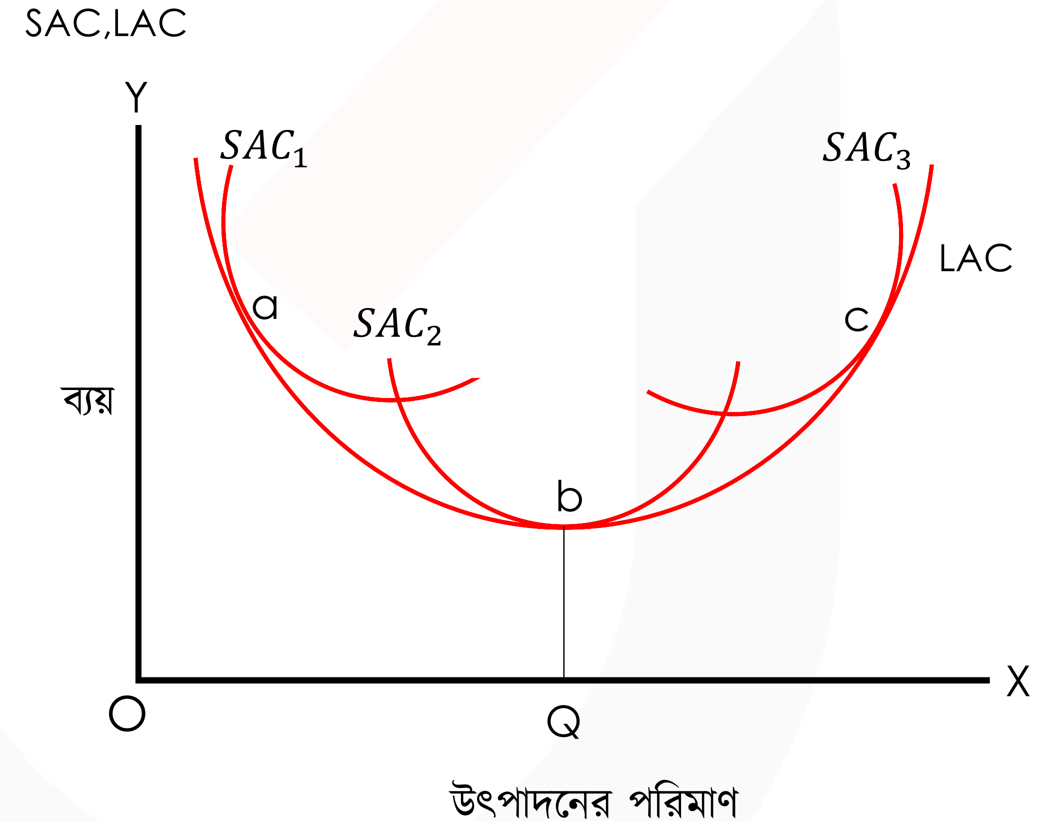


গড় ব্যয়
Average Cost

চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো-

উৎপাদনের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদন খরচ (SAC, LAC) পরিমাপ করা হয়েছে। SAC_1, SAC_2, SAC_3, দ্বারা উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের প্রেক্ষিতে প্লান্টের বিভিন্ন আয়তন নির্দেশিত হয়েছে। যেগুলো সর্বনিম্ন বিন্দু যথাক্রমে a, b ও c এখন এই বিন্দুগলো যোগ করে LAC রেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ LAC রেখা অনেক SAC রেখাকে আচ্ছাদিত করে রাখে বলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা (LAC) এনভেলাপ আকৃতি ধারণ করে।



প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

মোট উৎপাদন এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের বা মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

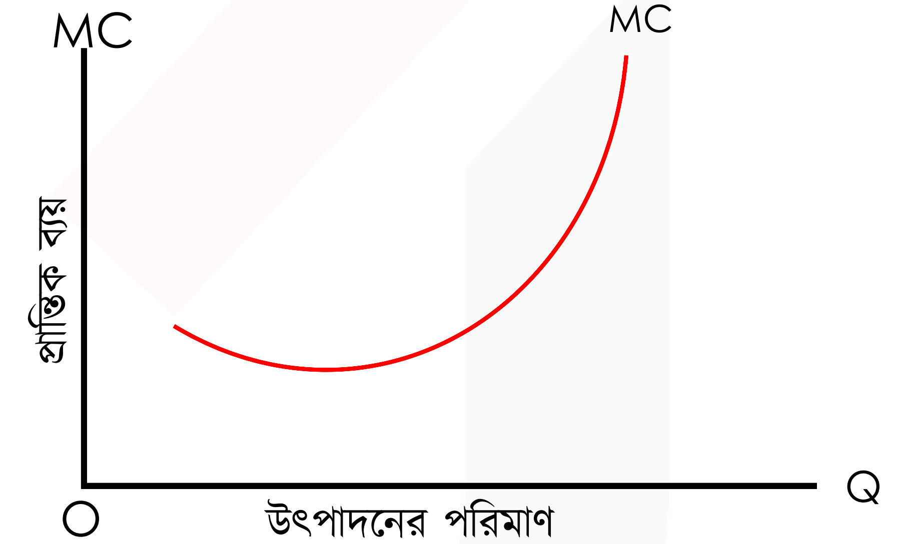
সূত্র: প্রান্তিক ব্যয় $(MC) = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন } (\Delta TC)}{\text{মোট উৎপাদনের পরিবর্তন } (\Delta Q)} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{d(TC)}{dQ}$

অন্যভাবে, $MC = (TC_n - TC_{n-1})$. অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে n তম একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় হলো n তম একক উৎপাদন এবং (n-1) তম একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পার্থক্য।

উদাহরণ: মনে করি, ১০টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ৫০০০ টাকা এবং ১১টি শার্ট তৈরির জন্য ব্যয় হয় ৫৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১টি শার্টের জন্য ব্যয় হয় (৫৫০০-৫০০০) টাকা = ৫০০ টাকা সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় (MC) = ৫০০ টাকা।

প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8(10-8)
3	21	3(21-18)
4	24	3(24-21)
5	28	4(28-24)
6	35	7
7	47	12

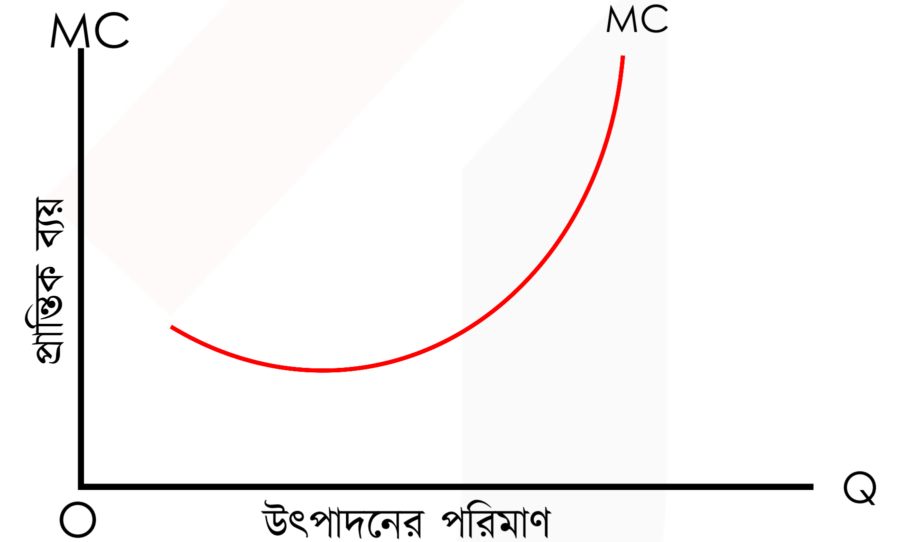


চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8
3	21	3
4	24	3
5	28	4
6	35	7
7	47	12

প্রান্তিক খরচ হচ্ছে মোট খরচের পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ মোট খরচ রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে উহার ঢাল (slope) ই হচ্ছে প্রান্তিক খরচ। তাই মোট খরচ রেখার ঢাল যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা নিম্নগামী এবং মোট খরচ রেখার ঢাল যখন বাড়তে থাকে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। মোট খরচ রেখা প্রথমে উপরের দিকে উত্তল এবং পরে নীচের দিকে উত্তল হয়।

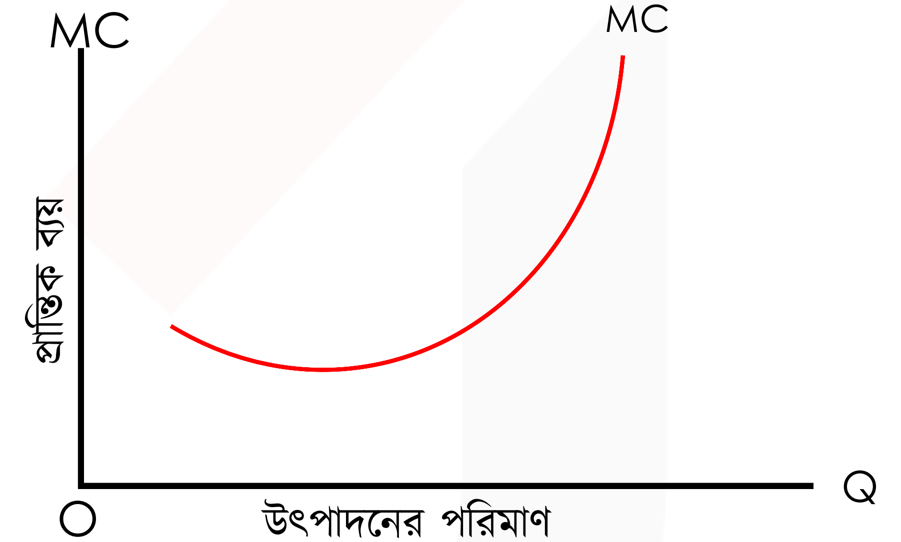


চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8
3	21	3
4	24	3
5	28	4
6	35	7
7	47	12

উপরের দিকে উত্তল হওয়ার মানে রেখাটির ঢাল কমছে অর্থাৎ মোট খরচ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক খরচ রেখা এই পর্যায়ে নিম্নগামী। পরে মোট খরচ রেখা নিচের দিকে উত্তল হওয়ার মানে রেখাটির ঢাল বাড়ছে। অর্থাৎ মোট খরচ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক খরচ রেখা এই পর্যায়ে উর্ধ্বগামী।

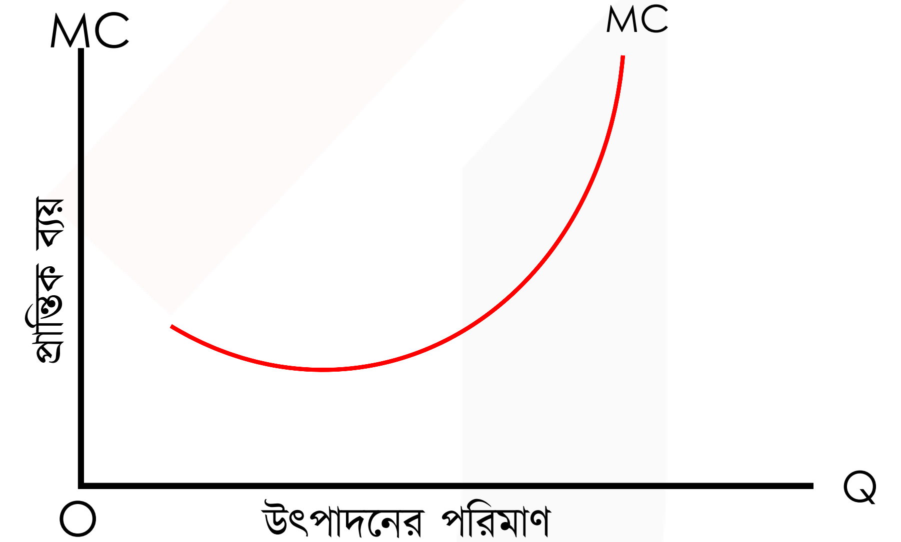


চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8
3	21	3
4	24	3
5	28	4
6	35	7
7	47	12

অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ রেখা 'U' আকৃতি বিশিষ্ট। এর কারণ এই যে ফার্মের দক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যবহারের আগ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়লে দক্ষতা বাড়ে এবং খরচ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়।



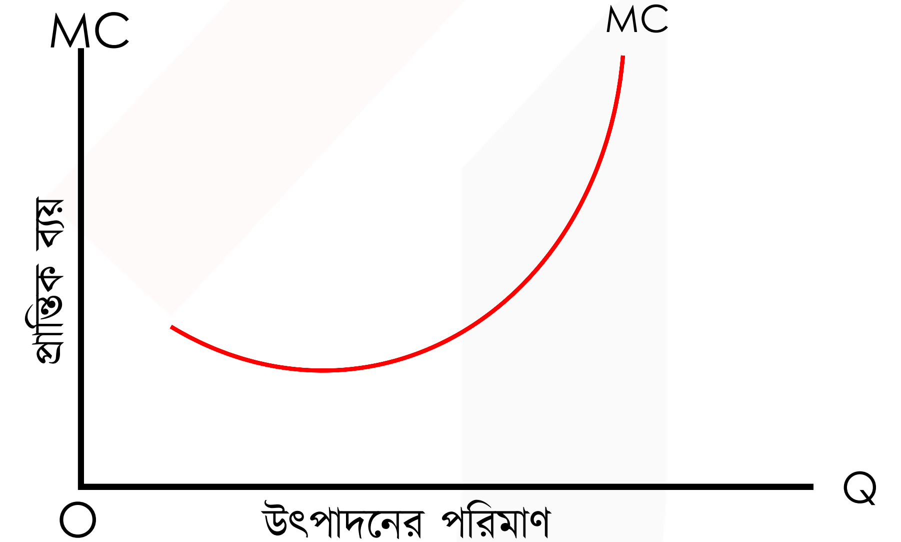
চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

প্রান্তিক ব্যয়
Marginal Cost

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	10	10
2	18	8
3	21	3
4	24	3
5	28	4
6	35	7
7	47	12

আবার দক্ষ উৎপাদন ক্ষমতা পেরিয়ে গেলে উৎপাদন অপরিচালনীয় হয়ে পড়ে এবং খরচ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাড়তি (Additional) এক একক উৎপাদন করতে গিয়ে যে বাড়তি ব্যয় তথা অতিরিক্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় সংযুক্ত হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।



চিত্র: প্রান্তিক ব্যয়

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিচে চিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা হলো।

পণ্য বা সেবা উৎপাদনে প্রতি এককের ব্যয়কে গড় ব্যয় (AC) বলে।

অন্যদিকে, এক একক অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে।

এ দুই ব্যয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক তিনটি বিবৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করা যায়।

যথা—

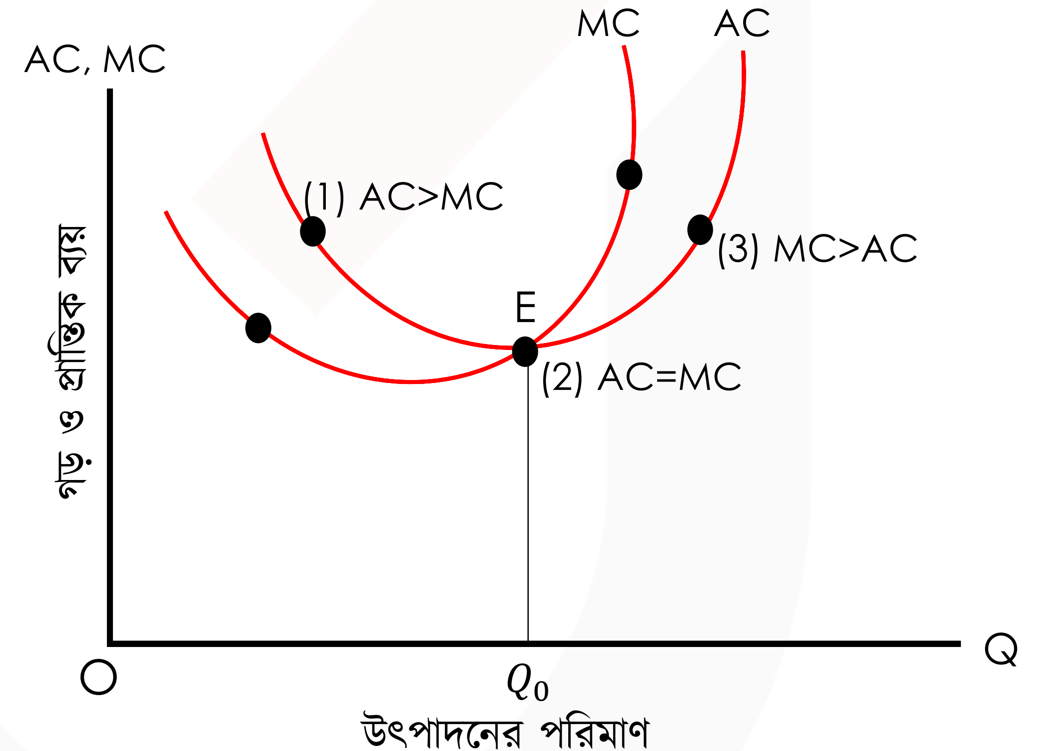
গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

(i) প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয়ের নিচে অবস্থান করে, গড় ব্যয় তখন কমে এবং প্রান্তিক রেখা নিম্নগামী হয়।

(ii) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় যখন সমান, তখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে।

(iii) প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের উপরে অবস্থান করলে গড় ব্যয় বাড়ে অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখাটি ঊর্ধ্বগামী হয়। AC ও MC এর মধ্যে এই সম্পর্ক তিনটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে AC ও MC পরিমাপ করা হয়েছে।

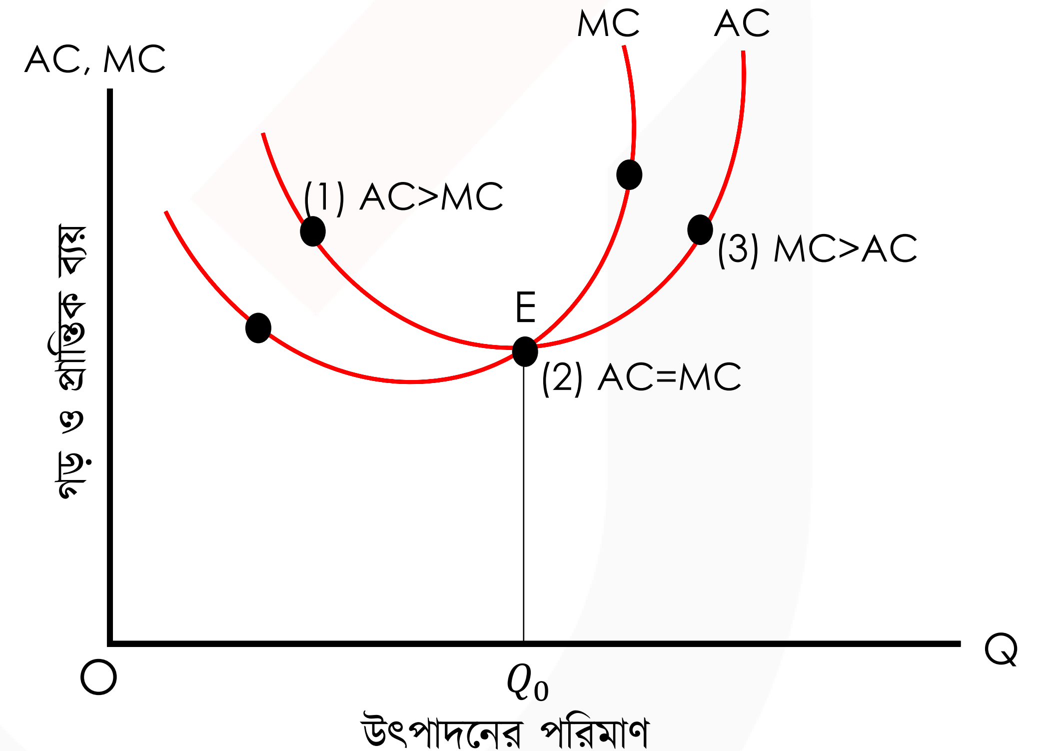


চিত্র: গড় ও প্রান্তিক ব্যয় এর সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

১. উৎপাদনের প্রথমদিকে MC এবং AC উভয়ই হ্রাস পায়।
প্রান্তিক ব্যয় (MC) যখন গড় ব্যয়ের (AC) নিচে অবস্থান করে, গড় ব্যয় তখন কমে এবং গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়।
ফলে AC > MC হয়।

২. গড় ব্যয় (AC) যখন সর্বনিম্ন হয়, তখন প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা, গড় ব্যয় (AC) রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে।
ফলে AC = MC হয় , যা E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।



চিত্র: গড় ও প্রান্তিক ব্যয় এর সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

৩. E বিন্দুর পর AC এবং MC উভয় রেখাই ঊর্ধ্বগামী হয়।

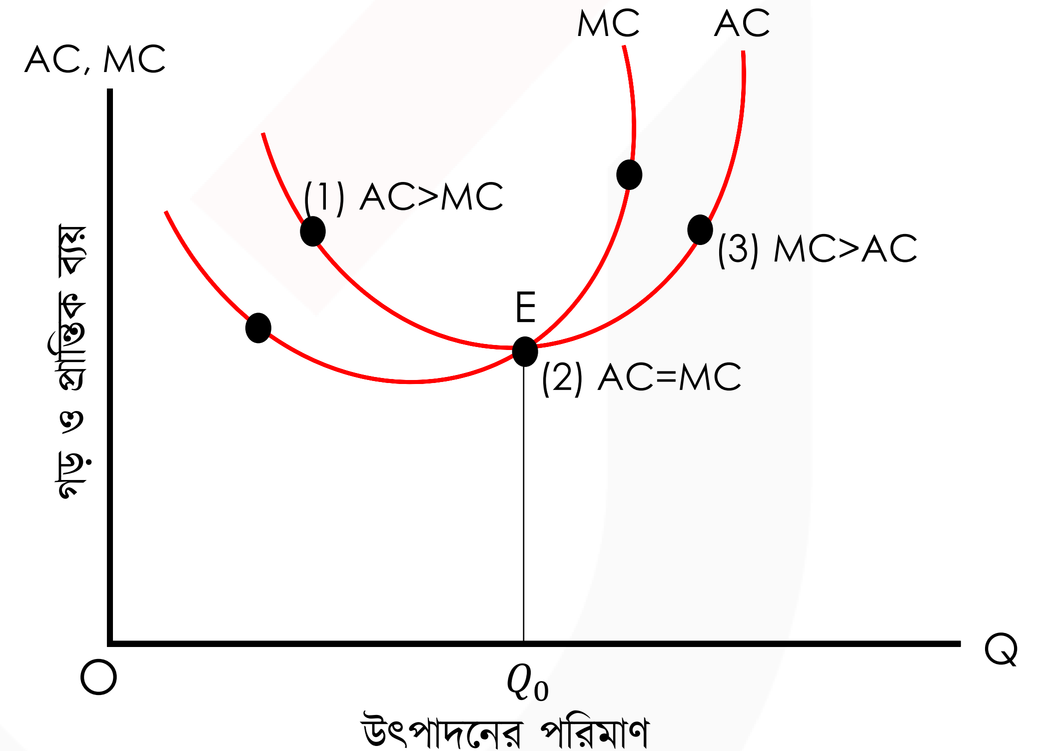
তখন MC বৃদ্ধির হার, AC বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। তাই প্রান্তিক ব্যয় (MC), গড় ব্যয় (AC)-এর উপরে অবস্থান করে।

ফলে MC > AC হয়।

সুতরাং, E বিন্দুর পূর্বে AC > MC,

E বিন্দুতে AC = MC হয়।

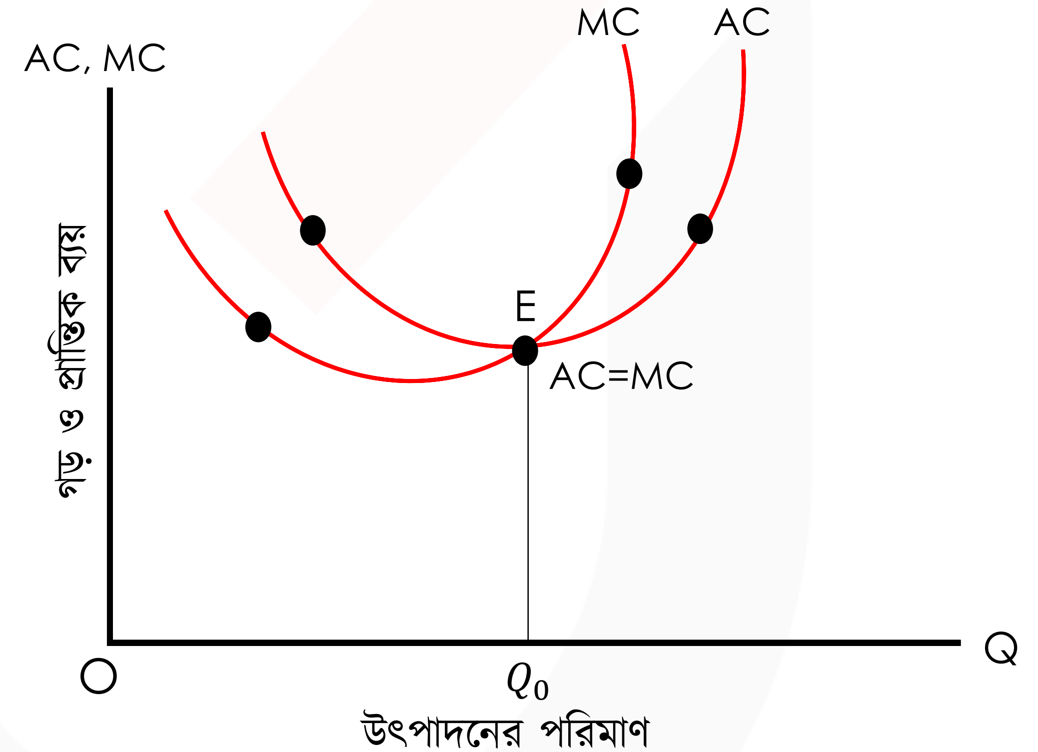
যখন AC সর্বনিম্ন এবং E বিন্দুর পরে MC > AC হয়।



চিত্র: গড় ও প্রান্তিক ব্যয় এর সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

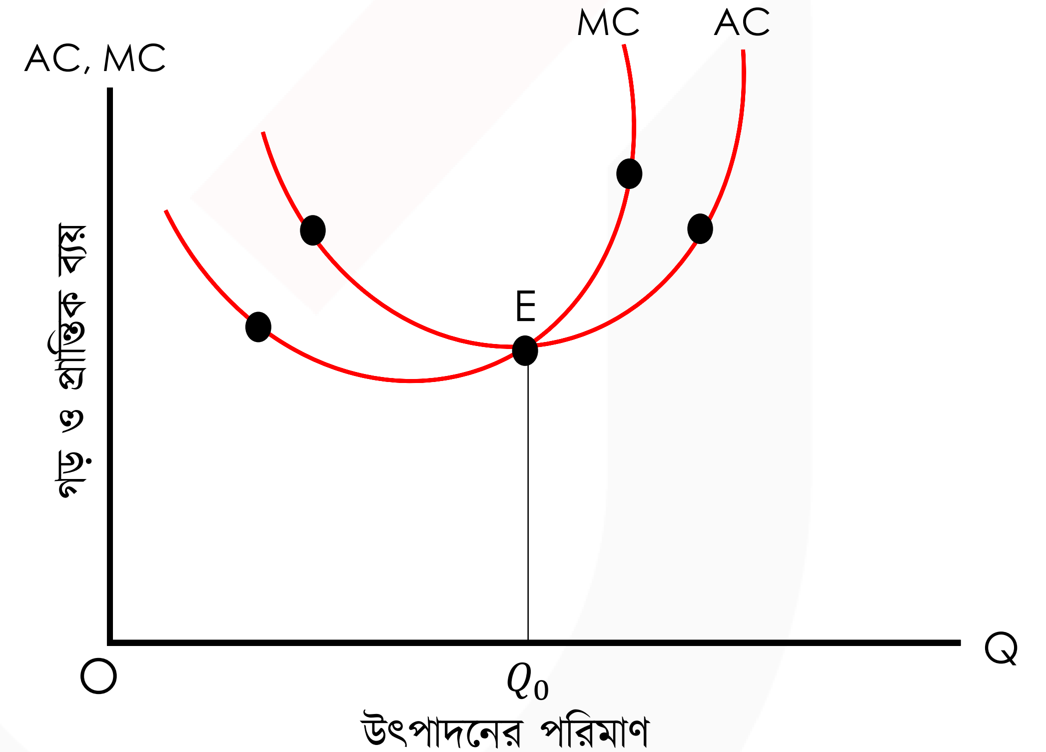
E বিন্দুর পূর্বে কি হয়?



চিত্র: গড় ও প্রান্তিক ব্যয় এর সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক
Average Cost Marginal Cost

E বিন্দুতে AC > MC হয়।



চিত্র: গড় ও প্রান্তিক ব্যয় এর সম্পর্ক

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost

নিচে মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো:

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য যে খরচ বা ব্যয় হয়, তাদের যোগফল বা সমষ্টিকে মোট ব্যয় বলে।
দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের মোট ব্যয়কে, মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে ব্যয় পাওয়া যায় তাকে গড় ব্যয় বলে।
অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত যে ব্যয় যুক্ত হয়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

২. উৎপাদনের প্রথম দিকে মোট ব্যয় (TC) বাড়লেও গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়।

৩. উৎপাদনের শেষ পর্যায়ে মোট ব্যয়ের চেয়ে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় বেশি হারে বাড়ে।

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost

৪. মোট ব্যয়কে TC, গড় ব্যয়কে AC এবং প্রান্তিক ব্যয়কে MC দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

৫. ক. স্বল্পকালে মোট ব্যয় STC = TFC + TVC, কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় LTC = TVC

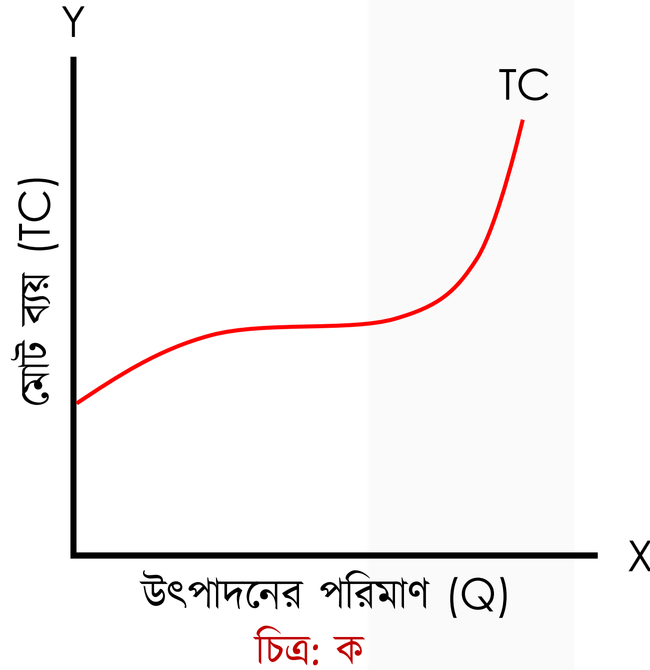
FCX

খ. স্বল্পকালে $SAC = \frac{STC}{Q}$, কিন্তু দীর্ঘকালে $LAC = \frac{LTC}{Q}$

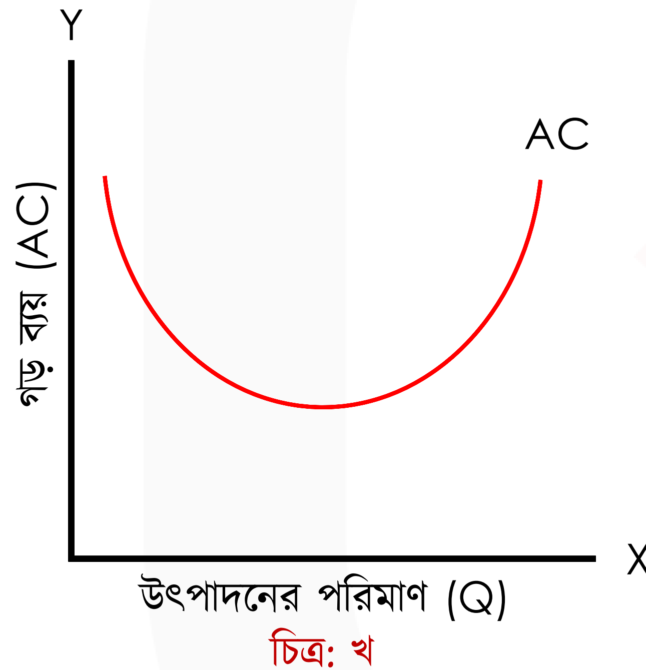
গ. স্বল্পকালে $SMC = \frac{d(STC)}{dQ}$, কিন্তু দীর্ঘকালে LMC $= \frac{d(LTC)}{dQ}$

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost

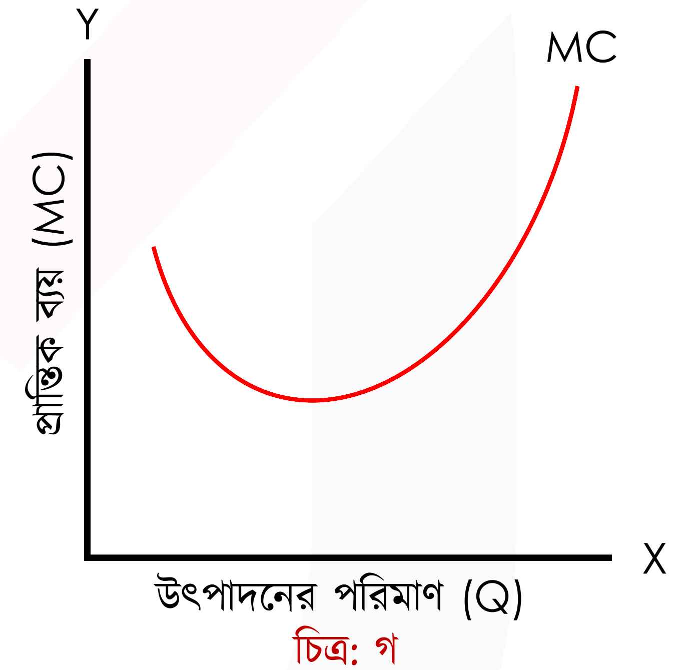
৬. চিত্রভিত্তিক তুলনা:



চিত্র: ক



চিত্র: খ



চিত্র: গ

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এসব ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের অংশ, যা ফার্ম বা উৎপাদক উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিশোধ বা নির্বাহ করে।

মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা
Comparison Among Total Cost, Average Cost and Marginal Cost

STC = Short Run Total Cost

TFC = Total Fixed Cost

TVC = Total Varible Cost

LTC = Long Run Total Cost

LAC = Long Run Average Cost

SMC = Short Run Marginal Cost

SAC = Short Run Average Cost

Q = Production

মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা
Concept of Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রি করে কোনো উদ্যোক্তা বা ফার্ম বা উৎপাদনকারী যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাকে আয় বলে।

এ আয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা— ক. মোট আয় খ. গড় আয় গ. প্রান্তিক আয়।

মোট আয়

কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য সেবার সবটুকু বিক্রি করে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে মোট আয় বলে।

বিক্রয়ের পরিমাণকে, গড় আয় বা দাম দিয়ে গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায় । অর্থাৎ R = মোট আয় (TR) = দাম (P) x বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) বা গড় আয় (AR)

$$R = TR = P \times Q = P \times AR$$

যেমন— একটি ফার্মে প্রতি একক পণ্য 100 টাকা দরে দৈনিক 40টি পণ্য বিক্রি হয়।

তাহলে ফার্মের দৈনিক মোট আয় R = TR= 100 x 40 =4000 টাকা

মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা
Concept of Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue

গড় আয়

দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় পায়, তাকে গড় আয় (AR) বলে।
অন্যভাবে বলা যায়, মোট আয়কে মোট বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় একক প্রতি গড় আয়।

অর্থাৎ গড় আয় (AR) = $\frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$

গাণিতিকভাবে, $AR = \frac{TR}{Q}$

যেমন— ফার্ম 40টি পণ্য বিক্রি করে 4000 টাকায়। তাহলে, ফার্মটির গড় আয় (AR)= $\frac{TR}{Q} = \frac{4000}{40} = 100$ টাকা

মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের ধারণা
Concept of Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue

প্রান্তিক আয়

উৎপাদিত দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রয়ের দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় অর্জিত হয়, তাকে প্রান্তিক আয় বলে। অন্যভাবে, কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে, তার পরিমাণকে প্রান্তিক আয় বলে।

অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR) = $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$

গাণিতিকভাবে, $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = \frac{d(TR)}{dQ}$

এখানে 'Δ' দ্বারা পরিবর্তন বোঝায়। যেমন— একটি ফার্ম ৪০টি পণ্য বিক্রয় করে মোট আয় পায় ৪০০০ টাকা এবং ৪১টি পণ্য বিক্রি করে মোট আয় পায় ৪২০০ টাকা। তাহলে প্রান্তিক আয় (MR) = ৪২০০-৪০০০= ২০০ টাকা । পরিশেষে বলা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের সাপেক্ষে মোট আয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের অনুপাতই হলো প্রান্তিক আয় ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and Mr Curve of a Firm in Perfect Competition Market & Explain the Shape of Them

কোনো ফার্ম বা বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয়ের প্রকৃতি ও রেখা বাজার অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে। বাজারে বিক্রয়রত একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা আঁকার জন্য কাল্পনিক আয় সূচি বিবেচনা করা হলো।

১ কেজি টক দই = ৬০ টাকা

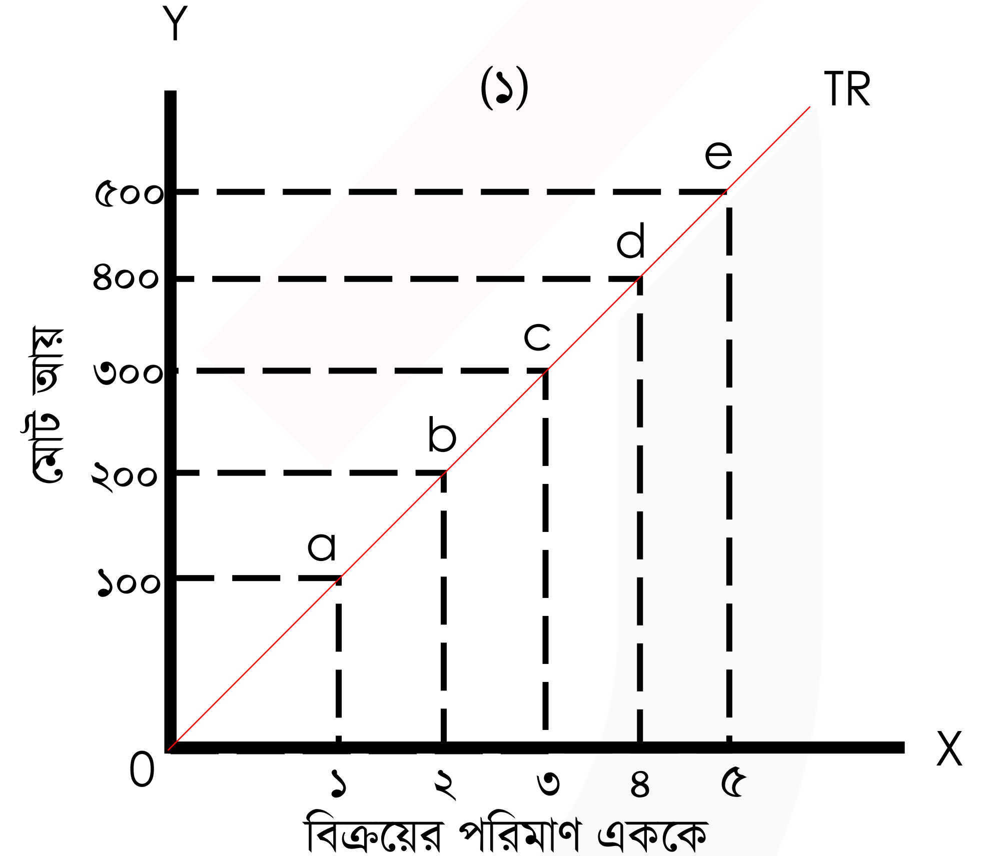
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম/বিক্রেতার আয় সূচি (টাকায়)

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)(এককে)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০০	১০০	১০০
২	২০০	১০০	১০০
৩	৩০০	১০০	১০০
৪	৪০০	১০০	১০০
৫	৫০০	১০০	১০০

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and Mr Curve of a Firm in Perfect Competition Market & Explain the Shape of Them

i. মোট আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:

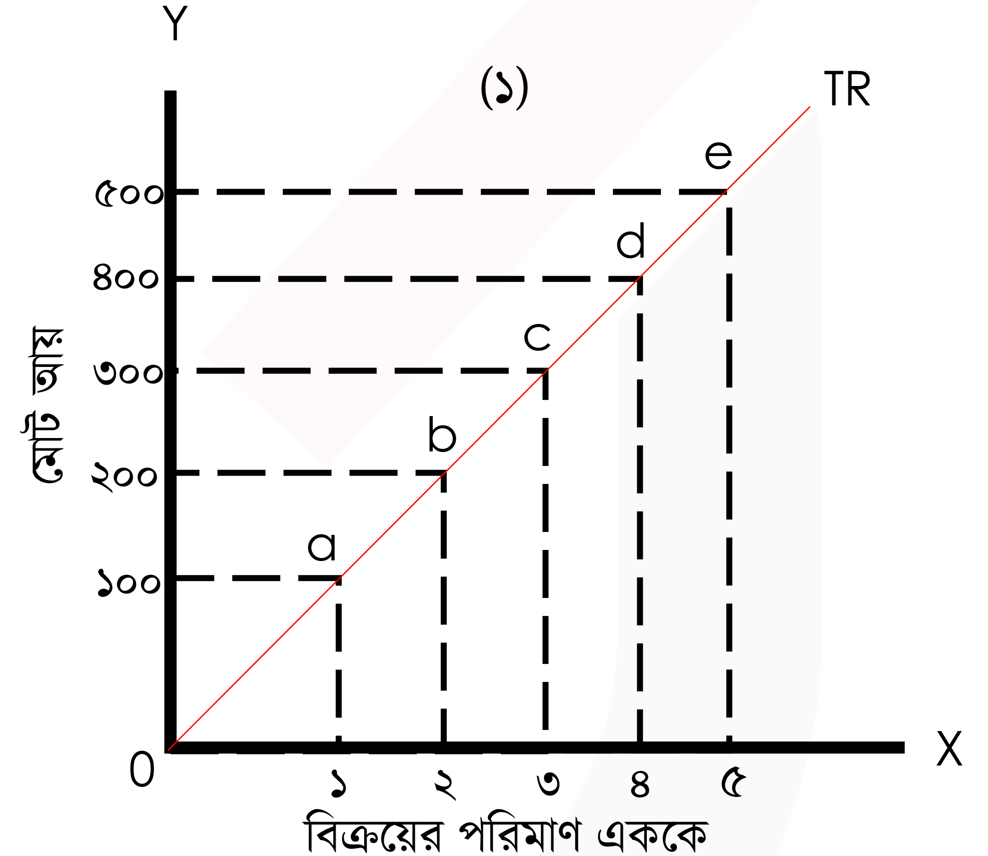
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো বিক্রেতা/ফার্ম তার দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হলে তাকে তা নির্ধারিত দামেই বিক্রয় করতে হয়। এজন্য সে দ্রব্যের প্রতিটি একক থেকে একই আয় পায়। ফলে সে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে বিক্রেতার মোট আয় রেখা (TR) আঁকা হয়েছে।



চিত্র: পূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যাখ্যা
Drawing TR, AR, and Mr Curve of a Firm in Perfect Competition Market & Explain the Shape of Them

চিত্রে দেখা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের TR রেখা হলো একটি সরলরেখা যা মূল বিন্দু থেকে উঠে বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে মোট আয় একই হারে বাড়ায় রেখাটি এ রকম আকৃতি বিশিষ্ট হয়েছে।

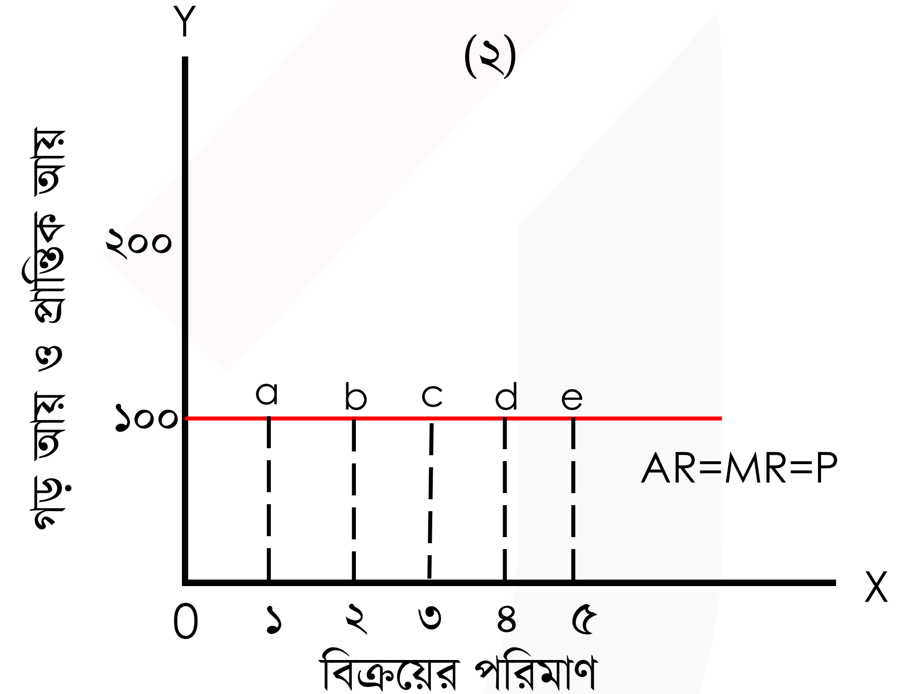


চিত্র: পূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and Mr Curve of a Firm in Perfect Competition Market & Explain the Shape of Them

ii. গড় আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:

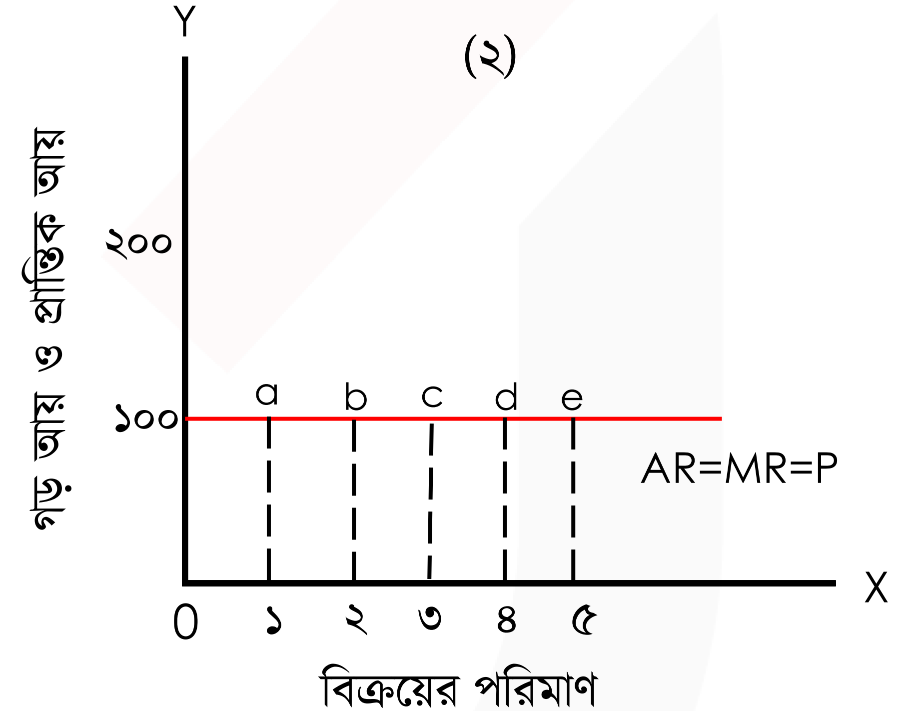
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোনো বিক্রেতা একই দামে যতটা ইচ্ছা বিক্রয় করতে পারে। এজন্য এ বাজারে প্রতিটি একক থেকে একই দাম তথা গড় আয় পাওয়া যায়। ফলে দাম বা গড় আয়ও সমান থাকে। প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে চিত্রে গড় আয় রেখা (AR) আঁকা হয়েছে।



চিত্র: পূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যাখ্যা
Drawing TR, AR, and Mr Curve of a Firm in Perfect Competition Market & Explain the Shape of Them

২নং চিত্রে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ ১ একক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলেও গড় আয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে গড় আয় ১০০ টাকা হয়। এ অবস্থায় AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।



চিত্র: পূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

iii. প্রান্তিক আয় রেখা ও তার প্রকৃতি:

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয় হলো গড় আয় বা দামের সমান। এ বাজারে দামের বা গড় আয়ের কোনো পরিবর্তন না ঘটায় অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন হয় তা প্রতিটি বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে স্থির থাকে। ফলে প্রান্তিক আয়ও স্থির থাকে এবং তা গড় আয়ের সমান হয়। প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে ২নং চিত্রে যে প্রান্তিক আয় রেখা আঁকা হয়েছে তা গড় আয় রেখা AR-এর আকৃতি ধারণ করে তার সাথে একত্রে অবস্থান করছে। চিত্রে MR হলো কাঙ্ক্ষিত প্রান্তিক আয় রেখা।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যাখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

যে বাজারে ক্রেতা বিশেষ করে বিক্রেতার সংখ্যা কম থাকে, বিক্রেতাদের দ্রব্য একই ধরনের হলেও তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে এবং বিক্রেতারা দ্রব্যের দাম কম বেশি প্রভাবিত করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

এ বাজারে বিক্রেতাদের সংখ্যা যত কম হয় দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তাদের তত বেশি হয়।

তবে এ বাজারে বিক্রয় বাড়াতে গেলে দাম কমাতে হয়। আবার এখানে যোগান কমিয়ে দাম বাড়ানোর মাধ্যমে আয় বাড়ানো যায়।

বিক্রয় বাড়াতে গেলে দাম কমাতে হয় বলে এ বাজারে বিক্রেতার মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

এজন্য গড় ও প্রান্তিক আয়ও হয় ক্রমহ্রাসমান, তবে প্রান্তিক আয়, গড় আয় থেকে কম থাকে।

প্রদত্ত আয় সূচির ভিত্তিতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখাগুলো আঁকা হলো—

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যাখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিক্রেতা আয় সূচি (টাকায়)

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (এককে)	মোট আয় (TR = AR x Q বা P x Q)	গড় আয় (AR = P = TR ÷ Q)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০০	১০০	১০০
২	১৮০	৯০	৮০
৩	২৪০	৮০	৬০
৪	২৮০	৭০	৪০
৫	৩০০	৬০	২০
৬	৩০০	৫০	০০
৭	২৮০	৪০	-২০

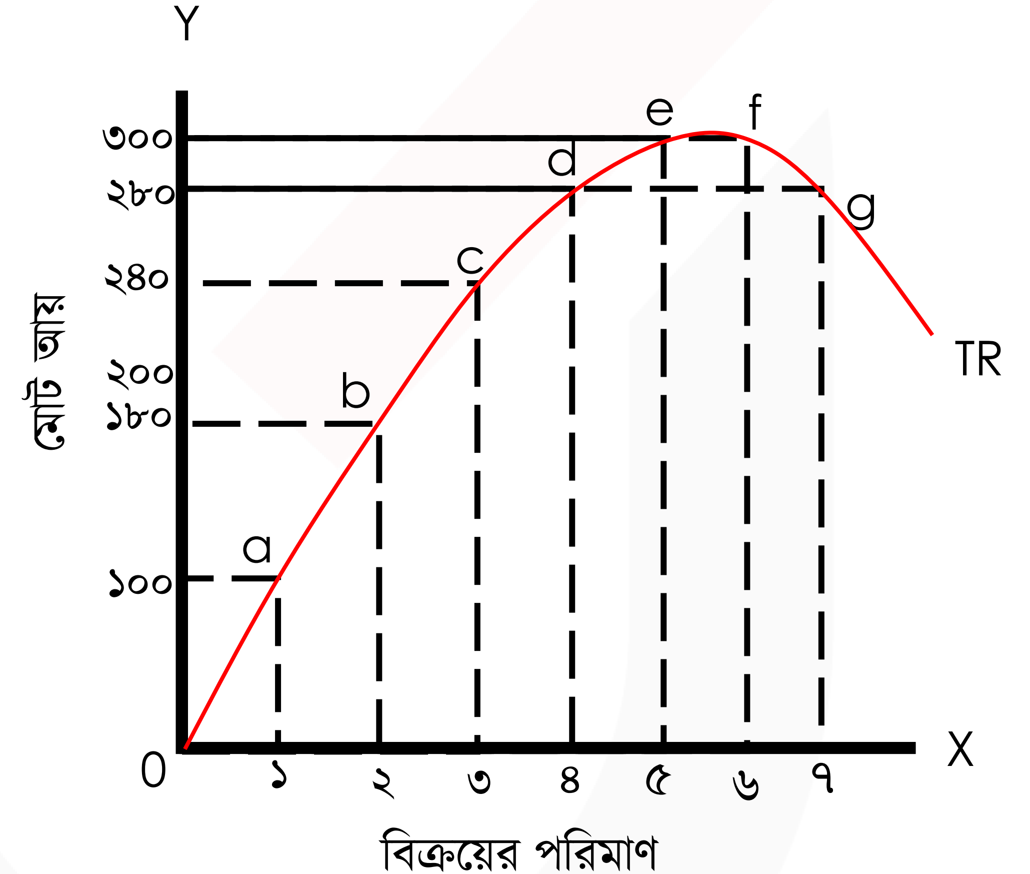
প্রদত্ত সূচিতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয় দেখানো হয়েছে। এ সূচির উপর ভিত্তি করে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বিক্রেতার মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখাগুলো আঁকা হয়েছে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

১. মোট আয় (TR) রেখা:

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, এ বাজারে কোনো বিক্রেতা বিক্রয় বাড়াতে গেলে তাকে দাম কমাতে হয়।

এজন্য **এ বাজারে বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে তার মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।**



চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

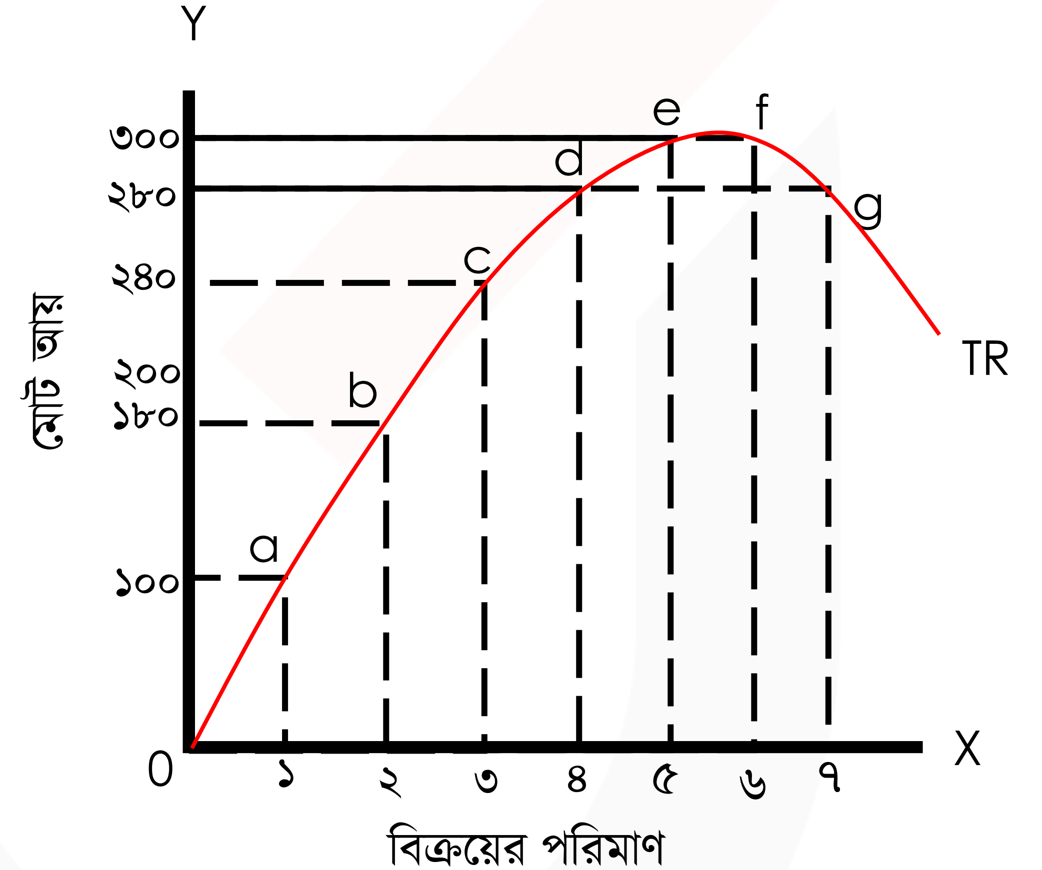
পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে মোট আয় (TR) পরিমাপ করা হয়েছে।

প্রদত্ত সারণিতে Q ও TR এর মানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে মোট আয় রেখা পাওয়া যায়।

চিত্রে TR হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা।

TR রেখাটি প্রথমে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে, নির্দিষ্ট সীমার পরে নিম্নগামী হয়েছে।

TR ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ার জন্য রেখাটি এ আকৃতি বিশিষ্ট হয়েছে।



চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মোট আয় রেখা

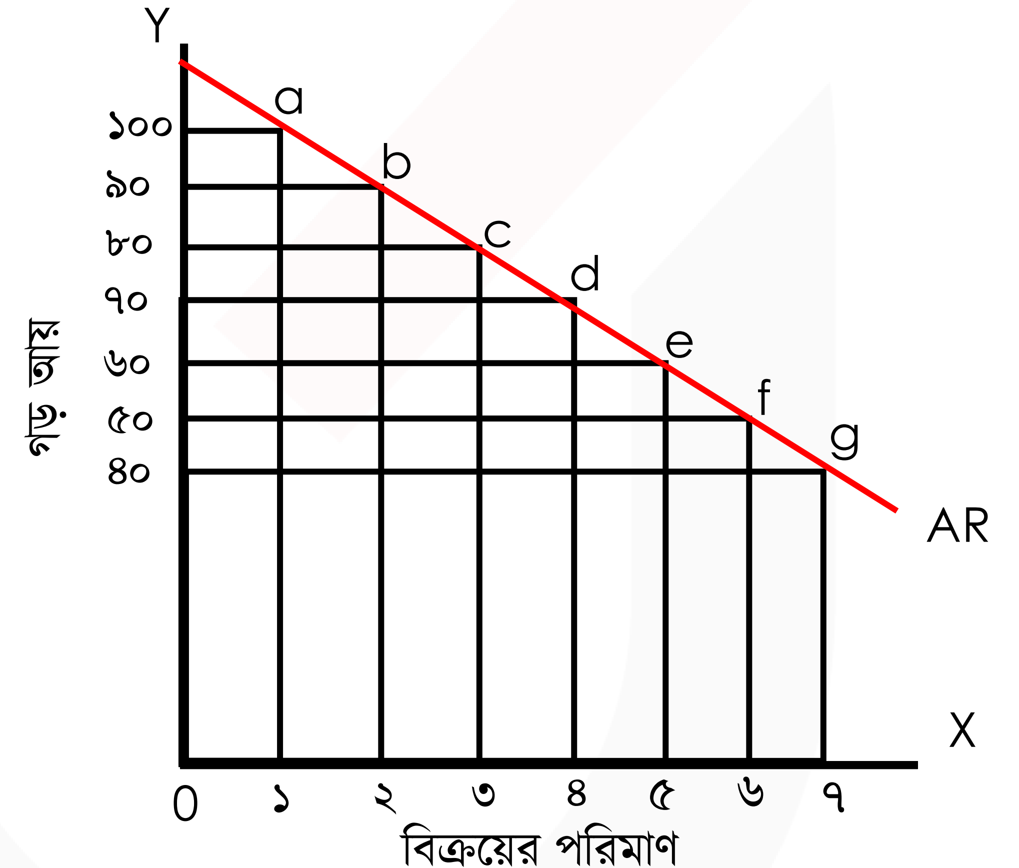
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

২. গড় আয় (AR) রেখা:

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কোনো বিক্রেতা বেশি বিক্রয় করতে চাইলে তাকে দাম কমাতে হয়।

এজন্য এ বাজারে যত বেশি বিক্রয় করা হয় দাম বা গড় আয় ততই কমে আসে।

প্রদত্ত সূচির ওপর ভিত্তি করে চিত্রে গড় আয় (AR) রেখা আঁকা হয়েছে।



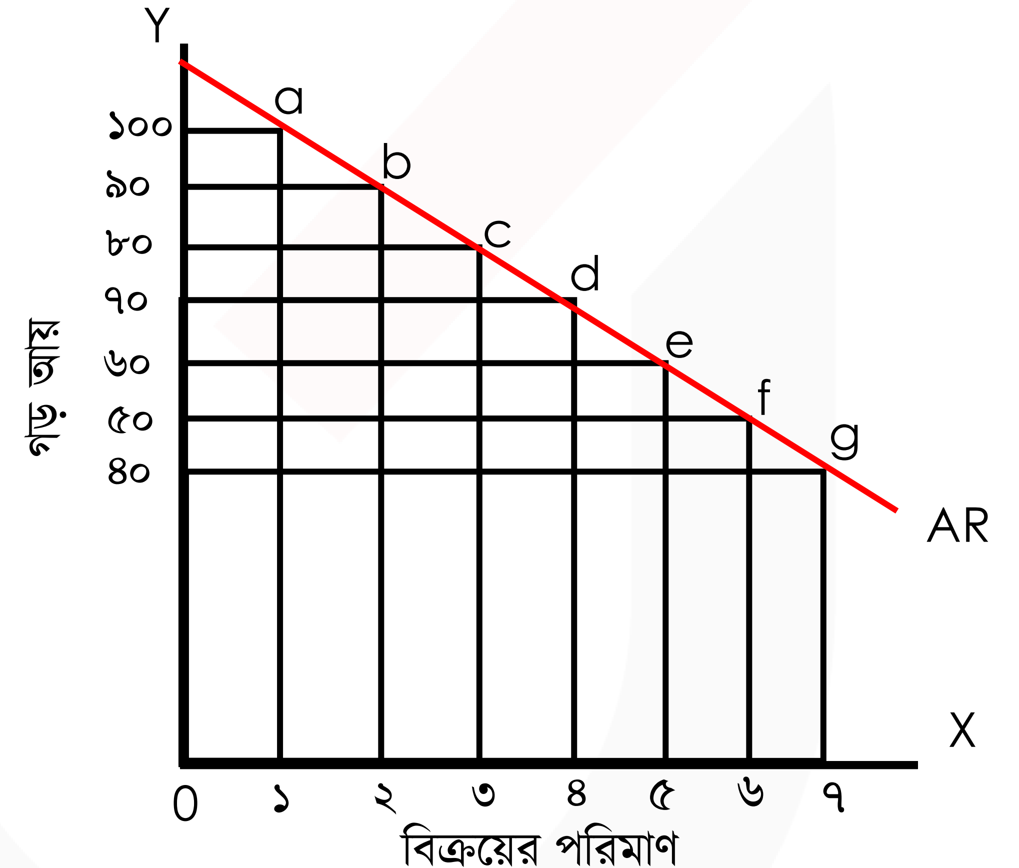
চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যাখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

পাশের চিত্রে ভূমির অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় আয় (AR) পরিমাপ করা হয়েছে।

সূচিতে Q ও AR এর উল্লিখিত মানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে গড় আয় রেখা পাওয়া যায়। চিত্রে AR হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা যত কম হয় AR রেখা ততই খাড়া হয়।

এর বিপরীতটি ঘটলে AR রেখা ততই ঢালু হয়।



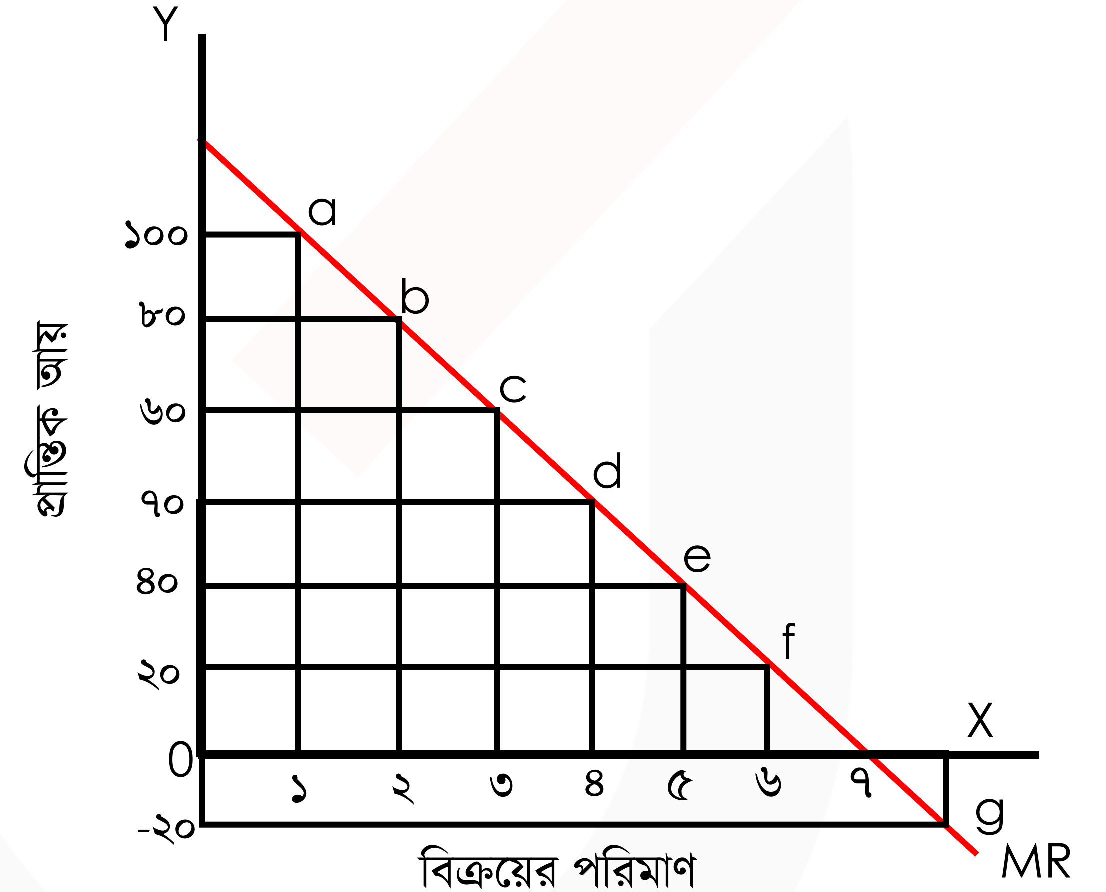
চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

৩. প্রান্তিক আয় (MR) রেখা:

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বিক্রেতা বেশি বিক্রয় করতে গেলে তাকে দাম কমাতে হয়।

এর অর্থ দাঁড়ায়- এ বাজারে বিক্রি বাড়াতে গেলে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে; এজন্য প্রান্তিক আয়ও ক্রমহ্রাসমান হয়। প্রদত্ত সূচির ওপর ভিত্তি করে চিত্রে প্রান্তিক আয় বা MR রেখা আঁকা হয়েছে।



চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা

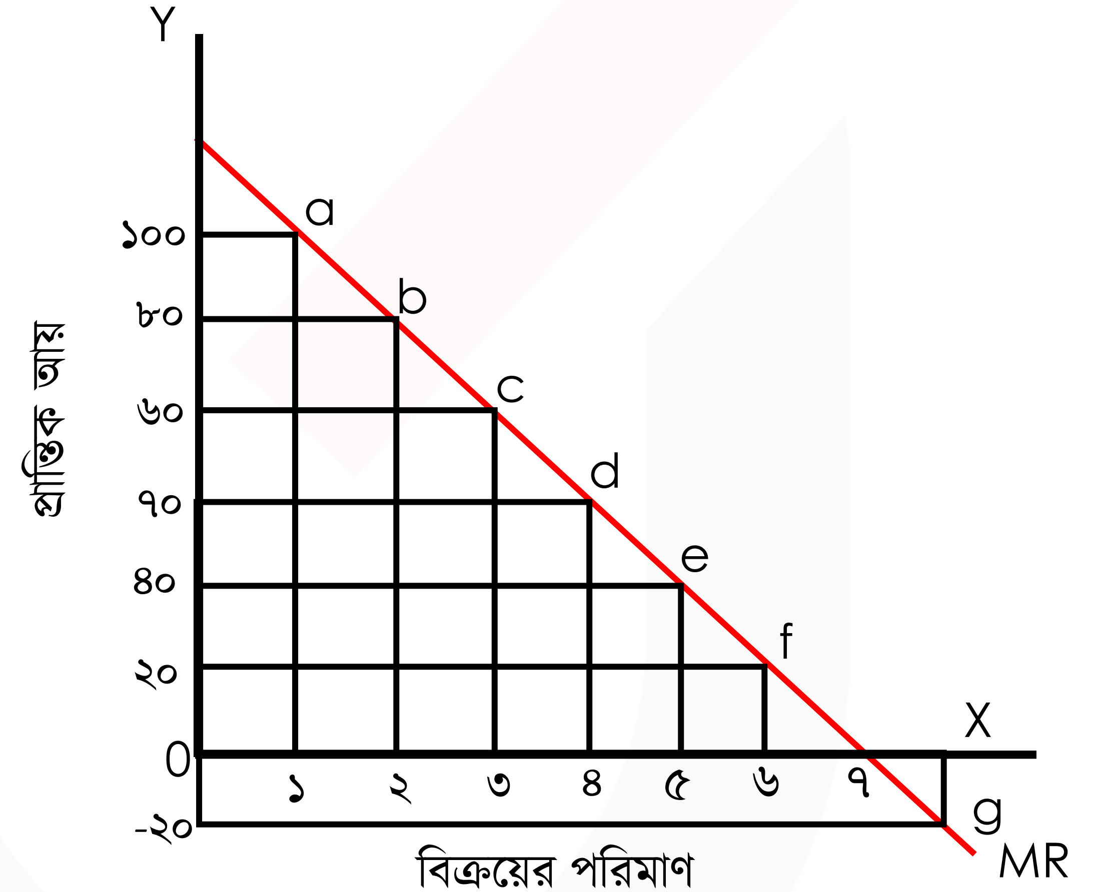
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচটিয়া বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা অঙ্কন ও তাদের আকৃতির ব্যখ্যা
Drawing TR, AR, and MR Curve of a Firm in Imperfect Market (Monopoly Market) and Explain the Shape of Them

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক আয় পরিমাপ করা হয়েছে।

সূচিতে Q ও MR এর উল্লিখিত মানগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের সাহায্যে চিত্রে রূপ দিলে প্রান্তিক আয় রেখা পাওয়া যায়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MR রেখা AR রেখার মত বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

তবে লক্ষ করলে দেখা যায়, AR রেখাটির তুলনায় MR রেখা অধিক খাড়া AR এর চেয়ে MR কমার হার বেশি বলে এমনটি হয়।



চিত্র: অপূর্ণ রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

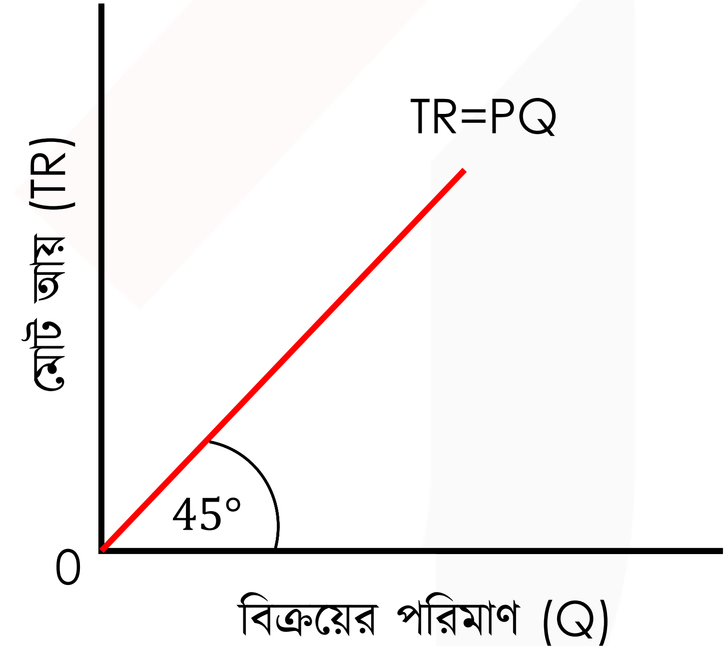
নিচে পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে মোট, গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

১। মোট আয় (TR):

এ বাজারে দাম স্থির থাকে। পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে মোট আয় (TR) সমানুপাতিক হারে বাড়ে।

ফলে মোট আয় রেখা মূল বিন্দু থেকে ওঠে ডানদিকে কৌণিক সরল রৈখিকভাবে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং ভূমির সাথে 45° কোণ তৈরি করে।



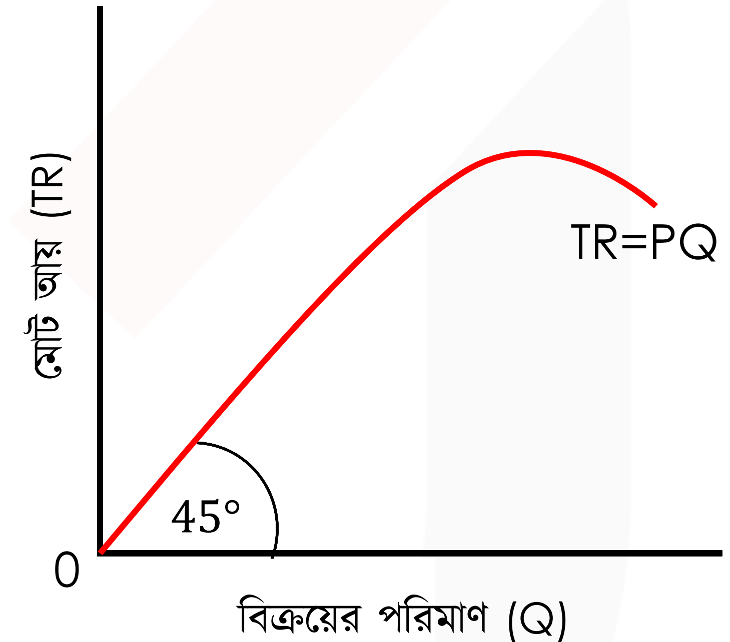
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজার

১। মোট আয় (TR):

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক তথা একচেটিয়া বাজারে দাম স্থির নয় বরং পরিবর্তনশীল।

তাই পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে প্রথমে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে, তারপর স্থির হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মোট আয় কমে।



পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

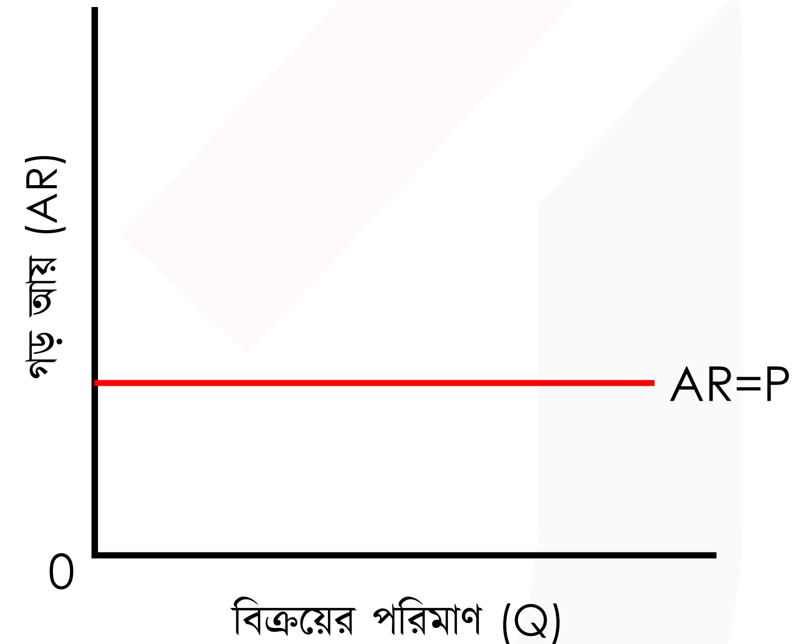
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

২। গড় আয়:

এ বাজারে দাম স্থির থাকায়; AR=MR = P হয়।

ফলে AR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়।



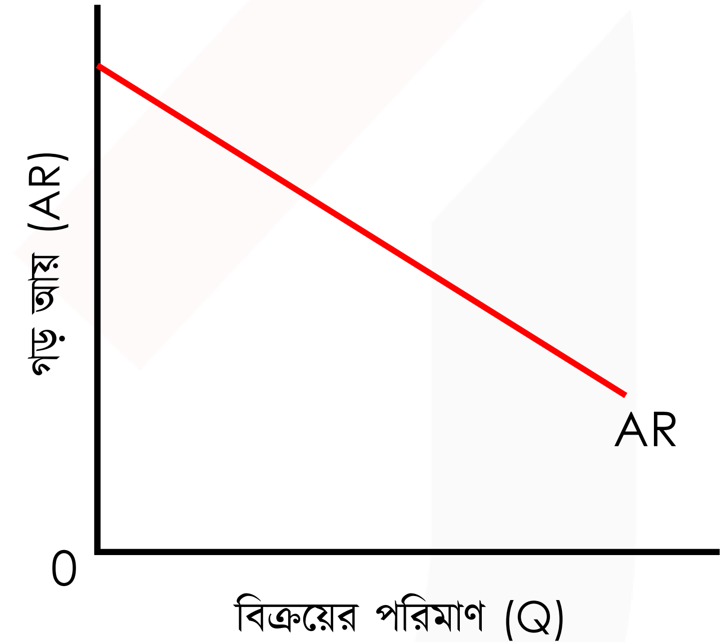
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজার

২। গড় আয়:

এ বাজারে দাম কমলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে।

ফলে AR হ্রাস পায়, যা চাহিদা রেখা হিসাবে AR = P নিম্নগামী হয়।



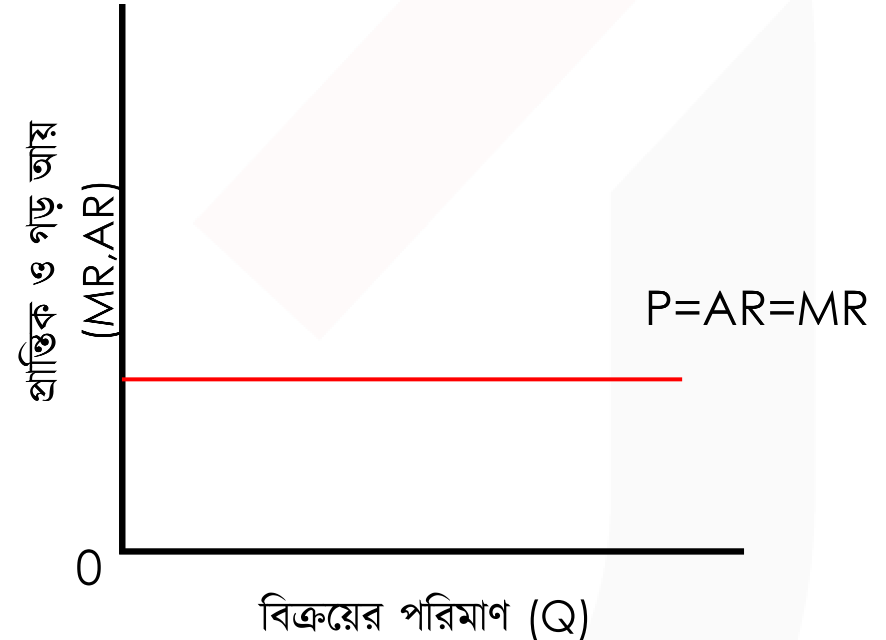
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

৩. প্রান্তিক আয় (MR):

এ বাজারে দাম স্থির থাকায় P =AR = MR হয়, ফলে AR ও MR রেখা একই সঙ্গে মিশে অবস্থান করে।

তাই এ বাজারকে দাম গ্রহীতার (**Price Taken**) বাজার বলে।



পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে পার্থক্য
Difference Among TR, AR, and MR Curve Under Perfect and Imperfect Competition

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজার

৩. প্রান্তিক আয় (MR) :

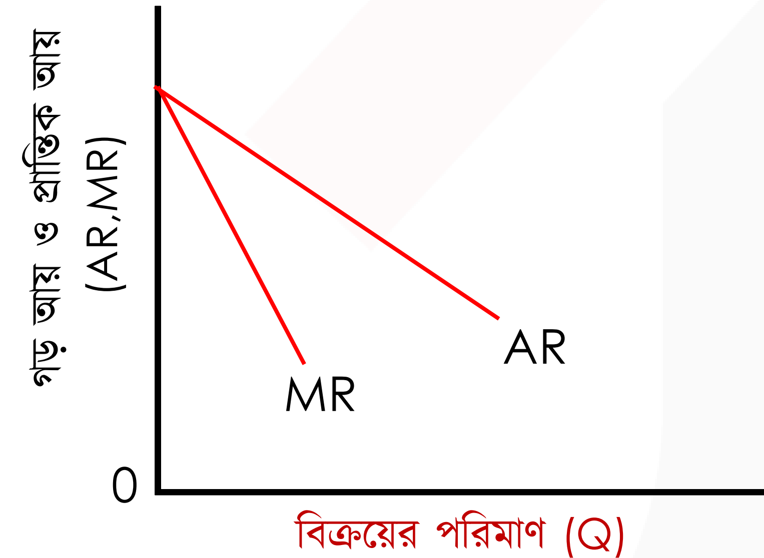
এ বাজারে বিক্রেতা দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ বাজারকে **Price Maker** বাজার বলে।

ফলে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে MR হ্রাস পায় এবং বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

MR রেখাটি; গড় আয় রেখা এবং লম্ব অক্ষের মাঝামাঝি দিয়ে নিম্নগামী হয়।

তাই MR এর ঢাল > AR এর ঢাল ।



বাজার





বাজার
Market

বাজারকে কেন্দ্র করেই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

বাজার ২ কাঠামোতে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা এবং দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে

বাজার ও বাজারের শ্রেণিবিভাগ,

বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ,

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার,

একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার,

অলিগোপলি, মনোপসনি,

ফার্ম ও শিল্পের ধারণা,

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা তথা দাম নির্ধারণ

এবং একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা তথা দাম নির্ধারণ আলোচনা করা হলো।



বাজার
Market

সাধারণত বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বোঝায় যেখানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়।

কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝায় না।

বাজার বলতে কোনো একটি পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতার অস্তিত্ব আছে এবং তাদের দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যটির লেনদেন বোঝায়। লেনদেন যেকোনো স্থানে হতে পারে অথবা যেকোনো যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে।

পণ্যের অস্তিত্ব এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জানুয়ারি মাসের কোনো এক শনিবার কাপাসিয়া বাজারে কৃষক আলফাজ ১ মণ ধান বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন।

বাজারে বহু ক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে মি. হাসান ১ মণ ধান ৮০০ টাকায় কিনে নেন।

শান্তা ইসলাম একজন চাকরিজীবী। তিনি জানুয়ারি মাসে কারওয়ান বাজারে তার সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ, মাছ, মাংস ও তরিতরকারি ইত্যাদির দাম যাচাই করে বিভিন্ন বিক্রেতার কাছ থেকে নগদ টাকায় এসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করলেন।

বাজার
Market

দুটি উদাহরণে লক্ষ করা যায়, নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট স্থানে, এক বা একাধিক দ্রব্য, দরকষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারণ ক্রেতা বিক্রেতা, চাহিদা ও যোগান পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করেছে।

বিভিন্ন ধরনের বাজার; যেমন- ধানের বাজার, পাটের বাজার, সবজির বাজার, কলম ও বই-খাতার বাজার, সোনার বাজার, শেয়ার বাজার, শ্রমবাজার ইত্যাদি।

ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার সিডনি চ্যাপম্যান (Sydney Chapman; 1888-1970) বলেন,

'বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়।"

ফরাসি অর্থনীতিবিদ অ্যান্টোনি আগস্টিন কুনট (Antoine Augustin Cournot; 1801-1877)-এর মতে,

"অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না, বরং যেকোনো অঞ্চলের সমগ্রকে বোঝান, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখায়।

বাজার
Market

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা শর্ত পাওয়া যায়। যথা—

১. একটি নির্দিষ্ট সময়।

২. ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য বা সেবা।

৩. দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা।

৪. দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক অঞ্চল।

৫. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব।

সুতরাং, **ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে অর্থনীতিতে বাজার বলে।**

বাজার ধারণা: বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি বা বাজারের আয়তন নির্ধারক
Concept of Market: Conditions of Extended Market

১. চাহিদার প্রকৃতি:

যে দ্রব্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী, তার বাজারও প্রসারিত হবে। যেমন- স্বর্ণের বাজার। আবার যে দ্রব্যের চাহিদা কম তার বাজার সংকীর্ণ। যেমন- চট্টগ্রামের শুঁটকি মাছের বাজার ।

২. যোগানের প্রকৃতি:

চাহিদা অধিক হলে যোগানের প্রাচুর্য অধিক হবে। অন্যথায় বাজার বিস্তৃতি লাভ করবে না। যেমন— যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর গম উৎপন্ন হয় বলেই বিশ্বের সব দেশেই তার যোগান দেয়া সম্ভব হয়।

৩. চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি:

চাহিদা ও যোগান যদি সীমিত হয় তাহলে বাজার সংকীর্ণ হবে। কিন্তু যদি চাহিদা ও যোগান দীর্ঘকালীন হয়, তাহলে বাজার প্রসারিত হবে।

বাজার ধারণা: বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি বা বাজারের আয়তন নির্ধারক
Concept of Market: Conditions of Extended Market

৪. দ্রব্যের স্থায়িত্ব:

যেসব দ্রব্য টেকসই ও স্থায়ী তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু যদি পণ্য অস্থায়ী ও ভঙ্গুর হয়, তাহলে বাজার সংকীর্ণ হতে বাধ্য। যেমন— দুধ, মাছ, শাক-সবজির বাজার সংকীর্ণ। কিন্তু লোহা, পাট, তুলা, স্বর্ণ, কাপড়ের বাজার বিস্তৃত।

৫. বহনযোগ্যতা:

যে দ্রব্য সহজে বহনযোগ্য সেসব পণ্যের বাজার বড় এবং যেসব দ্রব্যের বহনযোগ্যতা সহজ নয়, সেসব দ্রব্যের বাজার ছোট।

৬. সহজ পরিচিতি ও বিভাজ্যতা:

উৎকৃষ্ট গুণের দ্রব্য আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি অর্জন করলে তার বাজার প্রসারিত হয়। দ্রব্যের অংশ বিশেষ নমুনাস্বরূপ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রেরণ করে চাহিদা আকর্ষণীয় করা যায়

৭. শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ:

যে সব দ্রব্য গুণাগুণ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ করা যায় তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে, যেসব পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব রয়েছে, সেসব পণ্যের বাজার সংকীর্ণ হয়।

বাজার ধারণা: বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি বা বাজারের আয়তন নির্ধারক
Concept of Market: Conditions of Extended Market

৮. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:

দ্রব্য সহজে দেশ-বিদেশে প্রেরণ করার জন্য পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমগুলো উন্নত হলেও বাজার বিস্তৃত হয়।

৯. শান্তি ও নিরাপত্তা:

দেশের ভিতরে ও বাইরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান অবাধ হয়। এতে বাজারের বিস্তৃতি ঘটে। **যুদ্ধের সময় শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বাজার সংকীর্ণ হয়।**

১০. সরকারের বাণিজ্য নীতি:

সরকারের বাণিজ্য নীতি সহজ ও উদার হলে বাজার সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে বাজার সংকীর্ণ হয়।

বাজার ধারণা: বিস্তৃত বাজারের শর্তাবলি বা বাজারের আয়তন নির্ধারক
Concept of Market: Conditions of Extended Market

১১. আর্থিক নীতি:

সরকার সহজ আর্থিক নীতি গ্রহণ করলে ব্যবসার প্রসার হয়, ফলে বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু যদি আর্থিক নীতির কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পায়, তাহলে বাজার সংকুচিত হয়।

১২. শ্রমবিভাগ:

শ্রমবিভাগের ফলে অতিমাত্রায় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খরচ হ্রাস পায়। ফলে বাজার সম্প্রসারিত হয়।

১৩. প্রচারণা:

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা থাকলে বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না থাকলে বাজার সংকীর্ণ হয়।

এসব বিষয়গুলো বাজারের আয়তনকে প্রভাবিত করে থাকে।

যদি শর্তসমূহ বাজারের পক্ষে থাকে তাহলে বাজার সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু যদি বিপক্ষে থাকে তবে বাজার সংকুচিত হয়।

বাজারের শ্রেণিবিভাগ Classification of Market

বাজারের শ্রেণিবিভাগ Classification of Market

১) আয়তন বা পরিধি, ২) সময় এবং ৩) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে বিভক্ত করা যায়।

বাজারের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে করা হয়।

ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো—

বাজারের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Market

বাজার কাঠামো

১. আয়তন বা পরিধি অনুসারে
- i. স্থানীয় বাজার
- ii. জাতীয় বাজার
- iii. আন্তর্জাতিক বাজার

২. সময় অনুসারে
- i. অতি স্বল্পকালীন বাজার
- ii. স্বল্পকালীন বাজার
- iii. দীর্ঘকালীন বাজার
- iv. অতি দীর্ঘকালীন বাজার

৩. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার

বাজারের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Market

৩. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার

1. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Perfect Competitive Market)

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Imperfect Competitive Market)

বাজারের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Market

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার
(Imperfect Competitive Market)



১. একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competition Market)

৩. ডুয়োপলি বাজার (Duopoly Market)

৪. অলিগোপসলি বাজার (Oligopoly Market)

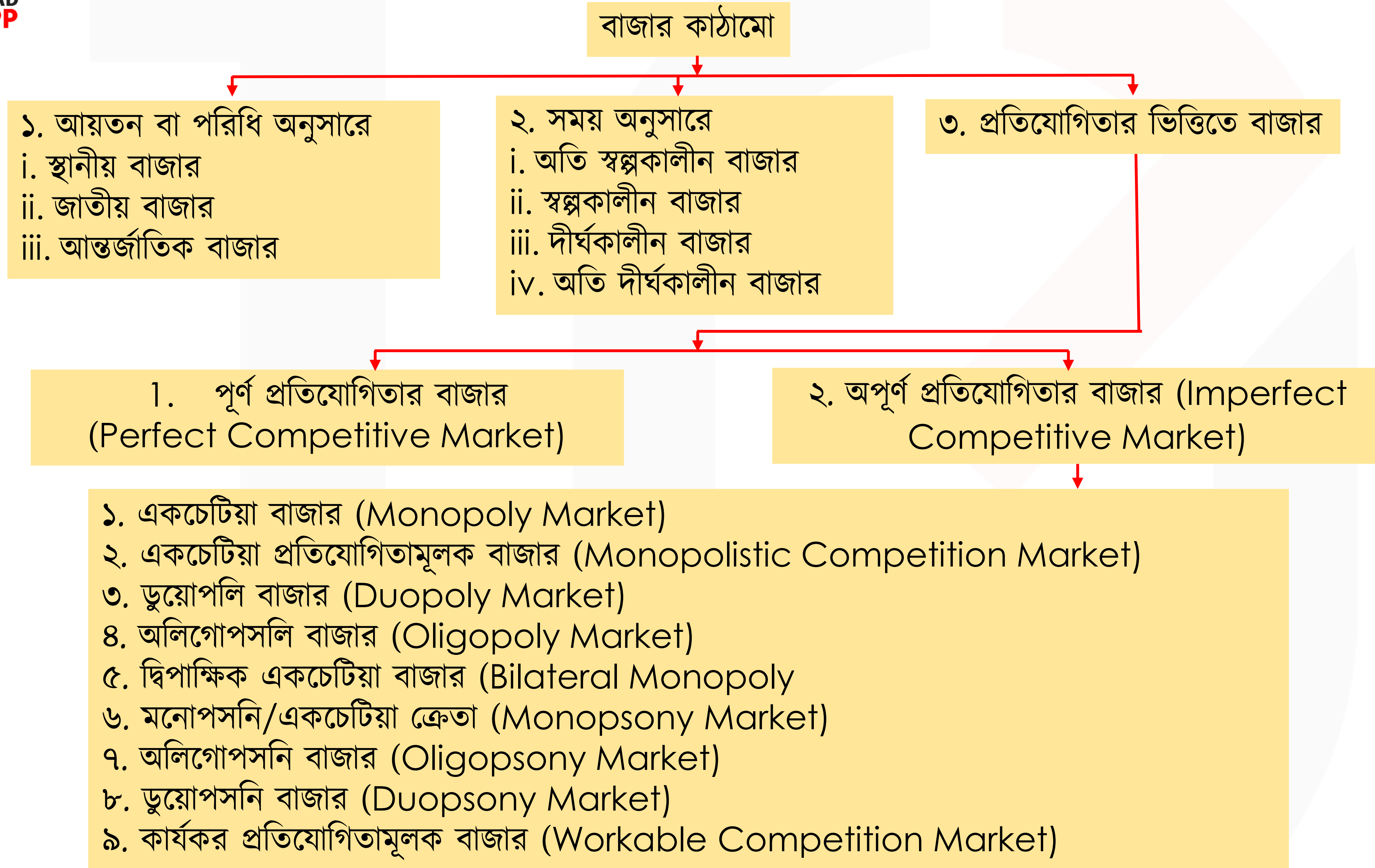
৫. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral Monopoly

৬. মনোপসনি/একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony Market)

৭. অলিগোপসনি বাজার (Oligopsony Market)

৮. ডুয়োপসনি বাজার (Duopsony Market)

৯. কার্যকর প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Workable Competition Market)



বাজার কাঠামো
১. আয়তন বা পরিধি অনুসারে
i. স্থানীয় বাজার
ii. জাতীয় বাজার
iii. আন্তর্জাতিক বাজার
২. সময় অনুসারে
i. অতি স্বল্পকালীন বাজার
ii. স্বল্পকালীন বাজার
iii. দীর্ঘকালীন বাজার
iv. অতি দীর্ঘকালীন বাজার
৩. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার
1. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Perfect Competitive Market)
২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (Imperfect Competitive Market)
১. একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)
২. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competition Market)
৩. ডুয়োপলি বাজার (Duopoly Market)
৪. অলিগোপসলি বাজার (Oligopoly Market)
৫. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral Monopoly
৬. মনোপসনি/একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony Market)
৭. অলিগোপসনি বাজার (Oligopsony Market)
৮. ডুয়োপসনি বাজার (Duopsony Market)
৯. কার্যকর প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Workable Competition Market)

আয়তন বা পরিধি অনুসারে According to Area

আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজারকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্থানীয় বাজার,

২. জাতীয় বাজার ও

৩. আন্তর্জাতিক বাজার।

আয়তন বা পরিধি অনুসারে According to Area

১. স্থানীয় বাজার (Local Market):

যে পণ্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন- দেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাছের বাজার, চালের বাজার, শাক সবজির বাজার প্রভৃতি।

২. জাতীয় বাজার (National Market):

কোনো পণ্যের বাজার যদি একটি দেশের সকল বিভাগ তথা সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন— দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী প্রভৃতির বাজার জাতীয় বাজার। অর্থাৎ বাবুর হাটের বা টাঙ্গাইলের কাপড়ের বাজার, তারাবো বিসিকের, জামদানি পল্লি, মিরপুর বেনারসি পল্লি।

৩. আন্তর্জাতিক বাজার (International Market):

কোনো দ্রব্যের বাজার যদি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কয়েকটি দেশজুড়ে তথা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত থাকে, তবে তার বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন— বাংলাদেশের পাটের বাজার, চায়ের বাজার, তৈরি পোশাকের বাজার, বাহরাইনে মুক্তার বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। তাই এসব দ্রব্যের বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

সময় অনুসারে
According to Time Period

সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. অতি স্বল্পকালীন বাজার,

২. স্বল্পকালীন বাজার,

৩. দীর্ঘকালীন বাজার ও

৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

সময় অনুসারে According to Time Period

১. অতি স্বল্পকালীন বাজার (Very Short Period Market):

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে।

এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন- মাছ, দুধ, শাকসবজি ইত্যাদির বাজার।

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, যে বাজারের স্থায়িত্ব কয়েক ঘণ্টা, একদিন, দুদিন বা কয়েক দিন হয় তাই অতি স্বল্পকালীন বাজার। এ ধরনের বাজার যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অর্থাৎ এ বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এবং চাহিদার পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটে।

সময় অনুসারে
According to Time Period

২. স্বল্পকালীন বাজার (Short Period Market):

যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে।

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালের মতে, 'যে বাজার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস স্থায়ী হয় তাই হলো স্বল্পকালীন বাজার'।

যেমন— শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতির বাজার স্বল্পকালীন বাজার।

এ ধরনের বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে পুরাতন উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা যোগান কিছুটা বাড়ানো যায় এবং চাহিদা কমে গেলে পুরাতন উপাদানের ব্যবহার কমিয়ে যোগান কিছুটা কমানো যায়।

তবে স্বল্পকালীন বাজারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা সংখ্যা পরিবর্তন করা যায় না।

ফলে এই ধরনের বাজারে চাহিদার সাথে যোগানের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় না।

এক্ষেত্রে যোগান দামের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও দামের উপর চাহিদার প্রভাব যোগানোর প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি।

সময় অনুসারে According to Time Period

৩. দীর্ঘকালীন বাজার (Long Period Market):

যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাড়া দিয়ে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

এক্ষেত্রে সব উপকরণই পরিবর্তনযোগ্য।

এ বাজারে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। যেমন— আসবাবপত্রের বাজার।

এরূপ বাজারে চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংখ্যা ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

ফলে দীর্ঘকালে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যোগান বাড়ানো যায় এবং চাহিদা হ্রাস ঘটলে যোগান হ্রাস করা যায় ।

সময় অনুসারে According to Time Period

৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার (Very Long Period Market):

যে বাজারের স্থিতিকাল অতি দীর্ঘ এবং যেখানে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে।

এ বাজারে ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস, জ্ঞান ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে।

ফলে চাহিদারও ব্যাপক পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। যেমন— সোনার বাজার ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

প্রতিযোগিতা অনুসারে According to Competition

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা—

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

প্রতিযোগিতা অনুসারে According to Competition

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা—

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার Perfect Competitive Market

যে দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একই সমজাতীয় দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মকে দামগ্রহীতা (Price Taker) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন (Joan Robinson) এর মতে, "যে বাজারে প্রতিটি উৎপাদনকারী উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।"

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়—

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

১. বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা:

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে **বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা** থাকে।

এর ফলে কোনো ক্রেতা দ্রব্যের চাহিদাকে কিংবা কোনো বিক্রেতা দ্রব্যের যোগানকে এককভাবে প্রভাবিত করে দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে না।

এ বাজারকে **দামগ্রহীতার বাজার হিসেবে (Price Taker)** গণ্য হয়।

২.সমজাতীয় দ্রব্য:

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—এখানে **একটি সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।**

সমজাতীয় দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝানো হয় যার বিভিন্ন একক, গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই এবং অভিন্ন এককগুলো পরস্পরের পূর্ণ পরিবর্তক হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

৩. বাজার সম্বন্ধে ক্রেতা বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান:

এ বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই দ্রব্যের গুণাগুণ ও দাম সম্পর্কিত সব তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকে।

এজন্য কোনো ক্রেতার পক্ষে নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দাম দেয়া কিংবা কোনো বিক্রেতার পক্ষে বেশি দাম চাওয়া সম্ভব হয় না।

ফলে বাজারে একই দাম বিরাজ করে বা দাম স্থির থাকে।

৪. দীর্ঘকালে বাজারে প্রবেশ ও সেখান থেকে প্রস্থানের অবাধ অধিকার:

এ বাজারে দীর্ঘকালীন কোনো বিক্রেতা লোকসানের সম্মুখীন হলে সে বাজার ছেড়ে যেতে পারে।

আবার বিদ্যমান বিক্রেতারা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে থাকলে বাইরের কোনো বিক্রেতা সেখানে অবাধে আসতে বা প্রবেশ করতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

৫. উপকরণগুলোর পূর্ণ গতিশীলতা:

এ বাজারে উৎপাদনের উপকরণগুলো বিভিন্ন ব্যবহার ও স্থানের মধ্যে পূর্ণ গতিশীলতা থাকে।

ফলে **সর্বত্র উপকরণগুলোর একই বা স্থির দাম বিদ্যমান**।

৬. পরিবহন ব্যয় বিবেচনা বহির্ভূত:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে পণ্য লেনদেন করা হয়, তার জন্য কোনো পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করা হয় না।

যদি পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করা হতো, তবে সমজাতীয় দ্রব্য হলেও।

স্থানভেদে পণ্যের দাম বিভিন্ন হতে পারত।

কাজেই দামের বিভিন্নতার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিবহন ব্যয় বিবেচনার বাইরে রাখা হয়।

৭. বাহ্যিক বিধিনিষেধ অনুপস্থিত:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো বাহ্যিক বিধিনিষেধ যেমন- কর, ভর্তুকি বা রেশনিং ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে।

বিক্রেতাদের মধ্যে কোনো জোটবদ্ধতা থাকে না।

ফার্ম মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে উৎপাদন ও উপকরণ নিয়োগ সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক্রেতা স্বেচ্ছাধীনে ক্রয় পরিচালনা করে, অপর কারো দ্বারা সে প্ররোচিত হয় না।

৯. উৎপাদন ও বিক্রয়:

প্রতিটি ফার্ম দ্রব্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Perfect Competitive Market

১০. মুনাফা লাভ:

মুনাফা লাভের জন্য ফার্ম ব্যয় সর্বনিম্ন করে।

১১. ভারসাম্যের শর্ত:

ফার্মের ক্ষেত্রে, প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC)।

কিন্তু শিল্প বা বাজারের ক্ষেত্রে চাহিদা (D) = যোগান (S)।

এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাস্তবে বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পৃথিবীর কোথাও নেই।

তবে গ্রামীণ কৃষিপণ্যের বাজার হলো এ বাজারের উদাহরণ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা
A Firm under Perfect Competition Market is a Price Taker

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য ফার্ম বা বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকে।

প্রত্যেক ফার্ম সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে।

একটি ফার্ম আলাদাভাবে বাজারের মোট যোগানের একটি নগণ্য অংশ উৎপাদন ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র।

তাই এককভাবে কোনো ফার্ম বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না।

বরং চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে যে দাম বাজারে নির্ধারিত হয় প্রত্যেক বিক্রেতা সে দাম গ্রহণ করে।

এজন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' (Price Taker) বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় যে, বাজারে পূর্ব থেকে নির্ধারিত দাম বিক্রেতা মেনে নেয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা
A Firm under Perfect Competition Market is a Price Taker

আবার বাজারে কোনো নতুন ফার্ম প্রবেশ করলে তাকে **পূর্ব নির্ধারিত দাম মেনে নিতে হয়**।

কারণ সমগ্র বাজারের তুলনায় ফার্মটি এতই ক্ষুদ্র যে তার উৎপাদন সিদ্ধান্ত দ্বারা **বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না**।

তাই **পূর্বের প্রতিষ্ঠিত দাম গ্রহণ করেই সে ব্যবসায়ে প্রবেশ করে**।

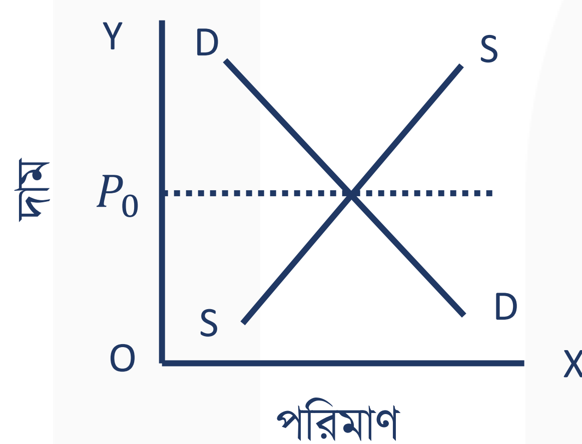
যদি একটি ফার্ম পূর্ব নির্ধারিত দাম গ্রহণ করে তবে তার চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হবে।

অর্থাৎ **দাম স্থির থাকলে AR = MR হয়**।

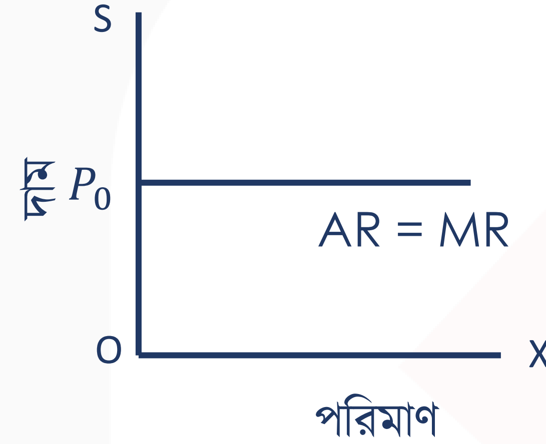
AR = MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

যেমন--

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা
A Firm under Perfect Competition Market is a Price Taker



ক) বাজারের ভারসাম্য

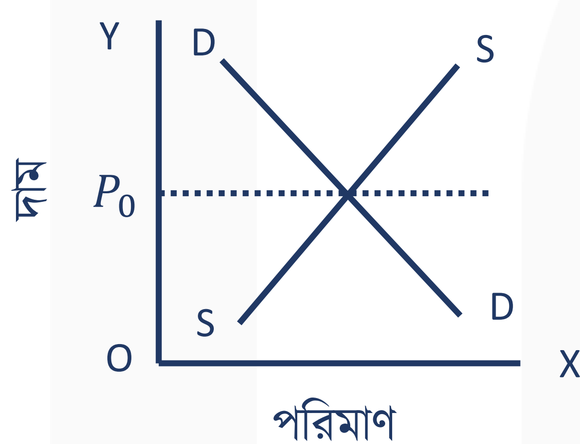


খ) ফার্মের চাহিদা রেখা

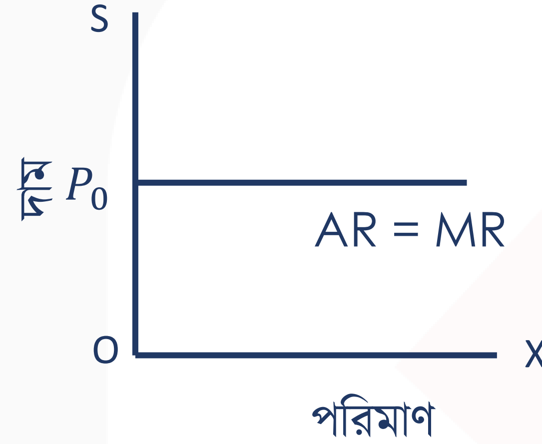
চিত্র: ফার্মের আনুভূমিক চাহিদা রেখা

চিত্রের ক. অংশে SS এবং DD রেখার ছেদক বিন্দুতে বাজার দাম Po নির্ধারিত হয়েছে। একটি ফার্ম Po দাম মেনে নেয় বা গ্রহণ করে। এ দামে একটি ফার্ম যত খুশি বিক্রি করতে পারে। Po এর বেশি দামে কোনো পণ্য বিক্রি হবে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বা বিক্রেতা দাম গ্রহীতা
A Firm under Perfect Competition Market is a Price Taker



ক) বাজারের ভারসাম্য



খ) ফার্মের চাহিদা রেখা

চিত্র: ফার্মের আনুভূমিক চাহিদা রেখা

আবার, ফার্ম P_0 এর চেয়ে দাম কমাবে না। কারণ P_0 দামে যত খুশি বিক্রি করতে পারলে দাম কমানোর কোনো যুক্তি নেই। তাই প্রতিযোগী ফার্মকে 'দাম গ্রহীতা' বলা হয়। P_0 দামের ওপর ভিত্তি করে খ. চিত্রে ফার্মের চাহিদা রেখা AR = MR অংকন করা হয়েছে— যা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এ রেখার স্থিতিস্থাপকতা অসীম (   ) কিন্তু ঢাল শূন্য (০)।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে
Application of Perfect Competitive Market: Incase of Perishable and Durable Goods

অধ্যাপক **আলফ্রেড মার্শাল** দ্রব্যের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের সাথে সময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

সময়ের উপর ভিত্তি করে তিনি বাজারকে **অতি স্বল্পকাল, স্বল্পকাল, দীর্ঘকাল এবং অতি দীর্ঘকাল এ চারভাগে ভাগ করেছেন**।

অতি স্বল্পকালকে বাজার সময়কাল বলে। বাজারে **একটি নির্দিষ্ট পণ্যের দামকে বাজার দাম** বলে।

এ সময়ে স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

বাজার কালে দ্রব্যের যোগান মজুদ দ্বারা সীমিত হয়। কিন্তু বাজারে যোগান মোট মজুদের সমান হয় না।

বাজার সময়কালে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে দ্রব্যের প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে।

বাজারে পচনশীল দ্রব্য এবং রক্ষণশীল বা স্থায়ী দ্রব্য দেখা যায়।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে
Application of Perfect Competitive Market: Incase of Perishable and Durable Goods

১. পচনশীল দ্রব্য (Perishable Goods):

যেসব দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায় না, বিশেষত কৃষিজাত দ্রব্য হলো পচনশীল দ্রব্য।

পচনশীল দ্রব্যের সম্পূর্ণ মজুদ বাজারে বিক্রির জন্য যোগান দেওয়া হয়।

তাই এসব দ্রব্যের বাজারে যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বা লম্ব (Y) অক্ষের সমান্তরাল হয়।

এ বাজারে চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারেই দামের পার্থক্য ঘটে তথা চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে এবং চাহিদা কমলে দাম কমে।

যেমন, দুধ ও শাকসবজির বাজার যেখানে অনেকক্ষণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে
Application of Perfect Competitive Market: Incase of Perishable and Durable Goods

২. স্থায়ী বা রক্ষণশীল দ্রব্য (Durable Goods):

বাজারে অধিকাংশ দ্রব্যই স্থায়ী এবং এদেরকে মজুদ করে রাখা যায়।

এগুলোর চাহিদা বাড়লে মজুদ থেকে এদের যোগান বাড়ানো যায়। এসব দ্রব্যের দুটি দামস্তর থাকে।

একটি হলো সর্বোচ্চ সীমা এবং অন্যটি সর্বনিম্ন সীমা সর্বোচ্চ দাম হলো, যে দামে বিক্রেতা তার সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করতে রাজি থাকে।

সর্বনিম্ন দাম হলো, যে দামের নিচে কোনো বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করে না, এ দামকে **সংরক্ষণ দাম (Reserve Price)** বলা হয়।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে
Application of Perfect Competitive Market: Incase of Perishable and Durable Goods

সংরক্ষণ দাম নির্ভর করে--

১. বিক্রেতার ভবিষ্যৎ দাম প্রত্যাশার ওপর;

২. বিক্রেতার তরল অর্থের প্রয়োজনীয়তার ওপর;

৩. দ্রব্যের গুদামজাত খরচের ওপর;

৪. দ্রব্যের স্থায়িত্বের মাত্রার ওপর;

৫. দ্রব্যের পুনঃউৎপাদন খরচের ওপর;

৬. দ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদা সংক্রান্ত প্রত্যাশার ওপর;

৭. বিক্রেতার ঝুঁকিপ্রিয়তার ওপর।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োগ: পচনশীল ও স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে
Application of Perfect Competitive Market: Incase of Perishable and Durable Goods

এ দুই দামের মধ্যে দাম পরিবর্তনের সঙ্গে যোগান পরিবর্তিত হয়।

রক্ষণশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতা কম দামে অল্প দ্রব্য যোগান দেয় এবং উচ্চ দামে বেশি দ্রব্য যোগান দেয়।

মজুদ দামে যোগানের পরিমাণ শূন্য হয় এবং দাম বৃদ্ধির সঙ্গে যোগান বৃদ্ধি পায়।

এ বৃদ্ধি সকল উচ্চ দাম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তাই স্থায়ী দ্রব্যের যোগান রেখা একটা নির্দিষ্ট দামস্তর পর্যন্ত ডানে ঊর্ধ্বগামী এবং এ দামের পর খাড়া সরল রেখা বা লম্ব (Y) অক্ষের সমান্তরাল হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Imperfect Competitive Market

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিপরীত হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

এখানে বাজার প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ নয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে সব শর্ত বা বৈশিষ্ট্য থাকে, তার যেকোনো একটির অভাব ঘটলে যে বাজার পরিলক্ষিত হয়, তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

সুতরাং, যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কখনও কম, কখনও বেশি থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি অসমজাতীয় দ্রব্য আংশিক বা অসম প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Imperfect Competitive Market

বৈশিষ্ট্য:

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়-

১. ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা কম।

২. দ্রব্যের গুণাগুণ বিভিন্ন হবে।

৩. দাম সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৪. দাম বিভিন্ন হবে।

৫. ক্রেতাদের যুক্তিসঙ্গত আচরণের অভাব।

৬. বিজ্ঞাপন খরচ বিবেচ্য।

৭. চাহিদা রেখা নিম্নগামী

বাস্তবে এ ধরনের বাজারই বেশি লক্ষ করা যায়।

বিজ্ঞাপন ব্যয়/বিক্রয় ব্যয় কী?

প্রত্যেক ফার্ম তার নিজ নিজ দ্রব্যের অধিক বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজ, রেডিও, টিভিসহ নানা রকম প্রচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এটাই বিজ্ঞাপন ব্যয়। বিজ্ঞাপন ব্যয়কে বিক্রয় ব্যয় হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

যে বাজারে **একজন বিক্রেতা বা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান** কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের **মোট যোগান প্রদান করে** তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

ইংরেজি 'Monopoly' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ একচেটিয়া বাজার।

'Mono' শব্দের অর্থ এক এবং 'Poly' শব্দের অর্থ বিক্রেতা।

তাই **এক বিক্রেতা বিশিষ্ট বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়**।

অর্থনীতিবিদ **কূটসোয়ানিস (A. Koutsoyiannis)** এর মতে,

“একচেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার কাঠামো যেখানে একজন বিক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক থাকে না এবং বাজারে প্রবেশে বাধা বিদ্যমান"।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

অর্থনীতিবিদ জি. জে. স্টিগলার (G. J. Stigler)-এর মতে, "একচেটিয়া কারবার এমন একটি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদক। প্রতিষ্ঠান যার কোনো নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই।"

আর. জি. লিপসির মতে, The monopolist is the industry. অর্থাৎ একচেটিয়া হলো একটি শিল্প ।

অধ্যাপক ই. এইচ. চেম্বারলিন (Prof. E.H. Chamberlin)-এর মতে,

"যে বাজারে ফার্ম বা শিল্পের কোনো বিশেষ পণ্য বা সেবার ওপর বিক্রেতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।"

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ:

১. পণ্যের স্বল্প চাহিদা:

কোনো কোনো পণ্যের বাজারে চাহিদা নিতান্তই কম থাকে। তখন একটি ফার্ম হয়তো সেই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

এ অবস্থায় অন্য কোন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করে লাভবান হবে না বলে মনে করে।

তখন সেই পণ্যের বাজারে একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

২. উপকরণের গতিশীলতার অভাব:

উপকরণ যদি সহজে স্থানান্তরযোগ্য না হয়, তবে উৎপাদকদের মধ্যে উপকরণ নিয়ে কোন প্রতিযোগিতা নাও থাকতে পারে।

আবার উপকরণ কখনও কখনও আইনগত বিধি নিষেধের কারণে এক শিল্প থেকে অপর শিল্পে যেতে পারে না।

তখন উৎপাদনক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

একইভাবে **প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল একজনের দখলে থাকলেও একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হতে পারে।**

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ:

৩. প্রতিদ্বন্দ্বি ফার্মের মুনাফা সম্পর্কিত অজ্ঞতা:

একটি বৃহৎ ফার্ম যখন উৎপাদন পরিচালনা করে তখন তার মুনাফা সম্পর্কে অন্যান্য ফার্ম জানতে পারে না।

ফলে বৃহৎ ফার্ম কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তার মুনাফা বাড়াচ্ছে, এ সম্পর্কে স্বল্পকালে অন্য ফার্ম সহজে জানতে পারে না। এ অবস্থায় একচেটিয়া কারবার থাকতে পারে।

৪. ব্যয় সংক্রান্ত সুবিধা:

কোন ফার্ম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সুবিধা অর্জন করতে পারে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীনে উৎপাদন পরিচালিত হলে একটি ফার্ম যত খুশি উৎপাদন করতে পারে। তখন অপর কোন ফার্ম শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না।

ফলে বিবেচ্য ফার্ম একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ:

৫. স্বাভাবিক একচেটিয়া:

বাজারের পরিস্থিতি এমনই হতে পারে যে, সেখানে কেবল একটি ফার্ম / প্ল্যান্ট থাকা যুক্তিযুক্ত। যেমন, টেলিফোন ক্যাবল সংযোগ প্রদানে ভিন্ন ভিন্ন ফার্ম/প্ল্যান্ট থাকলে অযথা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে । এমতাবস্থায় একাধিক ফার্ম কাম্য হয় না। যদি বাজারের পরিস্থিতি কেবল একটি ফার্মকে অনুমোদন করে তবে সেক্ষেত্রে যে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়, তাকে স্বাভাবিক একচেটিয়া (Natural Monopoly) বলে।

৬. সরকারি উদ্যোগ:

সাধারণত সরকার সেই কারবারকে অধিগ্রহণ করে, যেখানে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য/ সেবার ক্ষেত্রে ভোক্তারা একচেটিয়া কারবার দ্বারা শোষিত হওয়ার আশংকা থাকে। আবার কখনও সরকার নিজেই পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এভাবেও একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ:

৭. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি :

পূর্বাবস্থিত ফার্ম (Existing firm) সীমাবদ্ধ দামনীতি (Limit Pricing Policy) অবলম্বন করতে পারে।

নতুন ফার্মের প্রবেশের ক্ষেত্রে এ নীতি বাধা জন্মায়।

এ ছাড়া বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার বা উৎপন্ন দ্রব্য পৃথকীকরণ- নতুন ফার্মের অনুপ্রবেশে, ক্ষেত্রে বাধা জন্মায়।

নতুন ফার্ম তখন উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবেশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একচেটিয়া কারবারী নিজের উৎপাদন চালিয়ে যায়।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

যে বাজারে **একজন বিক্রেতা বা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান** কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের **মোট যোগান প্রদান করে** তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

ইংরেজি 'Monopoly' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ একচেটিয়া বাজার।

'Mono' শব্দের অর্থ এক এবং 'Poly' শব্দের অর্থ বিক্রেতা।

তাই **এক বিক্রেতা বিশিষ্ট বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়**।

অর্থনীতিবিদ **কুটসোয়ানিস (A. Koutsoyiannis)** এর মতে,

"একচেটিয়া বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার কাঠামো যেখানে একজন বিক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক থাকে না এবং বাজারে প্রবেশে বাধা বিদ্যমান"।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া কারবার উদ্ভবের মূল কারণ:

১. পণ্যের স্বল্প চাহিদা

২. উপকরণের গতিশীলতার অভাব

৩. প্রতিদ্বন্দ্বি ফার্মের মুনাফা সম্পর্কিত অজ্ঞতা

৪. ব্যয় সংক্রান্ত সুবিধা

৫. স্বাভাবিক একচেটিয়া

৬. সরকারি উদ্যোগ

৭. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. একক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা:

একচেটিয়া বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কেবল একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে।

এ কারণে দ্রব্যের যোগান অথবা দামের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে ।

২. নিকট বিকল্প দ্রব্যের অনুপস্থিতি:

একচেটিয়া বাজারে যে দ্রব্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় হয় তার ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক দ্রব্য বা সেবা থাকে না ।

ফলে একচেটিয়া কারবারি দ্রব্য বা সেবার দাম অথবা যোগানের ওপর একক প্রাধান্য বিস্তার করে।

৩. দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ:

একচেটিয়া কারবারি ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্য সেবার দাম অথবা তার যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

তাই এ বাজার দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বাজার। তবে সে একই সঙ্গে উভয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য:

৪. বাজারে প্রবেশের পথে বাধা:

এ বাজারে যেহেতু কেবল একজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে সেহেতু এখানে নতুন কোনো প্রতিযোগীর প্রবেশ কিংবা বাজার ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

৫. বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই:

বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীকে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করতে হয় না।

তবে জনস্বার্থে তথ্যমূলক বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৬. মুনাফা:

এ কারবারে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ইচ্ছামতো দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে ।

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য:

৭. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য:

একচেটিয়া বাজারের দ্রব্যে নিকট বিকল্পহীন, ফলে এর আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য।

৮. নিম্নগামী গড় আয় বা চাহিদা রেখা:

একচেটিয়া বাজারে কম দামে বেশি বিক্রয় অথবা বেশি দামে কম পণ্য সেবা বিক্রয় করা যায়। এ বাজারে তাই দ্রব্যের গড় আয় (AR) বা চাহিদা (D) রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় এবং প্রান্তিক আয় (MR), গড় আয় থেকে কম হয়। অর্থাৎ AR = D হয় এবং MR < AR হয় ।

৯। ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকে নাঃ

১০। বিজ্ঞাপনের অনাবসশকতাঃ

একচেটিয়া বাজার
Monopoly Market

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. একক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা

২. নিকট বিকল্প দ্রব্যের অনুপস্থিতি

৩. দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ

৪. বাজারে প্রবেশের পথে বাধা

৭. বিজ্ঞাপন ব্যয় নেই

৮. মুনাফা

চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সূত্রঃ

$$E_c = \frac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{Y দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}} \times \frac{\text{Y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম}}{\text{X দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা}}$$

$$E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$

একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী
A Monopoly Firm is a Price Maker

বাজারে একটি ফার্ম থাকলে, উৎপাদিত পণ্যের নিকট বিকল্প না থাকলে এবং সর্বোপরি প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশ অধিকার না থাকলে পণ্যের যোগানের ওপর ঐ ফার্মের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

এক্ষেত্রে একটি ফার্ম পণ্যের দামের ওপর একক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রয়োজনে দাম বাড়াতে পারে আবার ইচ্ছা করলে দাম কমাতে পারে।

এ বাজারে দাম নির্ধারণে ক্রেতার কোনো ভূমিকা নেই।

বিক্রেতা নিজেই তার পণ্যের দাম ঠিক করে। এজন্য একচেটিয়া ফার্মকে দাম সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয় ।

উল্লেখ্য, একচেটিয়া কারবারি দাম বাড়িয়ে ক্রেতাকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে না।

তবে দাম কমিয়ে ক্রেতাকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে উৎসাহিত করতে পারে। এক কথায় ক্রেতা এক্ষেত্রে মার্শালীয় চাহিদা বিধি দ্বারা পরিচালিত। এজন্য একচেটিয়া ফার্ম বাজারে যে চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয় তা বাম থেকে ডানে নিম্নগামী।

একচেটিয়া ফার্ম দাম সৃষ্টিকারী
A Monopoly Firm is a Price Maker

গড় আয় রেখাকে কেন ফার্মের চাহিদা রেখা বলা হয়?
Why AR Curve is called Firm's Demand Curve?

আমরা জানি, **ফার্মের চাহিদা রেখা বিভিন্ন দামে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে।**

একচেটিয়া বাজারে দাম এবং চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক বিপরীত হয় বলে ভোক্তার চাহিদা রেখা এবং ফার্মের চাহিদা রেখা সমার্থক হয়ে পড়ে।

আবার AR রেখাও বিভিন্ন দামে বিক্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে।

অর্থাৎ প্রতি একক পণ্য কি দামে বিক্রি হয় তা AR রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কাজেই গড় আয় রেখা এবং ফার্মের চাহিদা রেখা ও ক্রেতার চাহিদা রেখা একচেটিয়া বাজারে সমার্থক হয়ে পড়ে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এডওয়ার্ড হেস্টিংস চেম্বারলিন (Prof. E. H. Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিত সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করেন।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার এ দুটি বিশ্লেষণ বাজার কাঠামোর দুটি মেরুতে অবস্থিত।

এদের মাঝামাঝি বিশ্লেষণ হলো একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অধ্যাপক চেম্বারলিন পূর্ণ প্রতিযোগিতা।

একচেটিয়া কারবারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ধারণার মধ্যে সেই সমন্বয় প্রয়াস নিহিত।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের সংমিশ্রণ ঘটে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

সুতরাং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বলতে এমন একটি বাজার কাঠামো বোঝায়, যার বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকে—

- যথেষ্ট ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যা,
- তারা সদৃশ্য কিন্তু সামান্য বিভেদীকৃত দ্রব্য উৎপাদন করে,
- তাদের বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা থাকে এবং
- বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার জ্ঞান থাকে অপূর্ণাঙ্গ।

(Monopolistic competition is a market structure characterized by a large number of relatively small firms, similar but slightly different products, freedom of entry and exit and imperfect knowledge.)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রবক্তা আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ই. এইচ. চেম্বারলিন (The Theory of Monopolistic Competition, 1933. E. H. Chamberlin)।

পরবর্তীতে তার সাথে যুক্ত হন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন (The Economics of Imperfect Competition, Joan Robinson)।

চেম্বারলিন দ্রব্য পৃথকীকরণ ও বিজ্ঞাপনের ওপর এবং রবিনসন দাম বৈষম্যকরণ ও শোষণ এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে এমন বাজার কাঠামোকে বোঝায়,

যেখানে বহুসংখ্যক বিক্রেতা বাজারে অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা নিয়ে কর্মরত থাকে এবং প্রত্যেক বিক্রেতা দ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে (রঙ, গন্ধ, ট্রেডমার্ক, ব্রান্ড ও লেবেল, মোড়ক, পরিবেশনার উপায়) কিছুসংখ্যক ক্রেতার ওপর কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

চেম্বারলিন পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

সুতরাং, যে বাজারে একচেটিয়া বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বহুলাংশে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, সে বাজারকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

ই. এইচ. চেম্বারলিন এর মতে,

"যে বাজারে, বহুসংখ্যক বিক্রেতা একই জাতীয় কিন্তু পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রি করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।"

এ বাজারে ফার্মের সংখ্যা দশ-এর চেয়ে অধিক হয়।

এরূপ বাজারে বিক্রেতা বিভিন্ন ট্রেডমার্ক এবং ব্রান্ডের মাধ্যমে দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে।

যেমন- বিভিন্ন রকম টুথপেস্ট, সাবান, বিভিন্ন কোম্পানির শাড়ি-কাপড়, ব্লেড ইত্যাদি।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Monopolistic Competition Market

১. বহুসংখ্যক ছোট ফার্ম মোট উৎপাদনের সামান্য পরিমাণ বাজারে পণ্যসেবার যোগান দেয়।

২. প্রত্যেক বিক্রেতা নানাভাবে যেমন- ট্রেডমার্ক, ব্রান্ড, লেবেল, মোড়ক, বিজ্ঞাপন, আকৃতি, রঙ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্য পৃথকীকরণ করে থাকে।

৩. নতুন ফার্মের বাজারে প্রবেশের কোনো বাধা নেই আবার পুরাতন ফার্মের প্রস্থানেও কোনো বাধা নেই।

৪. উৎপাদিত পণ্যগুলো প্রয়োজন ও ব্যবহারের দিক থেকে একই ধরনের হলেও একটি পণ্য অন্যটির নিকট বিকল্প প্রকৃতির হয়।

৫. বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দাম হ্রাস করতে হয়। ফলে গড় আয় বা চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। এ বাজারে চাহিদা রেখার ঢাল; একচেটিয়া বাজারের চাহিদা রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

৬. বিক্রেতা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রি করে এবং সে কম-বেশি স্বাধীন দাম নীতি অনুসরণ করতে পারে।

৭. ক্রেতারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি, গুণাগুণ ও দাম সম্পর্কে আগাম ধারণা পেয়ে থাকে।

৮. পণ্যভেদ থাকায় বিক্রয় খরচ অপরিহার্য। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজার দখল ও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয় ও বিক্রয় খরচ বহন করে।

৯. বাজারে দলীয় বা গ্রুপ ভারসাম্য কার্যকর হয়।

১০. আদর্শ উৎপাদন (Ideal Output) সংক্রান্ত ধারণা এবং তার সাথে জড়িত অতিরিক্ত সামর্থ্যের (the excess capacity) ধারণা উভয়ই দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি ফার্মের আদর্শ উৎপাদন বলতে সেই অবস্থাকে নির্দেশ করা হয় যে উৎপাদনক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ন্যূনতম। (The ideal output of a firm was generally regarded as that output associated with minimum long run average cost.)

১১. একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় 'সদৃশ্য অথচ পৃথকীকৃত দ্রব্যের' অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে ক্রেতা সম্পূর্ণ অবহিত নয়। আবার বিক্রেতা বা ফার্ম অপরাপর ফার্মের আচরণ বা গতিবিধি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
Monopolistic Competition

জেনে রাখো:

E. H. Chamberlin একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমদিকে ধরে নেন যে প্রতিটি গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ফার্মের একই রকম ব্যয় এবং চাহিদা রেখা রয়েছে।

অর্থাৎ কোনো গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ফার্ম একই রকম ব্যয় ও চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়।

সে জন্য একচেটিয়া বাজারের ফার্মগুলো একই ধরনের হয়।

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

যে বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতা সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার বলে। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ফেলনার (William Fellner) এরূপ বাজারকে 'স্বল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মোবাইল ফোন কোম্পানি, ঢেউটিন, ইস্পাত, মোটরগাড়ি, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বাজার পরিলক্ষিত হয়।

অলিগোপলি অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে এমন একটি বাজার, যেখানে দুইয়ের অধিক বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক নয় এবং একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে তবে তাকে অলিগোপলি বাজার বলে।

এ ধরনের বাজারকে আবার কয়েকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও (competition among few) বলা হয়।

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

উল্লেখ্য যে, যখন বিক্রেতার সংখ্যা দুই থেকে দশ জন পর্যন্ত থাকে তখন অলিগোপলি বাজার সৃষ্টি হয়।

দুই বিক্রেতার বাজারকে ডুয়োপলি এবং এক বিক্রেতার বাজারকে একচেটিয়া কারবার বলে।

চারটি কারণে অলিগোপলির উৎপত্তি হয়। যেমন—

১. বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচন

২. কারবারির উদ্দেশ্য, বেশি মুনাফা, বেশি ক্ষমতা, বেশি আধিপত্য

৩. শিল্পে প্রবেশে বাধা এবং

৪. বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ সরকারি আইন।

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

অলিগোপলির প্রকারভেদ Types of Oligopoly

অলিগোপলি বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

১. বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও পৃথকীকৃত অলিগোপলি

২. খোলা অলিগোপলি ও বন্ধ অলিগোপলি

৩. আংশিক অলিগোপলি ও পূর্ণ অলিগোপলি

৪. যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি ও যোগসাজশবিহীন অলিগোপলি

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

উল্লেখ্য যে, যখন বিক্রেতার সংখ্যা দুই থেকে দশ জন পর্যন্ত থাকে তখন অলিগোপলি বাজার সৃষ্টি হয়।

দুই বিক্রেতার বাজারকে ডুয়োপলি এবং এক বিক্রেতার বাজারকে একচেটিয়া কারবার বলে।

চারটি কারণে অলিগোপলির উৎপত্তি হয়। যেমন—

১. বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচন

২. কারবারির উদ্দেশ্য, বেশি মুনাফা, বেশি ক্ষমতা, বেশি আধিপত্য

৩. শিল্পে প্রবেশে বাধা এবং

৪. বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ সরকারি আইন।

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

অলিগোপলির প্রকারভেদ Types of Oligopoly

অলিগোপলি বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

১. বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও পৃথকীকৃত অলিগোপলি

২. খোলা অলিগোপলি ও বন্ধ অলিগোপলি

৩. আংশিক অলিগোপলি ও পূর্ণ অলিগোপলি

৪. যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি ও যোগসাজশবিহীন অলিগোপলি

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

অলিগোপলির প্রকারভেদ Types of Oligopoly

১. বিশুদ্ধ অলিগোপলি ও পৃথকীকৃত অলিগোপলি:

স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে এমন বাজারকে বিশুদ্ধ অলিগোপলি বলে।

কিন্তু বাজারে স্বল্পসংখ্যক প্রতিযোগী বিক্রেতা প্রায় একই দ্রব্য অথচ সম্পূর্ণ সমজাতীয় নয় এরূপ দ্রব্য বিক্রি করলে সে বাজারকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি বাজার বলা হয়।

২. খোলা অলিগোপলি ও বন্ধ অলিগোপলি:

যে অলিগোপলির বাজারে নতুন প্রতিযোগী ফার্ম সহজেই প্রবেশ করতে পারে তাকে খোলা অলিগোপলি বলে।

অন্যদিকে, যে অলিগোপলির বাজারে নতুন প্রতিযোগী ফার্ম সহজেই প্রবেশ করতে পারে না তাকে বন্ধ অলিগোপলি বলা হয়।

অলিগোপলি বাজার
Oligopoly Market

৩. আংশিক অলিগোপলি ও পূর্ণ অলিগোপলি:

যে অলিগোপলি বাজারে মাত্র একটি বা অতি অল্পমাত্র বৃহদায়তন ফার্ম থাকে এবং বাজারে সে ফার্মগুলো দাম বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন ফার্ম সেই দাম মেনে চলে তাকে আংশিক অলিগোপলি বলে।

অপরপক্ষে, যে অলিগোপলি বাজারে প্রত্যেক ফার্ম নিজের ইচ্ছামতো বা স্বাধীনভাবে দ্রব্যের যোগান দেয় বা দাম নির্ধারণ করে সেই অলিগোপলি বাজারকে পূর্ণ অলিগোপলি বাজার বলে।

৪. যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি ও যোগসাজশবিহীন অলিগোপলি:

যে অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতা ও ফার্মগুলোর মধ্যে যোগসাজশ থাকে তাকে যোগসাজশপূর্ণ অলিগোপলি নামে অভিহিত করা হয়।

অন্যদিকে, যে অলিগোপলি বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মসমূহের মধ্যে কোনো যোগসাজশ থাকে না তাকে যোগসাজশবিহীন বা ষড়যন্ত্রহীন অলিগোপলি বলা হয়।

*যোগসাজশ = গোপনে সহযোগিতা।

অলিগোপলির বৈশিষ্ট্যসমূহ
Characteristics of Oligopoly

১. ফার্মসমূহের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় থাকায় স্বল্প ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ বাজারে দ্রব্যের দাম এবং উৎপাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফার্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়।

২. অলিগোপলিতে একজন বিক্রেতা অপর বিক্রেতার সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। অন্যের কাছ থেকে ক্রেতা কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া যায় এবং নিজ দ্রব্যের ভোক্তাদেরকে কীভাবে ধরে রাখা যায় এ বিষয়ে প্রত্যেক বিক্রেতা চিন্তিত। তাই নিজ দ্রব্যের গুণাগুণ প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেয়।

৩. মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য কয়েকটি ফার্ম দলীয়ভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে পারে। আর এই দলীয় মনোভাব সমঝোতামূলক বা চুক্তিমাফিক হতে পারে।

৪. অলিগোপলি বাজারে অবস্থিত ফার্মসমূহ আয়তনের দিক দিয়ে ছোট হতে পারে। আর এই আয়তনের পার্থক্যের কারণেই ফার্মসমূহের মধ্যে খরচের ব্যবধান হয়ে থাকে।

অলিগোপলির বৈশিষ্ট্যসমূহ
Characteristics of Oligopoly

৫. **মুষ্টিমেয় বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা** থাকায় একজনের পরিবর্তিত দামের দ্বারা অন্যজনের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

যেমন— একটি ফার্ম দাম কমালে প্রতিযোগী ফার্মগুলো দাম কমাবে না কি অপরিবর্তিত রাখবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আবার দাম যদি হ্রাস করে তবে তা কতটুকু হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

৬. এ বাজারে দ্রব্যসমূহ সমজাতীয় বা অসমজাতীয় অর্থাৎ **গুণগত বা আকৃতিতে পার্থক্য থাকে**।

আর **সমজাতীয় দ্রব্যের বাজারকে বিশুদ্ধ অলিগোপলি বলে।**

৭. এ **বাজারে দাম অনমনীয়** থাকে। তাই কোনোরূপ অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দামের যুদ্ধে উৎপাদনকারীরা অবতীর্ণ হতে চায় না। তাছাড়া চুক্তিমাফিক যে দাম নির্ধারিত হয় তা হ্রাসবৃদ্ধি করে অযথা দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় না।

ফলে এ বাজারে দামের অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা
Comparison among Oligopoly and others Markets

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ফার্ম থাকে।

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা যথেষ্ট।

মনোপলিতে একটি ফার্ম থাকে।

কিন্তু অলিগোপলিতে ফার্মের সংখ্যা একাধিক, তবে সংখ্যা সীমিত।

কাজেই বিক্রেতার সংখ্যার দিক থেকে অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজার কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

২. একচেটিয়া কারবারে যেহেতু একজন বিক্রেতা ভূমিকা রাখে, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো সুযোগ নাই।

অপরদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতাতে অসংখ্য ফার্ম থাকায় ফার্ম উপলব্ধি করতে পারে যে, এখানে প্রতিদ্বন্ধি করে কোনো লাভ নেই। বরং চলতি দাম মেনে নিয়ে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালানো যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু অলিগোপলিতে প্রতিদ্বন্ধি ফার্মগুলোর মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কখনও কখনও তারা গোপন চুক্তির ভিত্তিতে ষড়যন্ত্রমূলক জোট গঠন করে।

অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা
Comparison among Oligopoly and others Markets

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দ্রব্য সমজাতীয় হয়, সেখানে দ্রব্য পৃথকীকরণের সুযোগ থাকে না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতাতে দ্রব্য সামান্য পৃথকীকরণ থাকতে পারে।

অলিগোপলিতে কখনও সামান্য, আবার কখনও যথেষ্ট পৃথকীকরণ দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়।

৪. অলিগোপলি হলো সেই স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতার বাজার যেখানে ফার্মগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং অপরজন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে সে সম্পর্কে একটি ফার্ম সবসময় সজাগ থাকে।

অলিগোপলি ফার্মের এ ধরনের আচরণ পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দেখা যায় না।

অলিগোপলির সাথে অন্যান্য বাজারের তুলনা
Comparison among Oligopoly and others Markets

৫. **পূর্ণ প্রতিযোগিতায়** শিল্প সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় যে, সমজাতীয় দ্রব্য নিয়ে অসংখ্য ফার্মের সমন্বয়ে একটি শিল্প গঠিত হয়।

অপরদিকে **একচেটিয়া কারবারে** একক ফার্মই শিল্প বলে গণ্য হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় শিল্প কথার পরিবর্তে গ্রুপ কথাটি ব্যবহৃত হয়। শিল্প বা গ্রুপ পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতা যেভাবে উৎপাদন ও দাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, **অলিগোপলিতে** তা সম্ভব হয় না।

তাই **অলিগোপলিতে দাম ও উৎপাদন নির্ধারণের একক কোনো মডেল পাওয়া যায় না।**

মনোপসনি বাজার
Monopsony Market

মনোপসনি বাজার, মনোপলি বাজারের বিপরীত অবস্থা। যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতা অনেক থাকে তাকে মনোপসনি বাজার বলে। আখ চাষের অঞ্চলে আখ চাষি অনেক থাকলেও চিনি কল থাকে মাত্র একটি।

এক্ষেত্রে চিনি কল ক্রেতার এবং আখ চাষিরা বিক্রেতার ভূমিকা পালন করে।

মনোপসনি বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. এ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক।

২. এ বাজারে ক্রেতার সংখ্যা একজন।

৩. এ বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা কর্তৃক শ্রমিকের শোষণ পরিমাপ করা যায়।

উপকরণ বাজারে মনোপসনি থাকলে একটি ফার্ম উপকরণ বাজারে একাই ক্রেতা এবং সেখানে অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। অর্থাৎ উপকরণ বাজারে মনোপসনি কিন্তু পণ্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

ডুয়োপলি বাজার
Duopoly Market

ডুয়োপলি (Duopoly) শব্দে, ডুয়ো (Duo) যার অর্থ দুই এবং পলি (Poly) যার অর্থ বিক্রেতা।

কাজেই ডুয়োপলি শব্দটির অর্থ দুইজন বিক্রেতা।

বাজারে কেবল দুটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা দুজন বিক্রেতা থাকে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে, তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে। এ বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন অথবা যোগান এ দুজন বিক্রেতাই নিয়ন্ত্রণ করে।

যেমন— সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ডেসকো এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি।

ডুয়োপলি বাজারের বৈশিষ্ট্য:

১. বিক্রেতা মাত্র দুজন।

২. ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য।

৩. দুজন বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোনো বিক্রেতা বাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

ডুয়োপসনি বাজার
Duopsony Market

যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুজন, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

‘ক’ অঞ্চলে পাট চাষির সংখ্যা অনেক কিন্তু সেখানে পাটকলের সংখ্যা মাত্র দুটি।

উক্ত ‘ক’ অঞ্চলে পাট চাষিরা বিক্রেতা এবং পাটকল ক্রেতা। এটিকে ডুয়োপসনি বাজার বলা যায়।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
Bilateral Monopoly Market

বাজারে একজন বিক্রিতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে তাকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বলা হয়।

সাধারণত উপকরণের বাজারে এরূপ দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে।

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের একজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা থাকলে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজারের সৃষ্টি হয়।

উপকরণের একজন বিক্রেতাকে Monopoly Seller বলা হয় এবং একজন ক্রেতাকে Monopsony Buyer বলা হয়। কাজেই Monopoly Seller এবং Monopsony Buyer নিয়ে গঠিত বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার
Bilateral Monopoly Market

একটি উদাহরণ নেয়া যাক।

মনে করি, বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানি (BTC) সিগারেট উৎপাদনে একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

BTC সিগারেট উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ 'তামাক' এর একমাত্র ক্রেতা (Monopsony) আবার তামাক উৎপাদনকারী কৃষকগণ 'সমবায় সমিতি' গঠন করলে সমিতি হবে তামাকের একমাত্র বিক্রেতা (Monopoly)।

কাজেই BTC এবং সমবায় সমিতির উপস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার গড়ে উঠবে।

কিংবা সিগারেট উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকগণ 'শ্রমিকসংঘ' গঠন করলে শ্রমিকসংঘ শ্রমের একমাত্র বিক্রেতা বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে BTC এবং শ্রমিক সংঘের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া গড়ে উঠবে।

*পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সমশ্রেণির সমমনা কতিপয় মানুষ সমবায় আইনের আওতায় যে প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে তাকে সমবায় সমিতি বলে। সমবায় স্বল্পবিত্তসম্পন্ন মানুষের সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হল সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার
Price Discriminating Monopoly Market

একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম থাকে, উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকট বিকল্প থাকে না এবং সর্বোপরি নতুন প্রতিযোগি ফার্মের প্রবেশ নিষেধ।

এমতাবস্থায় একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম ও পণ্যের যোগানের উপর এককভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে ।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে Price Maker বলা হয়।

এজন্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে বিভেদমূলক দামনীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

তাই বৈষম্যমূলক দামনীতিকে সাধারণভাবে বৈষম্যমূলক একচেটিয়া কারবারও (Discriminating Monopoly) বলা হয় থাকে।

দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার
Price Discriminating Monopoly Market

দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজারের কতিপয় উদাহরণ—

১. দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বিভেদমূলক দাম।

যেমন, একই বই বোর্ড-বাঁধানো হলে একটি দাম এবং সাধারণ কাগজের প্রচ্ছদসহ (পেপার ব্যাক) হলে অপর একটি দাম দেওয়া হয়। টুথপেস্টের ছোট আকারের টিউবের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি এবং আবার ইকোনমি সাইজগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে কম।

২. গ্রাহকদের মর্যাদা দ্বারা বিভেদমূলক দাম নিরূপিত হয়। যেমন- সেনা বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সিনেমা হলে বা যানবাহনের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের দিক থেকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

৩. দ্রব্যের ব্যবহারের ভিন্নতার উপর নির্ভর করে বিভেদমূলক দাম।

যেমন, গৃহে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য যে চার্জ নেওয়া হয়, তার চেয়ে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চার্জ কম।

রেলওয়ে ওয়াগনে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য পরিবহনে এক ধরণের চার্জ, সৌখিন দ্রব্যাদি পরিবহনে ভিন্ন ধরনের চার্জ।

ওয়াগনে কয়লা পরিবহনে এক ধরনের চার্জ, আবার কাপড়ের গাঁট পরিবহনে আর এক ধরণের চার্জ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
১. অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা বিদ্যমান।	অসংখ্য ক্রেতা কিন্তু একজন মাত্র বিক্রেতা বিদ্যমান ।	ক্রেতা ও বিক্রেতা অনেক কিন্তু অসংখ্য নয়।
২. সমজাতীয় পণ্য বিদ্যমান।	একটিমাত্র পণ্য কিন্তু এটির পূর্ণ বিকল্প পণ্য নাই।	পণ্যগুলো একই ধরনের হলেও অভিন্ন নয়।
৩. বাজারে নতুন প্রতিযোগীর অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।	নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ।	নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা নেই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
৪. উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।	উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা নিম্নগামী।	উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা নিম্নগামী।
৫. উৎপাদনের কাম্য অবস্থায়, প্রান্তিক ব্যয়, দামের সমান হয়। অর্থাৎ MC = P	উৎপাদনের কাম্য অবস্থায়, প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। অর্থাৎ MC = MR	কাম্য অবস্থায়, বিক্রয় খরচসহ প্রান্তিক খরচ, প্রান্তিক আয়ের সমান হয় । অর্থাৎ MC = MR

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
৬. স্বল্পকালে ভারসাম্যবস্থায়, MC=MR= AR = P এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।	ভারসাম্যব্যস্থায়, MC = MR, (MR < AR = P)। এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।	ভারসাম্যবস্থায়, MC = MR ও MR <AR এবং ঢাল MR < ঢাল MC হয়।
৭. বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা জ্ঞাত ।	বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নয়।	বাজার তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা পূর্ণভাবে জ্ঞাত নয় ।
৮. অন্যান্য বাজার থেকে কম খরচে উৎপাদন বেশি হয়।	অন্যান্য বাজারের চেয়ে উৎপাদন কম হয়।	অন্যান্য বাজারের চেয়ে উৎপাদন কম হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে তুলনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার	একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার
৯. অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম কম থাকে।	অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম বেশি থাকে।	অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম বেশি থাকে।
১০. স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও ক্ষতি স্বীকার করলেও দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও ক্ষতি স্বীকার করলেও দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলেও অবাধে প্রবেশের ফলে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

ফার্ম ও শিল্পের ধারণা
Concept of Firm and Industry

১. প্লান্ট (Plant):

একটি দ্রব্য উৎপাদনে একই ব্যবস্থাপনায় কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা একক থাকে। উৎপাদনের এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা এককগুলোকে প্ল্যান্ট (plant) বলে। তাঁতের কাপড় বা পাটকলে প্রতিটি তাঁত বা লুম হলো এক একটি প্ল্যান্ট।

২. ফার্ম (Firm):

একই ব্যবস্থাপনায় একটি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ একাধিক প্ল্যান্ট থাকতে পারে। এসব প্ল্যান্টের সমষ্টিই হলো ফার্ম। সুতরাং, একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের সকল ইউনিটের সমষ্টিকে ফার্ম (Firm) বলে। যেমন—

১. তিব্বত সাবান কারখানা হলো ফার্ম, এ কারখানার অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট।

২. আকিজ জুট মিল হলো ফার্ম এবং এর অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট।

৩. বনরূপা টেক্সটাইল মিল হলো ফার্ম এবং এর অধীনে প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হলো প্ল্যান্ট ।

ফার্ম ও শিল্পের ধারণা
Concept of Firm and Industry

৩. শিল্প (Industry):

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

অন্যভাবে, কোনো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একক উৎপাদন ইউনিটকে ফার্ম এবং সব ফার্মকে একত্রে শিল্প বলে। যেমন—

১. বাংলাদেশে অবস্থিত কাপড় কাচা সাবানের ফার্মগুলোর সমষ্টিকে কাপড় কাচা সাবানের শিল্প বলা হয়।

২. বাংলাদেশের জুট মিলসমূহ একত্রে পাট শিল্প।

৩. বাংলাদেশের টেক্সটাইল মিলগুলো একত্রিত হয়ে টেক্সটাইল শিল্প।

৪. বাংলাদেশের সকল চিনির মিল নিয়ে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে।

ফার্ম ও শিল্পের ধারণা
Concept of Firm and Industry

দাম গ্রহীতা কী?

দাম গ্রহীতা বলতে প্রচলিত দাম মেনে নেওয়া বোঝায়।

পূর্ব নির্ধারিত দাম মেনে নিয়ে যে ফার্ম উৎপাদন বা বিক্রয় কাজ পরিচালনা করে, সেই ফার্ম দাম গ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Firm and Industry

ফার্ম ও শিল্পের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো ফার্মের বৈশিষ্ট্য:

ফার্মের বৈশিষ্ট্য

১. একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্টের সমষ্টি হলো ফার্ম;

২. একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত;

৩. একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফার্ম গঠিত হয়;

৪. ফার্মের পরিধি সীমিত;

৫. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল, কারণ দাম স্থির থাকে;

৬. ফার্মের যোগান মোট উৎপাদনের তুলনায় খুবই কম;

ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Firm and Industry

ফার্মের বৈশিষ্ট্য

৭. দামের ওপর কারও প্রভাব নেই । পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফার্ম দামগ্রহীতা তথা Price Taker হিসেবে কাজ করে;

৮. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; কারণ একটি ফার্মই হলো শিল্প;

৯. ফার্ম ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়;

১০. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় এবং একচেটিয়া বাজারে স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

তবে দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে, একচেটিয়ায় দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Firm and Industry

শিল্পের বৈশিষ্ট্য

১. বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে **শিল্প** বলে;

২. **শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত**;

৩. **একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মকে নিয়ে শিল্প গঠিত হয়;**

৪. শিল্পের **পরিধি ব্যাপক**;

৫. শিল্পের চাহিদা রেখা **ডানদিকে নিম্নগামী**;

৬. শিল্পের যোগান **ফার্মের তুলনায় বেশি**;

ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Firm and Industry

শিল্পের বৈশিষ্ট্য

৭. শিল্পে, চাহিদা যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়;

৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে;

৯. শিল্প বৃহৎ আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়;

১০. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে কিন্তু স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক, ক্ষতি ও অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Firm & Industry

বিষয়	ফার্ম	শিল্প
১. সংজ্ঞা	একই মালিকানায় উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্ট থাকে, তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে ।	বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।
২. ব্যবস্থাপনা	ফার্ম একক বা একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।	শিল্প বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।
৩. প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠান হলো ফার্ম।	সমজাতীয় বা একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মকে একত্রে শিল্প বলা হয়।

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Firm & Industry

বিষয়	ফার্ম	শিল্প
৪ .পরিধি	ফার্মের পরিধি সীমিত ।	শিল্পের পরিধি বিস্তৃত।
৫. উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ নীতি	ফার্মে দাম ও উৎপাদন নীতি ক্ষুদ্রতর।	শিল্পে দাম ও উৎপাদন নীতি বৃহত্তর।
৬. দাম নির্ধারণ	দামের ওপর প্রভাব নেই। তাই দাম গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে।	দ্রব্যের দাম নির্ধারণে শিল্প বড় ভূমিকা পালন করে।

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Firm & Industry

বিষয়	ফার্ম	শিল্প
৭. যোগান	ফার্মের যোগান শিল্পের তুলনায় ছোট।	শিল্পের যোগান অনেক বেশি।
৮. চাহিদা রেখা	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।	শিল্পের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী এবং যোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী।
৯. রেখাচিত্র	দাম, P_0, D, O, Q_1, Q_2, পরিমাণ	দাম, P_0, D, S, E, S, D, O, Q_0, পরিমাণ

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Firm & Industry

বিষয়	ফার্ম	শিল্প
১০. বাজার	একচেটিয়ায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।
১১. মুনাফা	স্বল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ও একচেটিয়ায় ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা; অস্বাভাবিক মুনাফা ও ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে। তবে দীর্ঘকালে ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক মুনাফা ও একচেটিয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।	পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে শিল্প ও স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এবং একচেটিয়ায় শিল্প অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক কাজের পারিতোষিককে মুনাফা বলে।

অধ্যাপক আলফ্রেড **মার্শালের** মতে, "মুনাফা হলো উদ্যোক্তার মজুরি।”

অধ্যাপক **টাউজিগ** এর মতে, “মুনাফা হলো উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার পারিশ্রমিক।”

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বা ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে **মুনাফা** (Profit) বলে ।

সূত্রানুসারে π = R - C বা $\pi = TR - TC$

এখানে, $R = TR =$ মোট আয়, $C = TC =$ মোট ব্যয়

$\pi =$ পাই, (গ্রিক অক্ষর) = মুনাফা।

* পারিতোষিক = বকশিস, পুরস্কার।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximisation)

প্রতিটি ফার্মের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।

ভারসাম্য অর্জনের মাধ্যমে ফার্ম মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করে।

ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হলে উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রবণতা থাকে না।

ফার্মের ভারসাম্য তথা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যথা-

১. সনাতন পদ্ধতি:

মোট আয় (TR) ও মোট ব্যয় (TC) পদ্ধতি (Total Revenue and Total Cost Method)

২. আধুনিক পদ্ধতি:

প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) পদ্ধতি (Marginal Revenue and Marginal Cost Method)

এ দুটি পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো---

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximisation)

১. সনাতন পদ্ধতি (মোট আয় ও মোট ব্যয় পদ্ধতি):

মোট আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যই হলো মুনাফা।

অর্থাৎ $\pi = TR - TC$, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের **দুটি শর্ত** রয়েছে।

১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত:

মোট আয় রেখা, **মোট ব্যয় রেখার উপরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ TR > TC হবে।**

অন্যভাবে, $\frac{d\pi}{dQ} = 0$ হবে। অর্থাৎ উৎপাদনের সাপেক্ষে মুনাফা রেখার সর্বোচ্চ হবে এবং এর পরিবর্তন হবে না।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximisation)

১. সনাতন পদ্ধতি (মোট আয় ও মোট ব্যয় পদ্ধতি):

২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত:

যে বিন্দুতে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য সর্বাধিক হবে; সে বিন্দুতে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে। অন্যভাবে, $\frac{d^2\pi}{dQ} < 0$ হবে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হওয়ার পর মুনাফা রেখা ধরে ডানে পরিবর্তন হলে মুনাফা কমে যাবে অর্থাৎ মুনাফা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হবে।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

২. আধুনিক পদ্ধতি (প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি)

ভারসাম্য বা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের-

১ম শর্ত:

MR = MC হবে। অর্থাৎ MR ও MC পরস্পরকে ছেদ করবে

২য় শর্ত:

MR রেখার ঢাল < MC রেখার ঢাল।

অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দুতে তথা সর্বোচ্চ মুনাফা স্তরে MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে যাবে।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি
Conditions of Profit Maximisation

২. আধুনিক পদ্ধতি (প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি)

ভারসাম্য বা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের-

অতিরিক্ত শর্ত:

মুনাফা নির্ধারণে AC রেখা অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বল্পকালে পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ক্ষেত্রে **(P=AR) > AC** এবং দীর্ঘকালে পূর্ণ = প্রতিযোগিতায় P=AC হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় P> AC হয়।

তাই অতিরিক্ত শর্ত: P> AC অর্থাৎ দাম বা AR রেখা, গড় ব্যয় রেখার বেশি হবে।

ফার্মের ভারসাম্য
Equilibrium of a Firm

যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন বাজার উপাদান পণ্য বা উপকরণ ক্রয় করে পণ্য বা সেবা বিক্রির জন্য যোগান দেয় তাকে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বলে।

ফার্মের মূল লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য হলো মুনাফা।

মোট আয় = পণ্যের দাম × উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ $R = TR = P \times Q$

মোট ব্যয় = পণ্যের গড় খরচ × উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ $C = TC = AC \times Q$

মোট ব্যয় অপেক্ষা মোট আয় যত বেশি হবে মুনাফার পরিমাণও তত বেশি হবে।

ফার্মের যে বিন্দুতে বা যে পরিমাণ উৎপাদনে মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয় সবচেয়ে বেশি হয় সে বিন্দুতে ফার্ম কাম্য অবস্থায় তথা ভারসাম্যে পৌঁছে এবং মুনাফা সর্বাধিক হয়।

একটি ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ভারসাম্যের মাধ্যমে কাম্যতা অর্জন করে। যে উৎপাদনে তার মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, সে উৎপাদন বিন্দুকে ফার্মের **ভারসাম্য বিন্দু** বলে। **ভারসাম্য বিন্দুতে সর্বদাই দুটি শর্ত পালিত হয়।**

ফার্মের ভারসাম্য
Equilibrium of a Firm

শর্তগুলো হলো:

১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত:

MR = MC অর্থাৎ ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হতে হবে।

২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত:

MR এর ঢাল < MC এর ঢাল। অর্থাৎ MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক দিয়ে ছেদ করে উপরের দিকে যাবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা পূর্ণ জ্ঞানে একটি সমজাতীয় পণ্য দরকষাকষির মাধ্যমে স্থির দামে ক্রয় বিক্রয় করে সে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। এ বাজারের অনুমিতিসমূহ

১. সমজাতীয় বা একই জাতীয় দ্রব্য,

২. অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা এবং তাদের বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সরকারি হস্তক্ষেপ নেই।

৩. বাজারে পণ্যের দাম স্থির থাকে।

৪. উৎপাদক শিল্পে সহজে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে।

৫. উপাদানসমূহ গতিশীল থাকে অর্থাৎ একই উপাদান বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬. পরিবহণ ব্যয় ধরা হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

স্বল্পকাল হলো এমন একটি সময়কাল যখন ফার্ম তার পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহ পরিবর্তনে সক্ষম হলেও স্থির উপাদান পরিবর্তন করতে পারে না।

অর্থাৎ ফার্মকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

কোনো ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না।

ফলে ফার্ম যখন তখন উৎপাদন বন্ধ করতে পারে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা, অস্বাভাবিক মুনাফা ও ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

ভারসাম্যের দুটি শর্ত রয়েছে। যথা

১. ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary Condition):

ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ MR = MC হবে।

২. ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition):

ভারসাম্য বিন্দুতে MR এর ঢাল < MC এর ঢাল। অর্থাৎ MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক দিয়ে ছেদ করে উপরে যাবে।

গাণিতিকভাবে ফার্মের ভারসাম্য শর্ত প্রাপ্তি:

ধরি,

ফার্মের মোট আয় (R) = TR, প্রান্তিক আয় MR, মোট ব্যয় (C) = TC এবং প্রান্তিক ব্যয় MC । তাহলে মুনাফা অপেক্ষক

x = TR-TC

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ১ম শর্ত হলো:

আমরা জানি,

সর্বোচ্চ মুনাফায় মুনাফা অপেক্ষকের ঢাল শূন্য

$$\frac{d(\pi)}{dQ} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dQ}(TR - TC) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dQ}(R - C) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dR}{dQ} - \frac{dC}{dQ} = 0 \Rightarrow MR - MC = 0$$

$$\therefore MR = MC$$

যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত হলো:

সর্বোচ্চ মুনাফায় মুনাফা অপেক্ষকের ২য় অন্তরকের মান শূন্যর চেয়ে ছোট হয়।

$$\therefore \frac{d^2\pi}{dQ^2} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dQ}(MR - MC) < 0 \Rightarrow \frac{d(MR)}{dQ} - \frac{d}{dQ}(MC) < 0$$

$$\therefore \frac{d(MR)}{dQ} < \frac{d}{dQ}(MC)$$

MR এর ঢাল < MC এর ঢাল; যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত। অতিরিক্ত শর্ত; স্বল্পকালীন AC এর অবস্থানের ওপর ফার্মের মুনাফার অবস্থা নির্ভর করে ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

১. P= AC হলে, ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে

২. P> AC হলে, ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

৩. P<AC বা AC > P> ন্যূনতম AVC হলে, ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করবে।

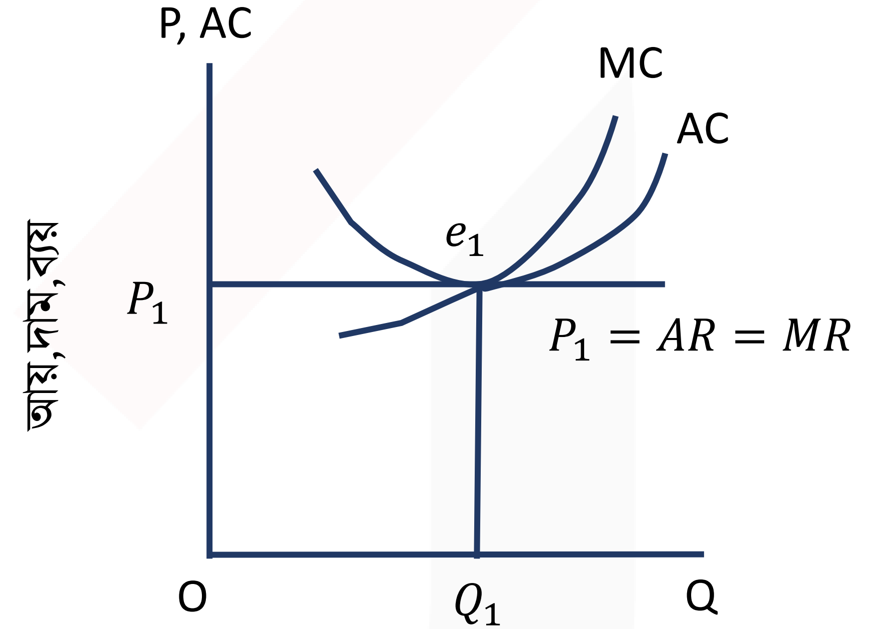
এ তিনটি অবস্থা চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit):

চিত্রে বিন্দুতে MR = MC, মুনাফা সর্বোচ্চের ১ম শর্ত এবং MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, ২য় শর্ত পালিত হয়েছে। ফলে e_1 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।

OP_1 ভারসাম্য দাম এবং OQ_1 ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।



চিত্রঃ স্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য
Short Run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit):

কারণ **মোট আয়,**

TR = দাম × উৎপাদনের পরিমাণ = $OP_1 \times OQ_1 = OP_1e_1Q_1$

মোট ব্যয়,

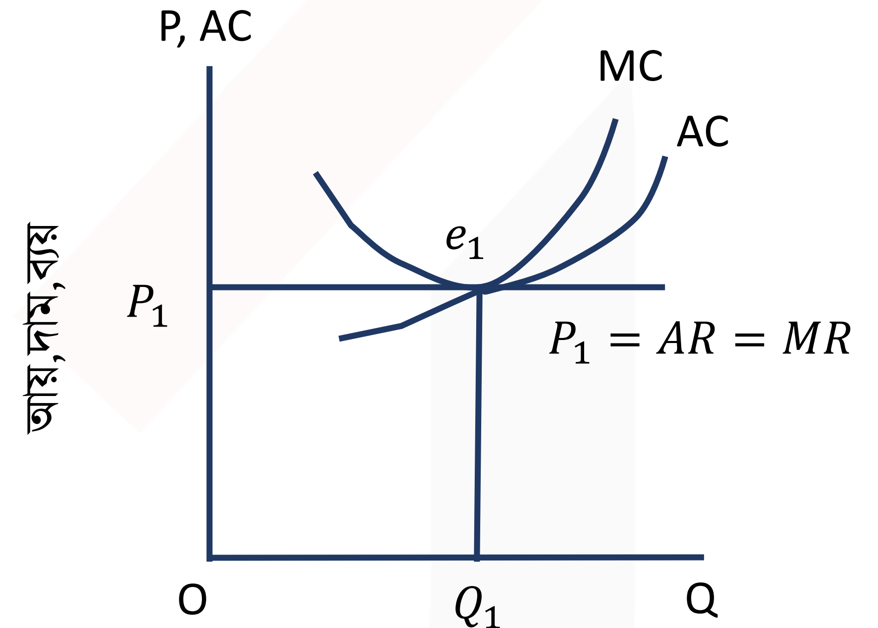
TC = AC × উৎপাদনের পরিমাণ = $Q_1e_1 \times OQ_1 = OP_1e_1Q_1$

সুতরাং মুনাফা, $\pi = TR - TC$

$= OP_1e_1Q_1 - OP_1e_1Q_1 = 0$

$\Pi = 0$

AC এর মধ্যে উৎপাদকের পারিশ্রমিক ধরা রয়েছে তাই $\pi = 0$ হওয়া সত্ত্বেও এখানে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।



উৎপাদনের পরিমাণ

চিত্রঃ স্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত হলো:

সর্বোচ্চ মুনাফায় মুনাফা অপেক্ষকের ২য় অন্তরকের মান শূন্যর চেয়ে ছোট হয়।

$$\therefore \frac{d^2\pi}{dQ^2} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dQ}(MR - MC) < 0 \Rightarrow \frac{d(MR)}{dQ} - \frac{d}{dQ}(MC) < 0$$

$$\therefore \frac{d(MR)}{dQ} < \frac{d}{dQ}(MC)$$

MR এর ঢাল < MC এর ঢাল; যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

অতিরিক্ত শর্ত;

স্বল্পকালীন AC এর অবস্থানের ওপর ফার্মের মুনাফার অবস্থা নির্ভর করে ।

১. P= AC হলে, **ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে**

২. P> AC হলে, **ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে**।

৩. P<AC বা AC > P> ন্যূনতম AVC হলে, **ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করবে**।

এ তিনটি অবস্থা চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

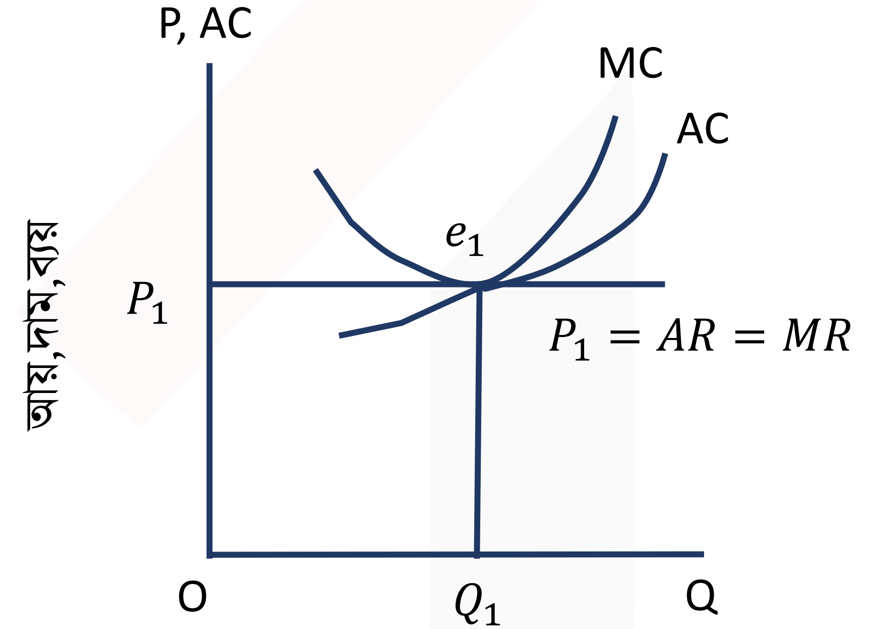
স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit):

চিত্রে বিন্দুতে MR = MC, মুনাফা সর্বোচ্চের ১ম শর্ত এবং MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, ২য় শর্ত পালিত হয়েছে।

ফলে e_1 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে।

OP_1 ভারসাম্য দাম এবং OQ_1 ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং

P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।



চিত্রঃ স্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit):

কারণ **মোট আয়,**

TR = দাম × উৎপাদনের পরিমাণ = $OP_1 \times OQ_1 = OP_1e_1Q_1$

মোট ব্যয়,

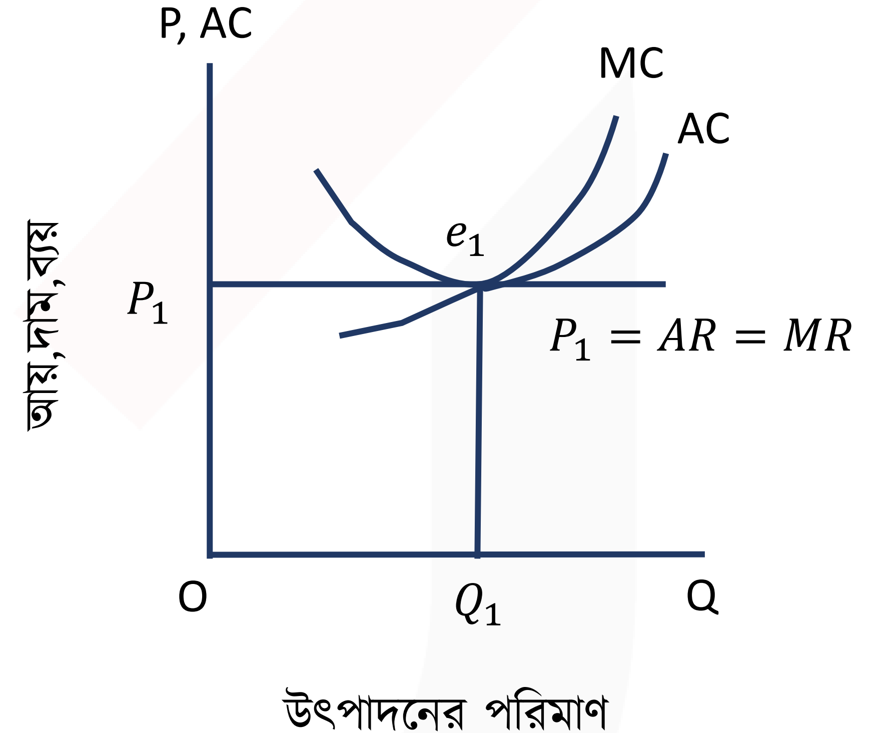
TC = AC × উৎপাদনের পরিমাণ = $Q_1e_1 \times OQ_1 = OP_1e_1Q_1$

সুতরাং মুনাফা, $\pi = TR-TC$

$= OP_1e_1Q_1 - OP_1e_1Q_1 = 0$

$\Pi = 0$

AC এর মধ্যে উৎপাদকের পারিশ্রমিক ধরা রয়েছে তাই $\pi = 0$ হওয়া সত্ত্বেও এখানে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।



চিত্রঃ স্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

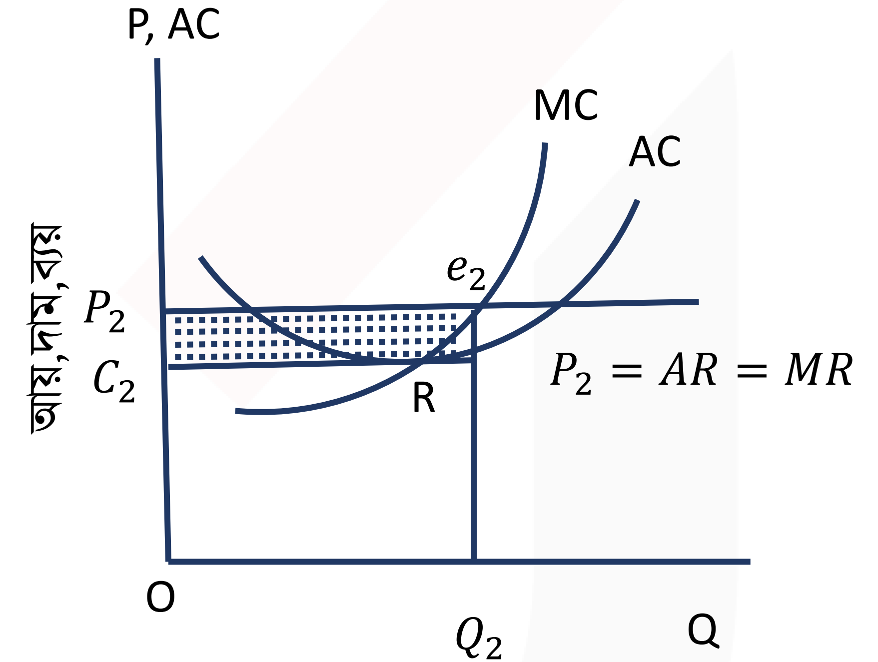
অস্বাভাবিক মুনাফা (Super Normal Profit):

চিত্রে e_2 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য দাম OP_2 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ_2 নির্ধারিত হয়েছে এবং $P > AC$ অর্থাৎ $P_2 > C_2$ হওয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

মোট ব্যয়, $TR = OP_2 \times OQ_2 = OP_2e_2Q_2$

মোট আয়, $TC = Q_2R \times OQ_2 = OC_2RQ_2$

মুনাফা $\pi = TR - TC = OP_2e_2Q_2 - OC_2RQ_2 = C_2P_2e_2R$, অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করছে কারণ AC এর মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা নিহিত রয়েছে, তার ওপরেও মুনাফা অর্জিত হয়েছে।



চিত্রঃ অস্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

ক্ষতি স্বীকার (Loss):

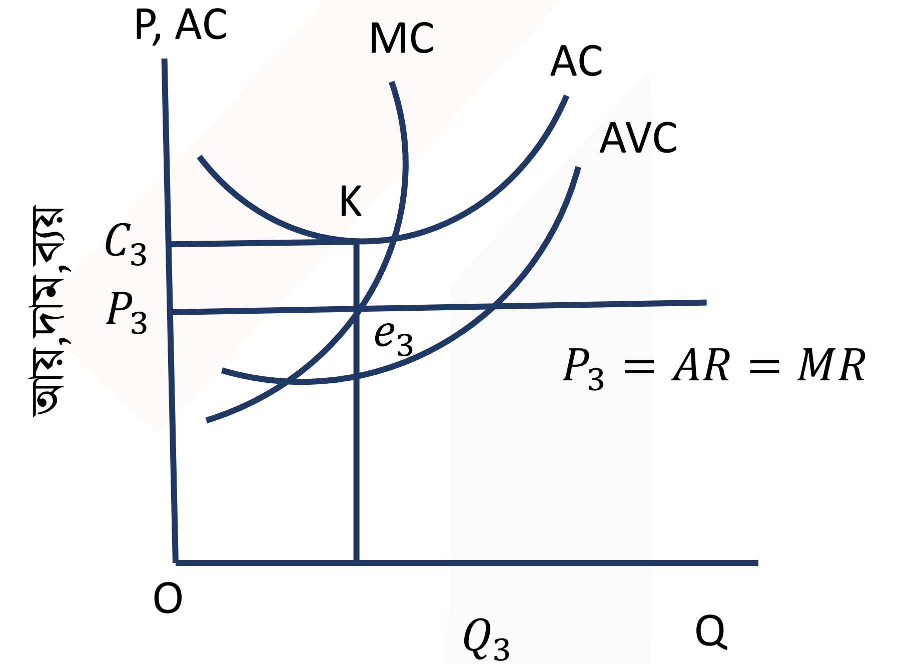
চিত্রে e_3 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে ফলে OP_3 ভারসাম্য দাম এবং OQ_3 ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং $AC > P > AVC$ অর্থাৎ $C_3 > P_3 > AVC$ হওয়ায় ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন করে।

মোট আয়, $TR = OP_3 \times OQ_3 = OP_3e_3Q_3$

মোট ব্যয়, $TC = Q_3K \times 0Q_3 = OC_3KQ_3$

ক্ষতি $= TC\text{-}TR = OC_3KQ_3 - OP_3e_3Q_3 = P_3e_3KC_3$

সুতরাং, স্বল্পকালে ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছালে কেবল ধনাত্মক মুনাফা অর্জন কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।



চিত্রঃ ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য: উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ

যে বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য থাকে না তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

অর্থনীতিবিদ লিপসির ভাষায় "The monopolist is the industry"।

এ বাজারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় একচেটিয়া কারবারি দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

একচেটিয়া কারবারির লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন।

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য: উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ

অনুমিত শর্ত:

১. বাজারে ক্রেতা অনেক কিন্তু বিক্রেতা একজন।

২. প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই ।

৩. নিকট বিকল্প দ্রব্য নেই।

৪. উৎপাদক দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৫. AR ও MR রেখা নিম্নগামী তবে MR রেখা AR এর নিচে অবস্থান করে।

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য: উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ

ভারসাম্য:

এ বাজারে ভারসাম্যের শর্ত দুটি—

১। ১ম বা প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary Condition):

ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হবে।

২। ২য় বা পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition):

MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, ফলে MC রেখা, MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে ওপরে ওঠবে।

৩। অতিরিক্ত শর্ত (Additional Condition):

AC-এর অবস্থানের ওপর মুনাফার অবস্থা নির্ভর করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

ক. দাম (P) = গড় ব্যয় (AC) হলে, স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

খ . P> AC হলে, অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

গ. AC > P> ন্যূনতম AVC হলে ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন করবে।

নিচের চিত্রে পর্যায়ক্রমে এ তিনটি অবস্থা আলোচনা করা হলো

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

স্বাভাবিক মুনাফা:

e_1 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম শর্ত MR = MC এবং

২য় শর্ত MR এর ঢাল < MC এর ঢাল, উভয় শর্ত পালিত হয়েছে, এবং

P = AC হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

ফলে ভারসাম্য দাম OP_1 এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OQ_1

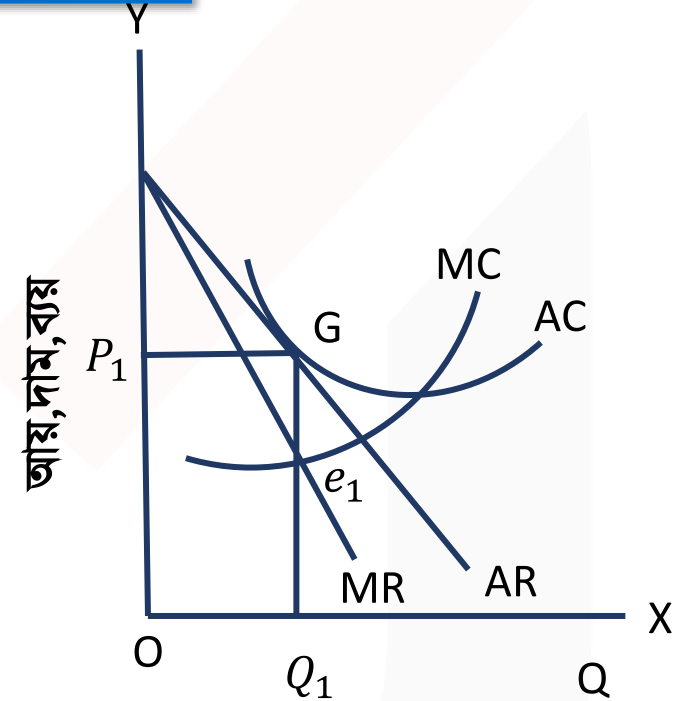
মোট আয় = $TR = OP_1 \times OQ_1 = OP_1GQ_1$

মোট ব্যয় = $TC = AC \times OQ_1 = Q_1G \times OQ_1 = OP_1GQ_1$

মুনাফা $R = TR - TC = OP_1GQ_1 - OP_1GQ_1 = 0$

AC এর মধ্যে মুনাফা অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক দেওয়া থাকায়

$\pi = 0$ অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হবে।



চিত্রঃ স্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

অস্বাভাবিক মুনাফা:

e_2 বিন্দুতে ভারসাম্যের ১ম ও ২য় শর্ত পালিত হয়েছে

এবং **P > AC** হওয়ায় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

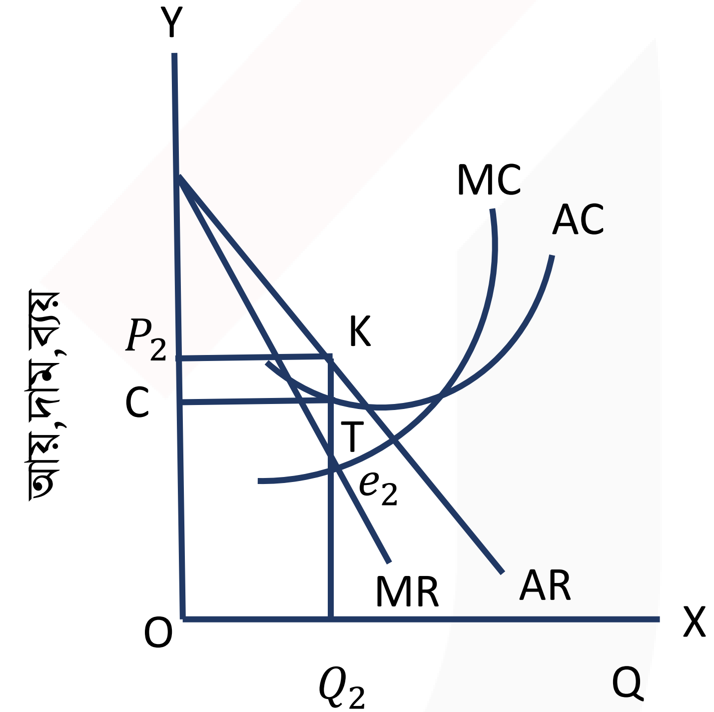
ফলে OP, ভারসাম্য দাম এবং OQ, ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে।

মোট আয় = $TR = OP_2 \times OQ_2 = OP_2KQ_2$

মোট ব্যয় = $TC = AC \times OQ_2 = Q_2T \times OQ_2 = OCTQ_2$

অস্বাভাবিক মুনাফা $\pi = TR - TC = OP_2KQ_2 - OCTQ_2 = CP_2KT$,

যা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে, কারণ AC এর ওপরে মুনাফা অর্জিত হয়েছে।



চিত্রঃ অস্বাভাবিক মুনাফা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন:

e_3 বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত পালিত হয়েছে।

ফলে OP_3 ভারসাম্য দাম এবং OQ_3 ভারসাম্য পরিমাণ

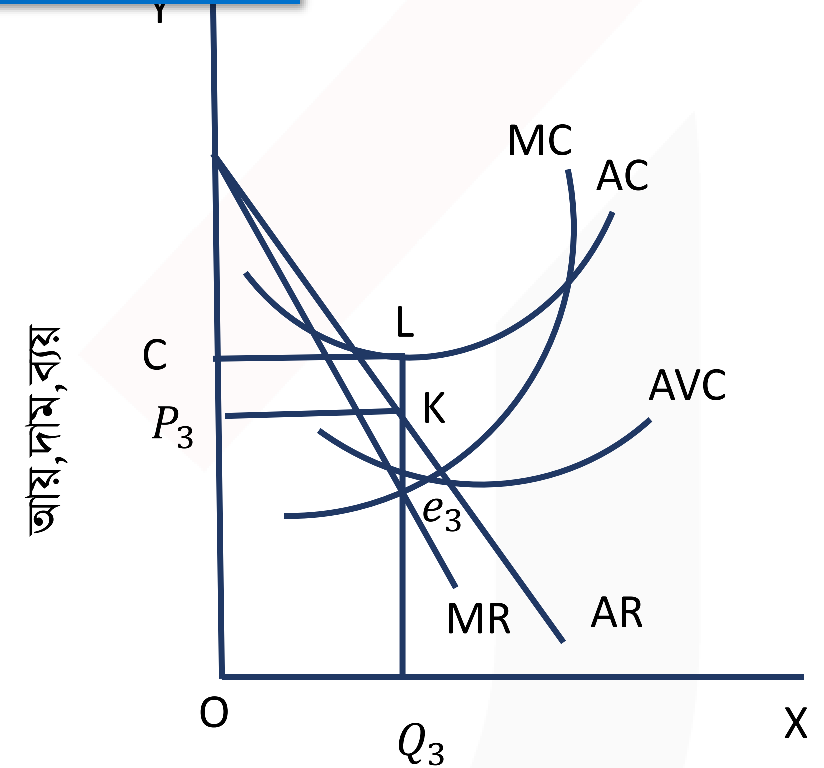
এবং AC > P > ন্যূনতম AVC হওয়ায় ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন নির্ধারিত হয়েছে।

মোট আয় = $TR=OP_3 \times OQ_3= OP_3KQ_3$

মোট ব্যয় = $TC = AC \times OQ_3 = Q_3L \times OQ_3 = OQ_3LC$

ক্ষতি = $TC = TR = OQ_3LC - OP_3KQ_3 = P_3CLK$,

কারণ TR> TC



চিত্রঃ ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
বাজার	ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের ব্রয়-বিক্রয়কে অর্থনীতিতে বাজার বলে। যেমন: কারওয়ান বাজারে একজন ক্রেতার কোনো একটি দামে যাচাই করে দ্রব্য ক্রয়।
স্থানীয় বাজার	যে দ্রব্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন: দেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাছের বাজার, চালের বাজার, বাজার প্রভৃতি।
আন্তর্জাতিক বাজার	কোনো দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হলে, সে বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে । যেমন: বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত তৈরি পোশাকের বাজার।
জাতীয় বাজার	কোনো দ্রব্যের বাজার সারা দেশব্যাপী হলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন: টাঙ্গাইলের কাপড়ের বাজার।
স্বল্পকালীন বাজার	এরূপ বাজারে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে দ্রব্যের যোগানের সামান্যতম সমন্বয় সাধন সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন ও যন্ত্রপাতির কোনো পরিবর্তন করা যায় না। এ বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে দ্রব্যের যোগানের সাথে চাহিদার ভূমিকা থাকে।
দীর্ঘকালীন বাজার	যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। যেমন: আসবাবপত্রের বাজার।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বাজার	যে বাজার বহু সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য একই দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।
একচেটিয়া বাজার	যে বাজারে একজনমাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে, উৎপাদিত দ্রব্যে কোনো ঘনিষ্ট পরিবর্তক থাকে না এবং অপর বিক্রেতার জন্য বাজারে প্রবেশে বাধা থাকে, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে ।
Price Maker	একচেটিয়া কারবারি তার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে তাকে 'Price Maker বলা হয়।
অলিগোপালি বাজার	অলিগোপালি অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে এমন একটি বাজার, যেখানে দুয়ের অধিক বিক্রেতা/উৎপাদনকারী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অধিক নয় এবং একটি দ্রব উৎপাদন ও তার দাম বাজারে অবস্থিত অন্য ফার্মগুলোর দামের ভিত্তিতে উৎপাদনকারী নির্ধারণ করেন।
মনোপসনি বাজার	যখন কোনো বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন তাকে মনোপসনি বাজার বলে। যেমন: কোনো অঞ্চলে আখ চাষি অনেক কিন্তু চিনি কল একটি। এখানে আখ চাষি বিক্রেতা, যারা সংখ্যায় অসংখ্য এবং চিনিকল ক্রেতা।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
ডুয়োপসনি বাজার	যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুজন, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য থাকে তাকে ডুয়োপসনি বাজার বলে ।
প্ল্যান্ট	একটি দ্রব্য উৎপাদনে একই ব্যবস্থাপনার কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা একক থাকে। উৎপাদনের এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট বা এককগুলোকে প্ল্যান্ট বলে।
ফার্ম	একই ব্যবস্থাপক বা মালিকানায় উৎপাদনের স্বয়ং সম্পূর্ণ এক বা একাধিক প্ল্যান্ট থাকতে পারে। এ প্ল্যান্টগুলোর সমষ্টিকে ফার্ম বলে। ফার্ম একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় বলে এর আয়তন সীমিত ।
শিল্প	কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। যেমন: বাংলাদেশের সকল কাগজকলের সমষ্টি হলো কাগজ শিল্প।
ফার্মের ভারসাম্য	উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম কর্তৃক উৎপাদনের যেক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয় সবচেয়ে বেশি, সেখানে মুনাফা সর্বাধিক। সেই অবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অর্জিত হয়।



মুদ্রা ও ব্যাংক





মুদ্রা ও ব্যাংক
Money and Bank

পৃথিবীর বয়স যত বেড়েছে, মানুষের নিত্য নতুন সম্পদের (যেমন- অর্থ) আবিষ্কারও তত বেড়েছে। ফলে সম্পদ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য পুরোহিত, স্বর্ণকার বা মহাজনদের দ্বারস্থ হয়েছে মানুষ।

সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে ওঠেছে। যুগের পরিবর্তন ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আধুনিক যুগে মানুষের কর্মকাণ্ড ব্যাংককে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেতে মানুষ বর্তমানে ব্যাংকিং সেবাকে নির্ভরযোগ্য মনে করছে। এজন্য সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আধুনিক করা হচ্ছে।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আধুনিক, সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যাংক হচ্ছে আর্থ-সামাজিক সেবা প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তি বলা হয়।

মুদ্রা
Money

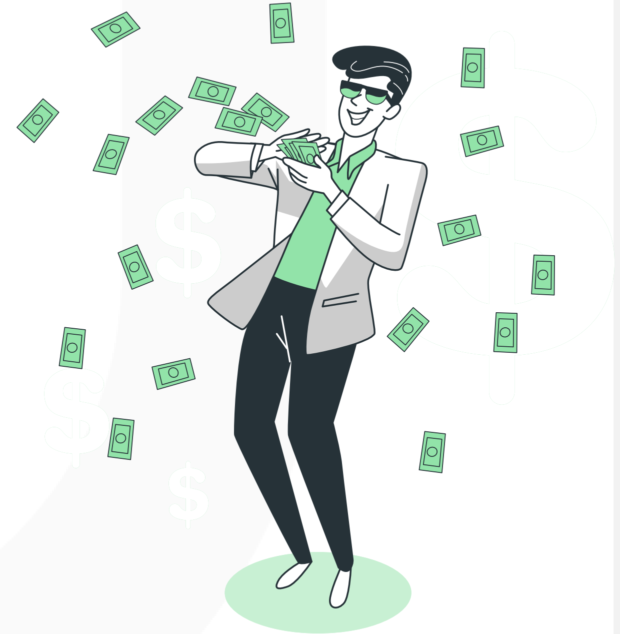
বর্তমান বিশ্বে অর্থই সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম।

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য তাকেই অর্থ বলা হয়।

অর্থের কার্যাবলি দ্বারাই অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজ অর্থনীতিবিদ স্যার ডেনিস হোলি রবার্টসন (১৮৯০-১৯৬৩) বলেন,

“দ্রব্যের দাম ও ব্যবসাগত কার্যকলাপের পাওনা হিসাবে যা সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তাই অর্থ।



মুদ্রা
Money

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক জিওফ্রে ক্লাউথার** (১৯০৭-১৯৭২) -এর মতে,

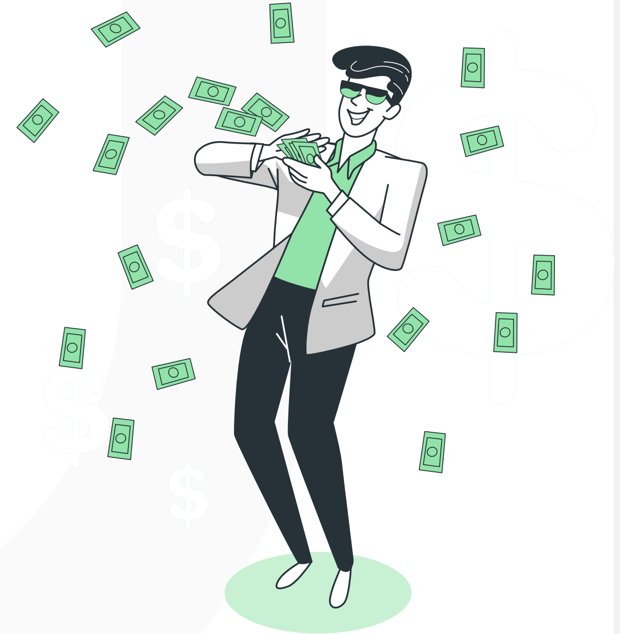
"যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সবার কাছে গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে তাই অর্থ।"

"Oxford Dictionary of Economics' অনুসারে,

"মূল্য সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের মাধ্যমই হলো অর্থ।"

পল অ্যান্থনি স্যামুয়েলসন (১৯১৫-২০০৯)-এর মতে,

"অর্থ হলো দেনা-পাওনা মিটানোর উপায় অথবা বিনিময়ের মাধ্যম।"



মুদ্রা
Money

সামষ্টিক অর্থনীতির জনক জন মেনার্ড কেইন্স-(১৮৩৩-১৯৪৬)-এর মতে,

"অর্থ এমন একটি জিনিস যা হস্তান্তর করে ঋণের চুক্তি ও পাওনা মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয় ক্ষমতা ধরে রাখা যায়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়,

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে দেনা-পাওনা পরিশোধের উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক, স্থগিত লেনদেনের মান ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বলা হয়।

মুদ্রা
Money

সংকীর্ণ অর্থে, অর্থের উপাদান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট নোট ও কয়েন (Currency and Coins)।

একে M1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর ব্যাপক অর্থে,

অর্থের উপাদান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোট ও মুদ্রা, বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট চাহিদা ও সঞ্চয় আমানত ।

বন্ড, ঋণপত্র, ক্রেডিট কার্ড, চেক প্রভৃতিও কার্যকর উপাদান।

যা M2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং,

অর্থ $(M) = M_1 + M_2$;

এখানে M= অর্থের যোগান, M_1= Narrow Money (সংকীর্ণ অর্থ), M_2= Broad Money (ব্যাপক অর্থ)।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা আর্থিক লেনদেন সহজ ও গতিশীল করার জন্য নানা ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে।

মুদ্রার কার্যাবলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি,

খ. সামাজিক কার্যাবলি এবং

গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions)

মুদ্রার মৌলিক কার্যাবলিকেই বাণিজ্যিক কার্যাবলি বলা হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. বিনিময়ের মাধ্যম:

মুদ্রার প্রধান কাজ হলো সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা।

অর্থ দ্বারা যেকোনো সময় ও স্থানে যেকোনো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম যেকোনো পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

২. মূল্যের পরিমাপক:

মুদ্রা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

এজন্য অর্থনৈতিক লেনদেনের যাবতীয় হিসাব মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা যায়।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions)

৩. স্থগিত লেনদেনের মান:

মুদ্রা ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনা মেটানো বা স্থগিত লেনদেন বা ঋণ পরিশোধের মান হিসেবে কাজ করে।

মুদ্রার মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল নয় বলে বর্তমানে এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের মূল্য ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

৪. সঞ্চয়ের বাহন:

মানুষ তার আয়ের সবটাই ব্যয় করে না; তার একাংশ সঞ্চয়ও করে।

মুদ্রার মাধ্যমে সঞ্চয় করা যায় বলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে স্থানান্তর করা যায়।

৫. মূল্য স্থানান্তরের বাহন:

মুদ্রার মাধ্যমে যেকোনো স্থানে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য সহজে ও নিরাপদে অনেক দূরেও স্থানান্তর করা যায়। যা সম্পদের ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions)

৬. ঋণের ভিত্তি:

বর্তমানকালে মুদ্রা আমানত হিসেবে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। এর ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে পারে।

তাছাড়া মুদ্রা, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ঋণপত্রের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে।

৭. বন্টনের কাজ:

একটি দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর পারিশ্রমিক (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) অর্থের মাধ্যমে বণ্টিত হয়।

৮. তারল্য রক্ষা:

মুদ্রা সম্পদের নগদাবস্থা রক্ষা করতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে যেকোনো দ্রব্য যেকোনো স্থান বা সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যায় বলে তা সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

খ. সামাজিক কার্যাবলি (Social Functions)

মুদ্রা সমাজবদ্ধ মানুষের সুবিধার জন্য কিছু সামাজিক কার্যাবলিও সম্পাদন করে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ: বস্তুতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রা মানুষের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সমাজে যার কাছে যত বেশি মুদ্রা থাকে সে তত বেশি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।

২. সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা: সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষকে উপহার প্রদান, দরিদ্রদের সাহায্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সভা-সমাবেশ করা ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হয়। মুদ্রা এসব কাজে সাহায্য করে।

৩. নিরাপত্তা প্রদানে সহায়ক : মুদ্রা মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, ঝুঁকিহীন ও আরামদায়ক কর্মক্ষেত্র, উন্নত খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রভৃতি লাভে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions)

মুদ্রা তার বহুমুখী ব্যবহার ও উপযোগ দ্বারা মানুষকে বিপদের সময় শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়।

মুদ্রা মানুষের মধ্যে এমন এক সুখানুভূতি সৃষ্টি করে যা তাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজে জড়িত হতে প্রেরণা যোগায়।

মানুষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রা থাকলে সে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করতে পারে।

সুতরাং, আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে সহজ, নিরাপদ, গতিশীল ও উৎপাদনক্ষম করে তোলে।

মুদ্রার কার্যাবলি
Functions of Money

আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রা আর্থিক লেনদেন সহজ ও গতিশীল করার জন্য নানা ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে।

মুদ্রার কার্যাবলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি,

খ. সামাজিক কার্যাবলি এবং

গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনার নিষ্পত্তির বিষয়টি বিনিময়ের দুটি মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে। যথা—

১। বিহিত মুদ্রা ও

২। আমানত।

বিহিত মুদ্রা (Legal Tender Money)

বিনিময়ের যে মাধ্যম সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা হলো বিহিত মুদ্রা।

ব্যবসায়িক দেনা পাওনার নিষ্পত্তিতে সকলে এ মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

বিহিত মুদ্রা দুই প্রকার, যথা—

ক. অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender Money)

খ. সসীম বা সীমিত বিহিত মুদ্রা (Limited Legal Tender Money)

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

বিহিত মুদ্রা (Legal Tender Money)

ক. অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender Money)

অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক বিহিত মুদ্রাকে বোঝায় যা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

বাংলাদেশে ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা।

এ মুদ্রা তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে মুদ্রার মানকে ধরে রাখে।

জনগণও এরূপ মুদ্রা পরিশোধ করে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা যত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারে।

এ মুদ্রার প্রচলনই বর্তমানে শতভাগ চলছে।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

বিহিত মুদ্রা (Legal Tender Money)

খ. সসীম বা সীমিত বিহিত মুদ্রা (Limited Legal Tender Money)

সসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন বিহিত মুদ্রাকে বোঝায় যা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়।

এ বিহিত মুদ্রা আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছানুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে ১ ও ২ টাকার কাগজি মুদ্রা এবং ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা হলো সসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা গ্রহণকারী কী পরিমাণ গ্রহণ করবে, বা আদৌ গ্রহণ করবে কী-না তা নির্ভর করবে, তার ইচ্ছার উপর।

এসব মুদ্রার বিনিময়ে জনগণ সমপরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা দাবি করতে পারে না।

বর্তমানে ১ টাকার কাগজি মুদ্রা ও ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রার প্রচলন তেমন লক্ষ করা যায় না।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

আমানত (Deposits)

সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে হিসাব খুলে তাকেই আমানত বলে।

তাহলে আমানত হলো ব্যাংকে গচ্ছিত জনসাধারণের মুদ্রা যা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন যায়।

আমানত দুই প্রকারের। যথা—

1. প্রাথমিক বা প্রকৃত আমানত ও
2. সৃষ্ট আমানত।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

জনসাধারণ ব্যাংকে হিসাব খুলে যে নগদ অর্থ জমা দেয় তা হলো **প্রাথমিক বা প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ আমানত**।

আর প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে যে হিসাব খুলে তাকে চেকের মারফতে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তা হলো **সৃষ্ট বা পরোক্ষ আমানত।**

আমানতকেও মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা চলে; কারণ তা দিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেনজনিত দেনা-পাওনা পরিশোধ করা যায়।।

তিন ধরনের হিসাব চালু করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যক্ষ আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যথা-

(ক) চলতি আমানত,

(খ) সঞ্চয়ী আমানত এবং

(গ) স্থায়ী আমানত ।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

ক. চলতি আমানত (Demand Deposits)

যে আমানতের অর্থ চাহিবামাত্র উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি আমানত বলে।

এ আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারী যেকোনো সময় আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারে, ফলে এ ধরনের আমানত নগদ অর্থের গুণসম্পন্ন। এ ধরনের আমানতের ওপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

এই চলতি আমানতের দ্বারা আমানতকারী তাদের দৈনন্দিন দেনা মিটিয়ে থাকে। এ আমানত দুই প্রকার। যথা-

১। সাধারণ চলতি আমানত ও

২। বিশেষ চলতি আমানত।

ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করেন তাদের চলতি আমানতের মাধ্যমে লেনদেন করা সুবিধাজনক।



বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

খ. সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits)

সঞ্চয়ী আমানত হচ্ছে এমন এক ধরনের আমানত যার ওপর কিছু সুদ দেওয়া হয় এবং এই সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কর্তৃক কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে এরূপ আমানত গঠন করা হয়।

আমানতকারী আমানতকৃত অর্থের ওপর সুদ লাভ করে, তবে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।

অধিক অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংককে পূর্বেই নোটিশ প্রদান করতে হয়।

এ ধরনের আমানত চাকরিজীবী এবং নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী।

এ আমানত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ন্যূনতম জমার পরিমাণ নেই।

ব্যাংকভেদে এ ন্যূনতম জমার পরিমাণে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

সঞ্চয়ী আমানত হলো সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের হিসাব, যারা তাদের বর্তমান আয়ের একটি অংশ ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং উক্ত সঞ্চয় হতে আয় অর্জনের জন্য ব্যাংকে জমা করে।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত
Legal Tender Money and Deposits

গ. স্থায়ী আমানত (Fixed Deposits)

নিরাপত্তা ও অধিক মুনাফার আশায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের লক্ষ্যে আমানত রাখেন, তখন সেই আমানতকে স্থায়ী বা মেয়াদি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে **একটি রসিদ প্রদান করে।**

উক্ত রসিদে আমানতকারীর হিসাব নম্বর, জমাকৃত টাকার পরিমাণ এবং আমানতের মেয়াদ ও সুদের হার উল্লেখ থাকে।

আমানতের মেয়াদ শেষে আমানতকারী উক্ত রসিদ ব্যাংকের কাছে জমা দিয়ে সুদসহ আমানতের সুদময় অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। মেয়াদের পূর্বেই উত্তোলন করলে আমানতকারীকে কম সুদ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে **আমানতের সর্বনিম্ন মেয়াদ ১ মাস, সর্বোচ্চ ১০ বছর হতে পারে।**

আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রথমে যে আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে থাকে, তাকে প্রাথমিক আমানত (প্রাথমিক রিজার্ভের পরিমাণ) বলে।

প্রাথমিক আমানত এবং তার ভিত্তিতে সৃষ্ট যে আমানত পাওয়া যায়, এ দুটির সমষ্টিকে মোট সম্প্রসারিত আমানত বলে।

বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে তুলনা

দ্রব্য ও সেবাকর্মের ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক আমানত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। তাদের মধ্যে তুলনা বা পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. বিহিত মুদ্রার আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে; কিন্তু ব্যাংক আমানতের তেমন স্বীকৃতি নেই।

২. দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বিহিত মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।

৩. বিহিত মুদ্রার তারল্য অসীম; সব সময়ই তা দিয়ে যেকোনো কিছু কেনা যায়। কিন্তু ব্যাংক আমানতের তারল্য খুব কম। ইচ্ছা করলেই তা দিয়ে দ্রব্য ও সেবাকর্ম কেনা যায় না।

৪. বিহিত মুদ্রায় লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের ওপর চেক প্রদান করলেই চলে।

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সাধারণ অর্থে মুদ্রার মূল্য বলতে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়।

মুদ্রা দ্বারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।

অর্থাৎ ১০০ টাকা দ্বারা ২ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে ঐ ২ কেজি চালই হলো ১০০ টাকার মূল্য।

পণ্যসামগ্রীর মূল্য যেমন মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তেমনিভাবে মুদ্রার মূল্যও পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

মুদ্রার মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

অর্থনীতিবিদ জে. এল. হ্যানসেন-এর মতে, "অর্থ যা ক্রয় করে তাই অর্থের মূল্য।"

অধ্যাপক ডি. এইচ. রবার্টসন-এর মতে, "এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পণ্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকেই অর্থের মূল্য বোঝায়।

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

আমরা সূত্রের সাহায্যে মুদ্রার মূল্য প্রকাশ করতে পারি—

ধরা যাক, ১ কেজি চালের দাম ২০ টাকা। তাহলে ২০ টাকার মূল্য ১ কেজি চাল। এক্ষেত্রে ১ টাকা= ১/২০ কেজি চাল।

সুতরাং $V_m = \frac{1}{p}$; যেখানে

V_m= Value of Money (মুদ্রার মূল্য),

P= Price Level (মূল্য স্তর)

উপরের সূত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,

P-এর মান বাড়লে $(\frac{1}{p})$ -এর মান কমে এবং অর্থের মূল্যও কমে।

আবার P-এর -এর মান কমলে $(\frac{1}{p})$ এর মান বাড়ে এবং অর্থের মূল্যও বাড়ে।

অর্থাৎ মূল্যস্তরের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে সমানুপাতিক হারে সম্পর্কিত।

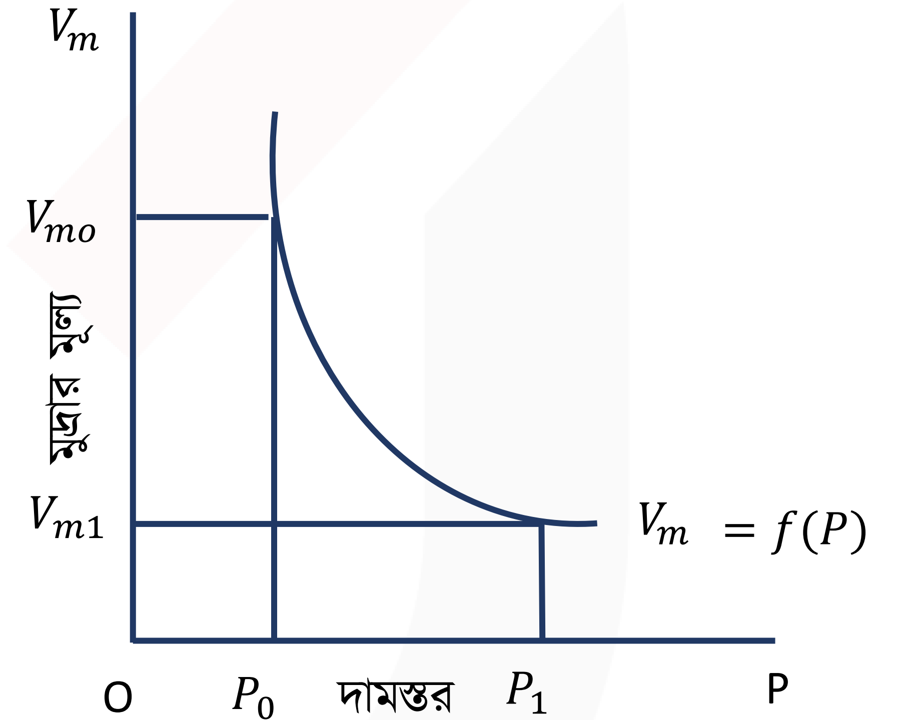
মুদ্রার মূল্য
Value of Money

মুদ্রার মূল্যের চিত্রভিত্তিক প্রকাশ:

প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দামস্তর ও লম্ব অক্ষে মুদ্রার মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে।

চিত্রে দামস্তর OP_o থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_1 হলে মুদ্রার মূল্য OV_{m_o} থেকে কমে V_{m_1} হয়।

অর্থাৎ P-এর সাথে V_m -এর সম্পর্ক বিপরীত।



চিত্রঃ দামস্তর ও মুদ্রার মুল্যের মধ্যকার সম্পর্ক

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

সংখ্যাসূচক উদাহরণ:

৫০ টাকা দ্বারা তথা ৫০ টাকা দামে ১ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে,

৫০ টাকার মূল্য = ১ কেজি চাল। অর্থাৎ ১ টাকা = ১/৫০ কেজি চাল।

আবার চালের দাম কমে ৪০ টাকা হলে,

তখন ৪০ টাকা = ১/৪০ কেজি চাল হবে। বিধায় মুদ্রার মূল্য ১ টাকা = ১/৪০ কেজি চাল হবে।

যেহেতু ১/৪০ > ১/৫০ তাই বলা যায়,

দামস্তর কমলে মুদ্রার মূল্য বাড়ে।

সুতরাং **দামস্তর ও মুদ্রার মূল্য বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ।**

মুদ্রার চাহিদা
Demand for Money

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার চাহিদা বলে।

বিশদভাবে বলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাংক ব্যতীত) যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তা হলো মুদ্রার চাহিদা।

মুদ্রা দিয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেনের নিষ্পত্তি করা যায়, হঠাৎ করে উদ্ভূত কোনো আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় কিংবা সুযোগ বুঝে ঋণপত্র কিনে লাভবান হওয়া যায় অর্থাৎ ফটকা কারবার করা যায়।

এসব কারণে জনসাধারণ হাতে নগদ মুদ্রা ধরে রাখতে চায়।

সুতরাং, মুদ্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জনসাধারণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখে তাকে মুদ্রার চাহিদা বলে।



মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আসলে মুদ্রার চাহিদা হয়।

তথা লোকে নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স (J.M. Keynes) এর ধারণানুযায়ী তিনটি উদ্দেশ্যে সমাজে তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার সৃষ্টি হয়। যথা—

১. লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা;

২. সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা এবং

৩. ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা।

এ তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার বিবরণ দেওয়া হলো-

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সাধারণ অর্থে মুদ্রার মূল্য বলতে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। মুদ্রা দ্বারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়। অর্থাৎ ১০০ টাকা দ্বারা ২ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে ঐ ২ কেজি চালই হলো ১০০ টাকার মূল্য। পণ্যসামগ্রীর মূল্য যেমন মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তেমনিভাবে মুদ্রার মূল্যও পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মুদ্রার মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

অর্থনীতিবিদ জে. এল. হ্যানসেন-এর মতে, "অর্থ যা ক্রয় করে তাই অর্থের মূল্য।"

অধ্যাপক ডি. এইচ. রবার্টসন-এর মতে, "এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পণ্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায় তাকেই অর্থের মূল্য বোঝায়।

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

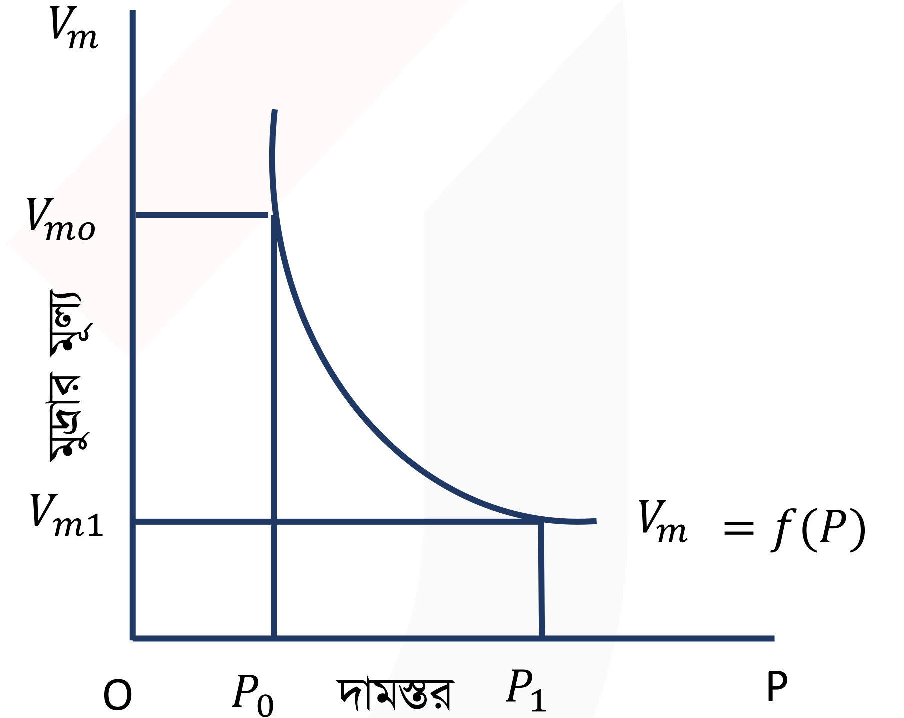
আমরা সূত্রের সাহায্যে মুদ্রার মূল্য প্রকাশ করতে পারি—

ধরা যাক, ১ কেজি চালের দাম ২০ টাকা। তাহলে ২০ টাকার মূল্য ১ কেজি চাল।

এক্ষেত্রে ১ টাকা= ১/২০ কেজি চাল। সুতরাং $V_m = \frac{1}{p}$; যেখানে V_m= Value of Money (মুদ্রার মূল্য), P= Price Level (মূল্য স্তর)

উপরের সূত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,

P-এর মান বাড়লে $(\frac{1}{p})$ -এর মান কমে এবং অর্থের মূল্যও কমে। আবার P-এর -এর মান কমলে $(\frac{1}{p})$ এর মান বাড়ে এবং অর্থের মূল্যও বাড়ে। অর্থাৎ মূল্যস্তরের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীতভাবে সমানুপাতিক হারে সম্পর্কিত।



চিত্রঃ দামস্তর ও মুদ্রার মুল্যের মধ্যকার সম্পর্ক

মুদ্রার মূল্য
Value of Money

মুদ্রার মূল্যের চিত্রভিত্তিক প্রকাশ: প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দামস্তর ও লম্ব অক্ষে মুদ্রার মূল্য পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দামস্তর OP_o থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_1 হলে মুদ্রার মূল্য OV_{m_o} থেকে কমে V_{m_1} হয়। অর্থাৎ P-এর সাথে V_m -এর সম্পর্ক বিপরীত।

সংখ্যাসূচক উদাহরণ: ৫০ টাকা দ্বারা তথা ৫০ টাকা দামে ১ কেজি চাল ক্রয় করা গেলে ৫০ টাকার মূল্য = ১ কেজি চাল। অর্থাৎ ১ টাকা = ১/৫০ কেজি চাল। আবার চালের দাম কমে ৪০ টাকা হলে, তখন ৪০ টাকা = ১/৪০ কেজি চাল হবে। বিধায় মুদ্রার মূল্য ১ টাকা = ১/৪০ কেজি চাল হবে।

যেহেতু ১/৪০ > ১/৫০ তাই বলা যায়, দামস্তর কমলে মুদ্রার মূল্য বাড়ে। সুতরাং দামস্তর ও মুদ্রার মূল্য বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ।

মুদ্রার চাহিদা
Demand for Money

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার চাহিদা বলে। বিশদভাবে বলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাংক ব্যতীত) যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তা হলো মুদ্রার চাহিদা। মুদ্রা দিয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেনের নিষ্পত্তি করা যায়, হঠাৎ করে উদ্ভূত কোনো আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় কিংবা সুযোগ বুঝে ঋণপত্র কিনে লাভবান হওয়া যায় অর্থাৎ ফটকা কারবার করা যায়। এসব কারণে জনসাধারণ হাতে নগদ মুদ্রা ধরে রাখতে চায়। সুতরাং, মুদ্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জনসাধারণ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখে তাকে মুদ্রার চাহিদা বলে।



মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আসলে মুদ্রার চাহিদা হয়। তথা লোকে নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স (J.M. Keynes) এর ধারণানুযায়ী তিনটি উদ্দেশ্যে সমাজে তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার সৃষ্টি হয়। যথা—

১. লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা;

২. সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা এবং

৩. ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা।

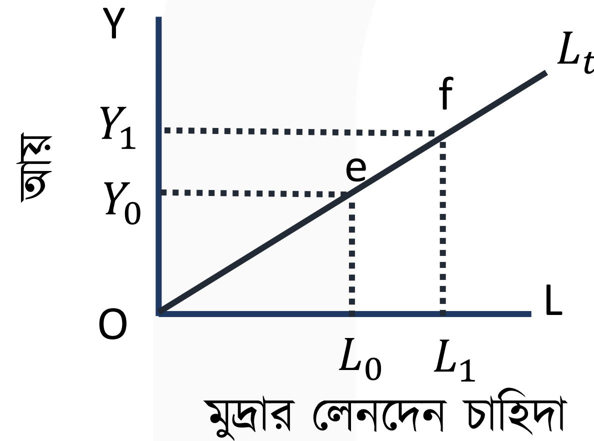
মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

নিচে এ তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদার বিবরণ দেওয়া হলো-

১. লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা (Transactionary Demand for Money): আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা বলে। পরিবারবর্গ বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় যত বেশি হয় তাদের আর্থিক লেনদেনও তত বেশি হয়। এ জন্য তাদের মুদ্রার লেনদেন চাহিদাও বেশি হয়। তাই মুদ্রার লেনদেন চাহিদা প্রধানত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা সুদের হার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। অবশ্য অর্থনীতিবিদ কেইনস মনে করেন, মুদ্রার লেনদেন চাহিদা কেবল আয়ের ওপর নির্ভরশীল। মুদ্রার লেনদেন চাহিদা ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিরাজ করে। প্রদত্ত চিত্রে রেখার সাহায্যে মুদ্রার এ চাহিদা দেখানো হলো:

মুদ্রার চাহিদার ধরন

Types of Demand for Money



চিত্রঃ মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা (L) ও লম্ব অক্ষে আয় (Y) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, আয় Yo হলে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা হয় Lo এবং আয় বেড়ে Y1 হলে এ চাহিদা বেড়ে হয় L1 যা যথাক্রমে e ও f বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন আয় ও অর্থের লেনদেন চাহিদা সম্পর্কসূচক e ও f বিন্দু দুটি যোগ করে যে L1 রেখাটি পাওয়া গেছে, এটি হলো মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখা। মুদ্রার লেনদেন চাহিদা ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায় L1 রেখাটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে।

মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

২. সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা (Precautionary Demand for Money): পূর্বে পরিকল্পনা করা যায় না এমন ব্যয় মেটানোর জন্য জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, ব্যবসায়ে ক্ষতি, চাকরিচ্যুতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হঠাৎ করে মুদ্রার প্রয়োজন পড়লে তা মেটানোর জন্য মুদ্রার এ চাহিদা হয়।

মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভর করে। আয় বাড়লে ও কমলে মুদ্রার এ চাহিদাও যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। সুতরাং বলা যায়, আয়ের সাথে মুদ্রার এ চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। এজন্য মুদ্রার এ চাহিদা রেখা, মুদ্রার লেনদেন চাহিদা রেখার মতোই বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

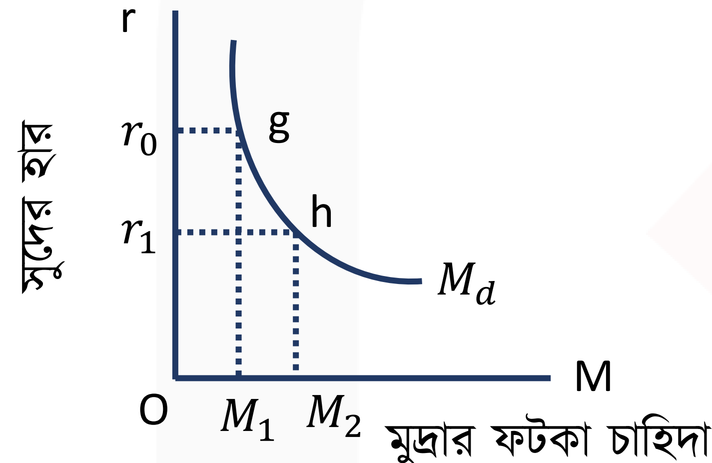
মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

৩. ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা (Speculative Demand for Money): কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে। তাই ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকেই মুদ্রার ফটকা চাহিদা বলে। অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের ওপর নির্ভর করে।

বাজারে সুদের হার বেশি হলে ফটকা মুদ্রার চাহিদা কম হয়। কারণ তখন ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। আবার সুদের হার কমলে মুদ্রার ফটকা চাহিদা বেশি হয়; কারণ তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে যে আয় হয় তার চেয়ে ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত আয় বেশি হয়। তাই দেখা যায়, সুদের হারের সাথে মুদ্রার ফটকা চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

মুদ্রার চাহিদার ধরন
Types of Demand for Money

রেখাচিত্রের সাহায্যে মুদ্রার এ চাহিদা দেখানো যায়:



চিত্র: মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখা

চিত্রে, ভূমি অক্ষে মুদ্রার ফটকা কারবারজনিত চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে সুদের হার r পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, সুদের হার ro থেকে r1 এ কমলে মুদ্রার ফটকা চাহিদা Mo থেকে বেড়ে M1 হয়, যা যথাক্রমে g ও h বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। সুদের হার ও মুদ্রার ফটকা চাহিদার সম্পর্ক সূচক g ও h বিন্দু দুটি যোগ করে যে M1 রেখাটি পাওয়া গেছে, তাই হলো মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখা। মুদ্রার ফটকা চাহিনা ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকায় M1 রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে।

মুদ্রার চাহিদার উপাদান

Factors of Demand of Money

মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য মুদ্রার চাহিদা হয়। মুদ্রার চাহিদার উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. আয়: মুদ্রার লেনদেন ও সতর্কতামূলক চাহিদা সরাসরি আয়ের ওপর নির্ভরশীল। যে পরিবারের আয় বেশি তার লেনদেনের প্রয়োজনও বেশি। আবার আয় বেশি হলে পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশি চিন্তা-ভাবনা হয়। এ জন্য আয় বেশি হলে মুদ্রার চাহিদাও বেশি হয়।

২. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা: প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান বেশি হলে মানুষ ভোগের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে। ফলে অর্থের লেনদেন চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটিও মুদ্রার চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা: অর্থের চাহিদার একটি অন্যতম উপাদান হলো প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা। প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বেশি হলে অর্থের লেনদেন চাহিদা কমে যায়। আর প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা কম হলে অর্থের লেনদেন চাহিদা বেড়ে যায়।

মুদ্রার চাহিদার উপাদান

Factors of Demand of Money

৪. আয় প্রাপ্তির মেয়াদ: অর্থের চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আয় প্রাপ্তির মেয়াদ। যে ব্যক্তি প্রতিদিনের বেতন প্রতিদিন পেয়ে থাকেন তার নগদ অর্থের চাহিদা কম হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি মাসের শেষে বেতন পেয়ে থাকেন তাহলে তার নগদ অর্থের চাহিদা বেশি হবে। অর্থাৎ আয় প্রাপ্তির মেয়াদ যত বেশি হয় অর্থের চাহিদাও তত বেশি হয়।

৫. সুদের হার: সুদের হার বেশি হলে মানুষ বেশি করে সঞ্চয় করে। ফলে নগদ অর্থ হাতে কম রাখতে চায়। অন্যদিকে, সুদের হার হ্রাস পেলে মানুষ কম করে সঞ্চয় করতে চায়। ফলে নগদ অর্থ হাতে রাখার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার সুদের হার কমলে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদা বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়।

৬. দামস্তর: দামস্তর অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। দামস্তর বেড়ে গেলে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণ নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে দাম হ্রাস পেলে নগদ অর্থের চাহিদা কমে যায়।

মুদ্রার চাহিদার উপাদান

Factors of Demand of Money

৭. মুদ্রা বাজার: দেশের মুদ্রা বাজার শক্তিশালী হলে তথ্য অধিক সংখ্যক উন্নতমানের ও সুগঠিত ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান থাকলে নগদ অর্থ হাতে বেশি রাখতে হয় না। অপরদিকে মুদ্রা বাজার অনুন্নত ও অসংগঠিত হলে তথা অধিক সংখ্যক উন্নত মানের ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান না থাকলে মানুষের নগদ অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়।

৮. ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা: ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা এবং ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশা থাকলে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রার চাহিদা বেশি হয়।

মুদ্রার যোগান Supply of Money

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে মুদ্রার যোগান অন্যতম। সাধারণভাবে অর্থের যোগান দ্বারা একটি দেশের মোট অর্থের পরিমাণ প্রকাশ পায়। মোট অর্থের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা (কারেন্সি) ও চাহিদা আমানত অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রচলিত মুদ্রা বলতে সব রকমের ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোটের সমষ্টিকে বোঝানো হয়। ব্যাংকের চাহিদা আমানত বলতে সেই আমানতকে বোঝানো হয়, যা থেকে আমানতকারী চাওয়া মাত্র অর্থ তুলতে পারে। সুতরাং অর্থের যোগানের সংজ্ঞা দাঁড়ায়— একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত মুদ্রা (কারেন্সি) ও চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।

মুদ্রার যোগান
Supply of Money

সংজ্ঞানুসারে, অর্থের যোগান $M_s = C_p + DD;$

যেখানে, M_s অর্থের যোগান,

C_p = জনগণের নিকট কারেন্সির পরিমাণ (Currency held by people) এবং

DD = জনগণের চাহিদা আমানত (Demand Deposits or Current Account)।

উপরের সংজ্ঞাকে অনেকে সংকীর্ণ সংজ্ঞা বলেন। কিন্তু এটিই অধিক ব্যবহৃত সংজ্ঞা।

অর্থের যোগানের অন্তর্ভুক্ত উপাদান বাড়িয়ে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান (১৯১২-২০০৬) অর্থের যোগানের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করেন।

তার $M_s = C_p + DD + TD$; যেখানে TD মেয়াদি আমানতের পরিমাণ (Time Deposits or Fixed Deposit)।

মুদ্রার যোগানের উপাদান
Constituents of Money Supply

মুদ্রার যোগান কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট। নিচে মুদ্রার যোগানের উপাদানগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. জনগণের হাতে মুদ্রা (Currency with the Public):

জনগণের হাতে মুদ্রা হলো মোট মুদ্রার যোগান থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে সংরক্ষিত কারেন্সি নোট এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্টে রক্ষিত নোট এ দুয়ের সমষ্টির বিয়োগফল। সংক্ষেপে সমীকরণটি হলো নিম্নরূপ:

$CU = MS - (CC+CB);$

যেখানে, CU = জনগণের হাতের মুদ্রা, MS = মুদ্রার সরবরাহ,

CC = কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে সংরক্ষিত মুদ্রা এবং

CB = বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্টে রক্ষিত নোট।

উল্লেখ্য, CC ও CB উপাদান দুটি কখনো জনগণের হাতে আসে না। তাই জনগণের হাতের মুদ্রা থেকে তা বাদ দেওয়া হয়।

মুদ্রার যোগানের উপাদান
Constituents of Money Supply

২. চাহিদা আমানত (Demand Deposits)

ব্যাংকে গচ্ছিত ঐ আমানতকে চাহিদা আমানত বলে। যা গ্রাহকরা চাওয়ামাত্র ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

এ ধরনের আমানত যারা ব্যাংকে রাখে তারা তা যেকোনো সময় নগদ অর্থে রূপান্তরিত করতে পারে অথবা লেনদেনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। চলতি আমানতের বিপক্ষে চেক ইস্যু করে লেনদেন সম্পাদন করা হয়।

উন্নত দেশগুলোতে বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন চলতি আমানতের বিপক্ষে চেক ইস্যু করে সম্পাদন করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এ ধরনের লেনদন শুরু হচ্ছে। চাহিদা আমানত মুদ্রার মতোই কাজ করে বলে তা মুদ্রার যোগানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমীকরণের সাহায্যে মুদ্রার যোগানের এ উপাদানটি প্রকাশ করা যায়; $DD = MS - (CU+TD)$;

যেখানে, MS = মুদ্রার সরবরাহ, CU = জনগণের হাতের মুদ্রা, DD = চাহিদা আমানত ও TD= মেয়াদি আমানত।

অন্য কথায়, মুদ্রার মোট যোগান থেকে জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি বাদ দিলে যা থাকে তাই চাহিদা আমানত।

মুদ্রার যোগানের উপাদান
Constituents of Money Supply

৩. মেয়াদি আমানত (Time Deposits)

ব্যাংক ও যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত যে মুদ্রা **নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সুদসহ উত্তোলন করা যায় না** তাকে মেয়াদি আমানত বলে। এটিও মুদ্রার যোগানের একটি উপাদান। মেয়াদি আমানত বলতে মোট মুদ্রার যোগান থেকে চাহিদা আমানত এবং জনগণের হাতের মুদ্রা বাদ দিলে যা থাকে তাকে বোঝায়।

সমীকরণের সাহায্যে বলা যায়; **TD = MS - (CU +DD);**

যেখানে, TD = মেয়াদি আমানত, MS = মুদ্রার সরবরাহ, CU = জনগণের হাতের মুদ্রা, DD = চাহিদা আমানত।

তাই উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, **মুদ্রার যোগানের উপাদান হলো প্রধানত তিনটি;**

যথা- **১. জনগণের হাতের মুদ্রা (CU),**

২. ব্যাংকের চাহিদা আমানত (DD) এবং

৩. ব্যাংকের মেয়াদি আমানত (TD)।

অর্থ সরবরাহ MS = CU + DD + TD।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অর্থের মূল্য পরিবর্তন এবং নির্ধারণ সম্পর্কিত তত্ত্বই মূলত অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব।

১৮৮৬ সালে সাইমন নিউকম্ব (Simon Newcomb) তার 'Principle of Political Economy' নামক গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য রাখেন। মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার (Irving Fisher) ১৯১১ সালে তার "Purchasing Power of Money" নামক গ্রন্থে Simon Newcomb-এর বক্তব্যকে পরিমার্জন এবং সম্প্রসারণ করেন।

এ তত্ত্বকে 'Quantity Theory of Money' বলা হয়।

মূলবক্তব্য:

ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয় যে, অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যেভাবে নির্ধারিত হয় অর্থের মূল্যও ঠিক একইভাবে নির্ধারিত হয়।

অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যেমন তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থের মূল্যও অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ফিশারের মতে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় অর্থের পরিমাণের সাথে অর্থের মূল্য সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে অর্থের মূল্য ঐ একই হারে কমে।

আর অর্থের যোগান যে হারে কমে অর্থের মূল্যও ঐ একই হারে বাড়ে।

অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্যও দ্বিগুণ হবে।

অতএব ফিশারের মতে,

'অর্থের যোগানের ওপরই অর্থের মূল্য নির্ভর করে এবং অর্থের যোগানের পরিবর্তন হলে অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।'

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

ফিশারের তত্ত্বের অনুমিত শর্ত

১. অর্থ কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত,

২. শুধু লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয়,

৩. অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বিরাজমান,

৪. স্বল্পকালে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও লেনদেন স্থির থাকে,

৫. লেনদেনের পরিমাণ স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতিও স্থির থাকে,

৬. অর্থের চাহিদা ও যোগান সর্বদা সমান থাকে এবং

৭. দ্রব্যের দামস্তরের কোনো ভূমিকা নেই।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা: ফিশারের মতে, অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও তার চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

শুধু পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অর্থের চাহিদা হয়।

সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা নির্ভর করে **ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T)** এবং **দামের (P)** ওপর।

সেজন্য মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T)-এর সাথে দাম (P) গুণ করলেই অর্থের মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

$$MD = PT$$

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অর্থের যোগান (Supply of Money)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণই হলো অর্থের যোগান।

অর্থের মোট যোগান বিহিত মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত নোট ও কয়েন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র (চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড)-এর সমষ্টি।

তাছাড়া এদের প্রচলন গতিও (V) বিবেচনায় আনতে হবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা যতবার হাত বদলায় তাকে অর্থের প্রচলন গতি (Velocity of Circulation) বলা হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অর্থের যোগান (Supply of Money)

যেমন—

১ বছরে ১০ টাকার একটি নোট ১০০ বার হাত বদল হলে নোটটি ১০০টি নোটের কাজ করল।

মোট বিহিত মুদ্রাকে (M) তাদের প্রচলন গতি দ্বারা গুণ করে মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ পাওয়া যায়।

তেমনিভাবে ব্যাংক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র (M_1) যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমেও কেনাবেচা হয়। এগুলোরও প্রচলনগতি (V_1) আছে।

ঋণপত্র (M_1)-কে তাদের প্রচলন গতি (V_1) দ্বারা গুণ করলে মোট ঋণপত্রের পরিমাণ পাওয়া যাবে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

অতএব, অর্থের মোট যোগান হলো মোট বিহিত মুদ্রা এবং ঋণপত্রের পরিমাণ ও নোটের প্রচলন গতির গুণফলের সমান।

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ (Fisher's Equation of Exchange): আরভিং ফিশার নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন।

তার সমীকরণটি হলো—

$$PT = MV + M_1V_1$$

$$P = \frac{MV + M_1V_1}{T}$$

যেখানে, P= দামস্তর/মূল্যস্তর,

M= বিহিত মুদ্রার পরিমাণ,

V= বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি,

M_1 =ঋণপত্র,

V_1 = ঋণপত্রের প্রচলন গতি,

T= দ্রব্য সেবার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

ফিশারের মতে,

একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদা (PT) এবং যোগান ($MV + M_1 V_1$) সমান হয়।

যেহেতু ক্রয় বিক্রয়ের জন্যই শুধু অর্থের চাহিদা হয়, সেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হয় তাই অর্থের চাহিদা। তার মতে,

স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ (T) স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতি (V) এবং ঋণপত্রের প্রচলনগতি (V_1) স্থির থাকে। ফলে অর্থের পরিমাণ (M ও M_1) যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হয়।

অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে। যেহেতু দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্য বিপরীত ও সমানুপাতিক, সেহেতু দামস্তর দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং দামস্তর অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। সুতরাং, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। এটাই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারীয় ভাষ্যের মূল বক্তব্য।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

গাণিতিক উদাহরণ:

ধরা যাক, M =100. V = 5, M_1 =50, V_1 = = 5 এবং T = 25

তাহলে, $P = \frac{(100\times5)+(50\times5)}{25} = \frac{500+250}{25} = \frac{750}{25} = 30$

$$PT = MV + M_1V_1$$

$$P = \frac{MV+M_1V_1}{T}$$

এখন M এবং M_1 বেড়ে দ্বিগুণ হলে—

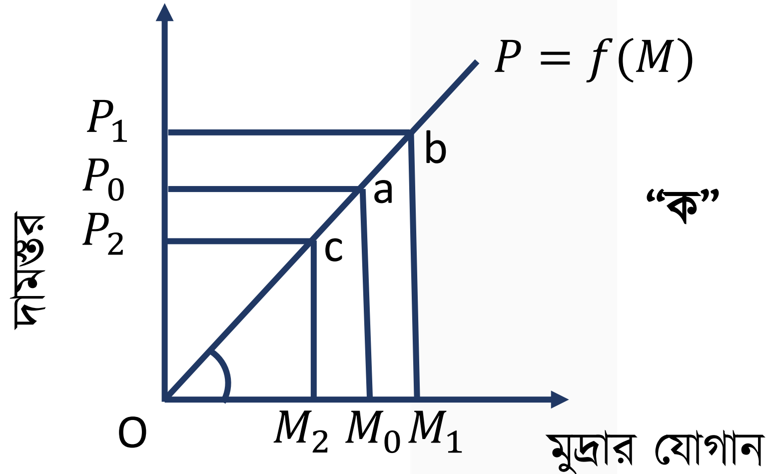
$$P = \frac{(200\times5)+(100\times5)}{25} = \frac{1000+500}{25} = \frac{1500}{25} = 60$$

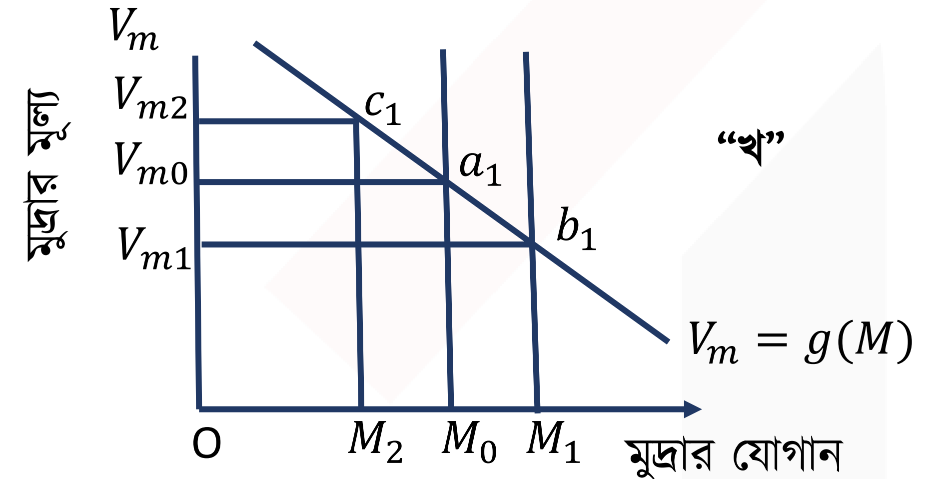
সুতরাং, অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়। ফলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। আবার M এবং M_1 অর্ধেক হলে

$$P = \frac{(50\times5)+(25\times5)}{25} = \frac{250+125}{25} = \frac{375}{25} = 15$$

অতএব; অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version





চিত্রঃ রেখাচিত্রের সাহায্যে মুদ্রার যোগান এবং দামস্তর ও মুদ্রার মুল্যের মধ্যে সম্পর্ক

রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ:

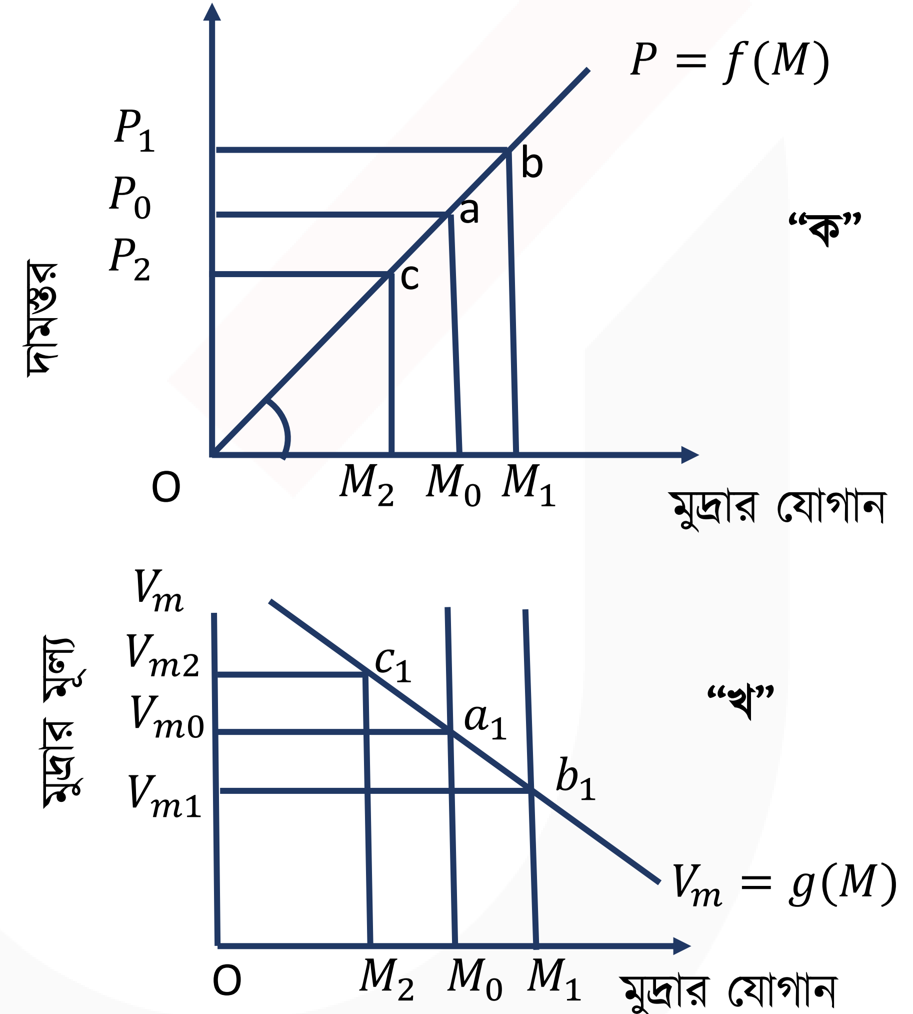
প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' উভয় চিত্রেই ভূমি অক্ষে মুদ্রার যোগান (M).

'ক' চিত্রে লম্ব অক্ষে দামস্তর (P) এবং 'খ' চিত্রে লম্ব অক্ষে মুদ্রার মুল্য (V_m) পরিমাপ করা হয়েছে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

'ক' চিত্রে P =f(M) রেখা ৪৫° হওয়ায় তা মুদ্রার যোগান ও দামস্তরের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক দেখায়।

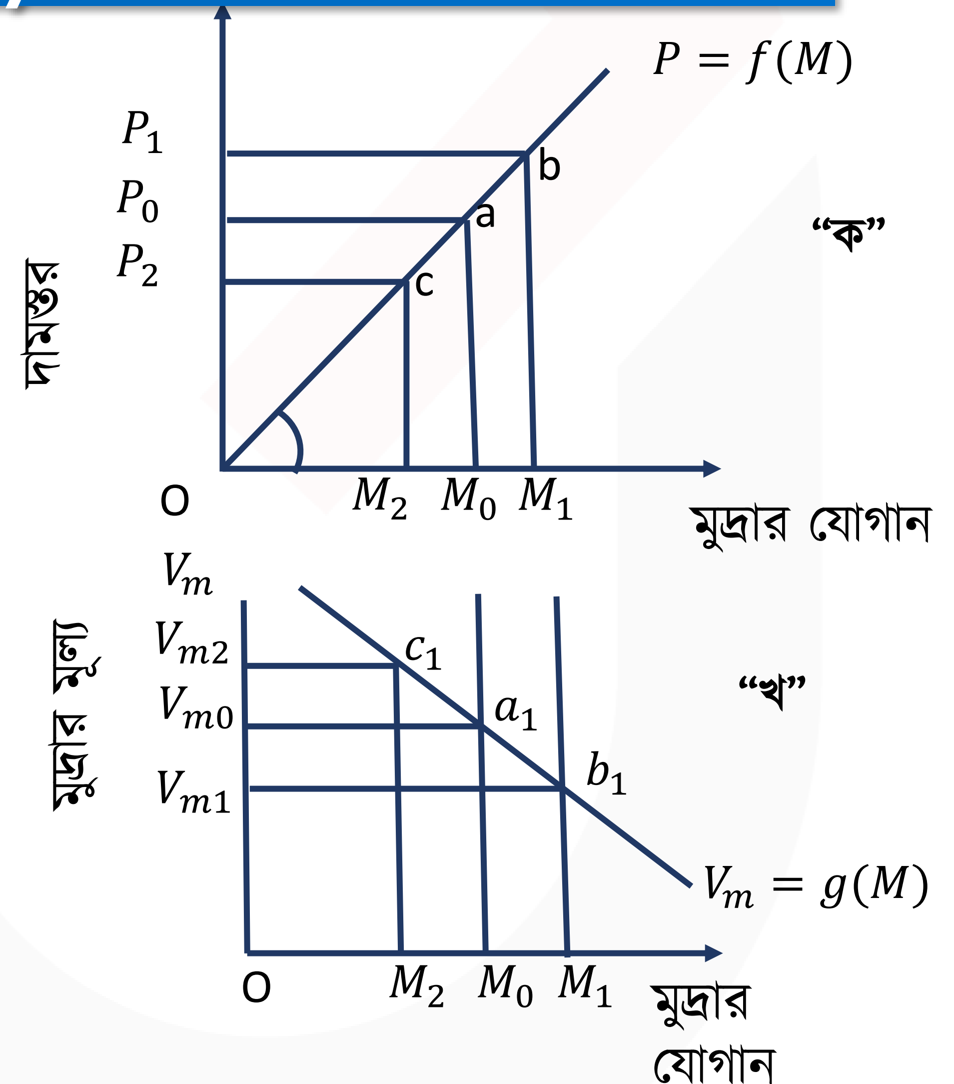
'ক' চিত্রে দেখা যায়, মুদ্রার যোগান **OM_0** থেকে বেড়ে **OM_1** হলে দামস্তরও সমানুপাতিকভাবে বেড়ে **OP_0** থেকে **OP_1** হয় তখন 'খ' চিত্রে মুদ্রার মূল্য **OV_{m_0}** থেকে কমে **OV_{m_1}** হয়।



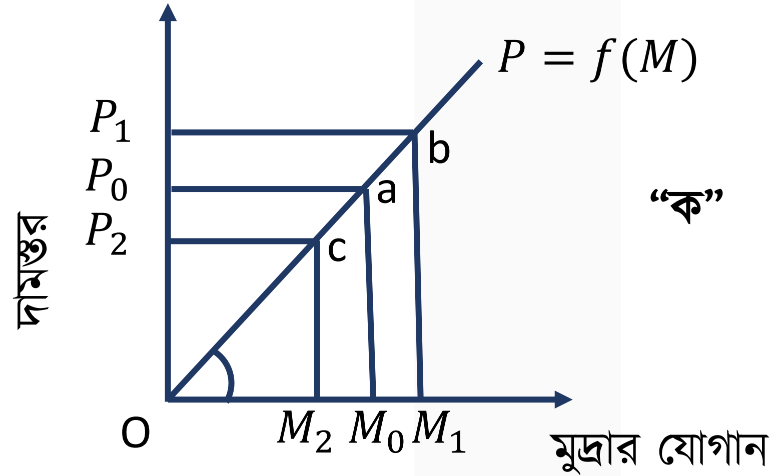
মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

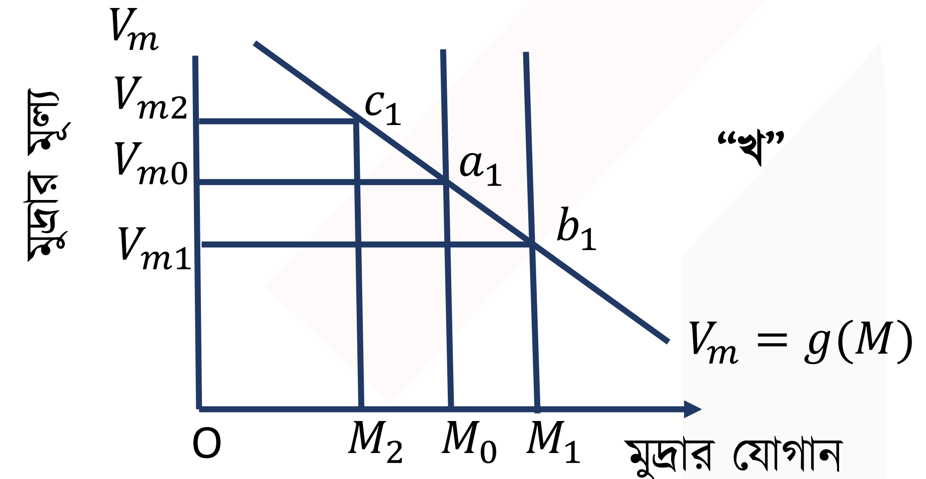
আবার 'ক' চিত্রে যখন মুদ্রার যোগান **OMo** থেকে কমে **OM2** হয় তখন দামস্তরও কমে **OPo**, থেকে **OP2;** হয় .

তখন 'খ' চিত্রে মুদ্রার মূল্য OV_{m_0} থেকে বেড়ে OV_{m_2} হয়।



মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version





চিত্রঃ রেখাচিত্রের সাহায্যে মুদ্রার যোগান এবং দামস্তর ও মুদ্রার মুল্যের মধ্যে সম্পর্ক

সুতরাং **অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায়।**

অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অতএব,

অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সরাসরি কিন্তু অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা

ফিশার প্রদত্ত মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বটি নানা দোষ-ত্রুটির কারণে নিম্নোক্ত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

১. মুদ্রার যোগান স্থির থাকলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভোক্তার রুচি, ফ্যাশন, জনসংখ্যা, মজুরি, পরোক্ষ কর প্রভৃতি উপাদানের পরিবর্তনের কারণে দামস্তরের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাই মুদ্রার যোগানের পরিবর্তন দামস্তর পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হতে পারে না।

২. বিভিন্ন কারণে T, V এবং V_1 পরিবর্তিত হয় এবং এজন্য M ও P-এর মধ্যে পরিবর্তন সবসময় সমানুপাতিক হয় না। তাই দামস্তর ও মুদ্রার যোগানের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক সঠিক নয়।

৩. কেবল পূর্ণ নিয়োগস্তরের পরেই মুদ্রার যোগানের বৃদ্ধি দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটায়। কারণ পূর্ণ নিয়োগস্তরের নিচে মুদ্রার যোগান বাড়ানো হলে তা দামস্তর না বাড়িয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ায়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব- ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money- Fisherian Version

ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা

৪. মূল্য সংরক্ষণ, ঋণ পরিশোধ, ফটকা কারবার প্রভৃতি কারণেও মুদ্রার চাহিদা হতে পারে। তাই মুদ্রা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় তা ঠিক নয়।

৫. তত্ত্বটিতে মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে মুদ্রার যোগানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে তার চাহিদার গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়েছে। এটি দাম নির্ধারণ তত্ত্বের পরিপন্থি।

অর্থনীতিবিদ ফিশারের মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বের উল্লিখিত ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে, মুদ্রার পরিমাণ তথা যোগানের সাথে দামস্তরের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সে কথা তত্ত্বটি থেকে জানা যায়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পরবর্তীতে অধ্যাপক ফিসার (Irving Fisher) ১৯১১ সালে 'The Purchasing Power of Money' গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তাই ফিসারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৮৮৬ সালে Simon Newcomb তাঁর 'Principle of Political Economy'-তে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে যে মতামত রাখেন তাকেই পরিমার্জিত করেন ফিসার। এজন্য অনেকে ফিসারের তত্ত্বকে 'Newcomb-Fisher Approach' বলে।

এ তত্ত্বকে American version of quantity theory of money বলা হয়।

আবার অনেকে এ তত্ত্বকে 'Crude Quantity Theory' বা 'Old Fashioned Quantity Theory of Money' বলে ।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

মূল বক্তব্য:

ফিসারের মতে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি ও বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক সমানুপাতিক হবে। তখন দ্রব্যের দামের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত হয়। সে অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, অর্থের যোগানের পরিবর্তন 'দামস্তরের উপর সরাসরি আনুপাতিক প্রভাব বিস্তার করে।

(... money supply changes would have a direct proportional effect on the price level.)

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

অনুমিত শর্ত:

ফিসারের তত্ত্বটি নিম্নোক্ত অনুমিত শর্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:

১. সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য থাকে ।

২. পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান

৩. অর্থকে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. অর্থের প্রচলনগতি স্বল্পকালীন সময়ে স্থির থাকে ।

৫. মোট লেনদেনের পরিমাণ স্বল্পকালীন সময়ে স্থির থাকে।

৬. দ্রব্যের দামস্তর নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

বিনিময় সমীকরণ (Equation of exchange):

অধ্যাপক ফিসার তাঁর প্রদত্ত মূল বক্তব্যকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করেন :

$MV = PT$

যেখানে,

M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ (Money supply),

V = অর্থের গড় প্রচলন গতি (Velocity of money),

P = সাধারণ দামস্তর (Price level) এবং

T = লেনদেনের পরিমাণ (Transaction)।

এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে V ও T স্থির থাকলে M এর সাথে P এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক।

অর্থাৎ অর্থের যোগান বাড়লে দ্রব্যের দামস্তরও বাড়ে।

ফিসারের মতে, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মতো অর্থের মূল্য এর চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয় ।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

অর্থের চাহিদা (Demand of money = PT):

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও দামের উপর নির্ভর করে।

সুতরাং লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণকে (T) এর দাম (P) দিয়ে গুণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অর্থের চাহিদা পাওয়া যায়।

অর্থের যোগান (Supply of Money = MV):

অর্থের যোগান বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে বোঝায়।

আধুনিক সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ, সরকারি মুদ্রার পরিমাণ ও যে পরিমাণ ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়, তার সমষ্টিকে বোঝায়।

আবার একটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাত বদলায়, এটি তত টাকার কাজ করে, এটিই অর্থের প্রচলন গতি।

তাই মোট অর্থের পরিমাণকে (M) এর প্রচলন গতি (V) দ্বারা গুণ করে মোট অর্থের যোগান (MV) পাওয়া যায় ।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

বিনিময় সমীকরণের প্রসারণ:

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বলতে কেবলমাত্র কাগজি ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণকে বোঝায় না, ব্যাংকের চলতি ও সৃষ্ট আমানত বা ঋণও অর্থ যোগানের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে ফিসার তাঁর সমীকরণটি সংশোধন করে। নিম্নোক্ত সমীকরণ প্রকাশ করেন $PT = MV + M'V'$ ।

বা, $MV + M'V' = PT$

এক্ষেত্রে,

M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ,

V' = ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি।

তাঁর মতে, এক্ষেত্রেও অন্যান্য উপাদান স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (M ও M') যে হারে পরিবর্তিত হবে, দামস্তরও (P) একই হারে পরিবর্তিত হবে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

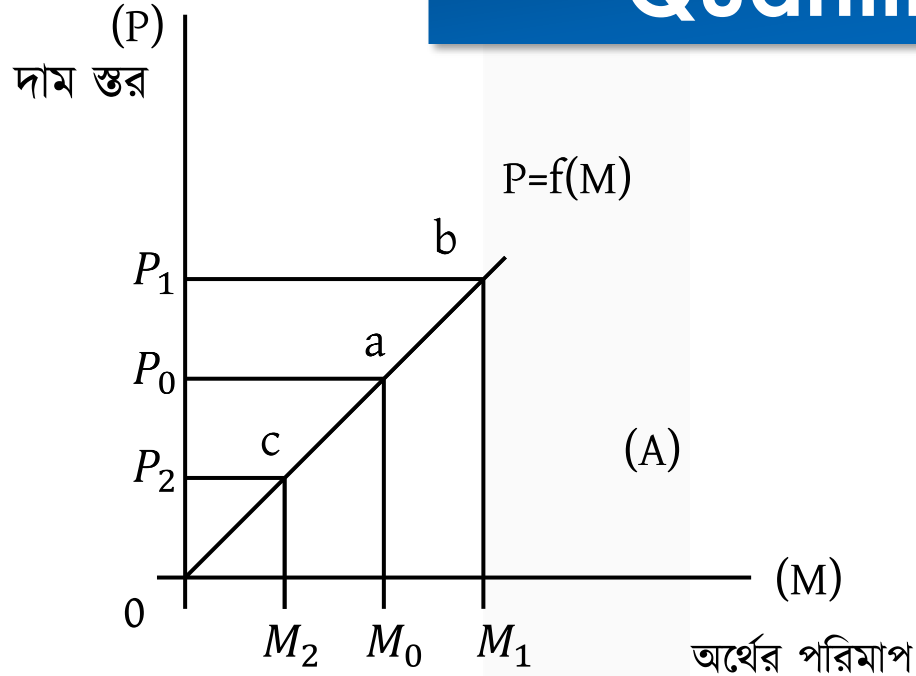
উদাহরণঃ

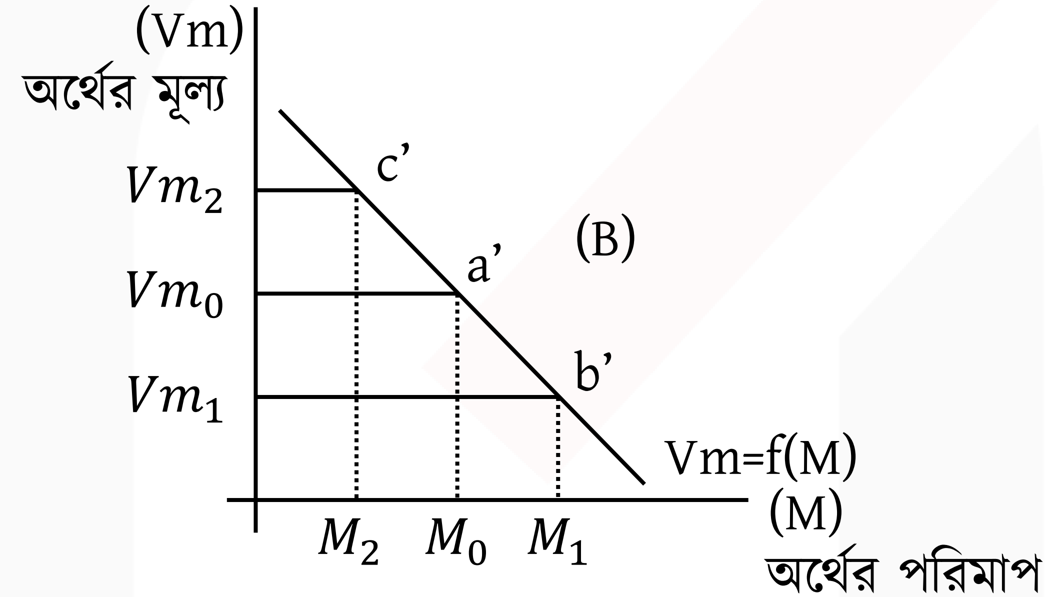
পর্যায়	M	V	M’	V’	T	$P=\frac{MV+M'V'}{T}$	$Vm=\frac{1}{P}$
1	100	5	100	5	10	$P=\frac{500+500}{10}=100$	$Vm=\frac{1}{100}=0.01$
2	200	-	200	-	-	$P=\frac{1000+1000}{10}=200$	$Vm=\frac{1}{200}=0.005$
3	50	-	50	-	-	$P=\frac{250+250}{10}=50$	$Vm=\frac{1}{50}=0.02$

অতএব বোঝা যায়, V, V' ও T' স্থির থেকে M ও M' বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও (P) বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়, অর্থমূল্য (Vm) হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়।

M ও M' হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হলে দামস্তরও হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয় কিন্তু অর্থমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

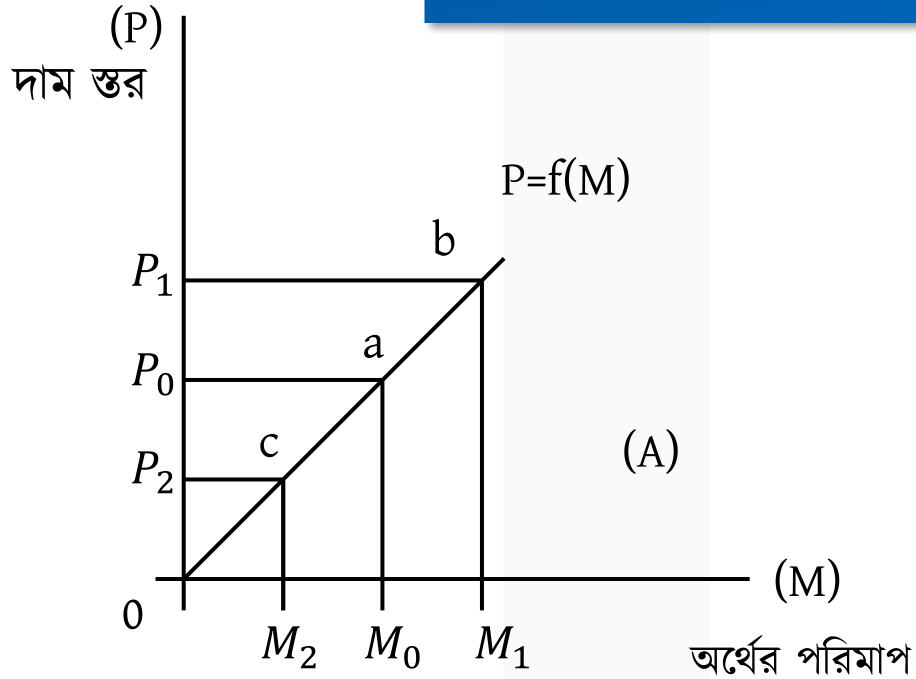


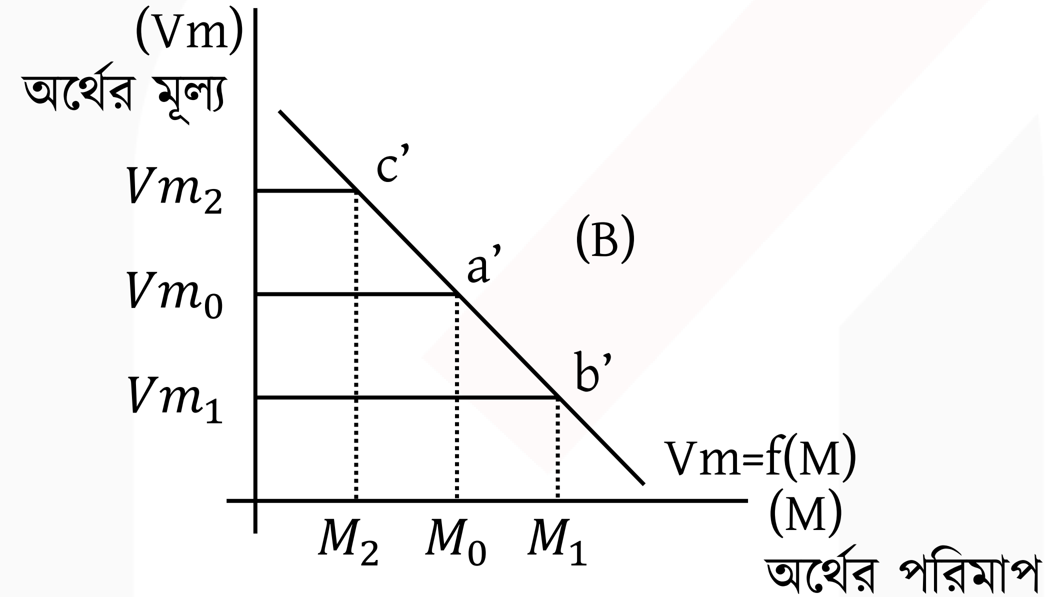


চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের পরিমাণ (M), লম্ব অক্ষে (A) চিত্রে দামস্তর P ও (B) চিত্রে অর্থমূল্য (Vm) পরিমাপ করা হয়।

(A) চিত্রে লক্ষণীয় যে, অর্থের যোগান OMo, থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হলে, দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে OP_0, থেকে OP_1, হয়। আবার, অর্থের যোগান হ্রাস পেয়ে OM_2 হলে দামস্তর হ্রাস পেয়ে OP_2হয়। (B) চিত্রে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে OMo থেকে OM_1 হলে অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে OVm_0 থেকে OVm_1 হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money





আবার অর্থের যোগান হ্রাস পেয়ে OM_2 হলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে OVm_2 হয়।এ থেকে বোঝা যায়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সরাসরি কিন্তু অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

সমালোচনা: অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি নিম্নোক্ত সমালোচনার সম্মুখীন:

১. ফিসারের সমীকরণ (MV = PT) একটি তাৎপর্যহীন অভেদ। অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থ প্রদানের মধ্যে শুধু সমতা সৃষ্টি করে, কোনো কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে না।

২. অর্থমূল্য একটি পরিবর্তনশীল ধারণা, তাই এ তত্ত্বটি গতীয় অর্থনীতিতে অচল।

৩. জনসংখ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রুচি প্রভৃতির বৃদ্ধি-হ্রাস, উত্থান-পতন রয়েছে। এ অবস্থায় দামস্তর নিষ্ক্রিয় বা স্থির নয় ।

৪. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শুধু অর্থকে বিবেচনা করা ঠিক নয়। অর্থ মূল্যেরও সংরক্ষক।

৫. পূর্ণ নিয়োগ একটি অবাস্তব ধারণা।

৬. ফিসারের সমীকরণে M ও V দুটি স্বতন্ত্র উপাদান। তাই এদের গুণফল অঙ্ক শাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

সমালোচনা: অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি নিম্নোক্ত সমালোচনার সম্মুখীন:

৭. মূল্যস্তরের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই এ তত্ত্বে বর্ণিত V, V' ও T অপরিবর্তিত থাকে বলে যে শর্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঠিক নয় ।

৮. ফিসারের তত্ত্ব অনুসারে দামস্তর (P) হলো বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের দামের গড়। কিন্তু P এর মাঝে জীবনধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় বন্ড, সিকিউরিটি পত্র ইত্যাদির দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে বিধায় অধ্যাপক হ্যানসেন (Hansen) P কে একটি গোজামিল বা জগাখিচুড়ি (Hotch-potch) দামস্তর বলেন।

৯. এ তত্ত্বে সুদের হারের প্রভাবকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

১০. এ তত্ত্বে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity Theory of Money

সমালোচনার দোষে দুষ্ট ফিসারের সমীকরণ স্বল্পকালীন সময়ে মূল্যস্তরের পরিবর্তন বা বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তবে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘকালীন সময়ে ফিসারের এ বক্তব্যটি অবশ্যই প্রযোজ্য হয়।

অর্থের পরিমাণ যে দামস্তরকে প্রভাবিত করে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো ১৯২৩ সালে জার্মানির ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি।

অতএব বলা যায়, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কার্যের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে এ তত্ত্বটি বিবেচিত।

ব্যাংক
Bank

ইংরেজি শব্দ Bank (ব্যাংক) অনেকের মতে জার্মান শব্দ 'Banck' থেকে উদ্ভূত।

আবার অনেকে মনে করেন এটি ইতালীয় শব্দ 'Banco' থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

খ্রিষ্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক শান্সী ব্যাংক (Shansi Bank) এবং ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক 'ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice)' স্থাপন করা হয়।

সংজ্ঞাগত দিক থেকে 'ব্যাংক' অর্থ –

এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং জমাকৃত অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং ব্যবসায় বাণিজ্য, উৎপাদন বা ভোগের নিমিত্তে ঋণদান করে থাকে।

ব্যাংক
Bank

সংগৃহীত আমানতি অর্থের উপর আমানতকারীকে অপেক্ষাকৃত কম সুদ প্রদান করে কিন্তু ঋণ গ্রহণকারীর উপর চড়া সুদ আরোপ করে।

প্রাপ্ত সুদের উদ্বৃত্ত অংশই ব্যাংকের মুনাফা সৃষ্টি করে।

যেমন:

সঞ্চয়কারীকে তার অর্থ জমা রাখার জন্য সুদ দেয় ৬% হারে এবং ঋণগ্রহণকারীকে ঋণের জন্য সুদ আরোপ৬ করে ১৪% হারে। ফলে (১৪%-৬%) বা ৮% মুনাফা হিসেবে ব্যাংক পেয়ে থাকে।

ব্যাংক, ঋণ লেনদেনের ব্যবসার সাথে সাথে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, অর্থ স্থানান্তর, বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত থাকে।

****বিনিময় বিলের অর্থ ধারক কর্তৃক মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নির্দিষ্ট বাট্টার বিনিময়ে ভাঙ্গানোকে বিনিময় বিল ভাঙ্গানো বা বিল বাট্টাকরন বলে।**

ব্যাংক
Bank

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ব্যাংকের সংজ্ঞা দান করেছেন—

স্যার জন প্যাগেট-এর মতে,--

“ব্যাংক এরূপ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখে, চেক জমা করে এবং চেকের মাধ্যমে আমানতকারীর হিসাব হতে অর্থ প্রদান করে।”

অধ্যাপক (Cairncross) মতে, --

“ব্যাংক হলো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ধার ও ঋণের কারবারি।”

অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার বলেন,--

“ব্যাংক তার নিজের ও অন্য লোকের ঋণের কারবার করে।” (“A Bank is a dealer in debts-his own and other peoples"-Crowther)।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সেয়ার্স (Sayers)-এর ভাষায়,

“ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত হয়।”

ব্যাংক
Bank

১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে,

“ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা সাধারণত জনসাধারণের নিকট হতে চলতি হিসাবের মাধ্যমে টাকা আমানত রাখে এবং জনসাধারণকে প্রয়োজনমতো চেক মারফত টাকা ওঠাবার সুযোগ প্রদান করে।”

সুতরাং বলা যায় যে,

ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প হার সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ জমা রাখে ও উচ্চ হার সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করার পাশাপাশি বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে, বিনিময় বিল বাট্টা করে, অর্থ এক স্থান বা প্রতিষ্ঠান হতে অন্যস্থান বা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করে ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

'ক' দেশটিতে 'ব্যাংক অব A' নামের একটি ব্যাংক রয়েছে।

এ ব্যাংকের মাধ্যমে 'ক' দেশটির অর্থবাজার ও মুদ্রা বাজারের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়।

ব্যাংকটি 'ক' দেশটির সরকারের মালিকানাধীন এবং এটি দেশের বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত ব্যাংকগুলোকে গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। কোনো ব্যাংক যদি অতিরিক্ত সুদ ধার্য করে তবে "ব্যাংক অব A" তা নিয়ন্ত্রণ করে।

আবার কোনো ব্যাংকের যদি দেউলিয়া হওয়ার মতো অবস্থা হয় তবে "ব্যাংক অব A" ঋণদানের মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকটিকে টিকিয়ে রাখে। এভাবেই 'ব্যাংক অব A' 'ক' দেশটির জনকল্যাণে কাজ করছে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, 'ব্যাংক অব A' হলো 'ক' দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কারণ 'ব্যাংক অব A' হলো 'ক' দেশটির মুদ্রা **বাজারের গতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক, অভিভাবক ও মুদ্রা ইস্যুকারী হিসেবে কাজ করে।**

সর্বোপরি **এটি দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি ব্যাংক।** এখানে তোমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি একক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুনাফা অর্জন নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংজ্ঞায়িত করেছেন ।

অধ্যাপক ভেরা স্মিথ (১৯১২-১৯৭৬) বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং বলতে মূলত এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কেবল একটি ব্যাংকের নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক আর. পি. কেন্ট বলেন, 'এটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা জনকল্যাণার্থে দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ, প্রসার ও সংকোচন-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

আন্তর্জাতিক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক আইন মোতাবেক, 'একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যে ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার ওপর মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রক, ঋণের পরিমাণ ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে।

মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাওয়া এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে।

যেমন— বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', ইংল্যান্ডে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

মুদ্রা বাজারের শীর্ষে থেকে দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে যে ব্যাংক তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

মুদ্রার প্রচলন, ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে লেনদেনের কাজ নিয়ন্ত্রণ, সরকারের অর্থ সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচ্ছত্র অধিকার।

যেহেতু সরকারের জন্য কাজ করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

- ডি. কক (De-Kock)-এর মতে,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো জনস্বার্থে কাজ করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা, মুনাফা অর্জন নয়।"

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

অধ্যাপক আর. পি. কেন্টের মতে,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সার্বিক জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান ।"

অধ্যাপক হট্রে (Hawtrey) বলেন,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল ।"

জেমস স্টিফেনসন-এর মতে,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের একটি প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে দেশের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সচেষ্ট হয়।"

কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Central Bank

ভেরা স্মিথ (Vera Smith)-এর মতে,

"Central Banking is a banking system in which a single bank has a complete monopoly of note issue." অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এরূপ একটি ব্যাংকব্যবস্থা যাতে একক ব্যাংক হিসেবে নোট প্রচলনের সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকর্তা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিটি স্বাধীন দেশেই এটি করে থাকে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ইংল্যান্ডে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

একটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানামুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে।

কাজের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী এর কার্যাবলিকে নিম্নোক্তভাবে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক. সাধারণ কার্যাবলি

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি

গ. দেশের সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি

ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি এবং

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলি ।

বিভিন্ন কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

ক. সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে—

১. নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনানুযায়ী নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন করা।

এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার।

নোট প্রচলনের জন্য ব্যাংকটি প্রচলনকৃত নোটের মূল্যের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।

২. মুদ্রার মান সংরক্ষণ:

এ ব্যাংক মুদ্রার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশীয় মুদ্রার মান তথা ক্রয়ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

আবার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

৩. ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

এ ব্যাংক দেশে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি, খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক জমার হার পরিবর্তন নীতি, ঋণের বরাদ্দকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

৪. মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ:

এ ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

মুদ্রা বাজারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ ব্যাংক দেশে মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার সরবরাহে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিময় হার নির্ধারণ ও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

৫. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ:

একটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সফলতা অনেকাংশে বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা:

মুদ্রা সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions as Govt. Bank)

বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। সরকারের ব্যাংকার হিসেবে এর কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. সরকারের তহবিল সংরক্ষণ,

২. অর্থ জমা, গ্রহণ ও স্থানান্তর,

৩. সরকারের হিসেব সংরক্ষণ,

৪. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি,

৫. সরকারের বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন এবং

৬. সরকারের ঋণের উৎস।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

গ. দেশের সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions as a Bank of other Banks)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকেরও ব্যাংকার। সে হিসেবে তাকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়-

১. ব্যাংক গঠন ও সম্প্রসারণ,

২. সদস্য ব্যাংকগুলোর নগদ রিজার্ভের আমানতকারী,

৩. ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল,

৪. নিকাশঘর হিসেবে কাজ এবং

৫. বিভিন্ন উপায়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে সাহায্য করা।

*ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থল হল নিকাশঘর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development Functions)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও নানা ধরনের কাজ করে থাকে

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রেখে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। বিশেষত সরকারকে বাণিজ্যনীতি নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরমার্শ কেন্দ্রীয় ব্যাংকই দিয়ে থাকে।

২. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন:

একটি দেশের কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে বিভিন্ন নীতি (যেমন- নৈতিক প্ররোচনা) নির্ধারণের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

ঘ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development Functions)

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অনুন্নত ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আর্থিক নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করে সরকার উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করে থাকে

৪. সমবায় ব্যাংকের উন্নয়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

- অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায় ঋণদান সমিতি একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।
- সমবায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেটি একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করেন।
- পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সমশ্রেণির সমমনা কতিপয় মানুষ সমবায় আইনের আওতায় যে প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে তাকে সমবায় সমিতি বলে। সমবায় স্বল্পবিত্তসম্পন্ন মানুষের সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হল সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলি (Other Functions)

১. গবেষণা:

একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য নতুন নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষণা করে থাকে।

২. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ:

সরকারের ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে।

৩. রিপোর্ট তৈরি:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা ও রিপোর্ট তৈরি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of the Central Bank

ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী?

কোনো দেশে ঋণের পরিমাণ কাম্য স্তরে রাখা ও কাঙ্ক্ষিত খাতে তা প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান নীতির ওপর বিধি-নিষেধ বা শর্তাদি আরোপ করাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

১. অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা

২. দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা,

৩. দেশে মুদ্রাস্ফীতি অথবা মন্দাভাব রোধ করা,

৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তা ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

দেশের অর্থবাজারে প্রধান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হতে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এটি স্বীকৃত যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের নেতা ও মুদ্রা বাজারের অভিভাবক।

এ ব্যাংকের গুরুত্ব দিন দিন এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, প্রথমাবস্থায় যেরূপ কার্য সম্পাদন করত বর্তমানে অনেক বেশি বিস্তৃত ধরনের কাজ এ ব্যাংককে সম্পাদন করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

(i) সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

(iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে (As a banker of other banks)

(iv) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development functions)

(v) অন্যান্য কার্যাবলি (Other functions)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(i) সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

১. মুদ্রা ও নোট প্রচলন:

De-Kock এ সম্পর্কে বলেন, 'The central banks which today enjoy a complete monopoly of the note issue."*

বর্তমানকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সকল দেশে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে।

২. মুদ্রামান সংরক্ষণ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতির সাথে সংগতি রেখে মুদ্রামান সংরক্ষণ করে।

Prof. Kisch এবং Elkin-এর মতে, "A central bank is a bank whose essential duty is to maintain stability of the monetary standard."

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(i) সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

৩. মুদ্রাবাজার পরিচালনা:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থে শক্তিশালী মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে বাদী তৎপর থাকে।

এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা দেয় ও তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর।

অধ্যাপক শ (Show) বলেন, "A central bank is a bank which controls credit."

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(i) সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

৫. বিনিময় নিয়ন্ত্রণঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়নে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এ লক্ষ্যে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কাম্যস্তরে বজায় রাখার জন্য এবং এরূপ মুদ্রার লেনদেনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

১. তহবিল সংরক্ষণ:

এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে।

২. আর্থিক লেনদেন সম্পাদন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

৩. অর্থ জমা গ্রহণ ও প্রদান:

সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে।

৪. হিসাব সংরক্ষণ:

এ ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বোর্ড, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

৫. ঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধান:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়।

বিভিন্ন খাত হতে ঋণ সংগ্রহে সরকারকে সহযোগিতা করে এবং উক্ত ঋণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।

৬. বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা:

এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: বিশ্বব্যাংক (IBRD), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক (যেমন : এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ADB) এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন ব্যাংক (যেমন : ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, IDB) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

৭. উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব:

এ ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নীতিনির্ধারণে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করে। এছাড়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৮. আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক R.S. Sayers তাই মন্তব্য করেন যে,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের সামগ্রিক প্রশাসনের একটি বিশেষ অঙ্গ যা সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।"

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে (As a banker of other banks)

১. তালিকাবদ্ধকরণ:

এ ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে এবং উক্ত ব্যাংক শর্ত পূরণ করছে কি না বা তালিকাভুক্তির পর শর্ত পালন করছে কি না তা তদারক করে।

২. নিকাশ ঘর:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে নিকাশ ঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনার বিষয়টি নিষ্পত্তি করে।

৩. ঋণদান ও তদারকি:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনে ঋণ দেয় এবং উক্ত ব্যাংকসমূহ কোন খাতে কীভাবে ঋণ দিচ্ছে তাও তদারক করে থাকে। জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ তদারকির এ ব্যবস্থা করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে (As a banker of other banks)

৪. ঋণ আদায়ে সহযোগিতা:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজস্ব নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অতিরিক্ত সরকারকে উৎসাহ দিয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়ে তাদেরকে সহযোগিতা করে।

এছাড়া দেশে খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা প্রকাশ করে অধস্তন ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়েও সহযোগিতা প্রদান করে।

৫. নিরীক্ষণ:

দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সঠিকভাবে তাদের খাতাপত্র ও হিসাবপত্রাদি সংরক্ষণ করছে কি না তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সতর্কতার সাথে নিরীক্ষণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে (As a banker of other banks)

৬. জমা সংরক্ষণ:

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল দেশেই তাদের সংগৃহীত আমানতের নির্দিষ্ট একটা অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রয়েছে।

৭. উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব:

এ ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iv) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development functions)

১. ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নিয়মনীতি নির্ধারণের মাধ্যমে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

২. বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন:

এ ব্যাংক দেশের উৎপাদন সম্পৃক্ত বিভিন্ন খাত; যেমন— কৃষি, শিল্প, সেবা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; যেমন— কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে সামগ্রিক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iv) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development functions)

৩. বৈদেশিক বাণিজ্য:

এ ব্যাংক দেশের আমদানি ও রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।
যেমন দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নয়ন:

সরকারকে বিভিন্ন তথ্য ও রিপোর্ট সরবরাহ করে এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক সরকার গৃহীত আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নয়নে সবসময় চেষ্টা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(iv) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development functions)

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ:

দেশের আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৬. জনশক্তির মান উন্নয়ন:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধিভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(v) অন্যান্য কার্যাবলি (Other functions)

১. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে বিভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক গবেষণাকার্য এবং গবেষণার সুবিধার্থে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকার্য পরিচালনা করে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সরকারকে পরামর্শ প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণা সেলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Central Bank

(v) অন্যান্য কার্যাবলি (Other functions)

২. রিপোর্ট তৈরি এবং প্রকাশনা:

এ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার চিত্র, বার্ষিক কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট তৈরি, প্রকাশ এবং তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ামক শক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র রূপলাভ করেছে।

এজন্য M. H. De-Kock মন্তব্য ,

"Central bank has developed their own code of rules and practices, which can be described as the art of central banking."

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

'A' নামক দেশটিতে সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণ দেয়।

এতে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে দেশটিতে মুদ্রার মান কমে যায়।

এ অবস্থায় ব্যাংকগুলোর অভিভাবক হিসেবে খ্যাত 'ব্যাংক অব A' আকর্ষণীয় সুদের হারে খোলাবাজারে ১, ২ এবং ৫ বছরমেয়াদি বিভিন্ন ঋণপত্র ছাড়ে। পরবর্তীতে ব্যাংকগুলো এসব ঋণপত্র কেনার ফলে বাজারের বেশি পরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংকটিতে জমা হয়।

এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণ নিয়েছে তাদের সম্পর্কে 'ব্যাংক অব A' তদন্ত করে।

রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দুটি ব্যাংকের ৬ মাসের জন্য নিকাশ ঘর সুবিধা বন্ধ রাখে এবং একটি ব্যাংককে সতর্কীকরণ নোটিশ দেয়।

এভাবে A নামক দেশটিতে ব্যাংকগুলো যে অতিরিক্ত ঋণ দিয়েছে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

আলোচনা থেকে বলা যায়, 'A' দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'ব্যাংক অব A' খোলাবাজারে ১, ২ এবং ৫ বছরমেয়াদি যে বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রি করার মাধ্যমে মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা এনেছে এ পদ্ধতিটি হলো খোলাবাজার নীতি ।

এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতির অন্যতম একটি পদ্ধতি।

আবার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বা এ ধরনের পরিস্থিতি যেন আবার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ব্যাংক অব সিকিউরড (Bank of Secured) বিধি অমান্য করার ফলে দুটি ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা বন্ধ করার পদক্ষেপটি প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতির একটি ধরন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

এখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মান ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঋণ দেওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীল রাখার জন্য সময়োপযোগী কাজ ও পদক্ষেপ নেয় তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায়, যা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কাম্য সরবরাহ বজায় রাখতে পারে।

দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজারে অর্থের ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত কোনোটাই কাম্য নয়।

তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাজারে কক্ষিত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে।

দেশের মূল্যস্তর তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাজ পরিচালনা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে বা বাড়িয়ে থাকে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো-

ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

গুণগত পদ্ধতি	পরিমাণগত পদ্ধতি
❑ ব্যাংক হার নীতি ❑ খোলাবাজার নীতি ❑ নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি ❑ রিজার্ভ হারের পরিবর্তন নীতি	❑ ঋণের রেশনিং (বরাদ্দকৃত ঋণ) ❑ ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রন ❑ বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন ❑ নৈতিক প্ররোচনা ❑ প্রত্যক্ষ আদেশ ও কাজ ❑ নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেগুলো হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত পদ্ধতি। নিচে এ পদ্ধতির হাতিয়ারগুলে আলোচনা করা হলো-

১. ব্যাংক হার নীতি:

ব্যাংক হার বলতে এমন একটি হারকে বোঝানো হয় যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উত্তম শ্রেণির ঋণপত্র জমা রেখে বা প্রথম শ্রেণির বিনিময় বিল পুনঃবাট্টা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে।

সহজ কথায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য নিম্নতম সুদের হারই হলো ব্যাংক হার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ব্যাংক হার নীতির কার্যক্রম

ব্যাংক হার এবং বাজার সুদের হার তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রদেয় ঋণের সুদের হার এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার সুদের হারের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন ব্যাংক হার বাড়ায়।

এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রদানযোগ্য ঋণের ওপর সুদের হার বাড়ে।

তখন ঋণের চাহিদা কমলে প্রদেয় ঋণের পরিমাণও কমে।

আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে ব্যাংক হার কমায়।

এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের প্রদেয় ঋণের জন্য সুদের হার কমিয়ে দেয়।

এর ফলে ঋণের চাহিদা বাড়লে ঋণের পরিমাণও বাড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

২. খোলাবাজার নীতি:

দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

খোলাবাজার নীতির কার্যক্রম:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন দেশে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তখন খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে।

ঋণপত্রের ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক কেটে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত থেকে আদায় করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

খোলাবাজার নীতির কার্যক্রম:

এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে গেলে ঋণের পরিমাণ কমে।

বিপরীত অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে খাণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে।

এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্রের বিক্রেতাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর চেক প্রদান করে।

বিক্রেতারা সে চেকগুলো তাদের ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংকগুলো তা আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দেয়।

তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত আমানত বাড়ে।

ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি পরিমাণে ঋণ দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

ক. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৩. নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি: প্রায় সকল দেশেই ব্যাংকিং আইনানুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। আমানতি অর্থের যে শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাকেই নগদ জমার হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ হার পরিবর্তন করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতির কার্যক্রম: নগদ জমার হার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে; তখন তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমে গেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে। আবার নগদ জমার হার কমানো হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ বাড়ে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষমতা বেড়ে যায় বলে ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

খ. গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ঋণদানের নিয়মাবলি পরিবর্তন করে তাকে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতির দ্বারা ঋণের গুণগত নিয়ন্ত্রণ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো;

১. ঋণের রেশনিং (বরাদ্দকৃত ঋণ): এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট নীতির অধীনে অর্থনীতির কিছু নির্বাচিত খাতে ঋণ প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা তা তুলে নেয়। দেশে ঋণের সংকোচন ঘটাতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত খাতের সংখ্যা বাড়ায়, আর বিপরীত অবস্থায় তা কমায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

খ. গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

২. ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করে। দেশে ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রদেয় ভোক্তার ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করতে পারে; যেমন—এক্ষেত্রে ক্রয়ের সময় প্রাথমিকভাবে নগদ অর্থ জমা দেওয়ার অংশ বাড়াতে ও কিস্তির সংখ্যা কমাতে পারে। আবার অর্থনীতিতে ঋণের প্রসার ঘটানোর বেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিকভাবে নগদ জমা দেওয়ার অংশ কমাতে ও কিস্তির সংখ্যা বাড়াতে পারে।

৩. বন্ধকী (জামানতী) ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন: ঋণগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বন্ধকীকৃত সম্পদের মোট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ জমা হিসেবে রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের প্রসার ঘটাতে চাইলে বন্ধকী ঋণের নগদাংশ কমায়, আর ঋণের সংকোচন করতে চাইলে এর অংশ বাড়ায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Credit Control of the Central Bank

খ. গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৪. নৈতিক প্ররোচনা: দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পত্র-পত্রিকা, টিভি, রেডিও, ব্যাংকারদের সাথে সভা ও মতবিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অধিক ঋণ নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপারে জোর প্রচারণা চালাতে পারে। প্রচারণার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান ও জনগণ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হলে ঋণের যোগান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. প্রত্যক্ষ আদেশ ও কাজ: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তফসিলভুক্ত ব্যাংক হওয়ায় আইনত তার আদেশ মানতে বাধ্য। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সরাসরি আদেশ দিতে পারে কিংবা বিনিময় বিলের পুনঃবাট্টা করতে অস্বীকার করতে পারে।

৬. নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ: দেশে অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলোকে চিহ্নিত করে। তারপর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়, কোন কোন খাতে ঋণের প্রসার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের সংকোচন ঘটাতে হবে। এভাবে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণের পরিমাণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান তিনটি হাতিয়ার হলো:

১. ব্যাংক হারের পরিবর্তন,

২. খোলাবাজার নীতি ও

৩. নগদ জমার হারের বা রিজার্ভ হারের পরিবর্তন ।

নিচে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহের তুলনামূলক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হলো—

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

১. প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা:

ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর থাকে। তারা ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোয় সাড়া না দিলে এ নীতি ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু খোলাবাজার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ দায়িত্ব পালনে তাকে উদ্যোগী হতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজ উদ্যোগে মুদ্রা বাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ কমাতে পারে; তখন ঋণের সংকোচন ঘটে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের প্রসার ঘটাতে পারে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নগদ জমার হারের পরিবর্তন সবচেয়ে সুবিধাজনক।

কারণ তা দ্রুত প্রয়োগ ও বিধিবদ্ধভাবে কার্যকর করা যায়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

২. ঋণপত্রের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা:

সরকারি ঋণপত্রের মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

কিন্তু খোলাবাজার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এর মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব ।

সরকারি ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদির মূল্য কমাতে কিংবা বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলো যথাক্রমে ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে পারে। ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতির ঋণপত্রের মূল্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

ফলে তা ঋণপত্রের মূল্য অস্থিতিশীল করে তোলে না। একই কথা নগদ জমার হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঘটে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

৩. অর্থনীতির মন্দাভাব প্রতিরোধ:

অর্থনীতিতে মন্দাভাব রোধ করার ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন ও নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে খোলাবাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে দেশে ঋণ তথা মুদ্রার যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। ঋণ ও মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রিত হলে অর্থনীতিতে মন্দাভাবের প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায়।

৪. ঋণপত্রের প্রাপ্যতা:

দেশের মুদ্রা বাজারে ঋণপত্রগুলোর স্বল্পতা থাকলে ব্যাংক হার পরিবর্তন বিশেষ করে খোলাবাজার কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না।

এ অবস্থায় নগদ জমার হারের পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

৫. ঋণদান নীতি দ্রুত কার্যকর করার ক্ষেত্রে:

ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন; তা ব্যাংক হার পরিবর্তন ও খোলাবাজার কার্যক্রম দ্বারা দ্রুত প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু নগদ জমার হার পরিবর্তন করে তা দ্রুত প্রয়োগ করা যায়।

৬. অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব:

অর্থনীতির ওপর নগদ জমার হার পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করা কঠিন, ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতিরও প্রভাব পরোক্ষ।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ দামস্তর, মজুরি, উৎপাদন, নিয়োগ, আয় ইত্যাদির ওপর খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সরাসরি প্রভাব পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা

৭. উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা:

ব্যাংক হার পরিবর্তন ও নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি বার বার বদলানো যায় না; কারণ তা মুদ্রা বাজারে আস্থার সংকট সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিস্থিতিভেদে যখন-তখন খোলাবাজার কার্যক্রম চালিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে খোলাবাজার কার্যক্রম অধিক কার্যকরী, উপযোগী ও সহজে প্রয়োগযোগ্য ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো মুদ্রা বাজার এবং মুদ্রানীতির একক নিয়ন্ত্রক।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী মুদ্রাবাজার সৃষ্টির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান নীতির পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নির্ভর করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান নীতির উপর।

অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধ, পূর্ণ নিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পদ্ধতি দুটি হলো :

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Quantitative Credit Control method)

যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটায়, তাকে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিনটি হাতিয়ার (উপকরণ) ব্যবহার করে। যেমন:

১। ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি (Changes in bank rate policy)

২। খোলা বাজার নীতি (Policy of Open market operations)

৩। নগদ জমার হার পরিবর্তন (Policy of Cash reserve ratio)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Quantitative Credit Control method)

(i) ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি (Changes in bank rate policy)

এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক দাবিকৃত বিশেষ সুদের হার, যা বিনিময় বিল পুনর্বাট্টা করার প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বহন করতে হয়, তাকে ব্যাংক হার বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের সাথে ব্যাংক হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

ব্যাংক হার এবং সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন: মূল্যস্ফীতির সময়ে সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস করা প্রয়োজন। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারও বৃদ্ধি পায়, ফলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক মন্দার সময় ব্যাংক হার ও সুদের হার হ্রাস করার ফলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ।

*বিনিময় বিল: পাওনা টাকা নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার জন্যে পাওনাদার(আদেষ্টা), দেনাদারের(আদিষ্ট) সাথে যে দলিলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাকে বিনিময় বিল বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Quantitative Credit Control method)

(ii) খোলা বাজার নীতি (Policy of Open market operations)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

যে নীতির মাধ্যমে ঋণ-পত্রের ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়, তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

মূল্যস্ফীতির সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে, ঋণ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস করে।

অর্থনৈতিক মন্দার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঋণপত্রের সুদের হার বাড়লে অর্থের ফটকা চাহিদা হ্রাস পায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Quantitative Credit Control method)

(iii) নগদ জমার হার পরিবর্তন (Policy of Cash reserve ratio)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট হারে আমানতের যে অংশ জমা রাখতে হয়, তাকে **নগদ জমার হার** বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণপ্রদানের পরিমাণ কমাতে চায়, তখন এ নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়।

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বা বাধ্যতামূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Qualitative or Selective Credit Control)

যেসব পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। যেমন :

(i) ঋণের রেশনিং:

নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ স্থির করে দেয়।

প্রত্যেক আবেদনকারী কী পরিমাণ ঋণ পাবে, ঋণদানের ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি না, জামানতের বিপরীতে কী পরিমাণ ঋণ পাবে এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে।

(ii) ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

বর্তমানে অনেক দেশে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য কিস্তিতে দাম পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয় ।

কিস্তির সংখ্যা বেশি হলে, দাম পরিশোধের সময় বেশি প্রদান করলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Qualitative or Selective Credit Control)

(iii) বন্ধকী (জামানত) ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন:

এ নীতির আলোকে বন্ধকীর (জামানত) হার বেশি হলে নগদ প্রাপ্তি বা প্রদেয় ঋণের পরিমাণ কম হয়।

অর্থাৎ কেউ ১০০ টাকার সম্পদ জামানত রাখলে নগদাংশ হিসাবে যদি ৭০% রাখতে হয় তাহলে ব্যক্তি ঋণ পাবে ৩০ টাকা।

(iv) নৈতিক প্ররোচনা:

যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক, তাই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অনুরোধের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ
Central Bank: Instruments of Credit Control

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Qualitative or Selective Credit Control)

(v) প্রত্যক্ষ আদেশ:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু মুদ্রাবাজারের শীর্ষে অবস্থান করে, তাই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণদান সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মানতে বাধ্য থাকে।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

(vi) নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

কখনো কখনো অনুৎপাদনশীল খাত হতে ঋণের স্থানান্তর উৎপাদনশীল খাতে করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় খাত চিহ্নিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

নিকাশঘরের ধারণা
Concept of Clearing House

জনাব জাকির একটি কলেজের শিক্ষক। তিনি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা বাবদ একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে প্রাইম ব্যাংকের নামে ২০ হাজার টাকার চেক পেয়েছেন। কিন্তু প্রাইম ব্যাংকে তার কোনো ব্যাংক হিসাব নেই।

তার এবি ব্যাংক হিসাব আছে। চেকটি এবি ব্যাংক-এ জমা দিলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে ২ দিন পর ব্যাংক হিসাবে টাকা নির্দিষ্ট বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এজন্যই সময় প্রয়োজন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব জাকিরের চেকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে যে নির্দিষ্ট বৈঠকে উপস্থাপিত লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বলে।

এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকে প্রাইম ব্যাংক এবং এবি ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি হয়ে জনাব জাকিরের ব্যাংকে টাকা জমা হবে।

নিকাশঘরের ধারণা
Concept of Clearing House

‘নিকাশঘর’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Clearing House’। এর আভিধানিক অর্থ ‘নিষ্পত্তি স্থল’।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তি স্থলকে নিকাশঘর বলে।

নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যকার সব দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে থাকে।

পৃথিবীর সব দেশেই এ নিকাশঘর ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে।

এর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরও গতিশীল হয়। পরবর্তীতে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। নিকাশঘরের সদস্যভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও শাখার চেক, বিনিময় বিল ও হুন্ডি প্রভৃতির দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি নিকাশঘরের মাধ্যমে করে।

নিকাশঘরের ধারণা
Concept of Clearing House

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক **১৬টি জেলা শহরে** নিকাশঘর ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে **সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের হয়ে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন** করে।

সুতরাং নিকাশঘর হলো এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে তাদের মধ্যের চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট লেনদেন নিষ্পত্তি করে।

নিম্নে **নিকাশঘরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** উপস্থাপন করা হলো—

১. **একটি নির্দিষ্ট কক্ষে নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়।**

২. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অফিস ও শাখা অফিসে সাধারণত নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়।**

কিন্তু যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা অফিস নেই সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্যকোনো ব্যাংক অফিসে লেনদেন নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

নিকাশঘরের ধারণা
Concept of Clearing House

৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের লেনদেন হয়।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোই নিকাশঘরের সদস্য হতে পারে।

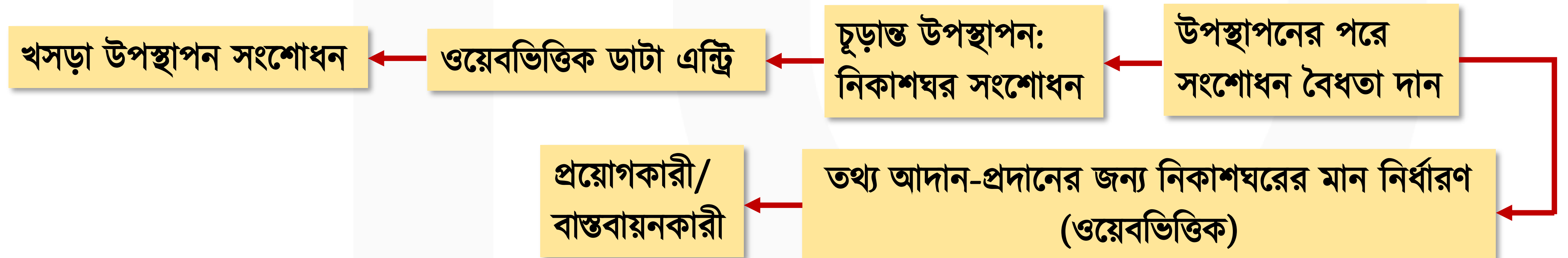
৫. একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নিকাশঘরের কাজ পরিচালিত হয়।

৬. প্রত্যেক দেশের নিকাশঘরই সরকারি অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিকাশঘরের ধারণা
Concept of Clearing House

নিকাশঘরের কাজের প্রক্রিয়াকে একটি উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো—

ধরা যাক, মি. হালিম ১/২/১৭ তারিখে রাজীব এন্টারপ্রাইজ থেকে ঢাকা ব্যাংক-এর একটি ২ লক্ষ টাকার চেক হাতে পান। ঢাকা ব্যাংকে তার হিসাব না থাকায় চেকটি সোনালী ব্যাংক কাওরান বাজার শাখায় জমা দেন। ২/২/১৭ তারিখে হিসাব বিবরণী দেখে হালিম সাহেব জানতে পারেন যে, উক্ত চেকটির অর্থ তাঁর হিসাবে জমা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত ঘটনায় আধুনিক স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘরের সহায়তায় ব্যাংকিং কাজ শেষ হয়েছে। নিকাশঘরের কাজের প্রক্রিয়া নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণদাতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ পদ্ধতির দ্বারা সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

এ পদ্ধতিতে ঝুঁকি আছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে গিয়ে দেশে মন্দা চলে আসতে পারে।

কারণ এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়।

গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ গ্রহীতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ পদ্ধতির দ্বারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, সামগ্রিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।

গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কমে না বরং ক্ষেত্রবিশেষে ভোগ কমতে পারে। তাই **মুদ্রাস্ফীতি আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।**

এ পদ্ধতির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাত শক্তিশালী হয়।

সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে অনুন্নত দেশে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

উভয় পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	পরিমাণগত পদ্ধতি	গুণগত পদ্ধতি
১. সংখ্যাগত	পরিমাণগত **পদ্ধতি সংখ্যাত্মক ধারণাই** প্রকাশ করে।	এখানে **গুণগত দিকটিই বিবেচনা** করা হয়।
২. হাতিয়ার বা উপাদান	(i) ব্যাংকহার নীতি, (ii) খোলাবাজার নীতি এবং (iii) নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি।	(i) ঋণের রেশনিং, (ii) ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (iii) বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন, (iv) নৈতিক প্ররোচনা (v) প্রত্যক্ষ আদেশ বা কাজ (vi) নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ।
৩. প্রভাব বিস্তার	ঋণদাতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।	ঋণ গ্রহীতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।
৪. বিবেচ্য বিষয়	ব্যাংকসমূহের সামর্থ্যকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়।	যেসব খাতে ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে, তার গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়।

পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

পার্থক্যের বিষয়	পরিমাণগত পদ্ধতি	গুণগত পদ্ধতি
৫. নমনীয়তা	তুলনামূলকভাবে কম নমনীয়।	তুলনামূলক অধিক নমনীয়।
৬. প্রকৃতি	ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ পদ্ধতি।	ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ পদ্ধতি।
৭. মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্য চক্র	.....প্রতিরোধে এ পদ্ধতি কম ফলপ্রসূ। কারণ বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় মন্দা এসে যেতে পারে।	.....প্রতিরোধে তুলনামূলকভাবে অধিক ফলপ্রসূ। কারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভোগ কমতে পারে।
৮. প্রয়োগক্ষেত্র	উন্নত অর্থনীতিতে এ পদ্ধতি অধিক সুফল প্রদানে সক্ষম। কারণ সেখানে শক্তিশালী অর্থবাজার বিদ্যমান।	কম উন্নত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো খাতকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

কোন পদ্ধতির কার্যকারিতা অধিক, এর উত্তরে বলা যায়, পদ্ধতি দুটি একে অপরের প্রতিযোগী নয়।
দুটি পদ্ধতির সমন্বয়েই ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়।
তবে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর পদ্ধতি দুটির তুলনামূলক কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যেকোনো দেশে এরূপ ব্যাংক একক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গঠন:

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ (১২৭ নং আদেশ) -এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক 'সেন্ট্যাট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল হতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

মূলধন:

এ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন ৩ কোটি টাকা যার সবটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত।

এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীনে পরিচালিত।

পরিচালনা পরিষদ:

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে।

গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ বা বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকার বলে এ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি।

তিনি সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

পরিচালনা পরিষদ:

সরকার ইচ্ছা করলে মেয়াদ শেষে তাকে পুনঃনিয়োগ করতে পারে।

ডেপুটি গভর্নরও সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে।

এ কমিটির সদস্যগণ হলেন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরদ্বয় এবং পরিচালকদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

কার্যকরী বিভাগসমূহ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যেমন -

(১) হিসাব ও বাজেট বিভাগ,

(২) কৃষি ঋণ ও বিশেষ কার্যক্রম বিভাগ,

(৩) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ,

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি,

(৫) জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ,

(৬) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,

(৭) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ,

(৮) বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ,

(৯) গভর্নর সচিবালয়,

(১০) মানব সম্পদ বিভাগ,

(১১) আইন বিভাগ,

(১২) আর্থিক নীতি বিভাগ,

(১৩) গবেষণা বিভাগ,

(১৪) নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ”

(১৫) পরিসংখ্যান বিভাগ ,

(১৬) ব্যাংক তদারকি বিভাগ,

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

কার্যকরী বিভাগসমূহ:

(১৭) ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ,

(১৮) Banking Regulation & Policy dept.,

(১৯) Common Services dept..

(20) Credit Information Bureau,

(২১) Department of Currency Management & Payment systems,

(২২) Foreign Reserve & Treasury Management dept.

(২৩) I.T. Operation & communication dept.

(২৪) Off-site supervision dept.,

(২৫) Information systems Development dept..

(২৬) Internal Audit & Inspection dept.,

(২৭) Secretary's dept.,

(২৮) Special Studies cell. প্রভৃতি।

বাংলাদেশ ব্যাংক: গঠন ও পরিচালনা
Bangladesh Bank: Composition and Management

অবস্থান:

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

এছাড়া ঢাকায় ২টি শাখাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে ১টি করে মোট ৯টি শাখা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে

(খ) সরকারের হিসেবে

(গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে

(ঘ) উদ্দেশ্যমূলক

(ঙ) উন্নয়নমূলক

(চ) অন্যান্য কাজ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে

বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কিছু মৌলিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন—

১। নোট প্রচলন:

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করা।

দেশের অভ্যন্তরে নোট চালু করার একচেটিয়া অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০০, ৫০০, ১০০, ৫০, ১০ ও ৫ টাকার কাগজি নোট প্রচলন করে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক 'ন্যূনতম রিজার্ভ পদ্ধতি' অনুসরণ করে।

এ প্রসঙ্গে ডি. কক (De-Kock) বলেন,

"কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে নোট প্রচলনের অধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে

২। মুদ্রা ও স্বর্ণমান নির্ধারণ:

দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন টাকার নোট (যেমন— ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা) ও ধাতব মুদ্রার আকার-আকৃতি, ওজন এবং মূল্যের সমজাতীয়তার মানের একমাত্র সংরক্ষক।

৩। মুদ্রা বাজার:

দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

৪। শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থা:

দেশের সুষ্ঠু ও শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের সেবার মান যাচাইপূর্বক নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে

(১) সরকারের ব্যাংক:

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা পড়ে এবং সরকারি ঋণের হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করে ও প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয়।

(২) সরকারের পরামর্শদাতা:

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি যেমন ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি, বাণিজ্যনীতি—এসব বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের আর্থিক পরামর্শদাতারূপে কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে

(৩) তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের তহবিল ও সম্পদ বিনা সুদে তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করে।

(৪) সরকারের প্রতিনিধি:

এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন উৎসে সরকারের দেনাও পরিশোধ করে।

(৫) সরকারি নির্দেশ: বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি নির্দেশে—

(i) নির্দেশিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে।

(ii) প্রয়োজন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

(iii) বিনা সুদে সরকারকে ঋণ প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে

(১) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক:

বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে তাদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণদান, এদের নগদ জমা সংরক্ষণসহ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পাদন করে।

(২) ঋর্ণের শেষ আশ্রয়স্থল:

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণের দরকার হলে অথবা প্রয়োজনের সময় জনগণকে ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হলে কিংবা অন্য কোথাও থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে না পারলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে

(৩) ঋণ তদারকি:

তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কোন খাতে কীভাবে ঋণ দিচ্ছে তা তদারক করাও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপযুক্ত সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

(৫) নিকাশ ঘর:

বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেক আদান-প্রদানের ফলে দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করা যায়।

তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্লিয়ারিং হাউস বা নিকাশ ঘর বলা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে

(৬) হিসাব নিরীক্ষণ:

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের রেজিস্টার, খাতাপত্র, দলিলাদি এবং হিসাবপত্রাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করছে কি না তাও বাংলাদেশ ব্যাংক তত্ত্বাবধান করে।

(৭) প্রতিনিধি:

এ ব্যাংক অন্য ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ঘ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি

(১) বিনিময় হারে স্থিরতা:

বিনিময় হারের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন সংঘটিত হয়। নিজ দেশের সঙ্গে অন্যদেশের বিনিময় হার ঠিক রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ ।

(২) মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা:

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ঘ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি

(৩) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ:

বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ অবৈধ পন্থায় ব্যয়, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বৈধ ক্ষেত্রে ব্যয়, অবৈধ উপায়ে বিদেশি মুদ্রার অনুপ্রবেশ বা বিদেশে পাচার প্রভৃতি রোধে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন—২০০৩ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ আইনকে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে আইনের সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনে সুপারিশ পেশ করে ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ঘ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি

(৪) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় আর্থিক ও রাজস্বনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে।

(৫) বাণিজ্যচক্র রোধ:

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মূল্যস্তরকে কাম্য পর্যায়ে উপনীত করার মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রের অশুভ প্রভাব হতে অর্থনীতিকে মুক্ত রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ঙ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

(১) কৃষি:

বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহজশর্তে কৃষিঋণ বিতরণ করে।

(২) শিল্প:

দেশে শিল্পের বিকাশ সাধনে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ করে।

(৩) জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন:

বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় বাজেটে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(ঙ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

(৪) গবেষণা ও তথ্য উপস্থাপন:

সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ এবং গবেষণা পরিচালনা করে।

(৫) আর্থিক নীতি প্রণয়ন:

দেশের প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে।

(৬) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা:

বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বিভিন্ন উৎপাদন সম্পৃক্ত খাত যেমন—কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, চা, মৎস্য, চামড়া ইত্যাদির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন, ব্যাংকিং খাতে নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank

(চ) অন্যান্য কাজ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (IMF) ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলোচনা ও প্রয়োজনবোধে তাদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে।

(৩) জাতীয় তহবিলে বিদেশি মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ।

আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদন ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

পুষ্পিতা ঢাকার একটি নামকরা কলেজে পড়াশোনা করে। কলেজের প্রতি মাসের বেতন ২-৫ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য তাদের কলেজের পাশেই ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপিত হয়।

বেতন দেওয়ার সময় প্রায়ই জনাব শামীমের সাথে পুষ্পিতার দেখা হয়। তিনিও ব্যাংকে টাকা জমা দেয়। তবে তা বেতন বাবদ নয়। একদিন পুষ্পিতা জনাব শামীমকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কেন প্রতিমাসে টাকা জমা দেয়? জনাব শামীম উত্তর দিলেন, তিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে যাতে নির্দিষ্ট সময় পর ব্যাংক সুদসহ তাকে ফেরত দেয়।

পুষ্পিতা জানতে চাইলে, এতে ব্যাংকের কী লাভ? তিনি বললেন, ব্যাংক তার মতোই অনেকের কাছ থেকে অলস অর্থ সংগ্রহ করে। সে অর্থ থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় অর্থাৎ বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এর দ্বারা ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুনাফা অর্জনের জন্যই এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে একে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক
Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ রজার বুটল বলেন, 'মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

অধ্যাপক গিলবার্ট এর মতে, "বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থ ও মূলধনের কারবারি। মধ্যস্থ কারবারি হিসাবে ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে এক পক্ষ থেকে অর্থ ধার করে অন্য পক্ষকে সে অর্থ ঋণ দেয়।"

সুতরাং বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্প হার সুদে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে উচ্চ হার সুদে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও অন্যদেরকে ঋণ প্রদান করে। এই দুই সুদের হারের পার্থক্য হলো এর মুনাফা। এ ব্যাংক আমানতকারীদেরই অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে তার তারল্য রক্ষার চেষ্টায় কেবল স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবারিও বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে ও অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জমাকৃত অর্থের জন্য কম হারে সঞ্চয়ী সুদ প্রদান করে এবং অধিকতর হারে বিনিয়োগের সুদ ধার্য করে উদ্বৃত্ত সুদ মুনাফা হিসেবে লাভ করে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

মি. রজার (Mr. Roger)-এর মতে, **"যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।"**

প্রফেসর এ. নাথ (Prof. A. Nath) বলেন, **"বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মাধ্যমিক মুনাফা তৈরির প্রতিষ্ঠান।"**

অধ্যাপক গিলবার্ট-এর মতে, **"বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থ ও মূলধনের কারবারি। মধ্যস্থ কারবারি হিসেবে ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে এক পক্ষ হতে অর্থ ধার করে অন্য পক্ষকে সে অর্থ ঋণ দেয়।"**

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবারিও বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমাকৃত টাকা আমানতকারীরা যেকোনো সময় উঠিয়ে নিতে পারে।

এ আশঙ্কায় ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে পারে না। তাই সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে।

তবে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলিও সম্পাদন করে।

যেমন—চেক, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ স্থানান্তরকরণ, আমানতকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ইত্যাদি।

এসব কাজের সার্ভিস চার্জ হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করে থাকে।

বর্তমানে শ্রমিক ব্যাংক, মহিলা ব্যাংক, স্কুল ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক—এরূপ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেও বাণিজ্যিক ব্যাংক সেবা প্রদান করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়—

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও মূলধনের মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

খ. জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে স্বল্পসুদে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করে।

গ. সংগৃহীত অর্থ অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে মূলধনের চাহিদা সৃষ্টিকারীদের মাঝে বণ্টন করে।

ঘ. এ **ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।**

ঙ. আমানতকারীদের দাবিকৃত চেকের মূল্য পরিশোধ করে।

চ. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদাহরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডের 'দি মিডল্যান্ড', 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার' 'লয়েডস্', বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর ভূমিকা পালনার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ সম্পূর্ণ করে তাকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

(খ) জনহিতকর কার্যাবলি

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং

(ঘ) অন্যান্য কার্যাবলি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি প্রবাহচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো :

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

ক। সাধারন ব্যাংকিং

১. আমানত গ্রহন

২. ঋণ দান

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি

৫. বিনিময় বিল

৬. দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সহায়তা

৭. মূলধন গঠন

খ। জনহিতকর

১. অর্থ স্থানান্তর

২. ওয়েজ আর্নার হিসেবে

৩. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষন

৪. ভ্রমনে সাহায্য

৫.সনদপত্র প্রদান

৬. প্রকাশনা

গ। প্রতিনিধিত্বমুলক

১. ঋণপত্রাদি সংগ্রহ ও প্রদান

২. ঋণপত্রের ক্রয় ও বিক্রয়

৩. অছির কাজ

৪. বৈদেশিক বিনিময়

৫. শেয়ার সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়

৬. অবলেখক

৭. গোপনীয়তা রক্ষা

ঘ। অন্যান্য

১. তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং

২. প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউট পরিচালনা

৩. গবেষনা কার্যক্রম

৪. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণভাবে যে কাজগুলো করে থাকে তাকে সাধারণ কার্যাবলি বলা হয়। এগুলো আলোচনা করা হলো-

১. আমানত গ্রহণ:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ।

এ আমানত সাধারণত তিন প্রকার। যথা—

(i) চলতি আমানত (demand deposits),

(ii) সঞ্চয় আমানত (saving deposits) এবং

(iii) স্থায়ী আমানত (fixed deposits or time deposits)।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

১. আমানত গ্রহণ:

চলতি আমানতের টাকা চাওয়া মাত্র আমানতকারীকে ফেরত দিতে হয়। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

সঞ্চয় আমানতে একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে টাকা আমানতকারী তুলে নিতে পারে।

যে আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয় তাই স্থায়ী আমানত।

যেমন— ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি।

এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়।

মেয়াদি বা স্থায়ী আমানতে সুদের হার সঞ্চয়ী আমানতের চেয়ে বেশি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

২. ঋণদান:

ঋণদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ।

এ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ রেখে বাকি অংশ ব্যাংক ঋণদান করে।

যথোপযুক্ত বন্ধকির (যেমন : মূল্যবান ধাতু, ধাতব দ্রব্য, সরকারি ও দেশি-বিদেশি ঋণপত্র, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি) বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে ।

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি:

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

যারা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে।

প্রয়োজনবোধে ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে সে টাকা ওঠাতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ হতেই আমানত সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

৫. বিনিময় বিল বাট্টাকরণ:

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের অর্থের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিনিময় বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ভাঙিয়ে দেয়, একে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রচুর লাভ হয়।

৬. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা:

দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থের যোগান দেয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো পরামর্শ দেয়।

এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

৭. মূলধন গঠন:

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান একটি কাজ হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(খ) জনহিতকর কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকে, এগুলোকে জনহিতকর কার্যাবলি বলে । নিম্নে জনহিতকর কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

১. অর্থ স্থানান্তর:

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রয়োজনে নিরাপদে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে।

এ ব্যাংক তার মক্কেলের প্রয়োজনে মেইল ট্রান্সফার ও ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে অর্থ পাঠাতে পারে।

২. ওয়েজ আর্নার হিসেবে:

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যথাযথ সেবা প্রদানে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(খ) জনহিতকর কার্যাবলি

৩. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ:

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন—দলিলপত্রাদি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে।

৪. ভ্রমণে সাহায্য:

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণ চেক, ঘূর্ণায়মান নোট ইত্যাদি প্রদান করে জনগণের বিদেশ ভ্রমণে উপকার সাধন করে।

৫. সনদপত্র প্রদান:

এ ব্যাংক মক্কেলদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

৬. প্রকাশনা:

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের আর্থিক কার্যাবলি ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সাময়িকী প্রকাশ করে জনগণকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো :

১. ঋণপত্রাদি সংগ্রহ ও প্রদান:

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রয়োজনে বা মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিল, প্রমিসরি নোট, লভ্যাংশ, কুপন, আয়কর, বাড়িভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম—এসব সংগ্রহ বা প্রদান করতে পারে।

২. ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়:

এ ব্যাংক তার গ্রাহকদের পক্ষে শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে ।

৩. অছির কাজ:

সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় অছির দায়িত্ব পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি

৪. বৈদেশিক বিনিময়:

বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় কাজে সহায়তা দান করে।

৫. শেয়ার-সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়:

এ ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় এবং সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়েও সহায়তা করে।

৬. অবলেখক:

বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন কোম্পানিকে শেয়ার বিক্রয়ের ঝামেলা হতে মুক্ত রাখার জন্য এরূপ কোম্পানির অবলেখক হিসেবে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৭. গোপনীয়তা রক্ষা:

এ ব্যাংক প্রতিনিধি হিসেবে মক্কেলদের অর্থের তথা হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

(ঘ) অন্যান্য কার্যাবলি

(i) অধঃস্তন শাখাসমূহ তত্ত্বাবধান ও তাদের কার্যাবলি মনিটরিং করে।

(ii) নিজস্ব কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করে।

(iii) ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

(iv) দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশে অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকে।

এর ফলে উৎপাদন বাড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ সহজতর হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

বর্তমান যুগে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। মুনাফা অর্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ কথা বলা যায়, নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যাংক সে মুনাফা অর্জন করে। আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং জনহিতকর কার্যাবলি।

নিচে সংক্ষেপে এ কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি: মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সচরাচর যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলো হলো সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি। এগুলো নিম্নরূপ—

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

১. আমানত গ্রহণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত আমানত সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা:

i. চলতি আমানত (Demand Deposit) : যে আমানতের অর্থ চাওয়া মাত্র তোলা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

ii. সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit): মূলত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এ আমানত খোলা হয়.। এ আমানতের অর্থ সপ্তাহে একদিন বা দুদিন তোলা যায়। এ আমানতের স্বল্পহারে সুদ দেওয়া হয়।

iii. স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit); যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তোলা যায় না তাকে স্থায়ী আমানত বলে। যেমন— ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর ইত্যাদি। এ আমানতের ওপর উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

২. ঋণদান পদ্ধতি: ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের আইনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আসলে আমানতকারীদের বিধায় তার নগদাবস্থা বজায় রাখার জন্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: নোট বা ধাতব মুদ্রার প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে আর্থিক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও গতিশীল করে তোলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

৪. বিনিময় বিল বাট্টাকরণ: আজকাল ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বাট্টা ধার্য করে বিনিময় বিল বা হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়। বিনিময় বিলের সময় মেয়াদ পূর্তি হওয়ার আগেই তা ভাঙিয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে নগদ অর্থ পেতে সাহায্য করে এবং তার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চালাতে সাহায্য করে।

৫. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন: দেশের জনসাধারণের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা ছড়ানো-ছিটানো সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করা এ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে এ ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

৬. দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান: এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। দেশি ও বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান ও বাট্টা ধার্য করে তা মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙিয়ে দেওয়া, বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা, আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিদেশে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যবসায়-বাণিজ্য গতিশীল ও নির্বিঘ্ন করতে সাহায্য করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of a Commercial Bank

খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিনিময় বিল, বাড়ি ভাড়া, কোম্পানির ল্যাংশ, প্রাপ্তব্য সুদ, পেনশন ইত্যাদির টাকা সংগ্রহ করা; বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা; আয়কর, বিমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

গ. জনহিতকর কার্যাবলি; বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের কল্যাণে মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদি সকরে রাখার সুব্যবস্থা করে তার নিরাপত্তা বিধান করে। প্রয়োজনে তার মক্কেলদের জন্য আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of a Commercial Bank

বর্তমান যুগে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। মুনাফা অর্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এ কথা বলা যায়, নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যাংক সে মুনাফা অর্জন করে। আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি, প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং জনহিতকর কার্যাবলি।

নিচে সংক্ষেপে এ কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি: মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সচরাচর যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলো হলো সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি। এগুলো নিম্নরূপ—

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of a Commercial Bank

১. আমানত গ্রহণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত আমানত সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা:

i. চলতি আমানত (Demand Deposit) : যে আমানতের অর্থ চাওয়া মাত্র তোলা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। এ আমানতের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

ii. সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit): মূলত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এ আমানত খোলা হয়.। এ আমানতের অর্থ সপ্তাহে একদিন বা দুদিন তোলা যায়। এ আমানতের স্বল্পহারে সুদ দেওয়া হয়।

iii. স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit); যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তোলা যায় না তাকে স্থায়ী আমানত বলে। যেমন— ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর ইত্যাদি। এ আমানতের ওপর উচ্চ হারে সুদ দেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of a Commercial Bank

২. ঋণদান পদ্ধতি: ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের আইনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আসলে আমানতকারীদের বিধায় তার নগদাবস্থা বজায় রাখার জন্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: নোট বা ধাতব মুদ্রার প্রচলনের ক্ষমতা না থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে আর্থিক লেনদেন সহজ, নিরাপদ ও গতিশীল করে তোলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of a Commercial Bank

৪. বিনিময় বিল বাট্টাকরণ: আজকাল ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বাট্টা ধার্য করে বিনিময় বিল বা হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়। বিনিময় বিলের সময় মেয়াদ পূর্তি হওয়ার আগেই তা ভাঙিয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে নগদ অর্থ পেতে সাহায্য করে এবং তার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চালাতে সাহায্য করে।

৫. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন: দেশের জনসাধারণের কাছে অলসভাবে পড়ে থাকা ছড়ানো-ছিটানো সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করা এ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে এ ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

৬. দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান: এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। দেশি ও বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান ও বাট্টা ধার্য করে তা মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙিয়ে দেওয়া, বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা, আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিদেশে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যবসায়-বাণিজ্য গতিশীল ও নির্বিঘ্ন করতে সাহায্য করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

Functions of a Commercial Bank

খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিনিময় বিল, বাড়ি ভাড়া, কোম্পানির ল্যাংশ, প্রাপ্তব্য সুদ, পেনশন ইত্যাদির টাকা সংগ্রহ করা; বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা; আয়কর, বিমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

গ. জনহিতকর কার্যাবলি; বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের কল্যাণে মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদি সকরে রাখার সুব্যবস্থা করে তার নিরাপত্তা বিধান করে। প্রয়োজনে তার মক্কেলদের জন্য আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য, কার্যপ্রকৃতি, পরিচালনা পদ্ধতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো—

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
১. সংজ্ঞা (Definition)	যে ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক ও মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে নোট ইস্যু, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে ও অর্থনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো— বাংলাদেশ ব্যাংক।	যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থ ও ঋণের ব্যবসা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। যেমন – বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
২. গঠন (Formation)	এ ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বা বিশেষ আইন বলে গঠিত হয়।	এ ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়।
৩. মালিকানা (Ownership)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়।	এ ব্যাংক সরকারি, বেসরকারি, যৌথ মালিকানায় গঠিত হতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
৪. উদ্দেশ্য (Objectives)	মুনাফা অর্জন করা এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনই এর প্রধান উদ্দেশ্য।	মুনাফা অর্জন করাই এ ব্যাংকের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য।
৫. প্রতিনিধিত্ব (Agency)	এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সাথে মক্কেলদেরও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
৬. মুদ্রা বাজারের সাথে সম্পর্ক (Relation with Money Market)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারের অভিভাবক।	বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সদস্য।
৭. নোট ইস্যু (Issue of Note)	এ ব্যাংক একচ্ছত্রভাবে নোট ইস্যু করে থাকে।	এ ব্যাংকের নোট ইস্যু করার কোনো ক্ষমতা নেই।
৮. ঋণদান (Loan Sanction)	এ ব্যাংক সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণদান করে।	এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।
৯. নিকাশঘর (Clearing House)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিকাশঘরের সুবিধা প্রদান করে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হিসেবে নিকাশঘরের সুবিধা গ্রহণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়বস্তু (Basis of difference)	কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)	বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
১০. রিজার্ভ সংরক্ষণ (Preserving Reserve)	কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নগদ অর্থ রিজার্ভ করতে হয় না। তবে প্রতিটি নোটের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করতে হয়।	এ ব্যাংককে আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।
১১. মর্যাদা (Status)	মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংকের মর্যাদা সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে।	এ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এ ব্যাংকের মর্যাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিচে।

তাই বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে উপরের পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উভয় ব্যাংক একে অপরের সহযোগী হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বা সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

এটি **প্রকৃত আমানত (Actual Deposit)** বলে পরিচিত।

দেশের ব্যাংকিং আইনানুযায়ী ব্যাংক এ আমানতী অর্থের কিছু অংশ বৈধ (Legal Reserve) হিসেবে গচ্ছিত রেখে অবশিষ্টাংশ তার গ্রাহকদেরকে **ঋণ হিসেবে প্রদান** করে।

ঋণ প্রদান করতে গিয়ে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার নামে নিজস্ব ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খোলে যাকে **সৃষ্ট আমানত** বলে।

ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাকে সৃষ্ট এ আমানতের অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করার ক্ষমতা দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

ধরা যাক, ঋণগ্রহীতা তার দেনা পরিশোধের জন্য কাউকে ঋণের সমপরিমাণ অর্থের চেক দিলে সে তা অন্য ব্যাংকে জমা দেয়। তখন ঐ ব্যাংকে আবার একইভাবে প্রকৃত ও সৃষ্ট আমানতের উৎপত্তি ঘটে।

এভাবে প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ সৃষ্ট আমানত সৃষ্টি করে যে ঋণদান কার্যক্রম চালিয়ে যায় তাকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের **ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া** বলে।

এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ সৃষ্টি হয়। এজন্য এ প্রক্রিয়াকে **ঋণের গুণিতক প্রসার (Multiple Expansion)** বলে ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনুমিতিসমূহ:

১. দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত,

২. ব্যাংকগুলোর মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান,

৩. ঋণভিত্তিক চেক দেশের কোনো না কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা পড়ে,

৪. জনগণের হাতে নগদ অর্থ রাখার ইচ্ছা স্থির থাকে,

৫. ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভের এর অতিরিক্ত অর্থ সংরক্ষণ করে না,

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

৬. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ অনুপাত (Legal Reserve) স্থির থাকে এবং

৭. ব্যাংক চাহিদা আমানতকে ব্যাংকের দায় এবং রিজার্ভ ও প্রদত্ত ঋণের সমষ্টিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে।

কোনো দেশের অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত থাকে।

এসব ব্যাংক মিলে প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

একে ব্যাংকের বহু গুণিতক ঋণ সৃষ্টি বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

ধরা যাক, A নামক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একজন গ্রাহক ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি চলতি আমানত খুললো, যা হল ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ও দায়। এ আমানত নগদ অর্থ বলে তা ব্যাংকের সম্পদ হিসেবেও বিবেচ্য হয়। উদ্বৃত্তপত্রে A ব্যাংকের এ অবস্থা দেখা যায়।

ধরা যাক, দেশের ব্যাংকিং আইনানুযায়ী মোট আমানতের ২০% ন্যূনতম রিজার্ভ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

A ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্র		A ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্র	
দায়	সম্পদ	দায়	সম্পদ
আমানত ২০,০০০	রিজার্ভ ২০,০০০	আমানত ২০,০০০	ন্যূনতম রিজার্ভ ৪,০০০ ঋণ ১৬,০০০
মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০

অর্থাৎ ৪,০০০ টাকা রেখে বাকি ৮০% অর্থাৎ ১৬,০০০ টাকা ব্যাংকটি, ব্যাংকঋণ হিসেবে প্রদান করে।

এখন ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে ১৬,০০০ টাকার একটি (সৃষ্ট) আমানত খুলে ও তাকে চেক দেয়।

এ অবস্থা ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্রে দেখা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, A ব্যাংকের ১৬,০০০ টাকার সৃষ্ট আমানতের মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবস্থার ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

A ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্র		A ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্র	
দায়	সম্পদ	দায়	সম্পদ
আমানত ২০,০০০	রিজার্ভ ২০,০০০	আমানত ২০,০০০	ন্যূনতম রিজার্ভ ৪,০০০ ঋণ ১৬,০০০
মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০	মোট = ২০,০০০

ঋণগ্রহীতা ঐ ১৬,০০০ টাকার চেক তার কোনো ঋণদাতাকে প্রদান করলে সে তা দ্বিতীয় ব্যাংক, ধরা যাক, B তে জমা দেয়। এখন B ব্যাংকে আমানত দাঁড়ায় ১৬,০০০ টাকা যা নিচে তার প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়েছে।

B ব্যাংকে ১৬,০০০ টাকার ২০% অর্থাৎ ৩,২০০ টাকা ন্যূনতম রিজার্ভ হিসাবে রেখে বাকি ৮০% অর্থাৎ ১২,৮০০ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করে যা তার চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

B ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বৃত্তপত্র		B ব্যাংকের চূড়ান্ত উদ্বৃত্তপত্র	
দায়	সম্পদ	দায়	সম্পদ
আমানত ১৬,০০০	রিজার্ভ ১৬,০০০	আমানত ১৬,০০০	ন্যূনতম রিজার্ভ ৩,২০০ ঋণ ১২,৮০০
মোট = ১৬,০০০	মোট = ১৬,০০০	মোট = ১৬,০০০	মোট = ১৬,০০০

লক্ষ করলে দেখা যায়, B ব্যাংকে ঋণগ্রহীতার নামে ১২,৮০০ টাকার যে সৃষ্ট আমানত খোলা হয়েছে সে তা তার ঋণদাতাকে চেক মারফত পরিশোধ করে। এ শেষোক্ত ব্যক্তি তার প্রাপ্ত চেক ধরা যাক, তৃতীয় ব্যাংক তথা C ব্যাংকে জমা দেয়।

এভাবে ৩য় ব্যাংক থেকে ৪র্থ, ৪র্থ ব্যাংক থেকে ৫ম, ৫ম ব্যাংক থেকে পরবর্তী ব্যাংকে ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

দেশের n সংখ্যক ব্যাংক ঋণ সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে যেভাবে তা সম্পন্ন করে নিচে সূচিতে তা দেখানো হলো—

ব্যাংক	নিট সংযোজিত অর্থ প্রাথমিক চাহিদা আমানত	নিট অতিরিক্ত ঋণ প্রদান (সৃষ্ট আমানত)	রিজার্ভের ক্ষেত্রে নিট সংযোজন
বাণিজ্যিক ব্যাংক A	২০,০০০	১৬,০০০	৪,০০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক B	১৬,০০০	১২,৮০০	৩,২০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক C	১২,৮০০০	১০, ২৪০	২,৫০০
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
বাণিজ্যিক ব্যাংক n	০০০	০০০	০০০
মোট	১,০০,০০০	৮০,০০০	২০,০০০

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী প্রথম ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ২০,০০০ টাকা ধরে মোট আমানতের পরিমাণকে নিম্নোক্ত সংখ্যা সিরিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রটি হলো:

$$\text{মোট আমানত} = \frac{\text{প্রাথমিক আমানত}}{\text{ন্যূনতম জমার হার}}$$

$$= ২০,০০০ + ১৬,০০০ + ১২,৮০০ + \ldots$$

$$= ২০,০০০ + ২০,০০০\left(\frac{৪}{৫}\right) + ২০,০০০\left(\frac{৪}{৫}\right)^{২} + \cdots$$

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া
Credit Creation Mechanism by Commercial Bank

$= ২০,০০০$

$$= ২০,০০০\left[\frac{১}{১-\frac{৪}{৫}}\right] = \frac{২০,০০০}{\frac{১}{৫}} = ২০,০০০ \times ৫ = ১,০০,০০০$$

সুতরাং দেখা যায়, সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক আমানতের অর্থাৎ ২০,০০০ টাকার ৫ গুণ তথা ১,০০,০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ৮০% অর্থাৎ ৮০,০০০ টাকা হলো সৃষ্ট ঋণ।

ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা
Limitations of Credit Creation

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির সীমাদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ:

১. ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের প্রসার ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ন্যূনতম রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তাহলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে এবং তার পরিমাণ কমিয়ে দিলে ঐ ক্ষমতা বাড়ে।

২. নগদ প্রিয়তা: জনসাধারণ বেশি না কম নগদ অর্থ হাতে রাখা পছন্দ করে তার ওপরও ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে। ঋণ গ্রহণের পর কোনো ব্যক্তি তার সম্পূর্ণটা ব্যাংকে জমা না রেখে যদি কিছু অংশ হাতে রাখে তবে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৩. উপযুক্ত জামানত: ব্যাংক উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে। ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হাতে কাঙ্ক্ষিত ধরনের জামানত না থাকলে ইচ্ছা করলেও ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া জোরদার করতে পারে না।

ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা
Limitations of Credit Creation

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির সীমাদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ:

৫. **ব্যবসায়ের মন্দাভাব:** দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব বিরাজ করলে ব্যাংক ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা কম ঋণ নেয়। ফলে ঋণ সৃষ্টি কম হয়।

উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো ছাড়াও আরও যেসব কারণে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় সেগুলো হলো: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচন বা সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি, জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস, খেলাপি ঋণের প্রভাব, দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি।

ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা
Limitations of Credit Creation

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র কাকে বলে?

নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধনের পরিমাণ, দায়, দেনা, সম্পদ ও সম্পত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে হিসাবের যে বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet) বলে।

সাধারণত প্রতি আর্থিক বছর শেষে এটি প্রকাশ করতে হয়।

উদ্বৃত্তপত্রের বামপাশে ব্যাংকের মূলধন ও দায় এবং ডান পাশে সম্পদ (Properties) ও সম্পত্তিগুলো (Assets) লিপিবদ্ধ করা হয়।

উচুরপত্র হতে ব্যাংকের মালিক, মক্কেলগণ, জনগণ, সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা, উন্নতি, অবনতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সহজেই স্পষ্ট ধারনা পেতে পারে।

তাই উদ্বৃত্ত পত্রকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের দর্পণ (Mirror) বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

সাধারণত **একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক দু'ভাবে ঋণ সৃজন** করতে পারে।

প্রথমত, জনগণ ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা রাখে এবং এর ফলে ব্যাংকের আমানত বা ঋণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংক গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। তখন ব্যাংক গ্রাহকের নামে একটি হিসাব খোলে এবং তাকে চেকের মাধ্যমে ঐ অর্থ ওঠানোর অনুমতি দেয়। এ প্রক্রিয়ায় ঋণ সৃজন একটি ব্যাংক করতে পারে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেকগুলো ব্যাংক থাকলে কোনো একক ব্যাংকের পক্ষে বাস্তবে অতিরিক্ত রিজার্ভের বেশি ঋণ প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ :

(i) অনেক ঋণগ্রহীতা আমানতের বিপরীতে চেক ইস্যু করে ব্যাংক থেকে অর্থ ওঠাবে। এ অবস্থায় বিবেচ্য ব্যাংকের অতিরিক্ত রিজার্ভ হ্রাস পাবে।

(ii) কিছু ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়ে অন্য ব্যাংকে আমানত হিসাবে রাখতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

বলা হয় যে, "প্রত্যেক ঋণই আমানত সৃষ্টি করে" (Every loan creates a deposit)।

ঋণগ্রহীতা তার প্রয়োজনে অপর ব্যক্তিকে চেক প্রদান করে।

সেই ব্যক্তি অপর কোনো ব্যাংকে চেকটি জমা দিবে।

যে ব্যাংকে চেকটি জমা পড়বে চেকভিত্তিক অর্থ উক্ত ব্যাংকটির আমানত বা ঋণ বলে গণ্য হবে।

সেই ব্যাংক নগদ সংরক্ষণের অনুপাত হিসাবে বৈধ রিজার্ভ অর্থ রেখে বাকিটা ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

এভাবে ঋণ গ্রহীতার নামে নতুন ঋণ লিপিবদ্ধ করে এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ তোলার ক্ষমতা দেয়।

একই প্রক্রিয়ার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়ে নতুন ব্যাংকে ঋণ সৃষ্টি হয়।

এভাবে সমগ্র বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রথম ঋণের তুলনায় মোট ঋণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

অনুমিতি :

(i) একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক বিবেচিত এবং প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

(ii) ব্যাংকে লেনদেনের প্রতি জনগণ উৎসাহী ।

(iii) সুষ্ঠু মুদ্রা বাজার বিদ্যমান।

(iv)কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির মধ্যে প্রগতিশীলতা বিদ্যমান।

(v) সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা বিদ্যমান।

(vi) ন্যূনতম সংরক্ষণের অতিরিক্ত কোনো অর্থ ব্যাংক সংরক্ষণ করে না।

(vii) আইনানুগ রিজার্ভ অনুপাত (Legal reserve ratio) স্থির থাকে ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

অনুমিতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ঋণ সৃজন কার্যক্রম নিয়ে একটি উদাহরণের মাধ্যমে সূচিতে দেখান হলো। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ধরা হচ্ছে শতকরা 10 ভাগ ।

ব্যাংক A		ব্যাংক B		ব্যাংক C		ব্যাংক D	
দেনা (Liabilities) (আমানত)	পাওনা (Assets) (বৈধ রিজার্ভ)	দেনা (আমানত)	পাওনা (Assets) (বৈধ রিজার্ভ)	দেনা (আমানত)	পাওনা (Assets) (বৈধ রিজার্ভ)	দেনা (আমানত)	পাওনা (Assets) (বৈধ রিজার্ভ)
10,000 টাকা	10%=1000 অতিরিক্ত রিজার্ভ = 9000	9000 টাকা	10%=900 অতিরিক্ত রিজার্ভ =8100	8100 টাকা	10%=810 অতিরিক্ত রিজার্ভ = 7290	7290 টাকা	10%=729 অতিরিক্ত রিজার্ভ =6561

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

গানিতিক ভাবে,

বৈধ রিজার্ভ = 10 % = $\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$

অতিরিক্ত রিজার্ভ $\left(1-\frac{1}{10}\right)=\frac{9}{10}$ যা দ্বারা ঋণ সৃজন হয় ।

প্রাথমিক আমানত = 10,000 টাকা

ঋণ সৃজন এর পরিমান $(\Delta C)=10{,}000+10{,}000\left(\frac{9}{10}\right)+10{,}000(\frac{9}{10})^2+10{,}000(\frac{9}{10})^3+$

$\cdots$ এভাবে n তম ব্যাংক পর্যন্ত ঋণ সৃজন চলবে।

যদি n এর মান খুব বড় হয় সেক্ষেত্রে $(\frac{9}{10})^n$ এ রাশিটির মান খুব ছোট হতে থাকবে ,

সেক্ষেত্রে $\Delta C=10{,}000\times\frac{1}{(1-\frac{9}{10})}=10{,}000\times\frac{1}{\frac{1}{10}}=1{,}00{,}000$ টাকা ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

সুতরাং দেখা যায়, সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবসায় যে পরিমান ঋণ সৃষ্টি করতে সক্ষম তার পরিমান 10,00,000 টাকা। এ পরিমান প্রথম পর্যায়ে সৃষ্ট ঋণের দশগুন ।

আমানত গুনক (Multiple Expansion of Credit) :

$$\text{আমানত গুনক } (k_d) = \frac{\text{মোট সম্প্রসারিত আমানত } (total\ deposits - T_d)}{\text{প্রাথমিক আমানত } (initial\ deposits - I_d)}$$

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

প্রথম আমানতের ভিত্তিতে মোট আমানত কত গুন বাড়ে, তা নির্ভর করে প্রয়োজনিয় রিজার্ভ এর অনুপাতের উপর।

সেক্ষেত্রে লিখা যায়ঃ. $K_d = \frac{1}{RR_r}$

সুতরাং $K_d = \frac{T_d}{I_d} = \frac{1}{RR_r}$

অতএব, TD = ID $\left(\frac{1}{RR_r}\right)$

আমানত গুনক $(k_d) =$

$$\frac{\text{মোট সম্প্রসারিত আমানত } (total\ deposits - T_d)}{\text{প্রাথমিক আমানত } (initial\ deposits - I_d)}$$

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

আমানত গুনক $(k_d) = \frac{\text{মোট সম্প্রসারিত আমানত } (total\ deposits{-}T_d)}{\text{প্রাথমিক আমানত } (initial\ deposits{-}I_d)}$

উদাহরনঃ যদি $RR_r = 0.20$ এবং $I_d = 1000$ হয়।

সেক্ষেত্রে $T_d = 1000\left(\frac{1}{0.20}\right) = 5000$

=মোট সম্প্রসারিত আমানত ।

সুতরাং আমানত গুনক $K_d = \frac{T_d}{I_d} = \frac{5000}{1000} = 5$

অর্থাৎ ঋণ বা আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা হলো প্রাথমিক আমানতের ৫ গুণ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

উদাহরনঃ

প্রাথমিক আমানত 50,000 টাকা এবং বৈধ রিসার্ভ 20% হলে মোট আমানত সৃষ্টির পরিমাণ নির্ণয় কর ।

মোট সম্প্রসারিত আমানত Td = 50000 (1/0.20) = 2,50,000

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ সৃজন
Credit or Deposit Creation by Commercial Bank

ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Credit Creation)

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক কারণে অসীমভাবে ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন :

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের প্রসার ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে, আমানত সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

২. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট পর্যাপ্ত, যথোপযুক্ত জামানত না থাকলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে না।

৩. মানুষের নগদ অর্থ হাতে রাখার আগ্রহ অধিক হলে ব্যাংকে তারল্য হ্রাস পাবে, ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ কম হলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও কম হয়।

৫. অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করলে ব্যবসায়ীরা কম ঋণ নেয়, ফলে আমানত (ঋণ) সৃষ্টি কম হয়।

অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক সংযোজন। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদেরকে চিরাচরিত প্রথায় যেভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে তাতে গ্রাহকদের ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা মিটলেও তা লেনদেন গতি আনতে পারে না। ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ এবং লেনদেন সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করার জন্যই অনলাইন ব্যাংকিং-এর উদ্ভব।

অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আন্তঃযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। এখানে গ্রাহক তাদের রক্ষিত হিসাবের জের, অনুসন্ধান, বিল পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তর প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। ইলেকট্রনিক ডেবিট ও ক্রেডিট পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল মুদ্রা প্রভৃতি ইলেকট্রনিক অর্থের মাধ্যমে এ লেনদেন সম্পন্ন হয়।

অনলাইন ব্যাংকিং হলো **কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারনেট সহায়ক ব্যাংকিং** এবং যে ব্যবস্থায় একজন গ্রাহক একই ব্যাংকের যেকোনো একটি শাখার মাধ্যমে তার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে, তাকে **অনলাইন ব্যাংকিং** বলে।

অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

প্রক্রিয়া: চিরাচরিতভাবে কেউ কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় হিসাব খুললে তাকে ঐ শাখাতেই যেতে এবং লেনদেন করতে হয়। কিন্তু অনলাইন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে এমনটি করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে ব্যাংকের কোনো গ্রাহক কোনো একটি শাখায় তার হিসাব খুললেও সে ঐ ব্যাংকের সকল শাখাকে একটি শাখার মতো ব্যবহার করতে পারে।

যেমন ধরা যাক, X ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখায় কোনো গ্রাহকের হিসাব থাকলে সে ঐ ব্যাংকের যেকোনো একটি শাখায় গিয়ে তার লেনদেন ও ব্যাংকিং কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে। গ্রাহক ঘরে বসেই নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এ ব্যবস্থায় সে ব্যাংকের যেকোনো শাখায় চেক জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে পারে।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
Importance of Online Banking

বর্তমানকালে ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে যেসব প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে তার মধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং অন্যতম। এ ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব অর্থনীতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে ব্যাংকিং খাতটিকেও তার সাথে তালমিলিয়ে চলতে হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে অনলাইন ব্যাংকিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব হলো

১. এটি খুব সহজ পদ্ধতি।

২. ক্রেতাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় না।

৩. ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় বাঁচায়।



অনলাইন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
Importance of Online Banking

৪। অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় একজন গ্রাহক কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের একটি শাখায় একাউন্ট খুললে ওই ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে অর্থ উত্তোলন ও জমা করতে পারে।

৫। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই একাউন্টের ব্যালেন্স জানা সম্ভব।

৬। খুব সহজেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা সম্ভব।

৭। ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা সম্ভব।

৮. ব্যাংক কর্মকর্তারা অতি সহজে এবং অতিদ্রুত গ্রাহককে সেবা দিতে পারে।

৯। এই ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ঝামেলা খুব কম। ফলে নিখুঁতভাবে এবং দ্রুত কার্যক্রম চালু হতে পারে ।

১০। অনলাইন ব্যাংকিং এর অতি দ্রুত রেমিট্যান্স প্রেরণ করা যায়।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা
Advantages of Online Banking

১. গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে যেতে হয় না।

২. ব্যক্তিগত কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রবেশ করতে পারে ।

৩. **ATM (Automated Teller Machine)** বুথের সাহায্যে দিন-রাত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব।

৪. ATM এ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডগুলো ব্যবহারের ওপর ডিসকাউন্ট দেয়। এছাড়া কার্ডের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়।

৫. অতি সহজে, দ্রুতগতিতে, বাড়ি, অফিস বা যেকোনো স্থানে অর্থ লেনদেন করতে পারে।

৬. নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল পরিশোধ করতে পারে।

৭. একাউন্টে ব্যালেন্সসহ যেকোনো প্রকার ব্যাংকিং তথ্যাবলি, সার্ভিস চার্জ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তির তথ্য জানা যায়।

৮. বিনিয়োগ তথ্যসহ শেয়ারবাজারের বিভিন্ন তথ্য জানা যায় ।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা
Advantages of Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং একটি আধুনিক পদ্ধতি হলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে।
যেমন- ব্যাংক সাইট পরিবর্তন হলে ক্রেতার সকল তথ্যসমূহ পুনরায় সংযোজন করতে হয়।

ডেবিট কার্ড (Debit Card)

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ডেবিট কার্ড। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত চুম্বকভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে।

এ কার্ডকে ক্যাশ কার্ড বা সম্পদ কার্ডও বলে। কারণ এ কার্ডে গ্রাহকের হিসাবে সরাসরি অর্থ জমা হয়।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ স্থানান্তর ও অর্থ উঠানো যায়। ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম কানাডায় এ কার্ডের ব্যবহার চালু হয়।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা
Advantages of Online Banking

ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

রিটেইল বা খুচরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর মধ্যে **ক্রেডিট কার্ড** একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।

এই কার্ডটি ব্যবহার করে পণ্য কেনাসহ যেকোনো ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।

এটি নগদ অর্থের চাহিদা পূরণ করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সাধারণত আমানতকারীর হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকলে ব্যাংক গ্রাহককে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্লাস্টিকের কার্ড সরবরাহ করে। একে ক্রেডিট কার্ড বলে ।



অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ই-ব্যাংকিং হলো নিরাপদ ওয়েবসাইট (Website) এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্রেতাদের সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এর দ্বারা ক্ষুদ্র, খুচরা ব্যাংকিং সেবা হতে শুরু করে উৎকর্ষ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে উন্নত সমাজ বিনির্মাণ নির্দেশ করে।

অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একজন ক্রেতা রেজিস্টার্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ক্রেতাকে শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন নাম বা সংকেত দ্বারা ক্রেতার গোপন নম্বর (Password) প্রদান করে যা টেলিব্যাংকিং-এর মতো নয়।

এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে অতি দ্রুত ক্রেতাকে শনাক্ত করতে পারে।

অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় ক্রেতা ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড পেয়ে থাকে।

এটি এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড যা ব্যাংক তার গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করে থাকে।

এক্ষেত্রে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক তার জমাকৃত স্থিতি হতে নগদ অর্থ ছাড়াই নিরাপদে লেনদেন করতে পারে।

অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতা পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পেলেও ঋণের জালে আবদ্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ পরিশোধ করতে হয়।

ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতা যেকোনো সময়ে ATM (Automated Teller Machine) মেশিন হতে টাকা উত্তোলন করতে পারে।

এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না।

অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা (Advantages of Online Banking)

(i) ক্রেতাকে লাইনে দাঁড়াতে হয় না।

(ii) বাড়ি বা অফিস যেকোনো স্থান হতে অর্থ লেনদেন করা যায়।

(iii) বিরামহীন সেবা, ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা। মাউসে একটি ক্লিক করলেই সব তথ্য জানা যায়।

(iv) সময়ের কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

(v) ব্যক্তিগত কম্পিউটার দ্বারা এ বাজারে প্রবেশ করা সহজ।

(vi) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল পরিশোধ।

(vii) বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় ।

(viii) দ্রুতগতিতে অর্থ লেনদেন অর্থ স্থানান্তর করা যায়।

(ix) ব্যালেন্স জানাসহ যেকোনো প্রকার ব্যাংকিং তথ্যাবলি, সার্ভিস চার্জ, সুদ প্রাপ্তি সব জানা যায়।

অনলাইন ব্যাংকিং
Online Banking

অনলাইন ব্যাংকিং একটি আধুনিক পদ্ধতি হলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে ।

যেমন স্বামী-স্ত্রী যৌথ নামের হিসাবের ক্ষেত্রে সম্পদ বা অর্থ স্থানান্তর কিছুটা ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

ব্যাংক সাইট (bank site) পরিবর্তন হলে ক্রেতার সকল তথ্যসমূহ পুনরায় সংযোজন (re-enter) করতে হয়।

আধুনিক অনলাইন ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি সাবধানতার সাথে দৃষ্টি রাখলে আর্থিক জীবন আনন্দপূর্ণ হতে পারে।

তখনই বলা যাবে, Banking online is both efficient and effective.

মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

অর্থাৎ মোবাইল ব্যাংকিং হলো এক প্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বা গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইসের (mobile device) মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করাকে বোঝায়।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং কার্যক্রমটি অতি সহজ ও দ্রুত করেছে এই মোবাইল ব্যাংকিং। বর্তমানে প্রায় সব মোবাইল ব্যাংকিং Mobile App নির্ভর করে তৈরি করা হচ্ছে।

ইউরোপে এ মোবাইল ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং অনেক সময় M-Banking, m-Banking নামেও পরিচিত।

'bKash' (বিকাশ) মোবাইল ব্যাংকিং এর একটি উদাহরণ।

এছাড়াও বাংলাদেশে Rocket, mCash, UCash প্রভৃতি নামে মোবাইল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস চালু রয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম বা সেবাসমূহ:

১. বিনা খরচে গ্রাহকের হিসাব খোলা।

২. নগদ টাকা নিরাপদে জমা বা উঠানো।

৩. এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে টাকা প্রেরণ, বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ

৪. হিসাবের ব্যালেন্স জানা, স্বপ্ল (মিনি) দৈর্ঘ্যের স্টেটমেন্ট জানা, বেতন-ভাতা প্রেরণ ও গ্রহণ।

৫. ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও পণ্য সেবা কেনাবেচা।



মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ব্যাংকিং-এর সুবিধাসমূহ:

১. মোবাইল ব্যাংকিং অনইন ব্যাংকিং-এর চেয়েও সহজ।

২. যেকোনো মোবাইলের সিম ব্যবহার করা যায়।

৩. ব্যাংকিং অপারেটিং খরচ খুব কম।

৪. বিভিন্ন যানবাহনের টিকেট সংগ্রহ- ট্রেনের টিকেট, বাসের টিকেট সংগ্রহ করা যায় ।



মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
Importance of Mobile Banking

সর্বাধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে অনলাইন ব্যাংকিং থেকে এ ব্যাংকি সেবা অনেকটা এগিয়ে আছে। এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে এক গ্রাহক দেশের যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করতে পারে। দূরে ও কাছে কাউকে অর্থ প্রেরণ, ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধ, গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ ইত্যাদি এ ব্যাংকিং সেবার সাহায্যে সহজে ও দ্রুত করা যায়।

এ ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকের কোনো শাখায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ি, অফিস কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা যায়।

এসব ছাড়াও এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ট্রেন-বাসে যাতায়াতের জন্য টিকিট কাটা ইত্যাদি দ্রুততরভাবে করা সম্ভব। এর ফলে কোনো হয়রানি বা বাড়তি খরচ ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত কাজটি যথাসময়ে করা সম্ভব।

এ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ উত্তোলন এবং দূরে বহন করার ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতা বহন করতে হয় না।

কারণ এ সেবার সাহায্যে নগদ অর্থ হাতে বহন না করে তা কাঙ্ক্ষিত স্থানে সময়মতো পাওয়া সম্ভব ।

মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ব্যাংকিং হলো এক প্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা তার ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইস (mobile device) দ্বারা SMS এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করাকে বোঝায়।

ইউরোপে মোবাইল ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি হলেও বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

যুবক গ্রাহকরা এই সেবা গ্রহণে অধিক আগ্রহী।

ব্যাংকিং সেবার জগতে এটির অধিক উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিদ্যমান।

মোবাইল ব্যাংকিং-এ মোবাইল তিনটি মূল কার্য সম্পাদন করে।

যেমন : হিসাব নির্ণয়, মধ্যস্থতা সাধন এবং আর্থিক তথ্য সেবা প্রদান।

মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিচিত সেবাসমূহ হলো—

(i) বিনা খরচে দ্রুত গ্রাহকের হিসাব খোলা,

(ii) নিরাপদে নগদ টাকা জমা, নগদ টাকা ওঠানো যায়,

(iii) এক হিসাব হতে অন্য হিসাবে টাকা পাঠানো,

(iv) বিদেশ হতে অর্থ পাঠানো,

(v) হিসাবের ব্যালেন্স জানা,

(vi) মিনি স্টেটমেন্ট জানা,

(vii) বেতন ভাতা প্রেরণ ও গ্রহণ,

(viii) ইউটিলিটি বিল পরিশোধ,

মোবাইল ব্যাংকিং
Mobile Banking

মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিচিত সেবাসমূহ হলো—

(ix) পণ্য কেনা-বেচা,

(x) যেকোনো মোবাইল ফোন এর সিম ব্যবহারের সুবিধা বিদ্যমান।

এরূপ ব্যাংকিং-এ খরচ খুব কম হয়। এটি অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়েও বেশি সহজ।

এ ধরনের ব্যাংকিং খুব নিরাপদ, আমানতকারীর বন্ধুসুলভ।

এ পদ্ধতিতে যখনই কোনো লেনদেন হয় তখনই আমানতকারীকে জানানো হয়।

বাংলাদেশে বিকাশ, ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং, এম-ব্যাংকিং প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই এ আধুনিক সেবায় যুক্ত রয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
Importance of Online Banking & Mobile Banking

এরূপ ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারের ফলে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস (মহাজন, ধনী বা বিত্তশালী কৃষক, স্বর্ণকার, সাহুকার প্রভৃতি ...) গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

এর ফলে গ্রামাঞ্চলে শোষণ-বঞ্চনা হ্রাস পায়।

উচ্চ সুদের কষাঘাতে ভিটে-মাটি উচ্ছেদ হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রক্ষা পায়।

মানুষের হাতের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চলে আসায় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তখন হতদরিদ্র কৃষক, ছিন্নমূল গরিব জনগোষ্ঠী, সীমিত আয়ের মানুষ মুদ্রাস্ফীতির চাপ হতে রক্ষা পায়।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এর মাধ্যমে দ্রুত দেশে পৌঁছে।

একারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় যা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে, মূলধন দ্রব্য আমদানিতে ভূমিকা রাখে।

অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
Importance of Online Banking & Mobile Banking

আধুনিক অর্থনীতিতে অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমানে 'দক্ষতা' শব্দটি গতিশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থার আলোকে বিবেচনা করা হয়।

ব্যক্তিগত দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সামাজিক দক্ষতার সুনিপুণ সমন্বয়ের মাধ্যমেই উন্নত সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ হতে পারে।

অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এরূপ উন্নত সমাজ নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল হতে নগর সভ্যতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে বৃহৎ মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করে।

একই সাথে চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রসার ঘটায় তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার চিরাচরিত কার্যাবলি সম্পাদন করা ছাড়াও আরও এমন কতকগুলো কাজ করে থাকে যাতে আর্থিক লেনদেনে জনগণের অধিক সুবিধা হয় এবং সামাজিক কল্যাণ বাড়ে। সমাজে বসবাসরত মানুষের আর্থিক লেনদেনজনিত সমস্যাগুলোর সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ ব্যাংকের পক্ষে এমনটি করা সম্ভব।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

১. গ্রাহকদের প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে তাদের জন্য অর্থ সংস্থান করে। গ্রাহকদেরকে সহজে ও ঝামেলাহীনভাবে অর্থ সংগ্রহ ও স্থানান্তর করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক ভ্রাম্যমাণ চেক, প্রত্যয়নপত্র, ড্রাফট, সার্কুলার নোট ইত্যাদি ঋণপত্র প্রচলন করে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

২। এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় বিলে গ্রাহকদের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান ও মেয়াদ পূর্তির আগেই তা বাট্টায় ভাঙিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে ধারে কারবার করতে সহায়তা করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চললে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই উপকৃত হয়। এর ফলে সামাজিক কল্যাণ ত্বরান্বিত হয়।

৩. এ ব্যাংক মক্কেলদেরকে ব্যবসায়, আয়কর প্রদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকে। এভাবে এ ব্যাংক তাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করতে দিক নির্দেশনা দেয়।

৪. এ ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে বৈদেশিক বাণিজ্যেও সহায়তা করে। এ ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের মাধ্যমে তার গ্রাহকদেরকে অন্য দেশের অপরিচিত ব্যবসায়ীদের সাথেও কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ব্যবসায় করার সুযোগ করে দেয়। ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন চলে। সামাজিক সমৃদ্ধি বাড়ে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার লকারে গ্রাহকদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী যেমন— সোনা-রুপার গয়না, জমিজমার দলিল, ব্যবসায়িক দলিলপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সংরক্ষণ করে। এর মাধ্যমে এ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সকলকে আশঙ্কামুক্ত ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। এভাবে এ ব্যাংক বৈষয়িক কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৬. আজকাল অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক লেনদেন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে পারে না। দিন শেষে তাই তাদের অনেকেরই হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থ থেকে যায়। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে সান্ধ্যকালীন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে তাদেরকে নগদ অর্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও ভীত হতে হয় না। তারা দুশ্চিন্তামুক্তভাবে তাদের সামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে ।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য তার মক্কেলদেরকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে। এর মাধ্যমে একদিকে ব্যাংক যেমন তার মক্কেলদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় তেমনি অন্যদিকে জামানত ছাড়াই কারবার করার সুযোগ করে দেয়। এভাবে এ ব্যাংক কম বিত্তের লোকদেরকেও আর্থিকভাবে লাভবান হতে সাহায্য করে । অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি আনে

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার সাথে সাথে তাদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাংকেরই প্রচেষ্টায় দেশের সকল সঞ্চয় একত্রিত করে মূলধন গঠিত হয়। অধিক মূলধন গঠিত হলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

৯। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের জীবনযাত্রার মান্নোয়নেও সাহায্য করে। সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য আজকাল ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ারকুলার ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। এ ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে ভোগ্য ঋণ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

১০. বেকার সমস্যা লাঘব করা একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক লোককে কাজে নিয়োজিত করে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।

১১. তাছাড়া, এ ব্যাংক অনেককেই ছোটখাটো বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম কাজে নিয়োজিত করে অর্থোপার্জনের সুযোগ করে দেয়। স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক এমন কাজ করতে পারে। এর ফলে সমাজের নিম্নবিত্ত লোকদের আয় বাড়ে এবং কিছুটা হলেও সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কমে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমাজ সেবার ক্ষেত্রে মুল্যবান অবদান রাখে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মধ্যস্বত্ত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

তবে বর্তমানে Corporate Social Responsibility (CSR) এর আওতায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত। যেমন:

- সচেতনতা বৃদ্ধি,
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ,
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ,
- এইডস-এর ভয়াবহতা প্রতিরোধ,
- বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসায় অনুদান,
- এসিড দগ্ধ নারীদের চিকিৎসা,
- সামাজিক বনায়ন,

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মধ্যস্বত্ত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

তবে বর্তমানে Corporate Social Responsibility (CSR) এর আওতায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত। যেমন:

- গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান,
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাহায্য,
- বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিবহণ যান (এ্যাম্বুলেন্স, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস) প্রদান,
- রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে দান,
- শহরের শোভাবর্ধন এবং
- গরিব অসহায় ও দুস্থদের মাঝে রিক্সা-ভ্যান দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক সমাজের সুস্থ পরিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জনগণের আস্থা অর্জন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে

- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি,
- শিক্ষার প্রসার,
- বাল্য বিবাহ রোধ ও এর কুফল সম্পর্কে প্রচারণা,
- পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ,
- ইভটিজিং প্রতিরোধে,
- মাদকের কুফল,
- সমাজের বৃদ্ধ ও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ,
- যৌতুক প্রথার কুফল,
- সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ভূমিকা,
- সংক্রামক ব্যাধি মোকাবেলায় সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করছে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান, বিনাসুদে ও কম সুদে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যুবকদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলছে।

এসিড দগ্ধ নারী, ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা রোগীদের চিকিৎসার খরচ বহন করে, দুর্যোগের সময় খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মানবিক সাহায্য প্রদান করছে।

ব্যাংকিং সেবা দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে।

এতে বড় ভূমিকা রাখছে ‘এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা’।

সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেওয়া ভাতা; স্কুল শিক্ষার্থীদের স্কুলে বসেই এ সেবা ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ করেছে অনেক ব্যাংক।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের মাসভিত্তিক ভাতা প্রদান, পোশাককর্মীদের বেতন সহজে পরিশোধে, কৃষকদের ঋণ সুবিধা দিতে এ সেবার পাশাপাশি USAID এর সুবিধা দিতে চালু হয়েছে বিশেষ কার্ড।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিরলস সেবা প্রদান করছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন** বলতে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বোঝায়, যার মধ্যে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কীরূপ সহায়তা প্রদান করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য **মূলধন** গঠন অপরিহার্য।
- **বাণিজ্যিক** ব্যাংক তার আমানতের উপর সুদ প্রদান করে জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে থাকে।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্রিত করে দেশের মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

- অলসভাবে পড়ে থাকা সঞ্চয়কে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে বিভিন্ন উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে।
- সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।
- দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সহায়তা করে।
- এ ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।
- এছাড়া ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুন্ডি বাট্টাকরণের** দ্বারা বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে থাকে।

** হুন্ডি বলতে বাণিজ্য ও ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আর্থিক দলিলসমূহকে বোঝায়।
সময়ের আগেই প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলনে হুন্ডির মালিক যে পদ্ধতিতে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে, সে পদ্ধতিকে হুন্ডি বাট্টাকরণ বলে। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই টাকার প্রয়োজন হলে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে হুন্ডি ভাঙিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। এ কাজে ব্যাংক প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ব্যাংক আমানত হিসেবে যা গ্রহণ করে তা থেকে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্যের চাকা সচল রাখে।

এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে **কৃষি** উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য যেসব কৃষি উপকরণ প্রয়োজন যেমন–

- জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর,
- সেচের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ,
- উন্নতমানের বীজ, পাওয়ার পাম্প,
- সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

- বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ দিচ্ছে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে।
- বৈদেশিক বিনিময় বিল গ্রহণ অথবা তা বাট্টা করে ভাঙিয়ে দেওয়া, এল. সি (Letter of Credit) জারি, টেলিগ্রাফিক ও মেইল ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- এ ব্যাংক দেশের মূলধন উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে সহজে স্থানান্তর করে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।

এর ফলে মূলধনের গতিশীলতা বাড়ে এবং মূলধন অঞ্চলে উৎপাদনমূলক কাজ করা সহজতর হয় এবং সমাজে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

এলসি (LC- লেটার অব ক্রেডিট) কি?

বিশ্বায়নের এই যুগে প্রায় সব ধরনের ব্যাবসা বাণিজ্যই আন্তর্জাতিক। ব্যবসায়ীদের নানা প্রয়োজনেই বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করতে হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ কাউকে চিনেন না। সেক্ষেত্রে বিক্রেতার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। এই ঝুঁকি এড়াতে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এই এলসি বা ল্যাটার ওব ক্রেডিট এর মাধ্যমে লেনদেন করে থাকেন।

বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানী করার চাইলে অবশ্যই ব্যাংকের মারফত এলসি করতে হবে। **আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বৈধ মাধ্যমই হল এলসি**। এলসির মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা একদেশ থেকে অন্য দেশে পন্য আমদানি-রপ্তানি করে থাকে। এলসি (LC) হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নাম যার সম্পূর্ণ করলে হয় লেটার অব ক্রেডিট (ইংরেজিতে) আর ইতালিতে এটিকে বলে লেত্তেরা ডিক্রেডিটো (Lettera di credito). সাধারণত বিদেশ থেকে পণ্য বা যন্ত্রাংশ আমদানী করার জন্য অবশ্যই ব্যাংকের মারফতএলসি করতে হয় । এই এলসির মাধ্যমেইন সরবরাহকারীরা একদেশ থেকে অন্য দেশে পন্য আমদানি রপ্তানি করে থাকে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- সীমিত আয়ের লোকদের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে বেকার সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- সাম্প্রতিককালে এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিক্সা-ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, ডাল-চাল-আটা ভাঙানোর মিল স্থাপনে ব্যক্তিগত জামিনের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে।
- ঋণদানের সময় ক্ষেত্র বিবেচনা করে, প্রধানত উৎপাদন খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। এর ফলে একদিকে অর্থের অপচয় রোধ হয় এবং অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণদান করার ফলে, ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা সহজ হয় এবং ভোক্তারা সহজে ও সুলভে ভোগ্যপণ্য ভোগের সুযোগ পায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেশ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোকে কার্যকরী করে বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ করে দামস্তর স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

- ঋণের যোগানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণের অলঙ্কারাদি, মূল্যবান দলিলপত্র ও অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে এদের নিরাপত্তা প্রদান করে গ্রাহক সেবা দান করে।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিদ্যুৎ-টেলিফোন বিল, শেয়ারের টাকা, বিমার প্রিমিয়াম প্রভৃতি সংগ্রহ করে থাকে।
- এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ চেক প্রদান করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সামাজিক খাতের উন্নয়নসহ মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সাধনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
মুদ্রা	যা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, তাই মুদ্রা। বিভিন্ন দেশে মুদ্রা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন: ভারতের মুদ্রার নাম রুপি, বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা।
আমানত	সঞ্চয় কিংবা মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানের জন্য জনসাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে নগদ অর্থ জমা রাখে এবং কিছু শর্তের মাধ্যমে তা উত্তোলন করার অধিকার ভোগ করে তাকেই আমানত বলে। আমানত দুই প্রকার। যথা: ক. প্রকৃত আমানত ও খ. সৃষ্ট আমানত
মুদ্রার মূল্য	মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সাধারণ অর্থে মুদ্রার মূল্য বলতে, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। মুদ্রা দ্বারা পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলা হয়।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
মুদ্রার চাহিদা	একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকেই মুদ্রার চাহিদা বলে।
মুদ্রার যোগান	মুদ্রার সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। সূত্রাকারে Ms=DD + Cu+TD এখানে, Ms = অর্থের সরবরাহ, DD = ব্যাংকে রক্ষিত আমানত, Cu= জনগণের হাতের মুদ্রা, TD মেয়াদি আমানত
তারল্য নীতি	গ্রাহকগণ তাদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে তারল্য নীতি বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
ব্যাংক	ব্যাংক (Bank) একটি ইংরেজি শব্দ। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক শান্সি ব্যাংক (Shansi Bank) স্থাপন করা হয়। ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং জমাকৃত অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বা ভোগের নিমিত্তে ঋণদান করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি একক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মুনাফা অর্জন নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।
মুদ্রা বাজার	ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে অর্থের লেনদেনের সমষ্টিগত কার্যক্রম যে বাজারে হয়ে থাকে, তাকে মুদ্রা বাজার বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
মূলধন বাজার	যে সমস্ত আর্থিক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণের লেনদেন করে, তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে।
নিকাশঘর	নিকাশঘর হলো এমন একটি স্থান বা কেন্দ্র যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে তাদের মধ্যের চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট লেনদেন নিষ্পত্তি করে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ ঋণসুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত উদ্যোক্তাকে তুলনামূলক অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।
বিহিত মুদ্রা	সরকার আইনের মাধ্যমে যে মুদ্রা চালু করে এবং মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেশের জনসাধারণ যা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
অসীম বিহিত	অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক মুদ্রাকে বোঝায় যা দিয়ে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।
সসীম বিহিত	সসীম বিহিত মুদ্রা বলতে এমন এক মুদ্রাকে বোঝায় যা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায় এবং এটি আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। জনগণ তার ইচ্ছানুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে।
লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা	আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা বলে.
মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা	আকস্মিক প্রয়োজন ও অনিশ্চয়তা, কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা	কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে টাকা খাটানোর কাজকে ফটকা কারবার বলে। তাই ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় | তাকেই মুদ্রার ফটকা চাহিদা বলে।
অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি ও বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সমানুপাতিকে হবে। তখন দ্রব্যের দামের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত হয়। সে অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।
মোবাইল ব্যাংকিং	যে পদ্ধতিতে কোনো ক্রেতা বা গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইলের দ্বারা SMS এর মাধ্যমে অতি দ্রুত আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে, তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে

অর্থনীতি ১ম পত্র

সেট-১

Solve

অর্থনীতি ১ম পত্র

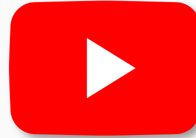
সেট-২

Solve



Economics 2nd Paper

এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ২য় পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো







DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

সুচিপত্র

এইচ এস সি ২১ শর্ট সিলেবাসের অর্থনীতি ২য় পত্রের ক্লাস গুলো পেতে নিচের বাটনে ক্লিক করো





বাংলাদেশের কৃষি







বাংলাদেশের শিল্প







জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থানসমূহ







আন্তর্জাতিক বাণিজ্য







মডেল টেস্ট এবং সলিউশন







বাংলাদেশের কৃষি





শিখনফল

- কৃষি, বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো ।
- বাংলাদেশের কৃষি উপখাতসমূহ ও অবদান ।
- কৃষি খামার ও কৃষিজোত ।
- বাংলাদেশের কৃষি খামারের স্বরূপ ও কৃষি খামারের প্রকারভেদ ।
- জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য।

কৃষি

কৃষির ইংরেজি প্রতিশব্দ **Agriculture** শব্দটি ল্যাটিন শব্দ **'Ager'** ও **'Cultura'** থেকে উদ্ভূত।

Ager অর্থ জমি বা মাঠ এবং **Cultura** শব্দের অর্থ চর্চা বা চাষ করা।

তাই সাধারণ অর্থে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষি বলে।

কৃষির সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে বাংলায় **'ক্ষেত্রকর'** বা **'কর্ষক'** বা **'কৃষক'** বলে।

এর সঙ্গে স্পষ্টতই ক্ষেত্র বা খেত এবং কর্ষণ শব্দগুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

কৃষি হলো এমন একটি সৃষ্টি সম্পর্কিত কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজবপন,উদ্ভিদ/শস্যচারা পরিচর্যা ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কৃষি

পৃথিবীর প্রাচীন ও বৃহত্তম শিল্প হলো কৃষি।

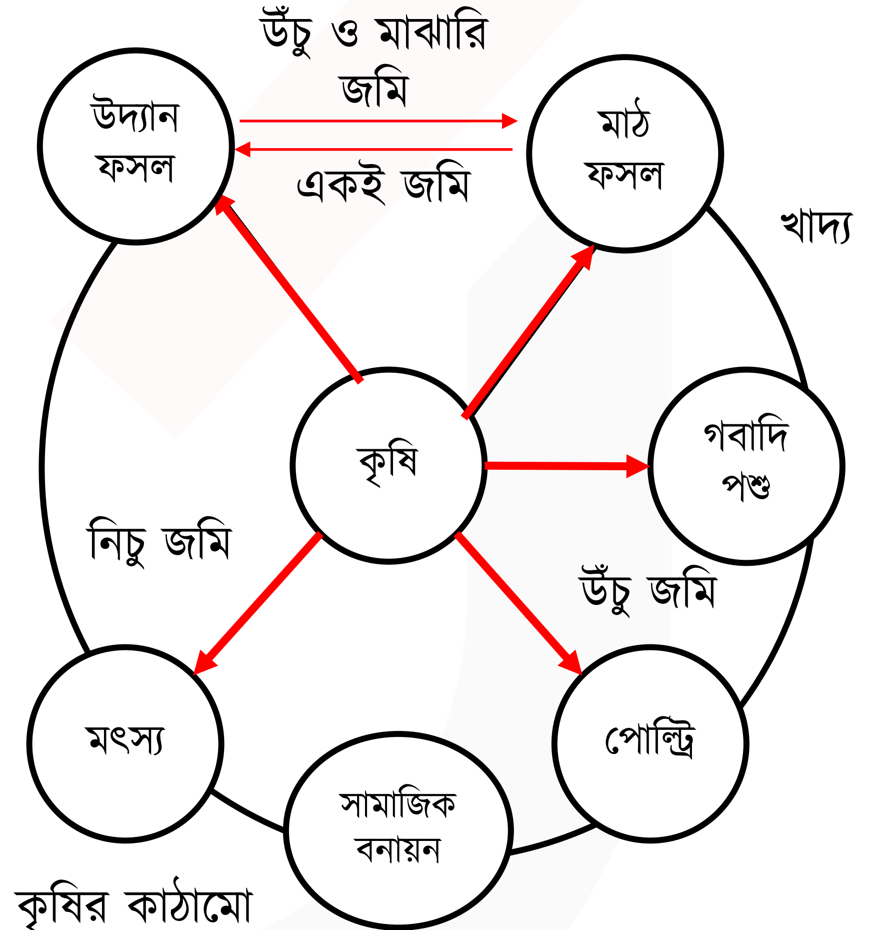
বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই কৃষিকাজ প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়।

অতএব, আমরা বলতে পারি, মনুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক জন্ম-বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির সাহায্যে মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে **কৃষি বা কৃষিকাজ** বলে।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

কৃষি একটি গতিশীল জৈবিক ও প্রাথমিক উৎপাদন প্রক্রিয়া। মাটির জৈবিক ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী পালনের সাহায্যে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশে কৃষির কাঠামো বা ক্ষেত্র কতগুলো খাত-উপখাতে বিস্তৃত। তা ছকে উপস্থাপন করা হলো :



চিত্র: কৃষির কাঠামো

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

উদ্যান ফসল	মৎস্য	মাঠ ফসল	গবাদি পশু	পোল্ট্রি
ফল	কার্প মাছ	দানা জাতীয় ফসল	গরু, মহিষ, উট	হাঁস, মুরগি, টার্কি, তিতির
সবজি	জিওল মাছ	ডাল জাতীয় ফসল	ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি	কবুতর, দোয়েল
মসলা	চিংড়ি	তৈলবীজ জাতীয় ফসল		পোষা পাখি প্রভৃতি
ফুল	রাক্ষুসে মাছ	অর্থকরী ফসল		
সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছ	সামুদ্রিক মাছ			

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো বলতে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান ও গুরুত্ব, কৃষির উপখাত ও সেগুলোর উৎপাদন, কৃষিপণ্যের ধরন, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ধরন, খামারের আয়তন, কৃষিকাজের ধরন, কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদির মিলিত রূপকে বোঝায়।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর কৃষি কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। দেশভেদে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ভিন্ন হয় বলে কৃষি কাঠামো ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিচে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান ও গুরুত্ব:

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি।
দেশের শ্রমশক্তির শতকরা ৪০.৬০ ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত।
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (মৎস্য খাত ব্যতীত) ১০.১১ শতাংশ হলো কৃষি খাতের অবদান।
কৃষি এদেশের মানুষের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়।
কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ কৃষির উপখাত ও সেগুলোর উৎপাদন:

মৎস্য উপখাত ব্যতীত এদেশের তিনটি উপখাতে বিভক্ত, যথা—শস্য ও শাকসবজি,পশু সম্পদ ও বনজ সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনের কৃষির উপখাতগুলোর মধ্যে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৭.০৫ ভাগ।

এরপর রয়েছে বনজ ও প্রাণী সম্পদের অবদান, যা যথাক্রমে প্রায় শতকরা ১.৫৮ ও ১.৪৭ ভাগ।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ **কৃষিপণ্যের ধরন:**

বাংলাদেশের কৃষিতে দুই ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। যথা— খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল।

ধান,গম,ডাল, ভুট্টা, তেলবীজ, আলু, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি প্রধান খাদ্যশস্য; অন্যদিকে পাট, চা, আখ, তামাক,রেশম,তুলা,রাবার ইত্যাদি হলো প্রধান অর্থকরী ফসল।

তাছাড়া দেশের প্রায় সব কৃষক পরিবার নিজেদের প্রয়োজনেই বসতবাড়িতে কমবেশি হাস-মুরগি এবং গরু-ছাগল পালন করে।

সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন অনেক বেড়েছে।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ উৎপাদনের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের কৃষকরা মূলত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করে।
এ কারণে সাধারণত তারা পরিবারের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই যতটা সম্ভব উৎপাদন করে।
তবে সাম্প্রতিককালে এদেশে কোন কোন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।
বহু তরুণ ও যুবক আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের খামার করায় এ খাতের আকার এখন বেশ বড়।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ **ভূমি ব্যবস্থার ধরন:**

বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রায়তওয়ারী প্রথা প্রচলিত আছে।

কৃষকরা সরকারকে প্রদত্ত খাজনার বিনিময়ে বংশানুক্রমে ভূমির ভোগ-দখল ও হস্তান্তরের অধিকার ভোগ করে।

উল্লেখ্য, এদেশে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কৃষকেরই নিজস্ব কোন জমি নেই। তারা ভূমিহীন কৃষক বা প্রান্তিক কৃষক। এ কৃষকরা যৎসামান্য আর্থিক মজুরি ও খাদ্যের বিনিময়ে কৃষিকাজ করে।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ খামারের আয়তন:

বাংলাদেশে বেশিরভাগ কৃষি খামারের আয়তন ছোট।
এদেশে মোট খামারের প্রায় ৯০% ভাগ হলো ০.৫-২.৪৯ একরের।
বৃহদায়তন খামারের সংখ্যা খুবই কম।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ **কৃষিকাজের ধরন:**

বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

যে বছর প্রকৃতি কৃষিকাজের অনুকূলে থাকে সে বছর কৃষির ফলন ভালো হয়। আর যে বছর তার বিপরীত ঘটে সে বছর ফলন কম হয়। এখানে কৃষিকাজের একক হলো ভূমির মালিক ও তার পরিবার এবং তাদের মালিকানাধীন এক বা একাধিক খণ্ড জমি।

মালিক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে স্বল্প মূলধন খাটিয়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করে।

বর্গাচাষ পদ্ধতির অধীনে নিজের জমি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অন্যকে চাষ করতে দেওয়ার রেওয়াজও চালু আছে।

এদেশে এখন মূলত সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ চললেও সাম্প্রতিককালে সীমিত পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ শুরু হয়েছে যা ক্রমেই বাড়ছে।

বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো

➢ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকই দরিদ্র।

দেশের ৫০ শতাংশেরও অধিক কৃষক পরিবার কার্যত ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে।

কৃষকদের আয় খুব কম বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর জীবনযাত্রার মান নিচু। যথাযথ খাদ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাবে তারা দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন।

আবার কারিগরি জ্ঞানের অভাবে কৃষির আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ।

জাতির খাদ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করলেও সাধারণত সমাজেও তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি খাতকে দুটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। উপখাতসমূহ হলো-

1. **কৃষি ও বনজ এবং**
2. **মৎস্য সম্পদ।**

তাহলে কৃষিকাজের ধরন ও উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সার্বিক কৃষিখাতের চারটি উপখাত রয়েছে।

নিচে এদেশের কৃষির উপখাতগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

❖ শস্য ও শাকসবজি খাত (Crops and Vegetables Sector):

বিভিন্ন প্রকার শস্য ও শাকসবজি নিয়ে বাংলাদেশের কৃষির শস্য ও শাকসবজি উপখাত গঠিত। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। এ খাতের উৎপাদিত শাস্যের মধ্যে ধান, পাট, গম, ডাল ইত্যাদি প্রধান।

এছাড়া আলু, কপি, লাউ, পটল, করলা, বেগুন, টমেটো ঝিঙ্গা, বরবটিসহ অনেক সবজি এবং বিভিন্ন ধরনের শাক উৎপাদিত হয়। এদেশে উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান।

শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষিজমির ৯০ শতাংশেই খাদ্যশস্যের চাষ হয়। আবার খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির প্রায় ৮০ শতাংশই ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এদেশের জাডিপির শতকরা ৮.৩৫, ২০১৬-১৭-তে ৭.৮৬ ভাগ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ৭.৫১ ভাগ। ২০১৮-১৯ অর্থবছর এ খাতের অবদান হলো ৭.০৫।

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

❖ পশু সম্পদ (Livestock):

গৃহে ও খামার পালিত নানা জাতীয় পশুপাখি নিয়েই বাংলাদেশের পশু সম্পদ উপখাত গঠিত।
গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি এদেশের পশু সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।
গ্রামীণ পরিবহণ, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশু সম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে এর অবদান ছিল শতকরা ১.৬০ ভাগ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ১.৫৩ ভাগ যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে অবদান ১.৪৭ ভাগ।

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

❖ বনজ সম্পদ (Forestry):

বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর।
এর ১.৬০ মি. হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। অবশিষ্ট ০.৭২ মি. হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন।

মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ১৭.৫% হলো বনভূমি। কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি, কাঠ, বেত, মোম, মধু, রাবার, গোলপাতা, শণ ইত্যাদি নিয়ে এ উপখাত গঠিত।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের জিডিপি এর শতকরা ১.৬৬ ভাগ এবং ২০১৭-১৮-তে ১.৬২% এবং ২০১৮-১৯-তে ১.৫৮% ছিল এ উপখাতের অবদান।

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

❖ **মৎস্য সম্পদ:**

বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো মৎস্য সম্পদ।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসংখ্যনদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য নিয়ে এই উপখাত গঠিত।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে GDP-তে এ উপখাতের অবদান ৩.৬১%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩.৫৬% এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩.৫০%।

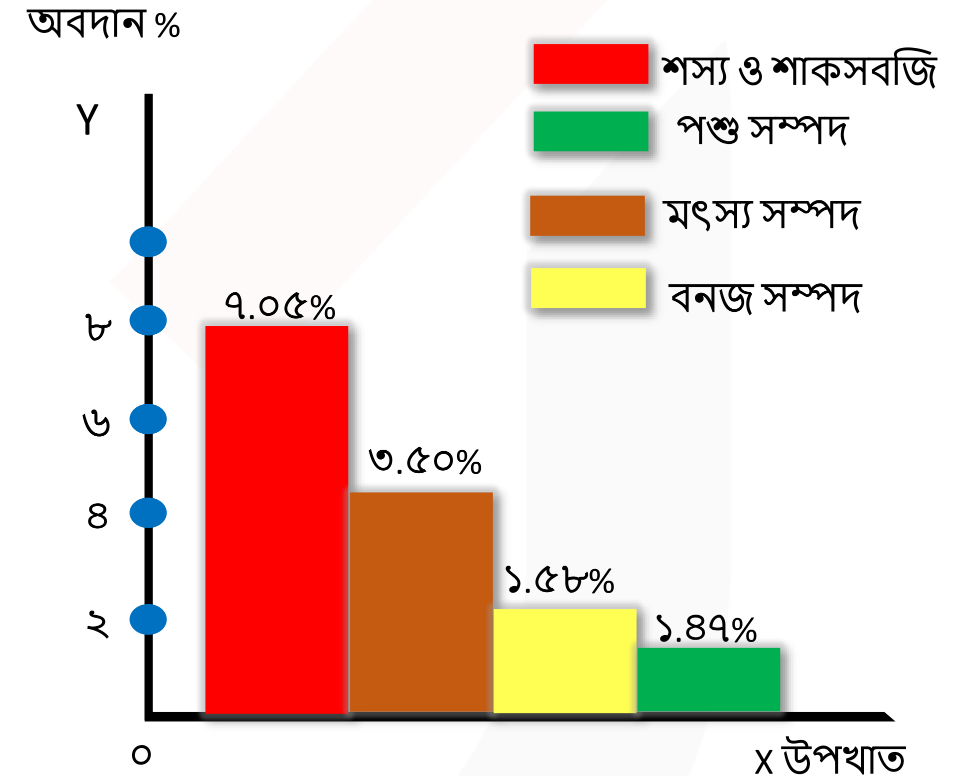
সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন উপখাতের অবদান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সার্বিক খাত হিসেবে কৃষি খাতকে দুটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। উপখাতসমূহ হলো—

১. কৃষি ও বনজ এবং ২. মৎস্য।

আবার কৃষি ও বনজ খাত তিনটি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ।

সম্প্রতি মৎস্যখাতকে একটি আলাদা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদনে এ উপখাতগুলো বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রেখে থাকে। পাশের লেখচিত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমগ্র কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।
বিভিন্ন উপখাতের অবদান শতকরা হিসাবে দেখানো হলো।



চিত্র: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমগ্র কৃষি উপখাতগুলোর শতকরা অবদান

জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। তবে দিনে দিনে এদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ কমে আসছে। সত্তরের দশকে এদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ।

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সে অবদান ক্রমেই কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ।এ ধারা অব্যাহত থাকে।
২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৬ শতাংশ।
২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮,২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা প্রায় ১৪.৭৪, ১৪.২৩ এবং ১৩.৬০ ভাগ।

জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান

অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে অতীতের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ক্রমেই অনেকখানি কমে এসেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, দেশের মোট বার্ষিক কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কৃষি উৎপাদম কমলেও সে তুলনায় দেশের জাতীয় উৎপাদন আরও বেশি বাড়ছে।

কৃষি খাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে পশু সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাত।

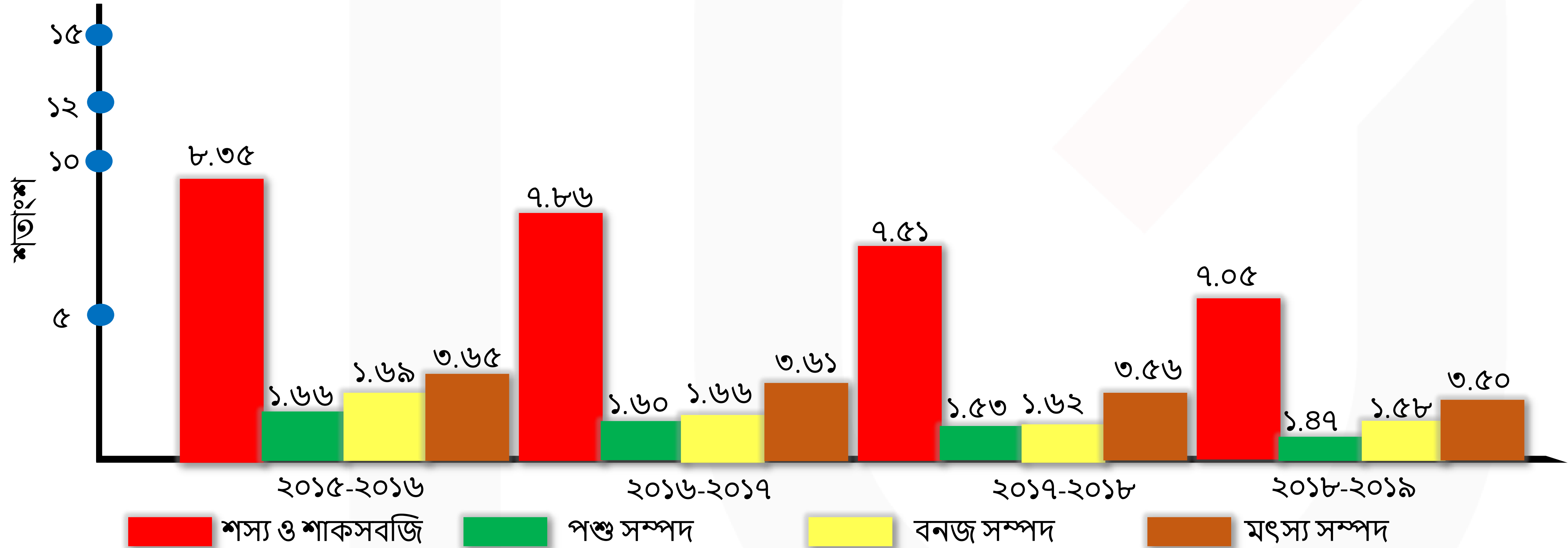
নিচে সারণি লেখচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরের জিডিপি'তে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান দেখানো হলো।

জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান

কৃষির উপখাত	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
ক. শস্য ও শাকসবজি	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৫১	৭.০৫
খ. পশু সম্পদ	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৩	১.৪৭
গ. বনজ সম্পদ	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৫৮
ঘ, মৎস্য সম্পদ	৩.৬৯	৩.৬৫	৩.৬১	৩.৫৬	৩.৫০

জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান

উপরের সারণির ভিত্তিতে নিচে গত কয়েক বছরের জিডিপিতে কৃষি উপখাতগুলোর অবদান লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



লেখচিত্র: বিভিন্ন অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের শতকরা অবদান

কৃষি খামার ও কৃষিজোত

যে স্থানে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় সে স্থানকে খামার বলে। একজন কৃষক কোন আয়তনের জমিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তা উৎপাদন ও ব্যবস্থাগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি খামার ও কৃষিজোত।

কৃষি খামার (Agricultural Farm) একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির বাহ্যিক অবস্থাকে কৃষি খামার (Agricultural Farm) বলে। একজন কৃষক যে জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তা একই স্থানে বা মাঠের বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে।

কৃষি খামার ও কৃষিজোত

এ রকম সব জমিকে একত্রে কল্পনা করে তিনি উৎপাদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। **কৃষক তার আওতাধীন জমিতে কোন কোন শস্য, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একককে খামার (Farm) বলে।** কৃষক কেবল একটি বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে তা হবে বিশেষায়িত খামার;আর তিনি যদি কয়েক ধরনের ফসলের উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন তবে তা হবে বহুমুখী খামার।

কৃষি খামার ও কৃষিজোত একই অর্থে ব্যবহার হয়। কেউ কেউ কৃষিজোত বলতে আদর্শ খামারকেই বুঝিয়েছেন। এর আকার একেক দেশে একেক রকম।

যেমন- চীনে আদর্শ খামারের আয়তন ৩২৫ একর, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫০ একর, জার্মানিতে ২১ একর বেলজিয়ামে ১৪ একর। বাংলাদেশে সাধারণত ৩ একর জমিকে আদর্শ খামার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ

বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারই হলো জীবনধারণোপযোগী খামার। কৃষক যখন তার জমিতে শুধু নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সব কৃষিপণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করেন তখন তাকে জীবনধারণোপযোগী খামার (Subsistence Farm) বলে। নিজের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোই এ খামারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

জীবনধারণোপযোগী কৃষি খামারে পরিচালিত কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের চাহিদা মেটানো। এরূপ খামারে সাধারণত পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করা হয় এবং এটিই উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত এমন খামার থেকে কৃষকের আয় হয় যৎসামান্য। এজন্য তাদের সঞ্চয়ও কম হয়।

বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ

এখানে কৃষিকাজে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ হয় নগণ্য। বাংলাদেশে যেসব জীবনধারণোপযোগী খামার একটু বড় সেখানে ব্যস্ত মৌসুমে প্রয়োজনবোধে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তবে এসব খামারের বেশিরভাগই অতি ক্ষুদ্রায়তনের হয়। এসব ক্ষুদ্রায়তন খামারের আকার ০.৫০-২.৪৯ একর হয়ে থাকে। মোট খামারের ৯০ শতাংশই এ আকারের।

দেশের মাঝারি খামারগুলোর আয়তন ২.৫০-৭.৪৯ একর। এ খামারগুলোও জীবনধারণোপযোগী খামার। তবে এগুলোতে কিছু ফসল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের চেষ্টা চলে। এদেশে বৃহদায়তন (৭.৫০ একর ও তার বড়) খামারগুলো হলো বাণিজ্যিক খামার। সেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ

এ ধরনের খামার এদেশের মোট খামারের মাত্র ২.৫২%। জীবনধারণোপযোগী খামারে কৃষক পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ, পারিবারিক শ্রমের সদ্ব্যবহার, নিবিড় চাষ পদ্ধতি, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ, উপকরণের অপচয় রোধ ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। তবে এ ধরনের খামারে অসুবিধাও কম নয়। ক্ষুদ্রায়তনের হওয়ায় এখানে উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগে বাধা, উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে না পারা, দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষীকরণের অভাব ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ

বাংলাদেশের কৃষি খামারের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এর আর একটি দিক বিবেচনা করা দরকার তা হলো খামারগুলোর বহুমুখিতা। এদেশের বেশিরভাগ খামারই জীবননির্বাহী হওয়ায় সেখানে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন করা হয়।

এ কারণে বলা যায়, এদেশের বেশিরভাগ খামার জীবনধারণোপযোগী হলেও সেগুলো বহুমুখী খামারও বটে। এ ক্ষেত্রে সারা বছর ধরে কৃষিকাজ করার সুবিধা, ফসলের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাস, একই ফসল চাষ করার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা, পরিবারের প্রয়োজনানুসারে ফসল উৎপাদন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করা যায়।

কৃষি খামারের প্রকারভেদ

বিভিন্নভাবে কৃষি খামারকে ভাগ করা হয়। নিচের ছকে তা উপস্থাপন করা হলো—

কৃষি খামার

মালিকানার ভিত্তিতে

১. ব্যক্তিমালিকানাধীন।
২. সমবায় খামার।
৩. যৌথ খামার।

ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে

১. বিশেষায়িত খামার।
২. বহুমুখী খামার।
৩. মিশ্র খামার

উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে

১. জীবননির্বাহী খামার
২. বাণিজ্যিক খামার।

আয়তনের ভিত্তিতে

১. প্রান্তিক খামার
২. ক্ষুদ্রায়তন খামার
৩. মাঝারি খামার
৪. বৃহদায়তন খামার

কৃষি খামারের প্রকারভেদ

মালিকানার ভিত্তিতে: মালিকানার ভিত্তিতে খামার তিন প্রকার। যথা—

১. ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার: যে খামার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় তাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার বলে।

২. সমবায় খামার: কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে বৃহদায়তন খামার গঠন করেন তাকে সমবায় খামার বলে। যেমন: বাংলাদেশের মিল্ক ভিটা সমবায় খামার।

৩. যৌথ খামার: যে খামারে কৃষকরা নিজেদের জমি ও মূলধন একত্রিত করে যৌথভাবে কৃষিকাজ ও খামারের অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনা করেন এবং কৃষক তার নিজস্ব শ্রমের ব্যয়িত সময় ও মান অনুসারে ফসলের অংশ পায়, তাকে যৌথ খামার বলে। রাশিয়ায় একসময় টোজ, আর্টেল, কমিউন নামে তিন ধরনের যৌথ খামার গঠিত হয়েছিল।

কৃষি খামারের প্রকারভেদ

ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে খামার: ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে খামার তিন প্রকার। যথা—

১. **বিশেষায়িত খামার:** কোনো একটি খামার বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে তাকে বিশেষায়িত খামার **(Specialised farm)** বলে। সর্বোচ্চ মুনাফা করার জন্য এ ধরনের ফার্মে ব্যবহৃত উৎপাদন কৌশল মূলধন নিবিড় হয়।

২. **বহুমুখী খামার:** একই খামারে একটি ফসলের পরিবর্তে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হলে তাকে বহুমুখী খামার বলে।

৩. **মিশ্র খামার:** যে খামারের একাংশে ফসল উৎপন্ন করে অন্য অংশে পশুপালন করা হয়, তাকে মিশ্র খামার **(Mixed Farm)** বলে। যেমন- কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরেপে এরূপ খামার দেখা যায়।

কৃষি খামারের প্রকারভেদ

উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার: উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার দুই প্রকার। যথা—

১. জীবননির্বাহী খামার (Subsistence Farm): জীবননির্বাহের জন্য কৃষক যে ভূমিখণ্ডে ফসল উৎপাদন করে, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

২. বাণিজ্যিক খামার (Commercial Farm): যে খামার মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়,তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে।

কৃষি খামারের প্রকারভেদ

আয়তনের ভিত্তিতে খামার: আয়তনের ভিত্তিতে খামার চার প্রকার। যথা–

১. প্রান্তিক খামার: যে খামারের আয়তন ০.০৫-০.৪৯ একর তাকে প্রান্তিক খামার বলে।

২. ক্ষুদ্রায়তন খামার: যে খামারের আয়তন ছোট অর্থাৎ ০.৫০-২.৪৯ একর, তাকে ক্ষুদ্রায়তন খামার বলে।

৩. মাঝারি খামার: যে খামারের আয়তন ২.৫০-৭.৪৯ একর, তাকে মাঝারি খামার বলে।

৪. বৃহদায়তন খামার: যে খামারের আয়তন ৭.৫ একর বা তার বেশি, তাকে বৃহদায়তন খামার বলে।

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে কৃষিপণ্য উৎপাদনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

কৃষির দক্ষতা ও উৎপাদন পদ্ধতি বহুলাংশে খামারের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

তাই চাষাবাদ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাষযোগ্য জমির নূন্যতম আকার নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এদেশে বৃহদায়তনে খামারের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন খামার অধিক দক্ষ।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম জে ফারেল (Prof. Michael James Farrell) কৃষি খামারের দক্ষতা ৩ দিক থেকে পরিমাপ করেছেন । যথা—

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

১। কৌশলগত দক্ষতা: যে উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন সর্বাধিক হয় তাকে কৌশলগ দক্ষতা বলে।

২। বণ্টনগত দক্ষতা: কৃষিপণ্যের মূল্য প্রদত্ত অবস্থায় উপকরণসমূহকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন সর্বাধিক হয় তাকে বণ্টনগত দক্ষতা বলে।

৩। অর্থনৈতিক দক্ষতা: কৌশলগত দক্ষতা ও বণ্টনগত দক্ষতা এক সাথে অর্জিত হলে তাকে অর্থনৈতিক দক্ষতা বলে ।এজন্য বলা হয় সে খামার অধিক দক্ষ যে খামারের অর্থনৈতিক দক্ষতা সবচেয়ে বেশি।

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

বিআইডিএস (BIDS) এর একজন গবেষক ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের শ্রম ও জমির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি খামারের উৎপাদন দক্ষতা যাচাই করেন।

এ যাচাই কাজে তিনি ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার কৃষি খামারের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখান যে ক্ষুদ্র খামারের উৎপাদন দক্ষতা বৃহৎ খামার অপেক্ষা অধিক।



কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

নিচের সারণিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো—

খামারের আয়তন(একর)	জমির দক্ষতা (টাকা)	একর প্রতি উৎপাদন (টাকা)	ফসলের নিবিড়তা (টাকা)	শ্রমের দক্ষতা (টাকা)
০ – ২.৪৯	৫৫২	৩৭২	১৪৯	৭.৬১
২.৫ – ৪.৯৯	৫৬০	৩৭৫	১৪৯	৮.১৩
৫.০ - ৭.৪৯	৪৬৩	৩৩৬	১৩৮	৭.৬২
৭.৫০ – উর্ধ্বে	৩২৬	২৫৮	১২৬	৬.৪৯
সমস্ত খামার	৪৪৯	৩১৬	১৪২	৭.৩৮

উৎস: Hossain Mahbub-Farm Size and Productivity in Bangladesh A Case Study of Phulpur Farms in BER, January-1974.

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

সারণিতে লক্ষ করা যায়, **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র আকারের খামারের উৎপাদন দক্ষতা বেশি।** ফলে এদেশে ক্ষুদ্র আকারের খামার অধিক কাম্য এবং এ ধরনের খামারই এদেশের জন্য আদর্শ খামার হিসেবে বিবেচিত।



জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য।

যে খামারে কৃষক তার নিজের তথা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করেন তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

অন্যদিকে, যে খামার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় বাণিজ্যিক খামার। এদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো—



জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য।

জীবননির্বাহী খামার	বাণিজ্যিক খামার
১. জীবননির্বাহী খামার ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হয়ে থাকে।	১. বাণিজ্যিক খামার বৃহদায়তন বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
২. পারিবারিক প্রয়োজনে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।	২. মুনাফার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।
৩. উৎপাদনে সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	৩. উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৪. উৎপাদনের দক্ষতা কম থাকে।	৪. উৎপাদনের দক্ষতা বেশি থাকে।
৫. উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভব হয় না।	৫. উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়।

জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য।

জীবননির্বাহী খামার	বাণিজ্যিক খামার
৬. কম মূলধন বিনিয়োগ হয়।	৬. বেশি মূলধন বিনিয়োগ হয়।
৭. বহুবিধ ফসল উৎপাদিত হয়।	৭. একটি বা দুই ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়।
৮. ঝুঁকির পরিমাণ কম।	৮. ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।
৯. খামারের ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা অদক্ষ।	৯. খামারের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পিত এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা দক্ষ।
১০. প্রকৃতির ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল।	১০. প্রকৃতির ওপর কম মাত্রায় নির্ভরশীল।

কৃষিজোত

কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তাকে কৃষিজোত বলে। কৃষিজোত হলো কৃষি খামারের অংশ। এরকম জোত ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বড় হতে পারে। আবার কৃষকের কৃষিজোতগুলো একত্রে না থেকে মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

মোটকথা, কৃষিকাজের জন্য কৃষকের অধীনে একটি অখণ্ড কৃষিজমিই হলো কৃষিজোত। একজন কৃষকের এক বা একাধিক কৃষিজোত থাকতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকেরই কৃষিজোতগুলো উপবিভক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। তবে কৃষিজোতের চেয়ে অর্থনৈতিক জোতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক জোত বলতে এমন একটি আয়তনের কৃষিজমিকে বোঝায় যার দ্বারা কৃষিকাজের দক্ষতা ও ফলন সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়। আবার উক্ত কৃষিজোতে নিয়োজিত পরিবারটি স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ

বাংলাদেশের প্রায় ৭৫% ভূমি মালিক নিজে চাষ করেন এবং ২৫% জমি বর্গাচাষের অধীন। এদেশের প্রায় ৪০% কৃষক পরিবার বর্গাচাষি এবং ৪৮% কৃষক পরিবার ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে বর্গাচাষি কিংবা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মোট কৃষিজোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৯ ভাগই হলো ক্ষুদ্রায়তনের জোত (০.৫-২.৪৯)। মাঝারি আয়তনের জোত(২.৫০-৭.৪৯)মোট জোতের শতকরা প্রায় ১০.৩৪ ভাগ। বৃহদায়তনের জোতের (৭.৫০ একর) সংখ্যা নগণ্য প্রায় ১.১৭ ভাগ। প্রদত্ত সারণিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, এদেশে কৃষিজোতগুলোর সিংহভাগই অতি ক্ষুদ্রায়তনের।

বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ

সারণি:১—বাংলাদেশ কৃষিজোতের আয়তন ও শতকরা হার		
	মোট জোতের শতকরা	জোতের গড় আয়তন
ক্ষুদ্রয়তনের জোত	৮৮.৪৯	১.২৯
০.৫০-০.৯৯ একর	৬৩.৫৫	০.৯৭
১.০০-১.৪৯ একর	১৩.৯৯	১.৫০
১.৫০-২.৪৯ একর	১২.৩১	২.২৬
মাঝারি আয়তনের জোত ২.৫০-৭.৪৯ একর	১০.৩৪	৪.৩২
বৃহদায়তনের জোত ৭.৫০ একর ও তদুর্ধ্ব	১.১৭	১২.৭৪

উৎস: বাংলাদেশের পরিসংখ্যান পকেট বুক,২০১৪

বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ

ক্ষুদ্রকারের জোতে পুঁজির সাহায্যে চাষ, পারিবারিক শ্রম ব্যবহার উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহার, সারা বছর ধরে চাষ, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সুবিধা থাকলেও এর কতগুলো সমস্যা ও রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজন মাফিক বিনিয়োগের অভাব, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ না করায় উৎপাদন না হওয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিজোতের আধিক্য রয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ দেশের বেশিরভাগ কৃষিজোতই পরিমিত আয়তনের নয়। এরূপ জোতে নিয়োজিত শ্রম ও মূলধন পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না।এখানে কৃষিকাজ অদক্ষভাবে পরিচালনা করা হওয়ায় উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হয় কম।এ কারণে ক্ষুদ্র কৃষকরা সন্তোষজনকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে না।

বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ

সারণি: বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার (হাজার একরে)

সাল	২০১২-১৩	২০১৮-১৯	২০১২-১৩ এর প্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপাত্তের পরিবর্তন ব্যাখ্যা
মোট অঞ্চল	৩৬৬৬৯	৩৮২৫৬	মোট অঞ্চল হ্রাস পেয়েছে
বনাঞ্চল	৬৩৫৯	৭৬৬৯	বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে
চাষ বহির্ভূত	৯২৯৩	৮৮৮৩	চাষ বহির্ভূত ভূমি হ্রাস পেয়েছে
চাষযোগ্য পতিত	৫০৫	৫৭৫	চাষযোগ্য পতিত জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
চলতি পতিত	৯৬৯	১০১০	চলতি পতিত ভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে
এক ফসলি	৬০৩১	৫৪৮৮	এক ফসলি জমি হ্রাস পেয়েছে
দুই ফসলি	৯৪৪১	৯৭০৭	দুই ফসলি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
তিন ফসলি	৪০৪৭	৪৩৪৭	তিন ফসলি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
চার ফসলি	২৪	৫২	চার ফসলি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
নিট ফসলি	১৯৫৪৩	১৯৬৪১	নিট ফসলি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
মোট ফসলি	৩০৩১০	৩৮২৩৮	মোট ফসলি জমি হ্রাস পেয়েছে

উৎস: স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক-২০১৮; কৃষি ডাইরি ২০২০

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্মস্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো: উৎপাদন শেষে পণ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, ঝুঁকি বহন, বিজ্ঞাপন প্রদান, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি।

এগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় এবং ভোক্তা সাধারণও তা যুক্তিসংগত দামে ক্রয় করতে পারে। কৃষিতে পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারব্যবস্থা অনুন্নত, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ। আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকায় বেশিরভাগ কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য মৌসুমের শুরুতেই অত্যন্ত কম দামে গ্রামের হাটবাজারে বিক্রি করে দেন।

অনেক সময় ফসল ক্ষেতে থাকা অবস্থায়ই আগাম বিক্রি করা হয়।

ফড়িয়ারা তা কিনে উপজেলা সদর, নদী-বন্দর ও ছোট শহরগুলোর পাইকার, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে কিছু লাভ রেখে বিক্রয় করেন।

ফড়িয়া বা ফড়ে (Middleman) বলতে স্বাভাবিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে অবস্থানকারী লোক, দালাল বা পাইকারকে বোঝানো হয়। অন্যকথায়, যে ব্যক্তি উৎপাদক ৰা জোগানদারের কাছ থেকে সস্তা দরে পণ্যদ্রব্য কিনে বেশি দামে বিক্রয় করে তাকে **ফড়িয়া** বলা হয় ।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ

এরা আবার তাদের ক্রয়কৃত পণ্য গুদামজাত করেন এবং শহর ও বন্দরে চূড়ান্ত পর্যায়ের পাইকারি বাজারে বিক্রয় করেন।

পাইকার ও খুচরা দোকানদাররা এ বাজার থেকেই পণ্য ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করেন।

পণ্য বিপণনের এ সমগ্র প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে তার দাম বাড়তে থাকে।

তাই কৃষকরা যে দামে তার পণ্য বিক্রয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ভোক্তারা ক্রয় করেন।

এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত মুনাফার সিংহভাগই মধ্যস্বত্বভোগীদের হস্তগত হয় এবং কৃষক ও ভোক্তা সাধারণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মধ্যস্বত্বভোগী হলো সেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা উৎপাদকের পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে ভূমিকা রাখে।

এরা সাধারণত চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষিপণ্য কিনে বাজারে ভোক্তা অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে।

যেকোনো পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দায়ী করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো

কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামোর ছকটি হলো-

১. প্রাথমিক বাজার → ২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাইকারি বাজার → ৩. চূড়ান্ত পর্যায়ের বন্দরভিত্তিক বাজার।

এদেশের সমগ্র বাজার ব্যবস্থার সিংহভাগ দখল করে আছে কৃষিপণ্য বাজার।

কৃষিপণ্যের এই ব্যাপক বাজার ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত।

বিস্তৃত অর্থে কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্ত।

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো

১। প্রাথমিক বাজার:

গ্রামে কৃষি খামারের কাছাকাছি স্থানে কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার বসে।

সাধারণত গ্রামাঞ্চলেরকৃষি খামারের ৪-৫ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার অবস্থিত।

এসব বাজারে দৈনন্দিন ক্রয়বিক্রয়ের সাথে সাথে সপ্তাহে এক/দুইদিন বড় হাট বসে।

২। মাধ্যমিক বাজার:

এ বাজারকে **পাইকারি বাজার** বলে।

কারণ ব্যবসায়ীরা প্রাথমিক বাজার থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে মাধ্যমিক বাজারে বিক্রি করে।

পাইকারি ব্যবসায়ী বা আড়তদাররা এ বাজার থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে থাকে।

বাংলাদেশ কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো

৩। খুচরা বাজার বা চূড়ান্ত বাজার:

চূড়ান্ত বাজারের ব্যবসায়ীরা মাধ্যমিক বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে তাদের ক্রয়কৃত পণ্য ভোক্তার কাছে বিক্রি করে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করার পর ভোক্তার জন্য খুচরা কারবারিরা দোকানে অথবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয় এ চূড়ান্ত বাজারে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের কৃষকরা নানা ধরনের সমস্যার মধ্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে পণ্য উৎপাদন করেন তার উপযুক্ত দাম পান না।

কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এজন্য দায়ী। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১। পণ্যের নিম্নমান এবং পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব:

দেশের সকল স্থানে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান একরূপ নয়।

নিম্নমানের বীজ, উৎপাদনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিম্ন হয়।

তাছাড়া পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ ও শনাক্তকরণের অভাবেও কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

২. কৃষকের দরিদ্রতা:

এদেশের কৃষকরা দারিদ্র্যের কারণে কৃষিপণ্য গুদামজাত বা সংরক্ষণ না করে ফসল ওঠারপরপরই তা বিক্রি করে দেন। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হন।

৩. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব:

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদারইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে।

এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্যই কৃষক পণ্যের যে দামপান এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেন তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে।

ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

৪. অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা:

বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য তাদের উৎপাদিতপণ্য শহরে বা বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন না।

তারা বাড়িতেই বা গ্রামের হাটবাজারে কম দামে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে পণ্য বিক্রি করেন।

ফলে কৃষকরা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পান না।

৫. কৃষিপণ্যের বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতা:

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

এজন্য একই পণ্য কোনো বাজারে চড়া দামে এবং কোনো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়।

এতে কম দামের বাজারের বিক্রেতা কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

৬. গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা:

দরিদ্র কৃষকদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদামঘর, হিমাগার ইত্যাদি নেই।

এ কারণে তারা ফসল তোলার মৌসুমের শুরু থেকেই কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন।

৭. বিপণন ঋণের অভাব:

কৃষিপণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন- সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কৃষকদের জন্য এরূপ কোনো ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

৮. দামের উত্থান-পতন:

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের দাম খুব বেশি ওঠানামা করে।

ফসল ওঠার মৌসুমে দাম কম থাকে।

আবার মৌসুম শেষে যখন পণ্যের দাম বেশ বেড়ে যায় তখন কৃষকদের কাছে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য থাকে না।

এজন্যও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৯. ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা:

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের ওজন ও পরিমাপ (সের, মণ, কেজি, কুইন্টাল) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ত্রুটিপূর্ণ ও প্রতারণার মাধ্যম।

ফলে কৃষক প্রায়ই ক্ষতির শিকার হন।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ

১০. অপ্রতুল বাজার সুবিধা:

বেশিরভাগ কৃষিজাত পণ্য গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে কেনা-বেচা হয়।

এ বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল।

তাছাড়া টোল চাঁদা দেয়ার কারণে কৃষকরা পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম পান না।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থায় কৃষকের অজ্ঞতা, বাজার তথ্যের অভাব, নমুনাকরণের অভাবসহ নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান।

সেজন্যই এখানকার কৃষকরা সাধারণত পণ্যের ন্যায্য দাম পান না।

কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশেই কৃষি উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ কার্যক্রম জোরদার করা, বাণিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিপণ্যের সুষম যোগান ও রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা কৃষিপণ্যের উন্নত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এ কারণে বলা যায়, কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে কৃষি উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হবে। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের নিম্নমান, কৃষকদের দারিদ্র্য, বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, অসংগঠিত কৃষি বাজার ব্যবস্থা, পণ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঘাটতি, পণ্যের দামের ব্যাপক উত্থান-পতন ইত্যাদি সমস্যা কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে। কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র সরকার/রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং এ থেকে সরাসরি কোনো মুনাফা পাওয়া যায় না বলে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেখা যায় না।তাই এ ব্যাপারে সরকার/রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হয়।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি

দেশের কৃষি বিপণন নীতির তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা:

ক. উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ।

খ. অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানির জন্য কৃষিপণ্যের উন্নত মান বজায় রাখা।

গ. কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা।

এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি বিপণন নীতি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি

১। বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন :

কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এদেরমধ্যে কৃষিপণ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও নমুনাকরণ, পাইকারি বাজার উন্নয়ন, কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। বাজার নিয়ন্ত্রণ:

কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে 'কৃষি বিপণন বিভাগ' (Department of Agriculture Marketing: DAM)। এটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি বিভাগ।

বাংলাদেশে প্রায় ২৪,০০০টি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষিপণ্যের বাজার আছে।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি

৩. মূল্য স্থিতিশীলকরণ:

কৃষি বিপণন বিভাগের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলকরণের উদ্দেশ্যে শস্য ক্রয় ও বিক্রয়েরকর্মসূচি রয়েছে।

ফসল কাটার মৌসুমে সরকার নির্দিষ্ট দামে শস্য ক্রয় করে।

আবার বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা নির্দিষ্ট দামে খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়।

সুষ্ঠুভাবে মূল্য স্থিতিশীলকরণের লক্ষ্যে সরকার 'কৃষি মূল্য কমিশন' (Agriculture Price Commission : APC) নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কাজ সরকারকেই করতে হবে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারে অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনেক। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা:

সরকারি উদ্যোগে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষকরা উপযুক্তদামে তাদের পণ্য বিক্রি করে আয় ও সঞ্চয় বাড়াতে পারবে। তখন এখাতে বিনিয়োগ বাড়বে।

এভাবে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পাওয়া নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

২. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ পরিচালনা:

এ দেশে কৃষকরা মূলত জীবনধারণোপযোগী কৃষিকাজ করেন।

এর ফলে কৃষিতে বিভিন্ন পণ্যের তেমন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না।

ফলে কৃষকদের আয়ও বাড়ে না।

কিন্তু সরকার যদি কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ পরিচালিত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

সরকারি/রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুষ্ঠু কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে পণ্যের গুদামজাতকরণ,সংরক্ষণ, নমুনাকরণ, পরিবহন, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হবে। ফলে বেকার সমস্যা লাঘব হবে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৪. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত উপকরণ ব্যবহার:

কৃষিপণ্য অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অপরিহার্য।

এ ধরনের চাষাবাদের জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থা, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আবশ্যক।

কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যয়বহুল বলে আধুনিক পদ্ধতির চাষ পুরোপুরিভাবে চালু করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

কেবল পণ্যের উপযুক্ত দাম পেলেই কেবল কৃষকরা চাষের এ ব্যয়বহুল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সুতরাং, কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা দূর করতে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৫. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন:

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো- অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।

পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং সরাসরি কোন মুনাফা অর্জন করা যায় না বলে একাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন দেখা যায় না।

এ জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের সক্রিয় ও অব্যাহত অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৬. কৃষিপণ্যের দামের স্থিতিশীলতা বিধান:

আমাদের দেশে কৃষিপণ্যের দামের ব্যাপক ওঠা-নামার কারণে কৃষকরা উৎপাদনের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। কোনো কৃষিপণ্যের বাম্পার ফলনের বছর এর দাম যাতে খুব নিচে নেমে যেতে না পারে সেজন্য সরকার তা উপযুক্ত দামে কিনে গুদামে সংরক্ষণ করতে পারে।

আবার যেসব পণ্যের ঘাটতি থাকে তা গুদামে রাখা মজুদ থেকে ন্যায্য বা ভর্তুকি দামে বাজারে বিক্রি করতে পারে।

তাহলে এসব পণ্যের দাম খুব একটা বাড়ে না।

তাই পণ্যের দাম স্থিতিশীলরাখার জন্য কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সরকারের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও অনেকাংশে প্রাচীন।

তবে সাম্প্রতিককালে তাতে একটি পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে জমিতে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লেগেছে।

ফলে এখাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটছে।

এ পরিবর্তন উৎপাদনের কলাকৌশল, উপরণসমূহের প্রয়োগ, শস্য-উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ পরিচর্যা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

কৃষিতে আধুনিকীকরণের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।

অতীতে বাংলাদেশের কৃষিখাত কেবল শস্য উৎপাদন, বিশেষ করে ধান, পাট, চা ইত্যাদি মুষ্টিমেয় শস্যের আবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু বর্তমানে শস্য উৎপাদন ছাড়াও গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি প্রতিপালন, চিংড়িসহ বিভিন্ন মৎস্য চাষ, বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি চাষ এবং বন ও নার্সারিসহ নানা উপখাত সৃষ্টি ও তার সম্প্রসারণ হচ্ছে।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরেই পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। যেমন—

ক. পশুচালিত লাঙলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার ও শস্য মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। বীজ/চারা রোপন, ফসল কাটা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

খ. গোবর সারের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হচ্ছে যা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে।

গ. পুরাতন পদ্ধতিতে সেচের পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর সেচের (STW, DTW, LLP) ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

ঘ. কৃষকরা জমির আইলে ফল বা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করছেন।

ঙ. জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি পতিত পড়ে থাকার হার কমেছে।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ফলে শস্য উৎপাদনে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রধান ধারা নিম্নরূপ:

১। বিভিন্ন শস্যের প্রচলিত বীজের পরিবর্তে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে।
ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে।
তবে দেশীয় অনেক প্রয়োজনীয় জাত হারিয়েও গিয়েছে এবং যাচ্ছে।

২। ফসলের বহুমুখীকরণও শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারার আর একটি রূপ।
পূর্বের এক ফসলের জায়গায় এখন বছরে দু-তিনটি ফসলের চাষ হচ্ছে।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

খাদ্যশস্য উৎপাদন:

বাংলাদেশের কৃষির প্রধান উপখাত হলো **শস্য উৎপাদন**।

অতীতে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রধানত দুই ধরনের শস্য উৎপাদিত হতো। এর একটি খাদ্যশস্য এবং অন্যটি অর্থকরী ফসল। খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ধান, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অর্থকরী শস্য হলো— পাট, চা, তুলা, আখ, রাবার ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাদ্য হলো ভাত।

তাই বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির **প্রায় ৮০ ভাগ জমিতেই ধান চাষ করা হয়ে থাকে**। বাংলাদেশে প্রধানত **তিন মৌসুমে ধান চাষ করা হয়**। যথা— **আউশ, আমন ও বোরো**।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

১৯৬০ সালে ফিলিপাইনে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ইরি জাত ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। বাংলাদেশে ব্যাপক মাত্রায় ইরি ধানের চাষ হয়। চাল মানে খুব উন্নত না হওয়ায় এর দাম তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া ইরি জাত উচ্চ ফলনশীল বলে এটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। ষাটের দশকের আগে এ দেশে গম চাষের কথা তেমন চিন্তা করা হতো না। কিন্তু খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হওয়ায় ধীরে ধীরে গমের চাহিদা বেড়েছে।

বর্তমানে গমের চাষও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্য হিসেবে, ভুট্টার চাষও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কৌশলগত পরিবর্তন আনা হচ্ছে।বর্তমানে প্রচলিত শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূল, উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের কৃষিতে গুণগত পরিবর্তন আসছে এবং কৃষির বহুমুখীকরণ ঘটছে।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

সারণিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। এ সারণি অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয় ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তার মধ্যে, আউশ ২৭.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৯.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন, বারো ১৯৫.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভুট্টা ৩৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট উৎপাদন ধরা হয় ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তার মধ্যে আউশ ২৭.০২ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯৬.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৮.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য যে, হিসাবের সময় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ধান, গম ও ভুট্টা ফসল মাঠে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। সারণিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০১০ - ২০১১	২০১৩ - ২০১৪	২০১৪ -২০১৫	২০১৫- ২০১৬	২০১৬- ২০১৭	২০১৭- ২০১৮	২০১৮- ২০১৯
আউশ	২১.৩৩	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯	২৭.০২
আমন	১২৭.৯১	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৯০	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪১.৩৪
বোরো	১৮৬.১৭	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.৪১	১৯৫.৯৪	১৯৬.২৩
মোট চাল	৩৩৫.৪১	৩৪৩.৫৬	৩৪৭.১০	৩৪৭.১০	৩৩৮.০৬	৩৬২.৭৯	৩৬৪.৫৯
গম	৯.৭২	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১১.৫৩	১২.৮৭
ভুট্টা	১৫.৫২	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.১৬	৩৮.৯৩	৩৮.২৮
মোট	৩৬০.৬৫	৩৮১.৭৪	৩৮৪.১৯	৩৮৮.১৭	৩৮৬.৩৪	৪১৩.২৫	৪১৫.৭৪

উৎস: বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো কৃষি মন্ত্রনালয়

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Crop Production

কৃষি মন্ত্রণালয় শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারার ব্যাখ্যা:

- **উৎপাদনের ধারা:** ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জে.পি. হেক্টর ধানের জাতের একটি ক্যাটালগ তৈরি করেন। তার মতে, সে সময় এ উপমহাদেশে প্রায় ২০ হাজার জাতের ধানের চাষ হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮২ সালে BRRI এদেশের ১২ হাজার ৪৮৭টি ধানের জাতের তালিকা তৈরি করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৬২ লাখ টন। গত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) দেশে চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়লেও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও চাষাবাদে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

- **ফসলের ধারা:** উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বিঘাপ্রতি ফলন হয় ২০-২২ মণ। তাই চাষিরা দেশি জাতগুলো ছেড়ে উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষে ঝুঁকে পড়ছেন। আগে এক জমিতে বছরে একবার মাত্র ধান ফলানো হতো, এখন বছরে দুই থেকে তিনবারও ধান চাষ করা যায়।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

❖ **শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন:** পুরোনো জাতগুলো থেকে অনেক নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ থেকে ৮ হাজার প্রজাতির ধান (৬ হাজার দেশি, ২ হাজার বিদেশি) সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে BRRI এর জিন ব্যাংকে। এ পর্যন্ত উচ্চফলনশীল ৬১টি এবং ৪টি হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিআর-২৮ ও বিআর২৯ জাত দুটি চাষিদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশি ধানের সঙ্গে পরাগায়নের মাধ্যমে ব্রি-৬২ নামের জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শরীরের জিংক ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। এ ধানটি সবচেয়ে কম সময়ে সর্বমোট ১০৫ দিনে উৎপাদিত হবে এবং ফলনও অন্যান্য জাতের চেয়ে বেশি হবে। এছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) হারিয়ে যাওয়া ধানগুলো নিয়ে কাজ করছে।

❖ **খাদ্য উৎপাদনে অন্যান্য ফসল:** শস্য খাতে উৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসে ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানাজাতীয় শস্য থেকে। এগুলো বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। গত দুই দশকে চালের উৎপাদন বেড়েছে বাৎসরিক প্রায় ৪ শতাংশ হারে। উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে কৃষকরা আউশের চাষ ছেড়ে ক্রমাগত কৃত্রিম সেচনির্ভর বোরো (শীতকালের শুষ্ক মৌসুমের ধান) চাষের দিকে ঝুঁকছেন।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

❖ **গম উৎপাদনের ধারা:** স্বাধীনতার সময় গমের উৎপাদন ছিল এক লাখ টনের নিচে। উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে গমের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এক দশকের মধ্যেই তা বেড়ে প্রায় ১০ লাখ টনে উন্নীত হয়। আশির দশকের শেষ দিকে বোরো ধানের প্রসারের ফলে গম উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিছুটা ভাটা পড়ে। তারপরও নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত গমের উৎপাদন প্রায় ১৮ লাখ টনে উন্নীত হয়। এরপর থেকে গমের আবাদ কমতে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গমের উৎপাদন ছিল ১২.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

❖ **ভুট্টা উৎপাদনের ধারা:** সাম্প্রতিককালে গমের জমিতে ভুট্টার আবাদ বেড়েছে। চাষের অনুকূল পরিবেশ, গমের তুলনায় বেশি ফলন ও লাভের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পোলট্রি খাদ্য হিসেবে ব্যাপক চাহিদার কারণে ভুট্টার নিশ্চিত বাজার রয়েছে। চাষিরা ন্যায্য দামও পাচ্ছেন। তাই তারা ভুট্টা চাষে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

❖ **কৃষি গবেষণার অবদান:** কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন শস্যের পাঁচ শতাধিক উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে কয়েকটি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন, ধানের জাতগুলোর মধ্যে বিআর-১১ (১৯৮১ সালে অবমুক্ত) এবং বিরি ধান-২৮ ও ২৯ (১৯৯৪ সালে অবমুক্ত)। ভারতীয় ধানের কয়েকটি জাত যেমন, স্বর্ণ ও শতাব্দী (মিনিকেট) কৃষকদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। শস্যদানার উন্নতমান, চাষের স্বল্প সময় এবং অল্প উপকরণের প্রয়োজনের কারণে কৃষকেরা এগুলোর আবাদে উৎসাহী। তারা চীন থেকে আমদানি করা হাইব্রিড জাতের ধানও (হীরা, জাগরণ, আলোড়ন ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবাদ করছেন।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন। এটি প্রাণিসম্পদের একটি অংশ। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন একটি পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্বে তা কেবল চাষাবাদ ও পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্য করা হতো। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিংবা স্বকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হচ্ছে। আজকাল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গাতেই ছোট-বড় পশুখামার গড়ে উঠছে। তবে এক্ষেত্রে হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব খামারে পুরাতন প্রজাতির পশু-পাখির পরিবর্তে নতুন নতুন প্রজাতির পশু-পাখি পালন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অধিক মাংস, দুধ, ডিম পাওয়া যায় এমন প্রজাতির গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি বেছে নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে, উদাহরণ হিসেবে খাকি কেম্বেল ও জিনডিং হাঁস এবং ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির নাম উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে গবাদি পশু এবং হাঁস,মুরগি প্রতিপালনে যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন টিকা ও প্রতিষেধক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, সাভারে গবাদি পশুর জন্য একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

গৃহপালিত পশুর অর্থনৈতিক উপকারিতা:

১. গরু-মহিষ ঘোড়া: চাষাবাদ, শস্য মাড়াই, পণ্য ও মানুষ পরিবহণ, তেলের ঘানি ও আখ মাড়াই;

২. খাদ্য হিসেবে মাংস ও অর্থ উপার্জন, আমিষের চাহিদা পূরণ ও দুধ, ঘি, পনির, দই, মাখন, ছানা প্রভৃতি প্রাপ্তি;

৩. পশুপালনে বেকার সমস্যার সমাধান ও আয় উপার্জিত হয়;

৪. চর্বি, সাবান শিল্পে ব্যবহার;

৫. গোবর থেকে উৎকৃষ্ট জৈবসার এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন হয়;

৬. পশম থেকে পোশাক তৈরি এবং

৭. হাঁড় ও শিং থেকে আঁঠা তৈরি করা হয়।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

- **কৃষিকাজে পশুর গুরুত্ব:** কৃষিকাজে পশুসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশের কৃষিকাজে অধিকাংশ সময় গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়। কারণ আমাদের দেশে কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো তেমনভাবে শুরু হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে গবাদি পশুর অবদান ১.৪৭%, গবাদি পশুর প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৭%, চলতি বাজার মূল্যে GDP অবদান ৪৩২১২ কোটি টাকা, প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ২০%, আংশিক কর্মসংস্থান ৫০%, চাষাবাদ ৫০%, গৃহপালিত ও হাঁস-মুরগি থেকে জ্বালানি সরবরাহ ২৫%।

- **খাদ্য ও প্রোটিনের যোগান:** গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি আমাদের দুধ, ডিম, মাংস দিয়ে খাদ্য ও প্রোটিনের যোগান দেয়। মানবদেহে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ এবং সুস্থ থাকার জন্য এসব খাদ্যসামগ্রী একান্ত অপরিহার্য।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

- **জাতীয় আয়ে পশুসম্পদের অবদান:** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পশুসম্পদ থেকে আসে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৩.৪৭ ভাগ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও পশুসম্পদের গুরুত্ব রয়েছে। পশুপালন, মাংস ব্যবসায়, পশু ব্যবসায় ও চামড়া ব্যবসায় নিয়োজিত বহু লোক পশুসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে।

- **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। বাংলাদেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় শতকরা ০.৪২ ভাগ এ খাত থেকে পাওয়া যায়।

- **সার ও জ্বালানি উৎস:** আমাদের দেশে গবাদিপশুর গোবর জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

- **পরিবহণের ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলে পরিবহণের ক্ষেত্রে পশু ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলে মালামাল পরিবহন ও যাতায়াতে গরু, মহিষ ও ঘোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, গ্রামীণ পরিবহণে পশুসম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **পুষ্টি সমস্যার সমাধান:** বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধানে পশুসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পুষ্টিকর খাদ্য দুধের জন্য আমাদের দেশের জনগণের গবাদিপশুর ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া আমাদের মাংসের চাহিদা মিটানোর জন্য আমরা গবাদিপশুর ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুসম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপর্ণ কাজেই পশুসম্পদের উন্নয়নে আমাদেরকে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা

প্রাণিসম্পদ: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সার্বিক কৃষিখাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৩.৪৬ শতাংশ।

- **অর্থনৈতিক অবদান:** জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম।

- **সরকারি উদ্যোগ:** গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত ‘তরল ও হিমায়িত সিমেন’ (Liquid and Frozen Semen) দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

- **উৎপাদন:** ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫৫৪.০২ লক্ষ ও ৩৪৪০ ২২ লক্ষ।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ি প্রাণিজ আমিষের একটি বিশেষ উৎস।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ চিংড়ি চাষ হচ্ছে এবং অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তাই চিংড়িকে ‘সাদা সোনা বা White Gold’ বলা হয়।

এদেশে মৎস্য চাষের উৎসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস,

খ. সামুদ্রিক উৎস।

অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. মুক্ত জলাশয়,

খ. চাষকৃত জলাশয়।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সম্পদ। বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটি একটি অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই চিংড়ি চাষের প্রচলন ছিল। তবে '৭০ এর দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে চিংড়ির চাষ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহে বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চিংড়ির চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি খাদ্যপণ্য হিসেবে কেনা-বেচা হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী হিসেবে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে রপ্তানি তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এজন্য সাম্প্রতিককালে চিংড়ি চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

বর্তমানে কেবল একটি উপাদেয় খাদ্য হিসেবেই নয় ; বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস হিসেবে চিংড়ি চাষের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন:

১. বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানিতে আগ্রহী।
২. এদেশে মাটি ও পানির অনুকূল পরিবেশের জন্য চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
৩. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সহজেই চিংড়ির পোনা আহরণ করা যায়।
৪. চিংড়ি চাষ বিনিয়োগের পরিমানও তেমন অধিক নয়।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

৫. স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্রায়তন চিংড়ি খামার স্থাপন সম্ভব।

৬. চিংড়ির সাথে অন্যান্য অর্থকরী মাছের মিশ্র খামার স্থাপন লাভজনক।

৭. ধানক্ষেতে ও সহজেই চিংড়ির চাষ করা যায়।

৮. বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

৯. উপকূলীয় জলাশয় ছাড়া নদী-নালা, পুকুর, ডোবা, দীঘিতেও চিংড়ি চাষ করা যায়।

১০. চিংড়ি চাষে শ্রমিক সহজলভ্য।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে চিংড়ি চাষের কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এগুলো হলো:

- ব্যাপকভিত্তিতে চিংড়ি চাষের ফলে ধান চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
- চিংড়ি চাষ এলাকায় জমির উর্বরা শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।
- বিপুল পরিমাণ জমি চিংড়ি চাষের আওতায় চলে যাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘেরের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চিংড়ি চাষ করে কিছু লোক বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে। এর ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Shrimp Cultivation

- চিংড়ি চাষের ফলে ধান চাষের জমি হ্রাস পাওয়ায় চাষিদের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, বেকারত্ব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- 'চিংড়ি এলাকায়' কৃষিকাজের অভাব দেখা দেওয়ায় গ্রাম থেকে লোক শহরে ভিড় করছে। এর ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং সেই সাথে শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- চিংড়ি চাষের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কারণে চিংড়ি চাষ আমাদের অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

ইতিহাস খুঁজে জানা যায়, প্রায় ৪ হাজার ৬০০ বছর আগে প্রাচীন মিসরীয়রা মাশরুমকে মনে করত অমরত্বের উৎস। প্রাচীন আমলে ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় ছিল মাশরুম। রোমানদের কাছে এটি ছিল দেবতার খাবার। চীন ও জাপানে ঔষধি হিসেবে মাশরুম ব্যবহার হয়ে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে।

শুধু ইউরোপ বা এশিয়া নয়, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও মাশরুম খাওয়ার চল ছিল। মাশরুম প্রাচীন বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কৃত্যে ব্যবহার হতো। তবে সবখানেই মাশরুমের একমাত্র উৎস ছিল প্রকৃতি।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

মাশরুম চাষের বৈশিষ্ট্য:

১. মাশরুম চাষে আবাদি জমির দরকার হয় না।

২. মাশরুম ঘরের মধ্যেই চাষ করা যায়।

৩. তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায়।

৪. অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে মাশরুম পাওয়া যায় যা বিশ্বের অন্য কোনো ফসলের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

❑ মাশরুমের প্রজাতি, পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা:

পুষ্টি উপযোগিতার দিক থেকে মাশরুমের বিশেষত্ব হলো এতে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ খুব কম এবং মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ অনেক বেশি।

প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনো মাশরুমে উন্নত মানের আমিষ রয়েছে ২৫-৩৫ শতাংশ। এছাড়া খনিজ লবণ ১০-১৫, ভিটামিন মিনারেল ও আঁশ ৪০-৫০, শর্করা ৪-৬ ও উপকারী চর্বি রয়েছে ৪-৫ শতাংশ। এছাড়া এটি ডায়াবেটিস, যা কোলেস্টেরল, মেদ-ভুঁড়ি, উচ্চরক্তচাপ, ভাইরাসজনিত রোগ, কিডনি রোগ, জন্ডিস, ডেঙ্গু জ্বর, যৌন রোগ, এইডস ব্রেস্ট ও অ্যানাল ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগ প্রতিরোধ, নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কার্যকর বলে প্রমাণিত। এছাড়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও মাশরুম অনন্য।। পৃথিবীতে যত মাশরুম উৎপাদন হয়, তার প্রায় অর্ধেকই হয় চীন দেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬ প্রজাতির মাশরুম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হচ্ছে।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

এসব মাশরুমের পরিবেশগত চাহিদা এবং উৎপাদন মৌসুম নিম্নরূপ:

মাশরুমের নাম	মাশরুমের ফুল ফোটার তাপমাত্রা	উৎপাদন মৌসুম
ওয়েস্টার মাশরুম	15-30°C	সারাবছর
মিল্কি মাশরুম	27-37°C	গরমকাল
স্ট্র মাশরুম	25-37°C	গরমকাল
শিতাকে মাশরুম	15-20°C	শীতকাল
বাটন মাশরুম	15-22°C	শীতকাল
ঋষি মাশরুম	25-36°C	গরমকাল

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

মাশরুম চাষ করার জন্য পুঁজি কম লাগে এবং তা দ্রুত ফেরত আসে। কারণ প্রতিদিন মাশরুম সংগ্রহ করা যায়।

মাত্র ৭-১০ দিনে এটির উৎপাদন হয়। বাড়তি কোনো আবাদি জমির দরকার হয় না।

অন্য পেশার পাশাপাশি এটি উৎপাদন করা যায়।

বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে মাশরুমে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি একটি মূল্যবান সবজি।

তাই বাজারে মাশরুমের চাহিদাও বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট রোগবালাই মাশরুমের কম ক্ষতি করে। এটি উৎপাদনের জন্য কম সময় প্রয়োজন।

অন্যদিকে, মাশরুম চাষে অতিরিক্ত কোনো শ্রমিকের দরকার হয় না। মাশরুম বিদেশে রপ্তানি করা যায়। ভিটামিন ও মিনারেলের উৎস হিসাবে মাশরুমের অবস্থান ঊর্ধ্বে। মাশরুম ফ্যাট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড দ্বারা তৈরি যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুষ্টিহীনতা ও জনপ্রতি সবজি পাওয়ার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

মাশরুম উৎপাদন (Mushroom Production):

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি কৃষিপণ্য মাশরুম।

এখানকার আবহাওয়া সারা বছরই মাশরুম উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এছাড়া এটি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ অনেক সস্তা ও সহজলভ্য।

উৎপাদন কার্যক্রমে মূলধনও প্রয়োজন হয় খুবই সামান্য। এ আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন করা যাবে, যা স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিচাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম।

এটি উৎপাদন পদ্ধতি অনেক সহজ হওয়ায় শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরও মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

এছাড়া দুই ফসলের মাঝামাঝি অলস সময় বা যে সময় মাঠে কম সময় দিতে হয়, সে রকম মুহুর্তেও ঘরে বসেই মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন কৃষক।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

ছায়াযুক্ত স্থানে কুঁড়েঘর, গোলপাতার ঘর বা বাঁশের চালার ঘরে মাশরুম চাষ করা হয়।

যেখানে বাঁশ বা কাঠের তৈরি তাকের ওপর রক্ষিত বিভিন্ন আধারে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর চাষ করা হয়। বাংলাদেশে যেসব মাশরুম চাষ করা হয় তার মধ্যে ঝিনুক, শিতাকে, দুধ-সাদা (মিল্কি), ঋষি, বাটন প্রভৃতি প্রধান।

মাশরুম উৎপাদনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. মাশরুমের স্পন (বীজ) উৎপাদন,

২. মাশরুম চাষ এবং

৩. সংগ্রহান্তে সংরক্ষণ।

খামারের আয়তন, বীজ মজুদের হার, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ওপর চাষের সাফল্য নির্ভর করে।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

গ্রামীণ তথা কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার পাশাপাশি দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কৃষির বৈচিত্রায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এ বৈচিত্রায়নের এক অনন্য মাধ্যম মাশরুম চাষ। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে প্রতিনিয়ত কৃষিজমির পরিমাণ কমে চলেছে, সেখানে কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি মাধ্যম হতে পারে মাশরুম চাষ।

কারণ এটি উৎপাদনে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হয় না।

এদেশে মাশরুম চাষ একদিক থেকে যেমন হতে পারে দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার, তেমনি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রেও রাখতে পারে অনেক বড় ভূমিকা।

কেননা মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই লাভজনক। কারণ মাশরুম চাষে কম পুঁজি, কম শ্রম দরকার হয়। তাই এ দিক থেকে মাশরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

১. মাশরুম চাষের জন্য ফসলি জমির প্রয়োজন হয় না।

২. স্বল্প জায়গায় স্বল্প পুঁজিতে মাশরুম চাষ করা যায়, কিন্তু মুনাফা হয় খুবই বেশি।

৩. ঘরে বসেই বেকার যুবক-যুবতীরা মাশরুম চাষ করতে পারে।

৪. মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ; যেমন— খড়, কাঠের গুড়া, পঁচাপাতা, আখের ছোবড়া ইত্যাদি খুবই সস্তা এবং সহজলভ্য।

৫. মাশরুম চাষের জন্য বিশেষায়িত কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই।

মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes of Mushroom Cultivation

৬. মাশরুম চাষে বিনিয়োগকৃত মূলধন কম সময়ে ফেরত আসে।

৭. মাশরুম চাষে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

৮. বিশ্বব্যাপী মাশরুমের চাহিদা বেশি হওয়ায় মাশরুম রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। মাশরুমের রকমারি খাবার: মাশরুমের রকমারি খাবার রয়েছে। যেমন- মাশরুম ফ্রাই, চপ, কাবাব, ফুলকি, পাপর, চিপস, সালাদ, মাশরুম বিফভুনা, সবজি, মাশরুম স্যুপ, চা, মাশরুম ভাজি, জ্যাম, জেলি, আচার, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি ছাড়াও আরও অসংখ্য উকৃষ্ট ও রোগ প্রতিরোধ পুষ্টিযুক্ত খাদ্য।

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

বন (Forest) :

সাধারণভাবে যে বিশাল এলাকা গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং যেখানে বন্য পশু-পাখি,কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীব প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে তাকে বন বলা হয়। গাছপালা, বন্যপশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও জীবের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক বনজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। অবশিষ্ট ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের প্রাথমিক সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও রাজশাহীতে দুটি নার্সারি স্থাপন করা হয়। সেখানে চারা উত্তোলন ও বিতরণই ছিল মূল লক্ষ্য। পরবর্তীতে সর্বপ্রথম ১৯৮০ সালে এডিবির আর্থিক সহায়তায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প চালু হয়। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলায় কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যথেষ্ট সাফল্য পাওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায়

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

বন (Forest) :

১৯৮৮ সাল থেকে উপজেলা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয় এবং তা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। পরবর্তীতে বনবিভাগের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং দেশে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। বাংলাদেশের বন হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। এখানকার বনভূমি থেকে বাঁশ, কাঠ, মধু ইত্যাদি বনজ সম্পদ আহরিত হয়; এটি বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তুর আবাসস্থলও বটে। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সুন্দরবন এলাকায় বনদস্যু, মৌয়ালী এবং কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থলের জন্য বেশ কিছু বনভূমির বিনাশ ঘটে। দিন দিন বিনাশকৃত বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

যেমন—

১. দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি বাগান সৃজন, সড়ক-রেলপথ-বাঁধ সংযোগ সড়ক বনায়ন,

২. বাঁশ বাগান সৃজন,

৩. বরেন্দ্র নালা বা গালি বনায়ন,

৪. প্রতিষ্ঠান বনায়ন,

৫. বিক্রি ও বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন,,

৬. ম্যানগ্রোভ বনায়ন,

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

৭. বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে সোনাচর, চাঁদপাই, দুদমুখী অভয়ারণ্য ,

৮. সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

৯. এছাড়া দেশের বনজ সম্পদ বিশেষ করে কাঠ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

১০. দেশের বন উন্নয়ন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে।

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির একটি উপখাত হলো বনজ সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

অর্থবছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
বনজ সম্পদ (%)	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৫৮



বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বনজ পণ্য (কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যাদি) রপ্তানি করে ৪.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

বনের প্রকারভেদ (Classification of forest):

- উৎপত্তি উৎস অনুসারে বনভূমিকে প্রধানত ২ প্রকার। যথা

১. প্রাকৃতিক বন (Natural forest)

২. কৃত্রিম বন (Artificial forest) বা মানুষের তৈরি বন (Man made forest)

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

❑ বনভূমি ও মৃত্তিকার প্রকৃতি এবং অবস্থান অনুসারে বনভূমিকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

১. পাহাড়ি বন (Hill forest)

২. সমতল ভূমির বন (Plainland forest)

৩. ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove forest)

৪. সামাজিক বন (Social forest)

৫. কৃষিবন (Agro-forest)।

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সুন্দরবন যার আয়তন ৬,০১৭ বর্গ কি.মি.।

২. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি যার আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি.।

৩. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি যার আয়তন ১,০৬৪ বর্গ কি.মি.।

৪. সিলেট অঞ্চলে বনভূমি যার আয়তন ১,০৪০ বর্গ কি.মি.।

৫. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি যার আয়তন ৩৯ বর্গ কি.মি.।



বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

নার্সারি (Horticulture) :

যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। নার্সারি স্থাপন দেশে বনায়ন কার্যক্রমেরই অংশ।

তবে এর মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়।

পূর্বে নার্সারিতে কেবল আম, জাম, কাঠাল, পেয়ারা, কুল, পেঁপে ইত্যাদি ফলের চারা উৎপাদন ও বিক্রি করা হতো।

কিন্তু বর্তমানে দেশে বনায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য এখানে এখন মেহগনি, সেগুন, কড়ই, শাল, গর্জন, চাপালিশ ইত্যাদি গাছের চারাও উৎপাদন করা হচ্ছে।

চারা উৎপাদনের ভিত্তিতে নার্সারিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা- ১. পলিব্যাগ নার্সারি ও ২. বেড নার্সারি।



বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture



নার্সারি (Horticulture):

১.পলিব্যাগ নার্সারি:

যে নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয় তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলে।

এই পদ্ধতিতে নার্সারি তৈরি করার জন্য প্রথমে বীজ সংগ্রহ করতে হয়, তারপর মাটি তৈরি করে পলিব্যাগ মাটি ভর্তি করতে হয় এবং সংগৃহীত বীজ বপন করতে হয়।

২. বেড নার্সারি: এ পদ্ধতিতে নার্সারি করতে প্রথমে জমিতে ছোট ছোট বেড তৈরি করতে হয়।

তারপর প্রয়োজনীয় সার মিশ্রণ করে মাটি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়।



বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

নার্সারি (Horticulture) :

দুটি পদ্ধতির মধ্যে পলিব্যাগে চারা তৈরি করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সুবিধা বেশি।

এছাড়া বিএডিসি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।



বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

নার্সারির গুরুত্ব (Importance of Horticulture):

স্ব-কর্মসংস্থান ও সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেও নার্সারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কৃষি খাতের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে নার্সারি স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের নার্সারির চাষ করা হচ্ছে।

নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে চাষিরা বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফল, পানের বরজ, আম, লিচু, কুল ও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সফলভাবে নার্সারি স্থাপনে অংশগ্রহণ করছে।

এসব নার্সারি একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভজনক পেশা হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এ কারণে বর্তমানে নার্সারি স্থাপন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
Trend of Changes in Forestry and Horticulture

নার্সারির গুরুত্ব (Importance of Horticulture):

উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হলে বাংলাদেশে নার্সারি স্থাপন একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে পরিণত হবে এবং কৃষির এ উপ-খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটবে। ফলে নার্সারির অর্থনৈতিক গুরুত্ব হলো—

১. ভেষজ উদ্ভিদের কঁচামাল যোগান দেয়
২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে অক্সিজেন প্রদান করে
৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে,
৪. শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়
৫. জ্বালানি ও কাঠের যোগান দেয়
৬. প্রাণী প্রজাতি রক্ষা করে
৭. বনভোজন ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত
৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করে।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষি নানাভাবে সমস্যাগ্রস্ত।

এজন্য এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা কৃষির উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ।

এদেশের অধিকাংশ কৃষক খুবই দরিদ্র।

কৃষি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন।

এসব উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য তাদের বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

কৃষি উৎপাদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।



কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

কৃষি ঋণের ধারণা:

কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য যে ঋণ প্রয়োজন হয় তাকে কৃষি ঋণ বলা হয়।

অর্থাৎ কৃষিকাজে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার অন্য কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, কীটনাশক, ভূমি সমতলকরণ, খাল খনন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, হিমাগার নির্মাণ, শস্যবীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে।

স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।



কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

কৃষি ঋণের প্রকারভেদ:

কৃষি ঋণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ: সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. স্বল্পমেয়াদি ঋণ:

যে ঋণের টাকার ১৫ মাস বা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ বলে।

যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

খ. মধ্যমমেয়াদি ঋণ:

যে ঋণের টাকা ১৫ মাস থেকে শুরু করে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে মধ্যমমেয়াদি কৃষি ঋণ বলে।

সাধারণত গরু, মহিষ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি মেরামত কাজের জন্য মধ্যমমেয়াদিঋণ গ্রহণ করা হয়।

গ. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ:

যে ঋণের টাকা ৫ বছরের বেশি সময়ের পরে পরিশোধ করতে হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে।

সাধারণত, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, ট্রাক্টর ক্রয়, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরনো ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি কাজের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

কৃষি ঋণের প্রকারভেদ:

কৃষি ঋণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

২. উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ: উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ তিন প্রকার। যথা:

ক. উৎপাদনশীল কৃষি ঋণ:

যে সকল ঋণ উৎপাদন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে তাকে উৎপাদনশীল কৃষি ঋণবলে।

যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, হিমাগার নির্মাণ ইত্যাদির জন্য যে ঋণগ্রহণ করা হয় তাই হচ্ছে উৎপাদনশীল ঋণ।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

খ. অনুৎপাদনশীল ঋণ:

মামলা মোকদ্দমা, ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদি, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে।

এ ধরনের ঋণ কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে না।

গ. ভোগ্য ঋণ:

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই প্রান্তিক কৃষক।

তারা নিজ জমির উৎপাদিত ফসল দিয়ে বছর শেষকরতে পারে না।

তাছাড়া অনেক সময় বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি কারণে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষক জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

এ ধরনের ঋণকে ভোগ্য ঋণ বলা হয়। ভোগ্য ঋণ কে অনুৎপাদনশীল ঋণও বলা হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

কৃষি ঋণের প্রকারভেদ:

কৃষি ঋণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

৩. বন্ধকীর দিক থেকে কৃষি ঋণ:

বন্ধকীর দিক থেকে কৃষি ঋণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

ক. জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ।

খ. ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত বন্ধক।

৪. ব্যক্তিগত সম্পর্কে ঋণ:

কৃষকদের ঋণের আরেকটি উৎস হলো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম্য মহাজন, দালাল,ফাড়িয়া, ভূ-স্বামী প্রভৃতি।

এ ধরনের ঋণকে ব্যক্তিগত ঋণ বলা হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

কৃষি ঋণের উৎস:

কৃষি ঋণের উৎসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও

খ. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।



কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

ঋণদানের যে সমস্ত উৎস সরকারি বিধি ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয় সেসব উৎসকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয়।

যেমন:

- আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব:

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো আত্নীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব।

আমাদের দেশের কৃষকরা প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে ঋণ গ্রহণকরে থাকে

এই ঋণের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দিতে হয় না।



কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

- **গ্রাম্য মহাজন:**

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আমাদের দেশের মহাজনেরা জমি, অলঙ্কার ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে।
এজন্য কৃষকদের অত্যাধিক উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়।

- **গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার:**

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার রয়েছে। তারা কৃষকদের ঋণদানের জন্য সব সময় কিছু নগদ অর্থ হাতে জমা রাখে এবং সাধারণত ফসল বপনের পূর্বে কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে। উৎপাদিত শস্য কম দামে ক্রয়ের জন্যই মূলত এ ঋণ দেওয়া হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

- **ফড়িয়া ও বেপারি:**

বাংলাদেশের কৃষকরা ফড়িয়া ও বেপারিদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই উৎস হতে প্রয়োজন বোধে সহজে ঋণ পাওয়া যায়। তাই সুদের হার খুবই বেশি হওয়া সত্ত্বেও কৃষেকরা তাদের নিকট হতে ঋণগ্রহণ করে থাকে।

- **গ্রাম্য বিত্তশালী ব্যক্তি:**

বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু ভুঁইফোড় বিত্তশালী ব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তারা সম্পত্তি, অলঙ্কার ইত্যাদি বন্ধক রেখে কৃষকদের ঋণদান করে। এজন্য কৃষকদের নিকট হতেচড়া হারে সুদ আদায় করা হয়।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ: যেসব উৎস সরকারি ঋণদানের বিধি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সে সমস্ত উৎসকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

- **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক:** বাংলাদেশের কৃষকরা যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে তাদের মধ্যেবাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অন্যতম। এই কৃষি ব্যাংক কৃষকদের বহুমুখী চাহিদা মিটানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে।
- **রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক:** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মতো ঋণদানের যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এটি দেশের উত্তরাঞ্চলেরকৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

- **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকরে। এই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষকদের ধান, গম, আখ, তুলা ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে।

- **বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড:** বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কৃষকদের ঋণদানের অন্যতমগুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই ব্যাংক সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণদান করে থাকে।

- **ভূমি বন্ধকী ব্যাংক:** ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কৃষকদের ঋণদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই ব্যাংক কৃষকদের একমাত্র সম্পদ ভূমি’ বন্ধক রেখে ঋণদান করে। এ ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।



কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ
Agricultural Development Programmes

- **গ্রামীণ ব্যাংকঃ** গ্রামীণ ব্যাংক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ঋণদান করে থাকে। গ্রামের দরিদ্র জনগণকে ঋণদানকরে এবং বিশেষ তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণের সঠিক ব্যবহার ও ঋণ আদায় নিশ্চিত করে।

- **বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড:** বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড কৃষি ঋণদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য সহজশর্তে ঋণদান করে।

উপরের উৎসের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের দেয় ঋণের সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম। পক্ষান্তরে, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে প্রাপ্ত ঋণের জন্য চড়া সুদ দিতে হয়। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তির জটিলতা খুবই কম এবং এটি অতি সহজে প্রয়োজনমতো পাওয়া যায়।

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Credit Distribution Programmes

কৃষিকাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষিঋণ বলে। এ দেশের কৃষকরা দরিদ্র বলে উৎপাদনের প্রয়োজনে নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ যোগান দিতে পারে না। এজন্য তারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়। এক্ষেত্রে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো অসংগঠিত, অনিশ্চিত ও শোষণমূলক হওয়ায় কৃষকদেরকে ঋণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর দিকে সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে:

১. কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদেরকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়।

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Credit Distribution Programmes

২. এছাড়া নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সরকার ৪ টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিআরডিবি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি, এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে। তারা সহজ শর্তে কৃষকদেরকে মূলত ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করছে।

৩. সরকার কৃষিঋণ বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে বর্ধিত কলেবরে কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Credit Distribution Programmes

৪. ঋণ বিতরণ সহজতর করার জন্য নীতিমালায় নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত হচ্ছে। সকল ব্যাংকের কার্যকরঅংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়ানো এবং পল্লি এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণেকৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

৫. প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণকর্মসূচি চালু করেছে। বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণিতে এ দেওয়া হলো:

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Credit Distribution Programmes

সারণি: বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০০-২০০১	৩,২৬৫.৯২	৩,০১৯.৬৭৮	২,৮৭৭.৮৭	১১,১৩৭.২৬
২০১০-২০১১	১২, ৬১৭.৪০	১২,১৮৪.৩২	১২,১৪৮.৬১	২৫,৪৯২.১৩
২০১২-২০১৩	১৪,১৩০.০০	১৪,৬৬৭.৪৯	১৪,৩৬২.২৯	৩১,০৫৭.৬৯
২০১৩-২০১৪	১৪,৫৯৫.০০	১৬,০৩৬.৮১	১৭,০৪৬.০২	৩৪,৬৩২.৮১
২০১৪-২০১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-২০১৬	১৬,৪০০.০০	১৭,৬৪৬.৩৯	১৭,০৫৬.৪৩	৩৪,৪৭৭.৩৭
২০১৬-২০১৭	১৭,৫৫০.০০	২০,৯৯৮.৭০	১৮,৮৪০.১৬	৩৯,০৪৭.৫৭
২০১৭-২০১৮	২০,৪০০.০০	২১,৩৯৩.৫৫	১৩,৫০৩.১২	৪০,৬০১.১১
২০১৮-২০১৯	২১,৮০০.০০	১২,১০১.০৪	১৩,৩০৫.৫০	৪০,৩০৫.৭৫

(উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত]।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ২১,৮০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সময় পর্যন্ত মোট ১২,১০১.০৪ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫.৫১ শতাংশ, ঋণ আদায় হয়েছে ১৩,৩০৫.৫০ কোটি টাকা এবং বকেয়া রয়েছে ৪০,৩০৫.৭৫ কোটি টাকা।

কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Equipment Distribution Programmes

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপকরণের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত যোগান আবশ্যক। এক্ষেত্রে এদেশের কৃষকরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের ন্যায্য দাম ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিতরণের জন্য সরকারের ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে।

➢ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান:

জনস্বার্থ রক্ষা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক বহন করলে ভর্তুকি বলে বিবেচিত হয়। এমনটি করা হলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দাম কম থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন রাসায়নিক সার, উন্নত মানের বীজ, কীটনাশক, সেচব্যবস্থা, ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। ভর্তুকি একান্ত প্রয়োজন। এসব উপকরণের দাম বেশি থাকলে এদেশের দরিদ্র কৃষকেরা সেগুলো প্রয়োজন মাফিক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে না। তাই সরকার এসব উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করে। ফলে সেগুলোর দাম সাধারণ কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Equipment Distribution Programmes

➢ কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ (Mobilization of Agricultural Equipment)

মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ। অধিক পরিমাণে মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ ধরনের বীজ উদ্ভাবনের জন্য সরকার দেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপন করেছে। এসব ইনস্টিটিউটে ধান, গম, আলু, শাকসবজি, ডাল, তেলবীজ ইত্যাদির উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবন করা হয়। উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, বর্ধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিএডিসি সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ, ২টি পাট বীজ, ২টি আলু বীজ, ৪টি ডাল বীজ ও তেলবীজ ও ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার পরিচালনা করে। তাছাড়া ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বীজ উৎপাদন ও বিতরণের এ প্রক্রিয়ায় সরকার ভর্তুকি প্রদান করে বিধায় তা কম দামে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়। নিচের সারণিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমের একটি হিসাব দেওয়া হলো:

কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি
Agricultural Equipment Distribution Programmes

সারণি: বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি (মেট্রিক টন)।

	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদন ও বিতরণ							
	ধান	গম	ভুট্টা	আলু	ডাল	তৈল	পাট	সবজি
উৎপাদন	৮৯৪৯৮	১৫০২৮	১১১	৩৫,৫১০	২৩১৩	১৬৭১	৪৩৭	১০২
বিতরণ	৮৭০২২	১৮০৭৯	১০	৩১,২৪৬	২৩৬৪	১৪২৭	২৩৬	৭৩

শস্যোৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সার বিশেষ করে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিকল্প নেই। সরকার কৃষি খাতে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য নিজ উদ্যোগে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি সার উৎপাদন করে। পরে এর ওপর ভর্তুকি দিয়ে। উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে। তাছাড়া টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের আমদানির ওপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে ভর্তুকি দেওয়া হয়, যাতে এগুলো দরিদ্র কৃষকরাও প্রয়োজনমাফিক ক্রয় করতে পারে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জমিতে সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
Distribution of Agricultural Equipment Assistance Card

বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্যে সম্প্রতি গৃহীত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি সরকার নেত্রকোণার আটপারা উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের এক কৃষক সমাবেশে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এই তিন শ্রেণির কৃষক সরকারি কৃষি উপকরণ কার্ড পেয়ে থাকেন।

i. উদ্দেশ্য (Objectives):

১. কৃষকদেরকে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা।

২. ভর্তুকিসহ বিনামূল্যে সরকার ঘোষিত সকল প্রকার কৃষি উপকরণ সহায়তা নিশ্চিত করা।

৩. সর্বোপরি দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
Distribution of Agricultural Equipment Assistance Card

ii. উপকরণ সহায়তা কার্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Equipment Assistance Card)

১. এ কার্ডে কৃষকের শনাক্তকারী নম্বর উল্লেখ থাকে।

২. এ কার্ডে কৃষকের নিজস্ব মোট জমির পরিমাণ, চাষকৃত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

৩. বিভিন্ন ঋতুতে আবাদকৃত ফসলের নাম, প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।



কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
Distribution of Agricultural Equipment Assistance Card

iii. সুবিধাভোগী (Beneficiaries)

১. সরকার ইতোমধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি, বর্গাচাষি, ভূমির মালিকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।

২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে। সরকারের নির্দেশনায় ১০ টাকার বিনিময়ে ১ কোটি ১১ লাখ ৯০ হাজারটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। সরকার কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ১ কোটি ৮২লাখ কৃষকের মাঝে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
Distribution of Agricultural Equipment Assistance Card

iv. কার্ডের সুবিধা (Advantages of Equipment Assistance Card)

১. বিনামূল্যে কৃষকদের সার, বীজ ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান।

২. কৃষকেরা ভর্তুকি সুবিধার উপকরণ ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।

৩. এ কার্ডের মাধ্যমে কৃষক তার ঈপ্সিত উপকার পাচ্ছে।

৪. কৃষকেরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং অর্থের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব।

শস্য বহুমুখীকরণ
Crop Diversification

কৃষি খামারে একটি মাত্র শস্য উৎপাদন করাকে বলা হয় মনোকালচার।

অন্যদিকে, খামারে একটি মাত্র শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে বলা হয় multiculture বা শস্য বহুমুখীকরণ।

অর্থাৎ একটি খামারে বা একই জমিতে বছরে একটি মাত্র একই জাতের শস্যের উৎপাদন না করে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে শস্যের বহুমুখীকরণ বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ ও খামার যান্ত্রিকীকরণকে শস্য বহুমুখীকরণ বলা হয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে একই জমিতে প্রতি বছর একই ফসল ফলানো হতো।

বাংলাদেশে এখনও একই জমিতে একই ফসল বার বার ফলানোর প্রবণতা রয়েছে।

বিশেষ করে অধিকাংশ জমিতে বছরের পর বছর শুধু ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

শস্য বহুমুখীকরণ
Crop Diversification

প্রতিবার একই ফসল ফলানোর ফলে জমির নির্দিষ্ট কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়।

ফলে ঐ বিশেষ ফসলটির উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে।

কিন্তু ঐ জমিতে যদি ধান চাষের পরে গম চাষ করা হয়।

আবার গম চাষ শেষে আলু চাষ করা হয়, তাহলে মাটির রাসায়নিক উপাদানসমূহের মান বজায় রাখা যায়।

এতে করে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ফসলের ওপর থেকে অনেক প্রাকৃতিক বিরূপ প্রভাব হ্রাস পায়।

একই জমিতে এরকমভাবে পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করাকেই বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ।

শস্য বহুমুখীকরণ
Crop Diversification

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে কৃষি ফসলের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, কৃষিতে শস্যের অবদান ৭৫% এরও বেশি।

এর মধ্যে মোট আবাদ যোগ্য জমির ৮০% জমিতে ধান চাষ করা হয়।

বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রসার এবং বিশ্বায়নের কারণে মানুষ একখণ্ড জমিতে বছরে বিভিন্ন সময়ে ঋতুভেদে ধানের পাশাপাশি আলু, ঢেঁড়স, কলা, পটল, পেঁপে, কপি, মরিচ, বেগুন, কাঁকরোল, ভুট্টা, বরবটি, শিম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি চাষ করছে।

এতে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

অর্থাৎ শুধু ধান বা একটি মাত্র ফসলের ওপর নির্ভর না করে বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া, মাটির গুণগত অবস্থা, সেচ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ঋতুভেদে শস্যের জাত ও প্রযুক্তির বিন্যাস করাই হচ্ছে শস্যের বহুমুখীকরণ।

শস্য বহুমুখীকরণের ধরন
Types of Crop Diversification

বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন।

এখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহের প্রাধান্য আছে।

ফলে সারা বছরই এখানে তিনটি মৌসুমে নানাবিধ ফসল উৎপাদন করা যায়। এগুলো হলো রবি, খরিপ-১, খরিপ-২।

প্রতি মৌসুমে কৃষক তার ফসলবিন্যাসে সেসব ফসল অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফসলের উৎপাদন সময়, মাটির উর্বরতা, সেচের সুবিধা এসব বিষয় বিবেচনায় এনে ফসল নির্বাচন করেন।

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার হিসেবে ৩টি নমুনা উল্লেখ করা হলো।

শস্য বহুমুখীকরণের ধরন
Types of Crop Diversification

➢ আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ:

এটি শস্য বহুমুখীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

কৃষক নিজেদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে চাষাবাদে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন।

এই চেষ্টার মধ্যে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ বেশ জনপ্রিয়।

রিলে ফসল অর্থ হচ্ছে একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে অন্য একটি ফসলের চাষ শুরু করা।

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কৃষকেরা আগাম আলু চাষ করেন। ৫৫ সে.মি. দূরত্বে সারি করা হয় এবং আলু লাগানো হয়।

প্রতি তৃতীয় সারি ফাকা রেখে সে সারিতে ডিসেম্বরে পটলের ডগা রোপণ করা হয়।

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মধ্যে আলু উত্তোলন শেষ হয়।

পটল বড় হতে থাকে এবং মার্চ মাস থেকে পটল ধরতে থাকে এবং নভেম্বর মাসে সংগ্রহ করা যায়।

এ প্রযুক্তিতে পটলের জন্য অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে এভাবেই বাড়তি আয় সম্ভব।

শস্য বহুমুখীকরণের ধরন
Types of Crop Diversification

➢ আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে করলার চাষ:

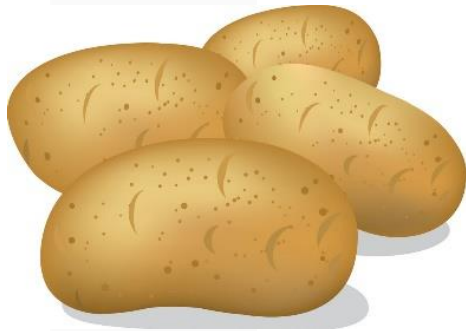
আলুর সাথে করলা চাষেরও বড় সুযোগ রয়েছে।

তাই উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলুর সাথে করলার চাষের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

কৃষক আগাম সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সারিতে আলু বীজ লাগান। দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরী হয়।

আলু লাগানোর পর পলিব্যাগে করলার চারা লাগানো কাচা কলার চারা রোপণ করা হয়।

ফেব্রুয়ারি মাঝামাচি করলার চারা গজানো হয়।





শস্য বহুমুখীকরণের ধরন
Types of Crop Diversification

➢ আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে করলার চাষ:

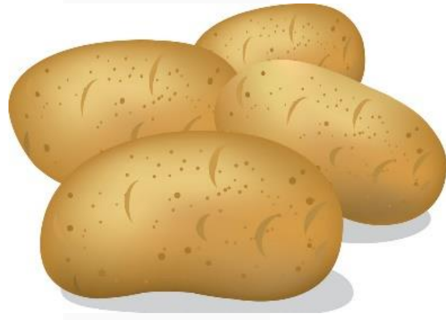
জানুয়ারি মাসে দুই সারির মাঝের নালায় করলার চারা গজানো হয়।

জানুয়ারি মাসে দুই সারির মাঝের নালায় করলার চারা রোপণ করা হয়।

ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি সময়ে সমস্ত আলু উত্তোলন করা হয়।

আলু তোলার পর করলা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে এবং মার্চ থেকে করলা ধরতে থাকে।

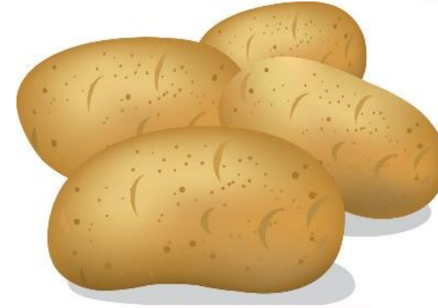
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত করলা তোলা হয়। শস্য বহুমুখীকরণের এটি আরো একটি কৃষি প্রযুক্তি।





শস্য বহুমুখীকরণের ধরন
Types of Crop Diversification

➢ মিশ্র ফসল হিসেবে আলু ও লাল শাকের চাষ:





লাল শাক স্বল্পমেয়াদি কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল।

আলুর সাথে লালশাকের চাষ একটি ভালো মিশ্র চাষ।

আগেই বলা হয়েছে যে সারিতে আলুর চাষ করা হয়।

আলু গাছের উচ্চতা ৫-৬ সে.মি, হয় তখন সারি বরাবর প্রথম মাটি তোলা হয়। এই তোলা মাটিতে লাল শাকের বীজ বপন করা হয়। আলু ও লাল শাক দুটোই সমানে সমানে বড়তে থাকে। লাল শাক দ্রুত বর্ধনশীল। তাই কয়েক দফা শাক ওঠানো যায়।ডিসেম্বর পর্যন্ত লালশাক সংগ্রহ করা হয়। লাল শাক তোলার পরও আলু বড় হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়। ।

❖ আরও কিছু সাথি ফসল হিসেবে

১. আখের সাথে কলার চাষ;

২. আখের সাথে টমেটোর চাষ হয়;

৩. আখের সাথে সরিষার চাষ হয়;

৪. আখের সাথে মসুরের চাষ হয়।

❖ মিশ্র ফসল হিসেবে

১. মসুরের সাথে সরিষার চাষ হয়;

২. আউশের সাথে তিলের চাষ;

৩. কলা বাগানে আউশের চাষ

শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা
Advantages of Crop Diversification

বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষক এখনও তাদের জমিতে বছরের পর বছর একই শস্যের চাষ করে। ফলে দেখা যায়, দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে ধান উৎপাদিত হয়। তাই এদেশের কৃষিতে শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতির তেমন একটা প্রয়োগ নেই এ কথা বলা যায়। তবে চাষের এ পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা থাকায় তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এদেশে শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব নিম্নরূপভাবে বিবেচনা করা যায়।

১। বিভিন্ন শস্য জমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়।
তাই শস্য বহুমুখীকরণ করলে জমির সকল রাসায়নিক উপাদানের সদ্ব্যবহার ঘটে এবং জমির সামগ্রিক উর্বরতা অক্ষুন্ন থাকে। কাজেই বাংলাদেশে একই জমিতে পাল্টা-পাল্টিকয়েক ধরনের শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করা যাবে।

শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা
Advantages of Crop Diversification

২. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়।

তাই এমনটি করা হলে আমাদেরকৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৩. এ ধরনের চাষাবাদের ফলে কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য ফসল দ্বারা তা অনেকটাইপূরণ করা যাবে। ফলে কৃষিতে ঝুঁকির মাত্রা কমবে।

৪. এ ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করলে কৃষকরা সারা বছর ধরে কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকতে পারবে।

ফলে তাদের সময় ও শ্রমের অপচয় হবে না।

শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা
Advantages of Crop Diversification

৫. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের জন্য পানি সেচের প্রয়োজন হয়।

তাই এ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনকরলে সেচ যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হবে।

৬. একের পর এক শস্য উৎপাদন হলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে।

ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে।

৭. এ ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতিতে জমিতে সব সময়ই আগাছা নিড়াতে হয়।

তাই এখানে আগাছা জন্মানোরসুযোগ পায় না।

সুতরাং, শস্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে এবং এর ফলে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হবে।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ
Extension of Irrigation Facilities

ফলপ্রসূ ও অব্যাহতভাবে চাষাবাদের জন্য শস্যক্ষেত্রে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক পানি সেচ একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বর্তমানে সীমিত পর্যায়ে কূপ, খাল, দোন, ঝুড়ি ইত্যাদি প্রাচীন পদ্ধতিতে সেচ করা হয়।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শক্তি চালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে জমিতে সেচ দেয়া হয়।

ব্যাপকভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের চাষ, শীতকালীন ফসল উৎপাদন, শস্যের বহুমুখীকরণ চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা জমিতে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক সেচের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ
Extension of Irrigation Facilities

অতএব, ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থিত পানি বিভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তোলন করে প্রয়োজন আনুযায়ী কৃষি জমিতে সরবরাহ করাকে সেচ ব্যবস্থা বলা হয়।

অন্যকথায়, উদ্ভিদের জন্ম, বর্ধন এবং ক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য কোনো শস্যক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ করাকে সেচ বলে।

নিচের ছকে সেচের পদ্ধতিসমূহ দেখানো হলো:

সেচ পদ্ধতি



১. প্রাচীন পদ্ধতি: কূপ, খাল, দোন, হেঁইত বা ঝুঁড়ি পদ্ধতি।

২. আধুনিক পদ্ধতি: শক্তিচালিত পাম্প, গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ

সেচের সরকারি কার্যক্রম
Government Programmes of Irrigation

বাংলাদেশে কৃষি-উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পগুলো হলো—

১. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প;
২. কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প;
৩. তিস্তা বাঁধ প্রকল্প;
৪. দিনাজপুর সেচ প্রকল্প;
৫. ব্রহ্মপুত্র বহুমুখী প্রকল্প;
৬. সাংগু প্রকল্প;
৭. মেঘনা উপত্যকা প্রকল্প;
৮. ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ডেমরা প্রকল্প;
৯. কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সেচ প্রকল্প এবং
১০. ফরিদপুর সেচ প্রকল্প।

সেচের সরকারি কার্যক্রম
Government Programmes of Irrigation

- সেচ করতে গিয়ে যাতে পানির অপচয় না হয় তা দেখা দরকার। তাই সেচকৃত পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোরমাধ্যমে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে

সেচের সরকারি কার্যক্রম
Government Programmes of Irrigation

- সাম্প্রতিককালে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থিত পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বিভিন্নকার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পগুলো হলো: খাল-নালা পুনঃ খনন ও সংস্কার, পাখা ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, সেচের পানিরঅপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থিত ও ভূ-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচ নালা নির্মাণ ইত্যাদি।
- সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে নতুন প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম স্থাপন করা হয়েছে।
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন এহয়েছে ।
- পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের সেচ কার্যক্রমের প্রভাব
Effects of Government Irrigation Programmes

পানি হলো শস্য ও উদ্ভিদের প্রাণস্বরূপ।

তাই কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য জমিতে নিয়মিত প্রয়োজনমাফিক সেচ অপরিহার্য।

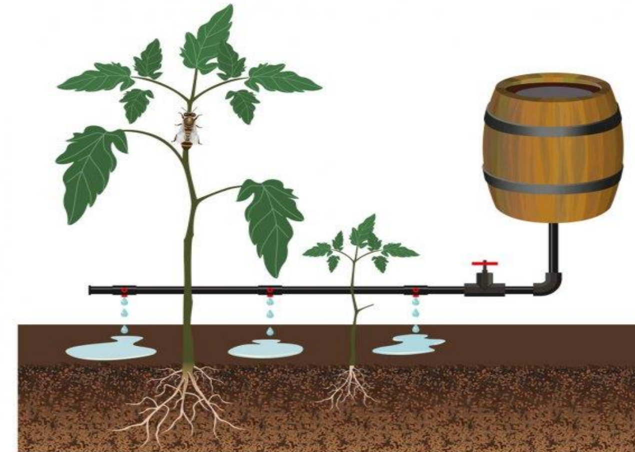
এ সত্য অনুধাবন করে সরকার পানি সেচের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ এসেছে।

এখন এসব কার্যক্রম ফল দিতে শুরু করেছে। জমিতে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক পানি সেচে সহায়তা করে সরকার ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়াতে সহায়তাকরছে।

এর ফলে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদনের বহুমুখীকরণ ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি ফলন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

পানি সেচের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত দশকে সেচের আওতাধীন এলাকা অনেক বেড়েছে।

যেমন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে যেখানে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৩.৭২ লক্ষ হেক্টর, সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৬.২০ লক্ষ হেক্টর।



সরকারের সেচ কার্যক্রমের প্রভাব
Effects of Government Irrigation Programmes

নিচের সারণিতে গত দশকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলো।।

সারণি: সেচকৃত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১১.৮৮	১২.২০	১২.২৫
গভীর নলকূপ	৯.৩৪	৮.৭৭	৯.৬২	১১.৯৪	১০.৬৩	১০.৭২	১১.১০
অগভীর নলকূপ	৩২.৪২	৩২.৭৯	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩০.৭৯	২৯.৮১	২৯.৯০
অন্যান্য	-	-	-	-	১.৯৭	২.৮১	২.৯৫
মোট সেচ	৫৩.৭২	৫৪.০২	৫৪.৪৮	৫৪.৯০	৫৫.২৭	৫৫.৫৬	৫৬.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh

খরা মৌসুমে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা বলতে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা বোঝায়।

পর্যাপ্ত পানির যোগান ছাড়া চাষাবাদ সম্ভব নয়।

বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল না থেকে কৃষির অন্যতম উপকরণ পানির যোগান নিশ্চিত করার জন্য পানি সেচ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানিসেচের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো।

➢ সারা বছর ফসল উৎপাদন:

বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করতে হলে সারা বছর ফসল উৎপাদন করতে হবে।

কিন্তু বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হলেও শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না।

অতএব শীত মৌসুমে বা খরার সময়ও ফসল উৎপাদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেচ করা।

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে সারা বছর মাঠে ধান বা গম দেখা যায় শুধু সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে।

অতএব পানিসেচ এদেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh

➤ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:

বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঠিক ফসলের জন্য সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

তাই সেচ ব্যবস্থা না থাকলে কৃষি মৌসুমি বায়ুর উপর 'জুয়া খেলা'তে পর্যবসিত হয়।

অতএব প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভর না করে সুষ্ঠু কৃষি কাজ করার জন্য সেচ অত্যাবশ্যক।

➤ জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি:

নিয়মিত সেচব্যবস্থা পরিচালিত করা হলে জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, এতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh

➢ **কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:**

বাংলাদেশে সম্প্রতি কৃষিতে আধুনিক সেচ-সার-বীজ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলে স্বাধীনতার পর প্রায় আড়াই দশক সময় কালের মধ্যে একই চাষযোগ্য জমিতে শস্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এই অভাবনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুবাদে এদেশের বিশাল জনসংখ্যা খাদ্য সংস্থান সম্ভব হচ্ছে।

কিন্তু এই সেচ-সার বীজ প্রযুক্তি অন্যতম প্রধান উপকরণ পানি।

উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ও সেচ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সেচ বাংলাদেশের কৃষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

➢ **অধিক কর্মসংস্থান:**

সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে প্রায় সারা বছরই কোনো না কোনো কৃষিকাজ করা যায়।

এতে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh

➢ একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন:

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে দুই বা তিনটি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। এটি সেচ ব্যবস্থার কারণেই সম্ভব হচ্ছে। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে আরো জমিতে দুই বা তিন ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। অতএব একাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ অতি গুরুত্বপূর্ণ

➢ শস্য বহুমুখীকরণ:

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দর্শনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল মূলত ধানভিত্তিক। এই ধানভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। এ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শস্য বহুমুখীকরণের কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু শস্য বহুমুখীকরণের জন্য বছরের বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পানি প্রয়োজন হবে। অতএব সেচ শস্য বহুমুখীকরণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh

- **জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৩.৬০ শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে। পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে জাতীয় আয় আরো বৃদ্ধি পাবে।
- **আমদানি ব্যয় হ্রাস:** প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যদি সময়মতো সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, তবে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে।
- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** সেচ ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কৃষকের জীবনযাত্রায় মানও উন্নত হবে।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এটা স্পষ্ট হল যে, বাংলাদেশে পানিসেচ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে বিশাল জনসংখ্যার অন্ন-সংস্থানের জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচ অপরিহার্য।

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ
Environment and Environmental Pollution

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস ও তার কাজকর্ম পরিচালনা করে তাই হলো পরিবেশ।

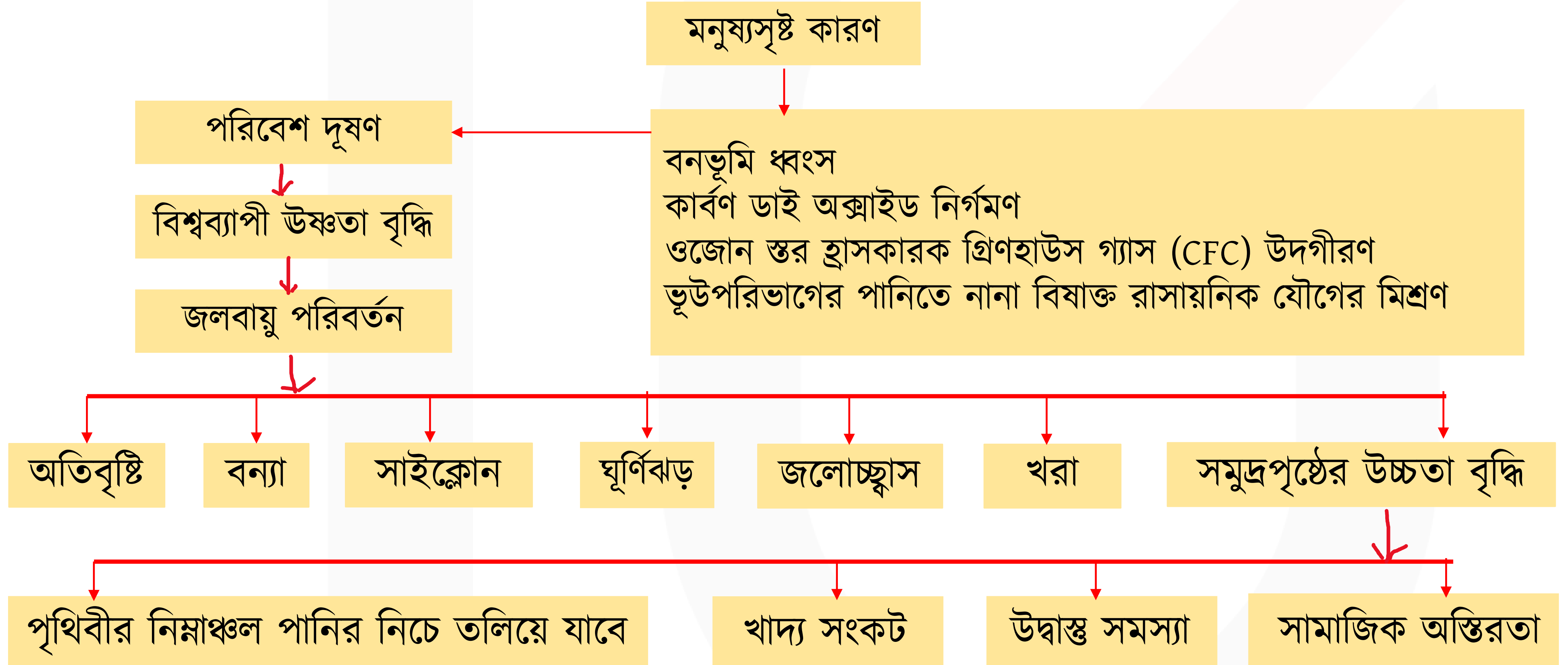
ভূপ্রকৃতি, মাটি গাছপালা, নদ-নদী, জলবায়ু, আবহাওয়া, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহ, সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি হলো পরিবেশের উপাদান।

আলো, বাতাস, পানি, নদী, পশুপাখি, গাছপালা, আবহাওয়া, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য নিয়েই পরিবেশ পরিবেশের এসব উপাদানের ওপর নেতিবাচক পরিবর্তনকে একত্রে পরিবেশ দূষণ বলে।

যেখানে এসব উপাদান জীবনযাপন ও উন্নয়নের সহায়ক হলে সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে আর কোথাও এর অন্যথা ঘটলে সেখানকার পরিবেশ দূষিত।

তাই কোনো দেশে পরিবেশের উপাদানগুলো প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বা উভয় কারণে জীবনযাপন ও উন্নয়নের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করলে সেখানে পরিবেশ দূষণ ঘটে। ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মাটি ক্ষয়, পানি, বায়ু, শব্দ, খাদ্য ইত্যাদি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের প্রকাশ ঘটে।

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ
Environment and Environmental Pollution



বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ
Environmental Pollution in Agriculture of Banglaesh

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত ও উৎপাদন আশানুরূপ নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এখানকার কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার। এখানে ঘনঘন সংঘটিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সূর্য তাপের প্রখরতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের নিম্নমুখিতা, শুষ্ক নদী নালা, খালবিল ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, এখানকার কৃষির পরিবেশ দূষিত। তাছাড়া আমাদের ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা, বিভিন্ন ফসলরোগ, হাঁস-মুরগির মড়ক, জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস, পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি ইত্যাদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে কৃষির পরিবেশ আশঙ্কাজনকভাবে দূষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ
Causes of Environmental Pollution in Agriculture of Banglaesh

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা– প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ।

প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন অন্যতম।

জীবনযাপন ও উৎপাদন কাজ সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত তাপের প্রয়োজন হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্যকিরণ তাপের এ চাহিদা পূরণ করে।

তবে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন উৎস থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও গ্রিনহাউস গ্যাস অধিক মাত্রায় উদগীরণ ও নিঃসারণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ
Causes of Environmental Pollution in Agriculture of Banglaesh

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ায় কলকারখানা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে।

এর সাথে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অসংখ্য কলকারখানা তো আছেই।

এসব কলকারখানা থেকে নির্গত ধোয়া থেকে সৃষ্ট কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বিশ্বের স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব। এসব গ্যাসের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

এর ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বেড়েছে; ঋতু পরিক্রমা ও ঋতু বৈচিত্র্যের রূপ ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

ফলে ধীরে ধীরে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং কৃষি পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ
Causes of Environmental Pollution in Agriculture of Banglaesh

মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে মাটি ক্ষয়ের দরুন মৃত্তিকা দূষণ একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটিকে ক্রমেই শক্ত ও অনুর্বর করে তুলছে।

শস্য ক্ষেতে যথেচ্ছা কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিকাজের জন্য উপকারী অনেক অণুজীবের মৃত্যু ঘটাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ পানি অধিক পরিমাণে উত্তোলনের ফলে একদিকে পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ভূ-অবনমনের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

পানি নিষ্কাশনের প্রাকৃতিক উপায়গুলো বিঘ্নিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে।

উজানে নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ায় সেগুলো শুষ্ক হয়ে উঠছে ও নাব্যতা হারাচ্ছে।

এসব কারণেও আমাদের কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ
Causes of Environmental Pollution in Agriculture of Banglaesh

সুতরাং পরিবেশ দূষণের কারণগুলো হলো—

ক. অতিরিক্ত জনসংখ্যা,

খ. সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব,

গ. শিল্প কারখানার বর্জ্য,

ঘ. বনভূমি বিনাশ,

ঙ. বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ,

চ. লবণাক্ততা,

ছ. অধিক হারে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন প্রভৃতি।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)

সহজ কথায় বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা।

পৃথিবীতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তাকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমন ও সঞ্চয়ন এবং ঘনমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো— ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়, কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে যেতে দেয় না।

সূর্য থেকে আসা বিকিরণের তাপমাত্রা বেশি থাকায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র থাকে এবং সেই বিকিরণ বায়ুমণ্ডলভেদ করে সহজেই পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে পারে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু দ্বারা প্রতিনিয়তই বিকীর্ণপাতের অংশ বিশেষ শোষিত হওয়ায় তাপমাত্রা হ্রাস পায় বলে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এ বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ভেদ করে যেতে পারে না।

সেজন্য পৃথিবী ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হতে থাকে। একে বৈশ্বিক উষ্ণতা' বা 'Global Warming' বলে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন গ্যাস, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) এসব বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নির্গমনের ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দেয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

সুতরাং এ উষ্ণতার কারণসমূহ হলো—

১. গ্রিন হাউস প্রভাব (Green House Effect)

২. বনভূমি ধ্বংস;

৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি;

৪. বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর ক্ষয়;

৫. রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার-এর ব্যবহার বৃদ্ধি ।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

যে নিয়ামকের দ্বারা জলবায়ুর উপাদান অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ্ আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার (Innocent Victim)।

এ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন।

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালিন হওয়ার প্রবণতা বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনকারী নিয়ামকগুলো হলো অক্ষাংশ, সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দূরত্ব, সমুদ্র থেকে স্থলভাগের উচ্চতা, বনভূমি, ভূমির ঢাল ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

এ সকল নিয়ামক দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তিত হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে।

মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে তা অধিকতর দূষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি এখনও অনেকাংশে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কখনও অতিবৃষ্টি ও বন্যা আবার কখনও অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দিচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে প্রায় প্রতি বছরই সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দেখা দেয়।

এর ফলে একদিকে কৃষিকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং অন্যদিকে উৎপাদনযোগ্য ফসলের এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হচ্ছে; জানমালেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে।

২০১৭ সালে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওর অঞ্চলে অসময়ে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ধানের জমি ডুবে যায় এবং দূষিত পানিতে মাছ ও হাঁস প্রচুর পরিমাণে মারা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গত ১০০ বছরে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করায় নদী থেকে পানিসেচ করা যাচ্ছে না এবং নদীপাশের অনেক জায়গার মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় চাষবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

গড় বৃষ্টিপাত বাড়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে ও কিছু কিছু করে জমি চাষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও প্রকোপ বাড়ায় এসব জায়গায় ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি ও ঝামেলা বাড়ছে এবং জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

অব্যবস্থাপনার দরুন কৃষিতে মাটি দূষণের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এ দূষণ ক্রমেই বাড়ছে।

এর ফলে মাটির বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এ কারণে মাটি ক্রমেই অনুর্বর হয়ে পড়ছে।

ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অধিক চাপ পড়ায় একদিকে পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে, 'ভূমি' অবনমনের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

শস্য ক্ষেতে যথেচ্ছা কীটনাশক ছিটানোর ফলে শস্য গাছের উপকারী অনেক অণুজীবের মৃত্যু ঘটছে ও বাতাস দূষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল
Situation/Effects of Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change on Banglaesh Agriculture

বড় বড় নদীতে উজান থেকে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশে ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা ও বালুময় অঞ্চলের প্রসার ঘটছে, নতুন নতুন চরভূমি গঠিত হচ্ছে; নদীগুলোতে পানি শূন্যতা বাড়ছে ও নাব্যতা কমছে।

এসবের ফলে অনেক কৃষি জমি চাষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে; কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য নৌকাযোগে আনা নেয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

ফলে কৃষি মালামাল পরিবহণ ও যাতায়াত উভয়ই ব্যয়বহুল ও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। এ টি এদেশের কৃষি উন্নয়নের পথে হুমকিস্বরূপ। এ সমস্যা থেকে তাই উত্তরণ প্রয়োজন।

তবে এ সমস্যার সরাসরি সমাধান সম্ভব না হওয়ায় পরিবেশ দূষণের তীব্রতা হ্রাস এবং অধিক দূষণ রোধকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অন্য কথায়, অভিযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলা করা দরকার।

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি বিষয়।

অভিযোজন বিষয়টি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলাকে বোঝায়।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অথবা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়, তাকে অভিযোজন (Adaptation) বোঝায়।

যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে উপকূল বরাবর বাঁধ নির্মাণ অথবা বন্যা কিংবা খরা সহ্য করতে পারে এমন ধরনের ধান চাষ করা।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও বিপন্নতা মোকাবেলা করতে ৭টি ধাপে একটি প্রক্রিয়ার ধারণা দেয়া যায়। যথা—

ধাপ-১: জলবায়ু ঝুঁকি নিরূপণ,

ধাপ-২: গুরুত্ব নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ,

ধাপ-৩: সচেতনতা বৃদ্ধি,

ধাপ-৪: সকলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি,

ধাপ-৫: জলবায়ু পরিবর্তনের বিপন্নতাগুলোকে সবার কাছে তুলে ধরা,

ধাপ-৬: অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময় এবং

ধাপ-৭: জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বয়িক দায়িত্ব।

প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে অভিযোজন সম্ভব।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে নীতি নির্ধারণ ও কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি (১৯৯২), জাতীয় পরিবেশ এ্যাকশন প্লান (১৯৯২), বননীতি (১৯৯৪), বনায়ন মাস্টার প্লান (১৯৯৩-২০১২) ইত্যাদি প্রধান। উল্লেখযোগ্য আইনের মধ্যে মৎস্য সংরক্ষণ আইন (১৯৫০), সামুদ্রিক অধ্যাদেশ (১৯৮৩), বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (১৯৭৩), ইট পোড়ানোর আইন (১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য । এসব আইন বিভিন্নভাবে কৃষিতেও পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য আরও কিছু কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কৃষকদেরকে সচেতন করা।

২. বিদ্যমান দুর্যোগগ্রস্ত ও দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলগুলোতে সতর্ক নজরদারি।

৩. আসন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি, পরবর্তী চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে পূর্বাভাস দান যা বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

৪. কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৫. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত ও সচেতন করে তোলা।

৬. গোবর সার, গো-মূত্র, ছাই ইত্যাদি দ্বারা জৈব কীটনাশক উৎপাদন।

৭. আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ।

৮. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

৯. মজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার।

১০. জলাবদ্ধতা দূর করা।

১১. আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা।

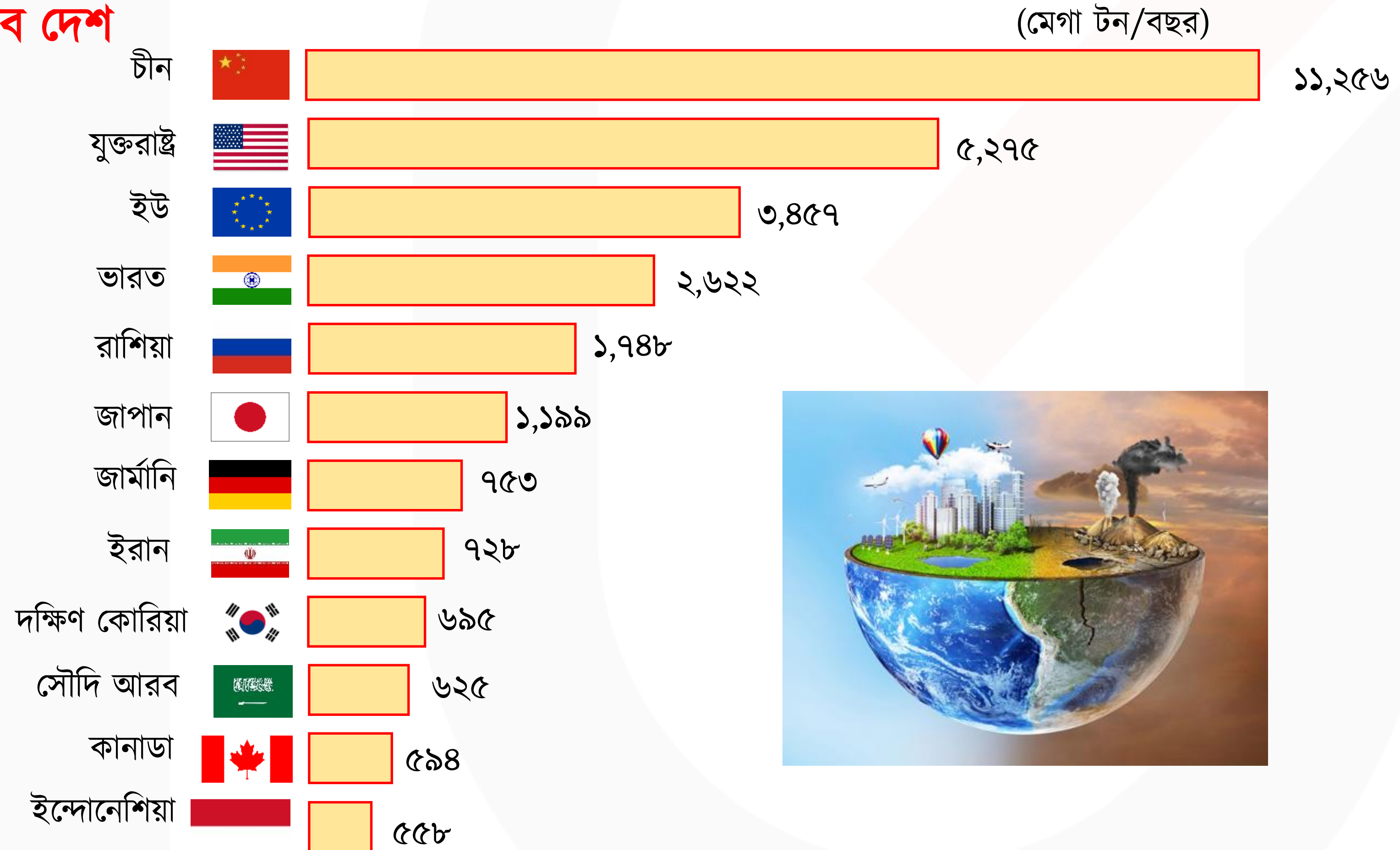
১২. লবণাক্ততা, মরুময়তা, অধিক পানি ইত্যাদিতে অভিযোজনে সক্ষম ধানসহ ফসলী বীজ উদ্ভাবন।

১৩. বন্যার পানি থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বসত ভিটা উঁচু জায়গায় তৈরি করা।

১৪. পুকুরে সাবান দিয়ে কাপড় কাচা বন্ধ করা।

কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
Means of Adaption with Environmental Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture

কার্বন নিঃসরণে এগিয়ে যেসব দেশ



১ মেগা টন= ১০ লাখ টন

সূত্র: বিবিসি

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে সঠিক সময়ে চারা রোপণ, তাপমাত্রা সহনশীল ফসল বা ফসলের জাতের উন্নয়ন ও এর উপায় বা কৌশল বের করতে হবে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

১. জলাবদ্ধতা বা বন্যায় ফসলের অভিযোজনের উপায়:

অধিকাংশ ফসল (জলজ উদ্ভিদ ছাড়া) বন্যা বা জলাবদ্ধতায় বেঁচে থাকতে পারে না।

ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ।

ধান গাছে অ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে এবং এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঠুরি থাকে।

বায়ু কুঠুরিতে অক্সিজেন জমা থাকে এবং ধানগাছ ডুবে না গেলে বন্যা বা জলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকে।

আবার লম্বা জাতের ধান উচ্চতার কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

আবার ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ; হাওর ও জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে কচুরিপানার উপর সারা বছর সবজি চাষ করা যায়।

ভাসমান পদ্ধতিতে ফসলের চারাও উৎপাদন করা যায়।

এ পদ্ধতিতে এসব এলাকার ফসলকে বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা যায়।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

২. উচ্চ তাপমাত্রায় অভিযোজনের উপায়:

উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায় এবং শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে।

তখন ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায় এবং পানির অপচয় হয়।

তাপ সহনশীল উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয় এবং এই উদ্ভিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

৩। ফসলের খরা অভিযোজনের উপায়:

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তীব্র খরা প্রবণ এলাকা — রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশ।

মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা — রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ।

সাধারণ খরাপ্রবণ এলাকা –- তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার পলল ভূমি এলাকা।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

৩। ফসলের খরা অভিযোজনের উপায়:

বর্তমানে তিস্তা নদীতে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

খরা কবলিত ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া।

খরা অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে।

ফসলের খরা প্রতিরোধের উপায় বা কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. খরা সহ্যকরণ ও

খ. খরা পরিহারকরণ

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

ক. ফসলের খরা সহ্যকরণের উপায় বা কৌশল:

ফসল খরাকবলিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরে স্বল্প পানির সাহায্য নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে।

খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় এ সব ফসল স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফুল ফল ধারণ করে।

ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল বা উপায়গুলো হলো--

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

ক. ফসলের খরা সহ্যকরণের উপায় বা কৌশল:

i. প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ:

খরায় উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়।

তখন উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারে।

এজন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে এবং বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহনশীল করে তোলে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

ii. কোষ গহ্বর শূন্যতা:

উদ্ভিদের অঙ্গভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্যের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

উদ্ভিদের যেসব অঙ্গে কোনো কোষ গহ্বর থাকে না, সেসব অঙ্গ খরা সহনশীল হয়।

যেমন— খরার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না।

তখন পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

iii. কোষের পানিশূন্যতা রোধকরণ:

খরাকবলিত ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাব জমিয়ে রাখে এবং কোষাভ্যন্তরে উচ্চতর অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে।

ফলে কোষ থেকে পানি শুকিয়ে কোষ চুপসে যায় না।

খরার সময় তোলা ফসলে এটি লক্ষ করা যায়।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

iv. সুপ্তাবস্থা: অনেক বহুবর্ষী উদ্ভিদের খরা অবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায়, কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থায় বেঁচে থাকে। আবার অনুকূল পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।

v.উপোসকরণ: খরা কবলিত অবস্থায় কিছু কিছু উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। তখন পাতার কোষ নেতিয়ে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশ্লেষণ বজায় রেখে উদ্ভিদ কোনো রকম বেঁচে থাকে।

vi. মোটা কোষ প্রাচীর: অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতিয়ে পড়ে না।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

খ. ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল: ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো হলো:

i.সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ: পত্ররন্দ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিছু ফসল প্রস্বেদন কমালেও পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। যেমন— ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ফসল।

ii. পত্ররন্দ্র নিয়ন্ত্রণ: খরাকবলিত অনেক ফসল পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরাবস্থা মোকাবিলা করে।

যেমন— যব ও লম্বা জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ রাখে।

আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্ররন্ধ্রের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররন্দ্র বন্ধ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে থাকে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

iii. প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণ: অনেক উদ্ভিদ খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিড জমা করে প্রস্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়। যেমন— সয়াবিন। আবার অনেক উদ্ভিদ পাতার উপরে ঘন রোমের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে প্রস্বেদন হ্রাস করে থাকে।

iv. পাতার আকার হ্রাসকরণ: খরাকবলিত অবস্থায় অনেক ফসল পাতার আকার হ্রাস করে প্রস্বেদন কমিয়ে দেয়। যেমন— গো-মটর । পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

v.পাতার দিক পরিবর্তন: অনেক উদ্ভিদ খরাবস্থায় সূর্যালোকের সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। যেমন— চীনাবাদাম, তুলা ও গো-মটরসহ আরও অনেক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
Way of Adaption in Agricultural Sector

vi. পাতা ঝরানো:

খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক উদ্ভিদ নিচ থেকে পুরাতন পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও গো-মটরে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়।



বাংলাদেশের শিল্প





বাংলাদেশের শিল্প
Industries of Bangladesh

অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত শব্দ হলো শিল্প একটি দেশের আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি শিল্প।

ফার্ম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজটি সম্পন্ন করে। এরূপ সমজাতীয় ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়। এদেশে প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

পণ্যের উৎপাদন, রূপান্তর, প্রক্রিয়াকরণ বা সংযোজন এ সবই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশ।

শিল্পের মালিকানা সাধারণত ব্যক্তিগত, অংশীদারি, সরকারি, বেসরকারি ইত্যাদি হতে পারে।

বর্তমানে বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, অতি ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প । এ অধ্যায়ে এসব শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি
Background of the Industries of Bangladesh

শিল্প হলো অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কারণ দ্রুত শিল্পায়ন ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব নয়।

কিন্তু বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান।

ব্রিটিশ সরকার প্রায় দুইশ বছর (১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) এবং পাকিস্তান সরকার প্রায় ২৪ বছর এদেশ শাসন ও শোষণ করেছে।

ব্রিটিশ সরকারের একচোখা নীতি ও পাকিস্তান সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে এদেশের শিল্প কারখানা আলোর মুখ দেখতে পারেনি।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে শিল্পকারখানার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উদ্যোক্তা, কার্যকর শিল্পনীতি প্রভৃতির অভাবে খুব বেশি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি
Background of the Industries of Bangladesh

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

এ লক্ষ্যে ২০১৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছে।

তাছাড়া উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়।

দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের কাজটি কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

এরূপ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়।

যেমন- বাংলাদেশে যতগুলো কাগজ তৈরির কল আছে তাদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের কাগজ শিল্প গড়ে ওঠেছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
Industrial Structure of Bangladesh

বাংলাদেশ শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত নয় তবে উন্নয়নের গতিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সময়ে সরকার বিভিন্ন শিল্পনীতি গ্রহণ করে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ক. মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ, উৎপাদন কলাকৌশল ও মূল্য সংযোজন বিষয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিল্পখাতকে তিনটি উপখাতে ভাগ করা হয়েছে।

যথা-

১. বৃহদায়তন শিল্প (মাঝারি শিল্পসহ),

২. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও

৩. কুটিরশিল্প।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
Industrial Structure of Bangladesh

শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে ---

বৃহৎ শিল্প প্রায় ১৫%, ক্ষুদ্র শিল্প প্রায় ২৫% ও কুটিরশিল্প প্রায় ৬০% কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে---

বৃহৎ শিল্প প্রায় ৫০%, ক্ষুদ্র শিল্প প্রায় ৩৬% ও কুটিরশিল্প প্রায় ১৪% সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্প, শিল্পজাত দ্রব্যের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে সেই প্রাধান্য নেই।

কারণ শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১৫% বৃহৎ শিল্পে সৃষ্টি হয়।

পক্ষান্তরে, **কুটিরশিল্পে মূল্য সংযোজন কম হলেও কর্মসংস্থান বেশি।**

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
Industrial Structure of Bangladesh

খ. উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পখাত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. ভোগ্যপণ্য শিল্প

২. মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প ও

৩. মূলধনী দ্রব্য শিল্প।

শিল্পখাতের মোট মূল্য সংযোজনে এসব শিল্পের অবদান হলো ভোগ্যপণ্য শিল্প প্রায় ৫৫%, মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প প্রায় ৪২% এবং মূলধনী দ্রব্য শিল্প মাত্র ৩%।

সুতরাং এ দেশের শিল্পখাতে বেশি পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়।

অন্যদিকে পর্যাপ্ত মূলধন এবং উন্নত প্রযুক্তির অভাবে এদেশে মধ্যবর্তী ও মূলধনী দ্রব্য কম উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
Industrial Structure of Bangladesh

গ. বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পগুলো হলো বস্ত্র শিল্প, পোশাক শিল্প, পাট শিল্প ও চামড়া শিল্প।

এ কয়েকটি শিল্প বৃহৎ শিল্প উপখাতের মধ্যে প্রায় ৭০% কর্মসংস্থান এবং প্রায় ৫০% মূল্য সংযোজন সৃষ্টি করে।

বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো রাসায়নিক শিল্প, সার শিল্প, পেট্রোলিয়াম শোধন শিল্প ও রাবার শিল্প।

বৃহৎ শিল্পের মধ্যে আরও রয়েছে চিনি, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

এ উপখাতে কতিপয় শিল্পের প্রাধান্য রয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, মেটাল শিল্প ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতের মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হলেও মূল্য সংযোজন কম (প্রায় ১৫% মাত্র)।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

বাংলাদেশের শিল্পের কাঠামোতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

দ্বৈত মালিকানা:

বাংলাদেশের শিল্পখাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মালিকানা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় জাতীয়করণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর, বিশেষ করে আশির দশকের পর থেকে এ দেশে বেসরকারি মালিকানায় শিল্প খাতের প্রসার ঘটতে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বেশির ভাগ শিল্পকারখানা বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন:

বাংলাদেশে বিগত এক দশকে পাট, বস্ত্র, চিনি, তৈরি পোশাক, ওষুধ ইত্যাদি অনেক শিল্পপণ্য উৎপাদনে বৃহদায়তনে শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

মাঝারি শিল্পের প্রাধান্য:

বাংলাদেশের শিল্প খাতে মাঝারি শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার বেশি এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন কারখানাকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মাঝারি শিল্প বলা হয়।

এ নীতি অনুযায়ী, জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন কারখানাকে মাঝারি শিল্প বলে।

বাংলাদেশে এ ধরনের শিল্প কারখানার সংখ্যাই বেশি।

বাংলাদেশে প্যাকেটজাত বিস্কুট, মেলামাইন, চীনামাটির বাসনপত্র, স্যানিটারি ফিটিংস, সাইকেল, টায়ার-টিউব, সিগারেট ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প হলো মাঝারি শিল্প।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য:

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তুলনামূলক কম মূলধন এবং শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে বাংলাদেশে এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

মোট শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ৪৫% আসে বস্ত্রশিল্প থেকে এবং শিল্প শ্রমিকের ৫০% এ শিল্পে নিয়োজিত।

পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার:

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি দ্রুত বিকশিত রপ্তানিমুখী শিল্প। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে স্বল্প খরচে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানি করাই এর মূল্য লক্ষ্য।

এ শিল্পে প্রচুর সংখ্যক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে।

শিল্প খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের প্রায় ৮০%-ই তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

মূলধনের স্বল্পতা:

বাংলাদেশের শিল্প খাতে স্বল্প পুঁজির শিল্প কারখানার আধিক্য লক্ষ করা যায়। মূলধনের স্বল্পতার কারণে বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানও সেভাবে গড়ে উঠে নি।

মুদ্রাবাজার (ব্যাংক, বিমা) কিংবা মূলধনবাজার (শেয়ার মার্কেট) থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে বড় শিল্প-কারখানা স্থাপন করার মতো অবস্থা এখনও বাংলাদেশে সেভাবে প্রসারিত হয়নি।

ভারি শিল্প গড়ে ওঠেনি:

ভারি শিল্পের অভাব বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, তাকে বৃহদায়তনের ভারি শিল্প বলে।

যেমন— পাটকলে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু পাটকলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি হয় ভারি শিল্পে।

বাংলাদেশে এ রকম ভারি শিল্পের ভিত এখন যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠেনি ।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

খনিজ সম্পদের অভাব:

শিল্পোন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়।
লৌহ, কয়লা, পেট্রোলিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদের অভাবে এদেশের শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

শক্তি সম্পদের অভাব :

বাংলাদেশে শক্তি সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কয়লা ও তেল নেই বললেই চলে।
প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎশক্তির যোগান পর্যাপ্ত নয়। ফলে শিল্পোন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে।

ওষুধ শিল্পের ব্যাপক প্রসার:

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। কিছু প্রতিষ্ঠানের ওষুধ বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন:

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।
মাধ্যমিক পণ্য ও মূলধনী পণ্য উৎপাদন হয় খুবই কম।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব:

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শের সরকার দেশে নির্বাচিত হয়। ফলে তাদের রাজনৈতিক কৌশলও বিভিন্ন হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের কারণে বিভিন্ন সময় দেশে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ প্রভৃতি দেখা দেয়।

ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখানে শিল্প স্থাপন করতে উৎসাহী হয় না এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্রমনিবিড় শিল্পের প্রাধান্য:

বাংলাদেশের শিল্প খাতে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই কম।

শিল্প-কারখানার অনুন্নত পরিবেশ:

কারখানার ভেতরে ও বাইরে নোংরা-আবর্জনাময় পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে কারখানার আশপাশে অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকাও লক্ষ করা যায়। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিগত প্রায় তিন দশক সময়ে বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে পরিবর্তনের একটি ধারা সূচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান
Contribution and Growth of Industrial Sector in GDP of Bangladesh

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের (Large industry) অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খনিজ ও খনন; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.২১ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ২২.৮৫ শতাংশ।

জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিভিন্ন অর্থবছরের অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে: (কোটি টাকা)[2]

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান

Contribution and Growth of Industrial Sector in GDP of Bangladesh

খাত	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	৩০৯০৯ (৯.০৬)	৩৩৯৪৫.৮ (৯.৮২)	৩৭০৮৬.৪ (৯.২৫)	৪০৮৯১.৯ (১০.২৬)
মাঝারি থেকে বৃহৎ	১০৮৪৩৬.২ (১ ।.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৪৭৩১৩ (১২.২৬)	১৬৩৮১৯.৫ (১১.২০)	১৮৭১৮৩.৭ (১৪.২৬)	২১৬৪১১.২ (১৫.৬১)
মোট	১৩২৯৯৪.২ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)	১৭৮২২২ (১১.৬৯)	১৯৭৭৬৫.৩ (১০.৯৭)	২২৪২৭০.১ (১৩.৪৯)	২৫৭৩০৩.০ (১৪.৭৩)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ।

দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে চারটি খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং খনিজ ও খনন; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ) সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। চারটি খাতের মধ্যে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান
Contribution and Growth of Industrial Sector in GDP of Bangladesh

জেনে রাখো:

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক পালাবদল ঘটেছে।

নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উঠে এসেছে এদেশ।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭০ সালে এ দেশের অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) আকার ছিল মাত্র ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

তৎকালীন সময়ে মুদ্রা বিনিময় হার ছিল প্রতি ডলারে ৭ টাকা ২৮ পয়সা।

সেই হিসাবে, অর্থনীতির আকার দাঁড়ায় ৩ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা।

গত অর্থবছরের স্থিরমূল্যে দেশের অর্থনীতি বা জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৪৭ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা।

মাথাপিছু আয় এখন ১৯শ' ডলার ছাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস
Classification of Industries in Bangladesh

'শিল্পনীতি ২০১০'-এর অনুসারে, বাংলাদেশের শিল্পগুলোকে ৯টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

ক. কুটিরশিল্প, খ. মাইক্রো শিল্প, গ. ক্ষুদ্র শিল্প, ঘ. মাঝারি শিল্প, ঙ. বৃহৎ শিল্প, চ. হাইটেক শিল্প, ছ. সংরক্ষিত শিল্প, জ. অগ্রাধিকার শিল্প এবং ব. নিয়ন্ত্রিত শিল্প।

পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শিল্পনীতিতে আরও ৩টি শিল্পের কথা বলা হয়েছে; যথা-

ঞ. হস্ত ও কারু শিল্প, ট. উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প এবং ঠ. সৃজনশীল শিল্প।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পগুলো মোট ১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

ক. কুটিরশিল্প (Cottage Industry):

'কুটিরশিল্প' বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০ এর অধিক নয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

অধিকাংশ কুটিরশিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় না। এসব শিল্পের কাঁচামাল স্থায়িভাবে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে রেশম শিল্প, লবণ শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, সাবান শিল্প তাঁত শিল্প, মাদুর ও ফুলদানি ইত্যাদি হলো কুটিরশিল্প ।

খ. মাইক্রো শিল্প (Micro Industry):

১. 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২৪ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

২. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

গ. ক্ষুদ্র শিল্প (Small Industry):

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে ভাড়া করা শ্রমিক, বিদ্যুৎ, এবং কিছুটা উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

ঘ. মাঝারি শিল্প (Medium Industry):

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত শিল্প হলো— সাবান শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প ও সিগারেট শিল্প প্রভৃতি।

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

৩. কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ড বৃহৎ শিল্পের বলে বিবেচিত হয়।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

ঙ. বৃহৎ শিল্প (Large Industry):

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

যেমন- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদিকে বৃহৎ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

চ. হাইটেক শিল্প (Hitech Industry):

১. 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) নির্ভর শিল্পকে বোঝায়।

২. কোনো একটি শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক (যে প্রতিষ্ঠানের অধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন) কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পের বেলায় যেকোনো বিনিয়োগ সীমা হলেও তার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিক পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকে।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

ছ. সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry):

সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেসব শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সংরক্ষিত শিল্পসমূহ হলো:

১. অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

২.পারমাণবিক শক্তি

৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল ইত্যাদি।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

জ. অগ্রাধিকার শিল্প (Priority Industry):

'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' শিল্প বলতে সে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বোঝায়।

যে সমস্ত শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা/প্রেষণা প্রদানের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক নীতি সমর্থন যোগানো প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে শিল্পের সংখ্যা ৩১টি।

শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2010

ঝ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প (Controlled Industry):

প্রাকৃতিক /খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা যাবে।

সরকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা তৈরি করে।

তাছাড়া বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প যেমন— স্যাটেলাইট চ্যানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মনোরেল, আন্ডারগ্রাউন্ড রেল, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদির ক্ষেত্রে Private Sector Infrastructure Guidelines-এর উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

শিল্পনীতি ২০১৬:

২০১৬-এর শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পের সংজ্ঞা হলো—

ব্যাপক অর্থে শিল্প বলতে পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড এবং মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সব সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কর্ম সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

শিল্পনীতি ২০১৬ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

২. উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টি।

৩. আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস।

৪. টেকসই শিল্পায়নের জন্য দেশীয় উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পণ্য বহুমুখীকরণ এবং আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৫. সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

৬. ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পের মাধ্যমে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ।

৭. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

৮. উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিকরণ।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ক. বৃহৎ শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক / শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যে সকল তৈরি পোশাক শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সে সকল তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

খ. মাঝারি শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

গ. ক্ষুদ্র শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না ।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ঘ. মাইক্রো শিল্প:

১. ‘মাইক্রো শিল্প’ (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে মাইক্রো শিল্প’ বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ঙ. কুটিরশিল্প:

১. 'কুটিরশিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

২. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

চ. হস্ত ও কারুশিল্প:

'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

ছ. হাইটেক শিল্প:

'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

জ. সংরক্ষিত শিল্প:

সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

সংরক্ষিত শিল্পখাতের উদাহরণ হলো—

১. অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি,

২. পারমাণবিক শক্তি,

৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল,

৪. বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ঝ. অগ্রাধিকার শিল্প:

'অগ্রাধিকার শিল্প' (Priority Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্পখাত/শিল্প উপখাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপখাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ:

১. প্লাস্টিক শিল্প, ২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ৩. জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ৪. পর্যটন শিল্প, ৫. হিমায়িত মৎস্য শিল্প, ৬. হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প, ৭. ভেষজ ঔষধ শিল্প, ৮. হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ৯. হস্ত ও কারু শিল্প, ১০. চা শিল্প, ১১. বীজ শিল্প, ১২. জুয়েলারি, ১৩. খেলনা, ১৪. আসবাবপত্র শিল্প ও ১৫. সিমেন্ট শিল্প ।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ঞ. উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প:

উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প (High Priority Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ:

১. কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প,
২. তৈরি পোশাক শিল্প,
৩. আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প,
৪. ঔষধ শিল্প,
৫. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প,
৬. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প,
৭. পাট ও পাটজাত শিল্প

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ট. সৃজনশীল শিল্প:

১. 'সৃজনশীল শিল্প' (Creative Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফটওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফ্টওয়্যার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২. এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে ।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

ঠ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প:

ক. প্রাকৃতিক / খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক / বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তিখাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন – সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন /অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Industries According to Industrial Policy to 2016

খ. নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারবে না। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের উদাহরণ:

১. যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প, ২. বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প, ৩. বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ, ৫. প্রাকৃতিক গ্যাস/ তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৬. কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৭. অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৮. স্যাটেলাইট চ্যানেল, ৯. কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান, ১০. সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল, ১১. সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন, ১২. VOIP (Voice Over Internet Protocol) ও IP (Intermet Protocol) Telephone, ১৩. এসিড উৎপাদনকারী শিল্প, ১৪. রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প ।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প
Small and Cottage Industry

কুটিরশিল্প:

যে শিল্পে স্বল্প মূলধন ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সংখ্যা ১০ জনের অধিক নয় ও সহজলভ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে পারিবারিক সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে।

অধ্যাপক পি. এন. ধর এর মতে,

যে শিল্পে ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য প্রস্তুতে ২০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পগুলো হলো তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, বেত ও কাঠ শিল্প।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প
Small and Cottage Industry

কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য:

১. সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় গৃহের ভেতরে বা পাশে ছোট পরিসরে এ শিল্প স্থাপিত হয়। তবে আধুনিক কাজে কিছু কিছু কুটিরশিল্পের কারখানা বসত বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে এবং কিছুটা বড় আকারে স্থাপন করা হয়।

২. এ শিল্পের হালকা ও সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়।

৩. এ শিল্পের ব্যবস্থাপনা কৃষি ব্যবস্থাপনার কাছাকাছি।

৪. সাধারণত পরিবার বা কোনো একটি গোষ্ঠীর দ্বারা এ শিল্পের শ্রমিক ও পুঁজি সরবরাহ করা হয়। এ শিল্পের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ কম হয়।

৫. কুটিরশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পের কারখানা গ্রামীণ ও শহরের বিচ্ছিন্ন এলাকায় স্থাপিত হয়।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প
Small and Cottage Industry

ক্ষুদ্র শিল্প:

২০১৬ শিল্পনীতিতে কুটিরশিল্প অপেক্ষা বড় কিন্তু বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ছোট এবং জমি কারখানা ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা ৩১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মতে,

'যে সকল শিল্পে জমি ছাড়া স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা সেসব শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।'

বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত বেতনভুক্ত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলো হলো—

ধাতব শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সাবান ও কসমেটিকস শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, কাচ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, স্টেশনারি দ্রব্য শিল্প, যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হালকা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও কুটিশিল্প
Small and Cottage Industry

ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য:

১. বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম পুঁজি, স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক ও মোটামুটি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এসব শিল্প পরিচালিত হয়।

২. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকের নিজস্ব মূলধন ছাড়াও ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৩. এসব শিল্পে দেশি ও বিদেশি উভয় উৎস থেকেই কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত হয়।

৪. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি কারখানার পরিবেশ বিরাজ করে এবং তা একক, অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হয়।

৫. এসব অধিকাংশ শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়।

৬. এসব শিল্পকে দেশের কারখানা আইন মেনে চলতে হয়।

৭. বাংলাদেশে সাধারণত এসব শিল্পের অধিকাংশ উৎপাদিত পণ্যের প্রসারিত অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে।

৮. অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা শহরাঞ্চলে বা শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়।

৯. এসব শিল্পের উৎপাদনে মূল্য সংযোজনের মাত্রা কুটিরশিল্প অপেক্ষা বেশি। তাই এসব শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব
Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কিংবা পারিবারিক অবসরকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো—

১. কর্মসংস্থান: বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বেকার সমস্যা। এ বিপুল বেকার জনশক্তিকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তাদেরকে ঘরে বসেই কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

২. মহিলাদের কর্মসংস্থান: আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ বিশাল অঙ্কের নারীসমাজ ধর্মীয় কারণে, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদির কারণে ঘরের বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না। তখন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তারা ঘরে বসেই কাজের ব্যবস্থা করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব
Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy

৩. কৃষিখাতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস: বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রচুর লোক ছদ্মবেশী বেকার, মৌসুমি বেকার হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল ছদ্ম বেকার, মৌসুমি বেকারদের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগ করা যায়।

৪. স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন: আমাদের দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হয় তাই মূলধনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। তাই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে এই স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করা যায়।

৫. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: দেশের কৃষকদের বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়ার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।

৬. সম্পদের সুষম বণ্টন: বৃহদায়তন শিল্পের কারণে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকে পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে এই সম্পদের সুষম বণ্টন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব
Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy

৭. দেশজ কাঁচামালের সদ্ব্যবহার: আমাদের দেশে পল্লি অঞ্চলে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলো কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে এ সকল দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা যায়।

৮. বৃহদায়তন শিল্পের উপজাত ব্যবহার: বৃহদায়তন শিল্পের উপজাত দ্রব্যের মধ্যে অনেক কিছু ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯. জনগণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে জনগণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। ফলে সৌখিন দ্রব্য আসবাবপত্র নির্মাণে এ শিল্প সাফল্য লাভ করে থাকে।

১০. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্য অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব
Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy

১১. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অনেক পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

১২. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস: বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বেশি হলে দামস্তর এমনিতে কমে যাবে। মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

১৩. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা সহজ: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্য একদিকে যেমন মূলধন কম প্রয়োজন হয় অন্যদিকে, তেমনি কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান কম ব্যবহার হয়। ফলে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সহজ।

১৪. কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না: কুটিরশিল্পসমূহ সাধারণত দেশের বিভিন্ন স্থানে ও অঞ্চলে বিক্ষিপ্তকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ফলে দেশে কোনো সময় যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তাহলেও কুটিরশিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব
Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy

১৫. পরিবেশ দূষণ কম: বৃহদায়তন শিল্প পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। কিন্তু এদিক থেকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না তথা এই শিল্পটি পরিবেশ বান্ধব।

১৬. জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ: বাংলাদেশের কুটিরশিল্প কারখানাকে পুরোনো ঐতিহ্যের জীবন্ত জাদুঘর হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আর তাই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকে ।

১৭. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি, বৃহদায়তন শিল্প ও অন্যান্য খাতের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Large Industry

যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বহুসংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে বৃহৎ শিল্প বলে।

উন্নত দেশগুলোতে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন কলাকৌশল, আকৃতি, ব্যবহৃত উপকরণ, সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও শ্রমিকের দক্ষতা এবং কারিগরি জ্ঞান অনেক উন্নতমানের। উৎপাদিত পণ্য উন্নত মানসম্পন্ন। সেসব অধিকাংশ শিল্প ভোগ্যপণ্য অপেক্ষা মূলধন দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে। উন্নত দেশের বড় বড় শিল্পের উৎপাদিত মূলধন দ্রব্যাদি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্প ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে এবং এগুলোর কিছু কিছু দ্রব্য মূলত রপ্তানির জন্য উৎপাদন হয়।

এ দেশের প্রধান বৃহৎ শিল্প হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইত্যাদি।

এসব বৃহৎ শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Large Industry

১. বৃহৎ শিল্প সাধারণত গোষ্ঠী মালিকানায় পরিচালিত এবং সেখানে শিল্প ও কারখানা আইন প্রযোজ্য হয়।

২. এসব প্রায় প্রতিটি শিল্প কিছুসংখ্যক ফার্ম বা কারখানার সমন্বয়ে গঠিত ।

৩. বৃহৎ শিল্প ব্যক্তিমালিকানা অথবা রাষ্ট্রীয় উভয় খাতেই স্থাপিত ও পরিচালিত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুসংখ্যক শিল্প ছাড়া অধিকাংশ বড় শিল্প বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন।

৪. ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পুঁজি বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে।

৫. এসব শিল্পে বিপুল মূলধন, বেশিসংখ্যক শ্রমিক, আধুনিক ও উন্নত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

৬. উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বেশি ও তার মান উন্নত।

৭. প্রায় সব বড় শিল্পের শ্রমিকরা কোনো না কোনো শ্রমিক সংগঠনের সদস্য।

৮. দক্ষ ও অর্ধদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিক রয়েছে।

৯. উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Large Industry

জেনে রাখো:

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা বা সংক্ষেপে বিসিক (BSCIC-Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation) বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প সংস্থা বা ইপসিক (EPSCIC - East Pakistan Small and Cottage Industry Corporation)। তৎকালীন EPSIC-এর উত্তরসূরী বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন। ১৯৭৩ সালে সরকারি নোটিফিকেশন নং ২৮ এর মাধ্যমে বিসিককে Bangladesh Small Industrics Corporation (BSIC) এবং Bangladesh Cottage Industries Corporation (BCIC) দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে সরকারি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উল্লিখিত করপোরেশন ২টি একত্রিত করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন নামে নতুন একটি করপোরেশনের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় এই করপোরেশন থেকে হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজকে পৃথক করে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড এবং বাংলাদেশ সেরিকালচার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়। বর্তমান বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

রপ্তানিমুখী শিল্প
Export Oriented Industry

রপ্তানিমুখী শিল্প:

দেশে উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার জন্য যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলা হয়। অর্থাৎ যেসব পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা ও রপ্তানির সম্ভাবনা বেশি থাকে সেসব পণ্যের শিল্পকেই রপ্তানিমুখী শিল্প বলা হয়। যেসব শিল্প তাদের উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে অথবা রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করে ও যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের সেবায় ন্যূনতম ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গণ্য করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য থেকে লাভ বৃদ্ধি করা। রপ্তানিমুখী শিল্প বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগ বা সম্পূর্ণভাবে দেশি বিনিয়োগ দ্বারা ব্যক্তিগত বা সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে। যেসব রপ্তানিমুখী শিল্পে দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সে শিল্পের পণ্য উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বেশি হয়।

পক্ষান্তরে, আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উপকরণের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প) মূল্য সংযোজনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

রপ্তানিমুখী শিল্প
Export Oriented Industry

প্রথমত, যেসব পণ্যের বিদেশে চাহিদা রয়েছে সেগুলোর কোনটি উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা (Comparative Cost Advantage) রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্যের চাহিদা ও বাজার সম্পর্কে ধারণা এবং তথ্য পেতে হবে। নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান অপরাপর পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, রপ্তানির জন্য নির্বাচিত পণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি, পুঁজি সংগ্রহ, উৎপাদন পরিবেশ ও কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, অন্যান্য দেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমশক্তি, উন্নত বিপণন, সহায়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি আবশ্যক।

রপ্তানিমুখী শিল্প
Export Oriented Industry

রপ্তানিমুখী শিল্পের বৈশিষ্ট্য:

রপ্তানিমুখী শিল্পের কতকগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো—

১. রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য কেবল বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হয়।

২. এ শিল্পের লক্ষ্য সর্বাধিক রপ্তানি আয় অর্জন।

৩. এ শিল্প দেশি-বিদেশি কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

৪. কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এ শিল্প স্থাপিত হয়।

৫. বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী শিল্প।

রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল
Export Oriented Industrialization Strategy

রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল বলতে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করাকে বোঝায়। অন্যভাবে দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে বিক্রয় করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল বলে।

সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয় তাকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Establishing Export Oriented Industries in Bangladesh

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর লেনদেন ভারসাম্য সবসময় প্রতিকূলে থাকে। তার কারণ হলো আমদানি নির্ভরতা। সেক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। আর সে জন্যই দেশে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের গুরুত্ব আরও বেশি।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার সপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো দেওয়া যায়:

১. শিল্পভিত্তি প্রসার: রপ্তানিমুখী বেশি সংখ্যক শিল্প স্থাপিত হলে পরিপূরক শিল্প হিসেবে অন্যান্য শিল্প স্থাপিত হবে এবং দেশের শিল্পভিত্তি প্রসারিত হবে।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Establishing Export Oriented Industries in Bangladesh

২. দেশজ কাঁচামালের সস্থ্যবহার: বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী বেশি সংখ্যক শিল্প স্থাপিত হলে দেশজ বিভিন্ন কাঁচামালের সদ্ব্যবহার হবে। যেমন— পাট শিল্প, চিনি শিল্প, কাগঞ্জ শিল্প, চামড়া শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইত্যাদি রপ্তানিমুখী শিল্প দেশজ কাচামাল ব্যাবহার করে।

৩. বিদেশি মূলধনের আগমন: রপ্তানিমুখী শিল্প বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত হলে বিদেশি মূলধনের আগমন ঘটে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ।

৪. শিল্প উন্নয়ন: বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা অন্যান্য সব শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি আমদানি করা যায়। ফলে দেশের সামগ্রিক শিল্পখাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৫. রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বেশি সংখ্যক রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপিত হলে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Establishing Export Oriented Industries in Bangladesh

৬. কর্মসংস্থান: বাংলাদেশে বিদ্যমান শিল্প কারখানার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্পের সংখ্যা বাড়লে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হবে এবং বেকারত্ব লাঘব হবে। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। দেশীয় সম্পদের ব্যবহার করে এদেশে শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখী শিল্পোৎপাদন শুরু করলে দেশে বেকার সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৭. উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান: স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিচালিত উন্নয়ন। কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ রপ্তানি বাড়লে উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংস্থান সহজ হবে। এজন্যই দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৮. শিল্প প্রযুক্তির উন্নয়ন: রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহ সাধারণত পণ্যের মান বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে। এর ফলে দেশের অন্যান্য শিল্পেও এ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৯. বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ: বাংলাদেশে অনেক বছর যাবৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি রয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ধিত রপ্তানি আয় দ্বারা বাণিজ্য ঘাটতি দূর করা সম্ভব

কতিপয় রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প (পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক)
Few Large Scale Export Oriented Industries (Jute, Textile, Tea, Leather and Garments)

ব্রিটিশদের প্রায় দুইশ' বছরের শাসন ও পাকিস্তানিদের পঁচিশ বছরের শাসন ও শোষণের ফলে এদেশে কোনো শিল্পই আলোর মুখ দেখেনি। তাছাড়া ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সঠিক শিল্পনীতির অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির কারণে এদেশে উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠেনি।

১৯৯৩ সালে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। এছাড়াও সরকার নতুন নতুন শিল্পনীতিসহ আরও গতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

তৎকালীন ভারতবর্ষে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল পাট ও চা। এদেশের পাট শিল্প সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ও স্কচ কোম্পানির হাতে ছিল। দরিদ্র পাট চাষিরা সংঘবদ্ধ ছিল না, তাই তারা ন্যায্য দাম পেত না। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটের দাম হঠাৎ কমে যায়। কিন্তু পাট কোম্পানির লাভ অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই পাটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট চলতে থাকে।

পাট শিল্প
Jute Industry

পাট পরিবেশবান্ধব শিল্প। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ (Golden Fiber of Bangladesh) বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন হয়ে আসছে। তাই বাংলদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহের মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। পাটকে বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল বলা হয় এবং পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে শীর্ষে ছিল। বর্তমানে এ শিল্পের অবস্থান দ্বিতীয়।

বিশ শতকের শুরুর দিকে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে দেয় পাট। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একের পর এক পাট শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর হয়ে ওঠে পাট শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। পাট চাষের পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয় এসব পাটকল। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটজাত সুতার সবচেয়ে বড় বাজার তুরস্ক। এর পরই রয়েছে চীন, ভারত, মিসর, ইরান, বেলজিয়াম, রাশিয়া, পাকিস্তান ও মেক্সিকো পাটের অন্যান্য পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় সুদান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কেনিয়া, বেলজিয়াম ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

পাট শিল্প
Jute Industry

বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশন (বিজেএমসি) তথ্য মতে, পাটপণ্য থেকে বৈশ্বিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশই রয়েছে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। বাকি অংশ ভারত, চীন, নেপাল ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পাটপণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ আয় করে ৪৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগের অর্থবছরে (২০১৭-১৮) পাটপণ্য রপ্তানি থেকে দেশে এসেছিল ৮৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর বাইরে বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাটও রপ্তানি হয়। এদেশে পাটপণ্যের বৈচিত্র্যও তুলনামূলক কম। যদিও দেশের সিংহভাগ পাটকলই ৫০ বছরের বেশি পুরনো মেশিন দিয়ে চলছে। পাটের জন্য বিশেষ পরিচিতি পাওয়া খুলনাই এখন এ শিল্পের ঊষর প্রান্তর। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল লোকসান দিয়ে এখনো টিকে থাকলেও একের পর এক বন্ধ হচ্ছে বেসরকারি পাটকল। খুলনায় বেসরকারি ২০টি পাটকলের মধ্যে সাতটিই এখন বন্ধ। সেকেলে হয়ে পড়েছে পাটকলের মেশিনারিজও। তার পরও পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে এখনো উঁচু অবস্থানেই রয়েছে বাংলাদেশ।

পাট শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Jute Industry

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ সারা বিশ্বে তুলার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আঁশ ফসল হিসেবে পরিচিত। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। **এদেশের ৪০-৪৫ লক্ষ চাষি প্রত্যক্ষভাবে পাট চাষের সাথে সম্পৃক্ত। পাট চাষ, পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট ও পাট জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসার সাথে প্রায় ৪ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত।** ১৯৮০ দশকের শুরুতে এদেশে কাঁচা পাটের উৎপাদন ছিল ৬০-৬৫ লক্ষ বেল। ১৯৯০ দশকে শুরুতে এটি নেমে যায় ৪৪-৪৭ লক্ষ বেলে (প্রতি বেল = ১৮২.২৫ কেজি বেলিং রোপসহ)। তবে সম্প্রতি পাট উৎপাদনে অগ্রগতি দৃশ্যমান। **দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৩-৪% আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে।** দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯টি পণ্যে মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ গড়ে ৭-৭.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং গড়ে প্রায় ৭০-৮০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়েছে। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৭৪.৪০ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাটের আবাদি জমি ও উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

পাট শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Jute Industry

নিচে পাট শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সরাসরি পাট শিল্পের সাথে জড়িত যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

২. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৩% অর্জন করে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্য সমূহ	২০১১-১২	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
কাচাপাট	২৬৬	১২৬	১১২	১৭৩	১৫৬	১৫৬	৮৭
পাটজাত দ্রব্য সমূহ	৭০১	৬৯৯	৭৫৭	৭৪৭	৮৭০	৬৩৩	৪৭৪

পাট শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Jute Industry

৩. পাট পরিবেশ বান্ধব: প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাবে বিশ্ববাসী সচেতন হওয়ায় পাটের ব্যবহার বাড়ছে। তাছাড়া ১ জানুয়ারি ২০০২ সাল থেকে ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যাগ এবং ২০০২ সালের মার্চে সারাদেশে পলিথিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। বর্তমানে সরকার পরিবেশ বান্ধব পাট উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করছে।

৪. মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি: বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাট শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. পাট কাঠি: গ্রামে রান্নার জ্বালানি, বেড়া, পারটেক্স তৈরিতে, পানের বরজে ব্যবহারের জন্য পাট কাঠির বহুল ব্যবহার রয়েছে।

পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
Present Condition of Jute Industry

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম এবং বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল।

২০০১ সালের ৩০ জুন লোকসানের কারণে এটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে পাটকলের সংখ্যা ছিল ৬৮টি।

বর্তমানে দেশে বিজেএমএ-এর অধীনে পাটকলের সংখ্যা ১৪৬টি। এর মধ্যে ৩৮টি পাটকল বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন ১০৮টি স্থাপিত (৮৯টি কম্পোজিট মিল, ৪টি কার্পেট ও ১৫টি বহুমুখী) পাটপণ্য উৎপাদনকারী মিল স্থাপিত হয়েছে। বিরাষ্ট্রীয়কৃত ৩৮টি মিলের মধ্যে বর্তমানে ১২টি চালু, ১৫টি আংশিক চালু এবং ১১টি বন্ধ রয়েছে।

'শিল্পনীতি ২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে 'অগ্রাধিকার খাত' হিসেবে চিহ্নিত করে 'পাটনীতি ২০১১' প্রণীত হয়। দেশে উৎপাদিত কাঁচাপাটের সিংহভাগ পাট বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের পাটকলসমূহে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো সারা দেশে স্থাপিত পাট ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে কাঁচাপাট ক্রয় করে পাট চাষিদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বর্তমানে বিজেএমসির আওতাধীন মোট মিলের সংখ্যা ২৬টি।

পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
Present Condition of Jute Industry

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। যা থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫২২০.৮৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বৃহৎ অংশ পাট শিল্পের সাথে জড়িত। সুতরাং, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নিচের সারণিতে বিগত কয়েক বছরের কাঁচাপাট উৎপাদনের পরিমাণ, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য দেখানো হলো:

সারণি: দেশে কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি মূল্য (কোটি টাকা)
২০১৪-১৫	৭৫.০১	১০.০১	৮১৬.৭৮
২০১৫-১৬	৮৭.৬৮	১১.৩৭	১১৭৮.৮৫
২০১৬-১৭	৮৮.৮৯	১২.১৮	৭২৭.৫৫
২০১৭-১৮	৯৩.১০	১২.৯৭	১২২৫.৫৫
২০১৮-১৯	৭৩.৫	০৮.২৫	৮৫৯.০৫

পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
Present Condition of Jute Industry

দেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাঁচাপাট উৎপাদিত হয় ৭৩.১৫ লক্ষ বেল, রপ্তানি হয় ০৮.২৫ লক্ষ বেল এবং রপ্তানি আয় হয় যথাক্রমে ৮৫৯.০৫ কোটি টাকা।

সারণি: পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মুল্যের বিবরণ

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি মূল্য (কোটি টাকা)
২০১৪-১৫	৮।.৬৫	৮.১৮	৫৬০২.১৬
২০১৫-১৬	৯।.৬৩	৮.২৫	৬২৪০.০০
২০১৬-১৭	৯।.৮৩	৮.০৪	৬৪৩০.৬০
২০১৭-১৮	১০।.২৬	৮.২৭	৬৮০১.৫৭
২০১৮-১৯	৯।.৩৮	৭.৩০	৫২২০.৮৫

দেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয় ৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, রপ্তানি হয় ৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রপ্তানি আয় হয় ৫২২০.৮৫ কোটি টাকা।

পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
Present Condition of Jute Industry

বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, শো-পিস, ম্যাট, সেন্ডেল ইত্যাদি। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান (সুতার তৈরি কাপড়), স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। তাছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটনব্যাগ, নার্সারি পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এসব পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ভারত, জার্মানি, মিসর, পোল্যান্ড, ইতালি, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করা হয়।

বর্তমানে পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাট অধ্যাদেশ ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, পাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন-রপ্তানি বার্ষিক মজুদ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন ও উফশী পাটবীজ উৎপাদনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ১০টির মতো প্রতিষ্ঠান পাট থেকে ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, কুশন, ল্যান্ডশেড, টেবিল ক্লথ, নকশা করা শপিং ব্যাগ, লন্ড্রি বাস্কেট, ফ্লোর ম্যাট ও ঘর সাজানোর উপকরণ ও পোশাক তৈরি করছে।

পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
Present Condition of Jute Industry

জেনে রাখো:

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। **১৯৩৮ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাট গবেষণাগার (Jute Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়।** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে একটি এক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। বর্তমানে BJRI তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে: ১. পাটের কৃষি তথা পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, ২. পার্টের কারিগরি তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন ও প্রচলিত পাট পণ্যের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং ৩. পাট, তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

পাট শিল্পের সমস্যা
Problems of Jute Industry

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। পাট শিল্পের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার: প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পাটের দাম হ্রাস পেয়েছে। তাই পাটচাষিরা পাট উৎপাদন এ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে ।

২. মান নির্ধারণে সমস্যা: আমাদের দেশে পাটকে উপযুক্ত মান অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করা হয় না। ফলে পাটের গড় মূল্য কৃষক পেয়ে থাকে। এতে কৃষক পাট চাষে নিরুৎসাহী হয়।

৩. চালের মূল্য বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চালের (ভাত) ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাটচাষিরা পাট উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ধান উৎপাদনে মনোযোগী হচ্ছেনা।

৪. সরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা: সরকার পাটচাষিদেরকে তাদের প্রয়োজনমতো ঋণের ব্যবস্থা না করায় এ ক্ষেত্র আগ্রহ হারিয়ে ধান উৎপাদনে মনোযোগী হচ্ছে না।

পাট শিল্পের সমস্যা
Problems of Jute Industry

৫. সরকারি নীতিমালার অভাব: পাটচাষিদেরকে পাট উৎপাদনে কীভাবে সহযোগিতা করা হবে এবং তারা লোকসানের সম্মুখীন হলে কীভাবে বা কতটুকু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা নির্ধারণে জটিলতা রয়েছে।

৬. মিল মালিকদের দৌরাত্ম্য: পাটচাষিরা পাট বিক্রি করলেও মিল মালিকরা সময়মতো চাষিদের টাকা পরিশোধ করে না। ফলে চাষিদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয় না।

৭. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী: পাটচাষিরা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি পাট বিক্রি করতে পারে না। এক্ষেত্রে মধ্যপন্থি, ফড়িয়া, দালালদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৮. মজুদকরণে সমস্যা: পাট উত্তোলনের পর চাষিরা মজুদ করতে বা সংরক্ষণ করতে পারে না। তাই তারা সংরক্ষণের অভাবে তড়িঘড়ি করে পাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষকরা দাম কম পেয়ে থাকে।

পাট শিল্পের সমস্যা
Problems of Jute Industry

৯. বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি: বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পাটের বিকল্প হিসেবে মেশতা, সিমাল, সিনথেটিক, রোজেল ইত্যাদি উদ্ভাবন হওয়ার ফলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমানে জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

১০. বাজার তথ্য সরবরাহের সমস্যা: বাজারজাতকরণ ও পাট সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া বাজারজাতকরণের উন্নত ব্যবস্থা এ দেশে অনুপস্থিত।

১১. উন্নত যন্ত্রাংশের অভাব: বাংলাদেশের পাটকলসমূহে এখনও প্রাচীন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে।

পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Jute Industry

বিপুল সম্ভাবনার খাত পাটকে বাঁচাতে পারলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। নিচে পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা হলো:

১. গুণগত মান সম্পন্ন বীজ: পাটের ভালো ফলনের জন্য ভালো বীজ সংরক্ষণ করে সে বীজ দ্বারা উৎপাদন পরিচালনা করতে হবে।

২. উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থা: উন্নত যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করে চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ: কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য সঠিক ওষুধ কৃষকদের নিকট পৌছাতে হবে।

৪. সরকারের সঠিক নীতিমালা: সরকারের একটি উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে পাটচাষিরা চাষ করতে উৎসাহ পাবে এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা পাবে।

৫. ঋণ দান: কৃষকেরা যাতে ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারে সেজন্য সরকারকে একটি কার্যকর সুদের হার নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৬. গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা: উন্নত গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করে পাট সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে।

পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Jute Industry

৭. তথ্যের প্রসার: পাট সম্পর্কে সহজেই যেন কৃষকরা বিভিন্ন তথ্য পেতে পারে সেজন্য টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে তথ্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

৮. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি: পাট শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে তারা উৎপাদন বাড়াতে পারবে।

৯. কূটনৈতিক তৎপরতাঃ বিশ্ববাজারে পাটকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সরকারি পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বলতর হবে।

১০. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি: পাট শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কেননা মজুরি বৃদ্ধি পেলে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহও বৃদ্ধি পাবে।

১১. উন্নত যন্ত্রাংশ ব্যাবহার: পাটশিল্পে উন্নত যন্ত্রাংশ ব্যাবহার করলে পাটকল গুলোতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

১২. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব বিলোপ পাট শিল্পের উন্নতির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে।

সুতরাং, পাট শিল্পের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উপরিউক্ত সমস্যা সমাধান করে এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Jute Industry

বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেটসের গবেষণা বলছে, ২০২২ সাল নাগাদ শুধু পাটের ব্যাগের বৈশ্বিক বাজার দাঁড়াবে ২৬০ কোটি ডলারের। যদিও দক্ষতা বাড়িয়ে পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে আরও ভালো অবস্থান তৈরির সুযোগ রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (EU) বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিষিদ্ধের কারণে এ বাজার তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, চীনসহ পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর সামনে এ বাজারে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)। এরই মধ্যে ২৩৫ ধরনের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনও হচ্ছে। এছাড়া পার্ট থেকে পলিথিনের বিকল্প 'সোনালি ব্যাগ', ভিসকস, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস, চারকোল, পাট পাতার পানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পাট শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে কাজ করছে। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'-এর আওতায় ১৯টি পণ্য (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, খুদ, তুষ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Jute Industry

পাটপণ্যকে উৎসাহিত করতে ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় রয়েছে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. পাট পরিবেশ বান্ধব: পাট পরিবেশ বান্ধব বস্তু বলে এর চাহিদা কখনোই কমবে না।

২. অন্যান্য বস্তু তৈরি: পাট হতে কাগজ, রেয়ন ইত্যাদি তৈরি করা যায় ।

৩. পাটের শ্রেষ্ঠত্ব: কৃত্রিম তন্তুর পরিধি বিস্তার করলে বর্তমানে পাট তার পূর্বের সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় ফিরে আসবে।

৪. আধুনিক উৎপাদন কৌশল: পাট শিল্পের আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের ফলে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

৫. স্বল্প উৎপাদন ব্যয়: বাংলাদেশে শ্রমিকের মজুরি খুব কম, ফলে এদেশে পাট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ও কম।

৬. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে এ শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ অফুরন্ত।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Jute Industry

৭. ভিসকস সুতা উৎপাদন: দেশে পোশাক শিল্প কারখানা ও বস্ত্র উৎপাদন কারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতার (স্পিনিং) কারখানা বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভিসকসের চাহিদা। বিশ্বে যত বস্ত্র তৈরি হয় তার ৩১ ভাগ হয় কটন থেকে। আর ৬৭ ভাগ ভিসকস, বাকি অংশ সিনথেটিকের মতো সুতা থেকে। কটনের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। পাট থেকে ভিসকস সুতা তৈরি শুরু হলে এ খাতে বাংলাদেশ রাজত্ব করবে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং, বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের কারণে পাটের সম্ভাবনা অফুরন্ত। সারা বিশ্ব এখন সবুজায়নে জোর দিচ্ছে। ইইউভুক্ত দেশগুলো পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে এসব দেশগুলোয় বিপুল পরিমাণ পাটের ব্যাগের চাহিদা সৃষ্টি হবে। এছাড়া পাটের শপিং ব্যাগ ও শৌখিন দ্রব্যেরও চাহিদা রয়েছে। এ বাজার ধরতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কারখানা স্থাপন করতে হবে। সেই সঙ্গে গবেষণার পাশাপাশি তৈরি করতে হবে দক্ষ জনবল।

পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Jute Industry

জেনে রাখো:

পাটে লিগনিন থাকার কারণে পাটের আঁশ শক্ত হয়। ওই পাটের আঁশকে লিগনিনমুক্ত করে ফেলা হয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক উপাদানও একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাট থেকে তা বের করে নিয়ে আসা হয়। এতে পাটের আঁশ পেজা তুলার মতো নরম হয়ে যায়। তা থেকে যে সুতা তৈরি হয়, সেটাই ভিসকস সুতা। এ সুতা দিয়ে তৈরি পোশাক অনেক আরামদায়ক হয়।

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র বাংলাদেশ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বস্ত্র শিল্প থেকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখছে। **বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।** যাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক তৈরি পোশাক খাত হতে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৩.৯০ শতাংশ আয় হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তৈ পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ৩৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪০% শতাংশ ওভেন কাপড় দেশীয় ওভেন শিল্প কারখানা হতে মেটানো হয়।

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (BTMC):

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেরে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত (অক্টোবর, ২০১৭) মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজৰ সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি । নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূত্রে বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন কার্যক্রমের ওপর একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

সারণি: বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমাণ
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প:

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৩.১০ লক্ষ তাঁত সচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ্য এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৬ লক্ষ। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী বছরে এব ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে আসছে।

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

বাংলাদেশের রেশম শিল্প:

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটিরশিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। এদেশের ৬.৫০ লক্ষের অধিক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (১৯৭৭), বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এ ৩টি সংস্থা একীভূত হয়ে 'বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড" অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি খাতে (২০১৩) গঠিত হয়েছে।

বস্ত্র শিল্প
Textile Industry

২০১৫-১৬ রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণিতে দেয়া হলো।

অর্থবছর	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২
২০১৬-১৭	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩
২০১৮-১৯	৩.১৬	৮৭.০০	০.৪৯

বস্ত্র শিল্পের সমস্যা
Problems of Textile Industry

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা লক্ষ করা যায়:

১. কাঁচামালের অভাব: বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। স্বাধীনতার পর তুলার উৎপাদন কম ছিল। এখনও এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

২.সুতাকলের অভাব: এখনো এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুতাকল গড়ে ওঠেনি। এজন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা উৎপাদন সম্ভব হয় না। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৩. মূলধনের অভাব: বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অধিক পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় মূলধনেরস্বল্পতা লক্ষ করা যায়।

৪. যন্ত্রপাতির অভাব: বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব দেখা দেয় এবং বস্তুকলে উৎপাদিত কাপড়ের গুণগতমান নিম্ন হয়।

৫. বিদ্যুতের অভাব: নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও বস্ত্র শিল্পে নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটছে না।

বস্ত্র শিল্পের সমস্যা
Problems of Textile Industry

৬. প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাব: বস্ত্র শিল্পের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের প্রয়োজনীয় সংযোগ এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম সরবরাহ করা হয়।

৭. দক্ষ শ্রমিকের অভাব: শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না করায় তারা দক্ষ হতে পারেনি। ফলে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা তাদের দক্ষতা দেখাতে পারে না।

৮. শ্রমিক অসন্তোষ: বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকরা কিছুদিন পরপর ধর্মঘটসহ ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়, যা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। কারণ শ্রমিক অসন্তোষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নষ্ট করে।

৯. জাহাজীকরণের সমস্যা: পণ্য জাহাজীকরণে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে, ফলস্বরূপ বস্ত্র মালিকরা প্রায়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয় ।কারণ তারা সময়মতো নির্ধারিত অর্ডার অনুসারে ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করতে পারে না।

১০. দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব: দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে বস্ত্রশিল্প এখন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Textile Industry

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সমস্যা দূর করা সম্ভব।

১. সরকারি নীতিমালা একটি আকর্ষণীয় বস্ত্র নীতিমালা সরকার তৈরি করলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে।

২. কাঁচামালের পর্যাপ্ততা: বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ও অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ হয়। এজন্য দেশের ভিতর কাঁচামাল তৈরিতে মনোযোগী হতে পারলে বা উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারলে সমস্যা সমাধান হবে।

৩. সুতাকল স্থাপন: এ দেশে সুতাকলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তাই সুতাকল নির্মাণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

৪. বিদ্যুৎ সংযোগ: নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেলে উদ্যোক্তারা অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

৫. প্রাকৃতিকগ্যাসের নিশ্চয়তা: প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ বলে আশা করা যায়।

বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Textile Industry

৬. আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি সহজলভ্য করতে হবে।

৭. ঋণের প্রসার: ঋণ সহজ ও শর্তমুক্ত হলে দেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে এবং এ শিল্পের প্রসার ঘটবে

৮. বন্ধ কারখানা চালু: বন্ধ পোশাক কারখানাগুলো সরকারকে বিশেষ প্যাকেজের আওতায় চালুর উদ্যোগ নিতে যাতে করে ফার্মের সংখ্যা বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৯. জাহাজীকরণ সমস্যা: জাহাজীকরণ সমস্যার সমাধান হলে সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করা যাবে।

১০. ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন: দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব।

এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের বস্ত্র ও সুতাকল যথেষ্ট উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বস্ত্র ও সুতা শিল্পে হবে উন্নত।

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Textile Industry

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এ শিল্প এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।

১. অনুকূল আবহাওয়াঃ অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করায় এদেশে বস্ত্র শিল্প ও তুলা উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

২. বস্ত্রের চাহিদা: এদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৩. সস্তা শ্রম: এদেশে সস্তা শ্রম বিরাজ করায় খুব সহজেই এবং কম খরচে বস্ত্র উৎপাদন করা যায়।

৪. সহায়তা নীতি: সরকার বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য মন্দা সহায়তা প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে যা ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকলে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of Textile Industry

৫. অনুকূল শিল্পনীতি: বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের সহায়ক।

৬. আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার: উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৭. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি: বাংলাদেশের অশিক্ষিত শ্রমিকের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

অর্থাৎ বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এসব কারণে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

চা শিল্প
Tea Industry

চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সর্বপ্রথম ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালিনীছড়া চা-বাগানের মাধ্যমে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয়। বর্তমানে নিবন্ধিত চা-বাগানের সংখ্যা ১৬৭টি। চা চাষের জমির পরিমাণ ২ লাখ ৭৯ হাজার ৫০৬.৮৮ একর। সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায় (৯১টি)। এছাড়া হবিগঞ্জ (২৫টি), সিলেট (১৯টি), চট্টগ্রাম (২১টি), পঞ্চগড় (৮টি), ঠাকুরগাঁও (১টি) ও রাঙামাটি (২টি) এলাকায়। চা চাষ হচ্ছে। ২০১৯ সালে ৯ কোটি ৬১ লক্ষ কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বে চা রপ্তানির তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঞ্চম। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ চা রপ্তানি হয় সেই সময়। ১৯৮২ সালে চা রপ্তানি হয় ৩ কোটি ৪৪ লাখ কেজি। ২০১৯ সালে সাড়ে ৬ লাখ কেজি রপ্তানি হয়।



চিত্র: চা বাগান

চা শিল্প
Tea Industry

অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়তে থাকায় রপ্তানিও কমে গেছে। ২০১৮ সালের চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ ছিল ৭৭তম। কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাজ্য, আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ফ্রান্সসহ অনেক দেশে বাংলাদেশের চা রপ্তানি হয়।

চা রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
রপ্তানি আয়	৬	৩	২	৪	২	৪	৩	২.৮২

চা শিল্প
Tea Industry

বাংলাদেশ চা উৎপাদনের দিক থেকে ১০ম অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বে চা উৎপাদনকারী শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা-

দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ (টন)
চীন	২৪,৭৩,৪৪৩
ভারত	১৩,২৫,০৫০
কেনিয়া	৪,৩৯,৮৫৭
শ্রীলঙ্কা	৩,৪৯,৬৯৯
ভিয়েতনাম।	২,৬০,০০০
তুরস্ক	২,৩৪,০০০
ইন্দোনেশিয়া	১,৩৯,৩৬২
মিয়ানমার	১,০৪,৭৪৩
ইরান	১,০০, ৫৮০
বাংলাদেশ	৯৫,০০০

জেনে রাখো:

দেশের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্র চট্টগ্রামে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চা নিলাম কেন্দ্র চালু হয়েছে চায়ের রাজধানী নামে খ্যাত মৌলভীবাজারে ।

চা শিল্পের সমস্যা
Problems of Tea Industry

চা শিল্পের নিম্নোক্ত সমস্যা বিরাজমান।

১. বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল: সময়মতো বৃষ্টিপাত না হলে চা উৎপাদন কম হয়। বৃষ্টিপাতের ওপর এ শিল্প এখনও নির্ভরশীল।
২. উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব: চা উৎপাদনের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায়ই চা নিম্নমানের হয় ।
৩. দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতা: অনেক সময় দক্ষ শ্রমিকদের স্বল্পতার জন্য চা শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
৪. গুদামজাতকরণ ও প্যাকিং-এর সমস্যা: উৎপাদিত চা গুদামজাতকরণের অভাব ও গুণগত মানের প্যাকিং নির্ধারণে সমস্যা দেখা যায়।
৫. কীটপতঙ্গের আক্রমণ: কীটনাশক সম্পর্কে কৃষকের সচেতনতার অভাবে প্রায়ই চা উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৬. পরিবর্তক দ্রবের উপস্থিতি: চা এর বিকল্প হিসেবে কফির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চায়ের চাহিদা কমে যাচ্ছে। দৈনন্দিন কফির সাথে চা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারা কঠিন হয়ে যাচ্ছে ।
৭. দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব: সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সময়মতো উপযুক্ত সিদ্ধান্তের অভাবে চায়ের কম উৎপাদন লক্ষ করা যায়।

উপরিউক্ত সমস্যার কারণে বাংলাদেশে চা শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

চা শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Tea Industry

চা শিল্পের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল না থেকে সময়মতো সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২. উন্নত বীজ ও নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র আবিষ্কার: চা উৎপাদনের জন্য উন্নত বীজ সংরক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৩. অধিক মূলধন: পুঁজি বিনিয়োগ করে ২-৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়। তাই অধিক মূলধনের সাথে চা মালিকদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারলে এই শিল্পের বিকাশ ঘটবে

৪. গুণগত মান বৃদ্ধি: চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারলে এর রপ্তানি বাড়বে ।

চা শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Tea Industry

৫. গুদামজাতকরণ ও প্যাকিং সমস্যার সমাধান: গুদামজাতকরণের ব্যবস্থাসহ আকর্ষণীয় প্যাকিং সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে এ শিল্প বিকশিত হবে।

৬. রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ: রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেতে হবে। যেমন: প্রচার, প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ।

৭. সরকারি নীতি: চা শিল্পের জন্য সরকারকে সঠিক ও উদ্দীপনামূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৮. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ: চা পাতা উত্তোলনের সাথে জড়িত এবং কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে চায়ের মান উন্নত হবে এবং সংগ্রহের পরিমাণও বাড়বে।

৯. উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং চা পরিবহণের উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সীমান্তের ওপারে দার্জিলিংয়ের চা পৃথিবীখ্যাত । আমাদের এখানেও ভালো মানের চা উৎপাদিত হয়। তবে চা শিল্পের বিকাশে আরও কাজ করতে হবে।

চামড়া শিল্প
Leather Industry

চামড়া শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প এখন **তৈরি পোশাকের পরই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চামড়া শিল্পের অবস্থান অন্যতম।**

বাংলাদেশ থেকে পাকা চামড়ার পাশাপাশি জুতা, ট্রাভেল ব্যাগ, বেল্ট, ওয়ালেট বা মানিব্যাগ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রচুর হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, যারা এ সব পণ্য তৈরি করে বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করছে।

বাংলাদেশের চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্যের বড় বাজার হলো ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা।

সাম্প্রতিক সময়ে এর বাইরে জাপান, ভারত, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, হংকং এবং তাইওয়ানে বেশি রপ্তানি হয়।

তবে বিশ্বে বাংলাদেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা জাপান।





চিত্র: চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

চামড়া শিল্প
Leather Industry

মোট রপ্তানি পণ্যের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ যায় জাপানের বাজারেই।

এর অন্যতম কারণ, বাংলাদেশি চামড়ার জুতার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই জাপান 'ডিউটি ফ্রি' ও 'কোটা ফ্রি' সুবিধা দিয়ে আসছে।

বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার এখন ২২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের।

আর এর মাত্র দশমিক পাঁচ শতাংশের জোগান দেয় বাংলাদেশ।

ট্যানারি ছাড়াও বাংলাদেশে ১১০টি জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের শিল্প কারখানা আছে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার জন্য আছে ২০৭টি শিল্প-কারখানা।

এর মধ্যে এপেক্স, এফবি, পিঁকার্ড বাংলাদেশ, জেনিস, আকিজ, আরএমএম, বেঙ্গল এবং বৌর রয়েছে নিজস্ব ট্যানারি ও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা।

সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও প্রতিবছর ২০০ থেকে ২৫০ মিলিয়ন জোড়া জুতা তৈরি হয় বাংলাদেশে।

চামড়া শিল্প
Leather Industry

ট্যানারি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ কোটি ৬৫ লাখ 'পিস' কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়।

এর মধ্যে ছাগলের চামড়া ১ কোটি, গরু ৫০ লাখ, ভেড়া ও মহিষ মিলে ১৫ লাখ পিস।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ২৩ কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।

আর এই চামড়ার প্রায় অর্ধেকই পাওয়া যায় কোরবানির ঈদের সময়।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত কাঁচা চামড়া বা 'ওয়েট ব্লু লেদার' এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়া বা ক্লাস্ট লেদার রপ্তানি করে আসলেও, এখন বেশি রপ্তানি হয় 'ফিনিশড লেদার'।

সারা দেশের ২২০টি ট্যানারির মধ্যে ১৫৪ টির অবস্থান হাজারীবাগে। প্রায় ৩ হাজার ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কর্মসংস্থান প্রায় ৮ লাখ মানুষের। হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি সরাতে সরকার অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করে আসছে।

তাই সাভারে তৈরি করেছে আধুনিক চামড়া শিল্প নগরী।

এ কাজে সহায়তা করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)।

চামড়া শিল্প
Leather Industry

২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১০৮ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতের আয় হয়েছে ১০১ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি) চামড়ার জুতা রপ্তানিতে আয় হয়েছে ১৬ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার।

সারণি: চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়

অর্থবছর	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
রপ্তানি আয়	১১৩১	১১৬১	১২৩৪	১০৮০	১০১০

চামড়া শিল্প
Leather Industry

চামড়া শিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ঋণের স্বল্পতা: চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায় না। কোরবানির সময় ব্যবসায়ীদের অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রায়ই সরকার প্রয়োজনের তুলনায় এ ক্ষেত্রে কম ঋণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

২. প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা: চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যানারি শিল্প সারা দেশে সমভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রায়ই চামড়া তার গুণগত মান হারায়।

৩. বিদ্যুৎ ঘাটতি: প্রয়োজনীয় বা চাহিদামতো বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এ শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এতে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। **সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে ১৫৪ টি কারখানার মধ্যে ১২৪ টিতে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে।**

৪. রাসায়নিক শিল্পের স্বল্পতা: চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এসব রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

চামড়া শিল্প
Leather Industry

৫. শ্রমিকদের অদক্ষতা: প্রায়ই চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ফলে চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়।

৬.সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা উদ্যোক্তাদেরকে চামড়া শিল্পে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

৭. সংরক্ষণের অভাব: চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়ার আড়ৎ থাকা দরকার, যা আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

৮. চামড়া নীতি: চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য যে রকম আকর্ষণীয় নীতি উদ্যোক্তারা আশা করে সে রকম নীতি সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি

৯. চামড়া পাচার: প্রতি বছর এ দেশ থেকে চামড়া পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যায়। ফলে এদেশের শিল্প কারখানায় চামড়ার অভাব দেখা যায়।

চামড়া শিল্প
Leather Industry

১০. পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ দূষণ বর্তমানে একটি জাতীয় সমস্যা। চামড়া শিল্পের জন্য আলাদা কোনো শিল্প নগরী নেই। ফলে এদেশের শহরে, নগরে ও শহরতলীতে এ শিল্প স্থাপন করার ফলে ট্যানারি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

১১. চামড়ার দাম হ্রাস: রপ্তানি ভাটার প্রভাব পড়ে কাঁচা চামড়ার দামেও। ২০১৩ সালে প্রতি বর্গফুট গরু মহিষের চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৫ ও ৯০ টাকা। ২০১৯ সালে ধার হয়েছিল ৪৫ ও ৫০ টাকা করে।

সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬		২০১৮	২০১৯
গরু	৮৫	৭০	৫০	৫০	৫০	৪৫	৪৫
মহিষ	৯০	৭৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫০	৫০

উপরিউক্ত সমস্যার কারণে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বিস্তৃতি ব্যাহত হচ্ছে ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Leather Industry

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. ঋণের পর্যাপ্ত যোগান: চামড়া শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে এবং সেই ঋণ সহজ হলে এ শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

২. বিদ্যুতের সংযোগ: চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করলে এ শিল্পের সমস্যার সমাধান হবে।

৩. রাসায়নিক দ্রব্যের পর্যাপ্ততা: প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে এ শিল্প আলোর মুখ দেখতে পারবে।

৪. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অধিক প্রয়োজন ।

চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়
Measures for Solving the Problems of Leather Industry

৫. পাচার রোধ: দেশের বাইরে যেন চামড়া পাচার না হতে পারে সে দিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. বিদেশে বাজার সৃষ্টি: বিদেশে বাজার সৃষ্টি করার জন্য দেশীয় বিনিয়োগকারীদের ও সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

৭. ট্যানারি শিল্প স্থাপন: দেশে আরও বেশি ট্যানারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. চামড়া নীতি: চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য সঠিক চামড়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে। চামড়া নীতিতে চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৯. পৃথক ট্যানারি বা শিল্প নগরী স্থাপন : বাংলাদেশে ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য সুপরিসর স্থানে একটি পৃথক শিল্পনগরী স্থাপন করতে হবে। উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প রপ্তানি আয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
Future Prospects of leather Industry

বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের একটি বিশেষ অংশ চামড়া শিল্প থেকে আসে। এদেশে চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **চামড়ার পর্যাপ্ততা:** এদেশে প্রতিদিন বহুসংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়। তাছাড়া কোরবানির সময় প্রচুর চামড়া পাওয়া যায়।

২. **উন্নত চামড়া:** এ দেশে যে চামড়া পাওয়া যায় তা উন্নতমানের এবং দিন দিন এই শিল্পে দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে।

৩. **সস্তা শ্রম:** জনবহুল দেশ হওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশি এবং সস্তা মূল্যে শ্রম পাওয়া যায়।

৪. **চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা:** বিদেশে এবং দেশের ভিতর চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিদেশের বাজারে উন্নতমানের চামড়ার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে চামড়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে চামড়া শিল্প ভবিষ্যতে একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে।

তৈরি পোশাক শিল্প
Readymade Garments Industry

পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এ দেশে এ শিল্পের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়।

স্বাধীনতার পর এ পোশাক শিল্পের ব্যাপারে প্রথম চিন্তা ভাবনা শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে কতিপয় সাহসী উদ্যোক্তার হাতে গড়া হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ শিল্পটির যাত্রা শুরু হয় এবং ১ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়। **বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে।**

এসব কারখানায় প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে।

এদের প্রায় ৮০ শতাংশই হলো অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা কর্মী। এই শিল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বর্তমানে এ খাত থেকে উপার্জিত হয়।

তৈরি পোশাক শিল্প
Readymade Garments Industry

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫ থেকে ৮৩ শতাংশেরও বেশি বস্ত্রপণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৪১৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে।

অর্থাৎ এ সময়ে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩.৯০% তৈরি পোশাক থেকে অর্জিত হয়েছে।

বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় হয়েছে ৪৫৯৩.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৬.৬৭ শতাংশ।

সুতরাং, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯]

১৯৭৬-৭৭ সালে এদেশে মাত্র ৩টি কারখানা ছিল।

তারপর ২০০৫ সালে এসে ৫ম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

প্রতি বছর এ খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসব পণ্য রপ্তানি করা হয়।

তৈরি পোশাক শিল্প
Readymade Garments Industry

তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	২০১১-১২	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় (নিটওয়্যারসহ)	১৯০৮৯	২৫৪৯২	২৮১৫০	২৮১৫০	৩০৬১৫	৩৪১৩৩

বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো:

১. শ্রমিক কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি,
২. পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজীকরণ,
৩. ইউটিলিটি বিল মওকুফ,
৪. বিমা প্রিমিয়াম হ্রাস,
৫. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ,
৬. নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা,
৭. কমপ্লায়েন্স অনুসরণ।
৮. শ্রমিকদের সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে এ খাতের মালিক; শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

Compliance শব্দের অর্থ হলো সম্মতি। অর্থাৎ কোন প্রস্তাবের পক্ষে মতামত প্রদান এবং সে অনুযায়ী কাজ করাকেই Compliance বলে।

তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Readymade Garments Industry

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। সেই প্রেক্ষিতে এই শিল্পের গুরত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে প্রায় ১ কোটি শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ২২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত। তাই তৈরি পোশাক শিল্প জনবহুল এই দেশের বেকারত্বের ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে।

২. উদ্যোক্তার প্রসার: স্বাধীনতার পর যেখানে কোনো উদ্যোক্তা ছিল না সেখানে বর্তমানে পোশাক শিল্প বিস্তারের সাথে সাথে সাহসী উদ্যোক্তাদের বিস্তৃতি ঘটেছে।

৩. নারীদের কর্মসংস্থান: বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি নারী তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে। এর ফলে সমাজ কাঠামো ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। তাই এ খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ৩৪১৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Readymade Garments Industry

৫. ব্যাংক ব্যবসার প্রসার: পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে ব্যাংক, বীমা ব্যবসার প্রসারণ ঘটেছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. আত্মনির্ভরশীল জাতি: পোশাক শিল্পের মাধ্যমে এদেশ আত্মনির্ভরশীল হতে চলেছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি করতে পারছে।

৭. অবকাঠামোর উন্নয়ন: পোশাক শিল্পের প্রসারণে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে।

৮. কৃষির ছদ্মবেশী বেকার হ্রাস: পোশাক শিল্পে অধিক সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হওয়ায় কৃষির ছদ্মবেশী বেকার হ্রাস পেয়েছে।

৯. সহায়ক শিল্প সৃষ্টি: পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে অন্যান্য সহায়ক শিল্প যেমন: সুতা, কার্টুন, পলিব্যাগ, গামটেপ, প্যাকিং প্রভৃতি পণ্যের কারখানার বিকাশ ঘটেছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা
Problems of Readymade Garments Industry

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা; বিশ্ববাজার সংকুচিত হওয়া ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। নিচে এ খাতের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো—

১. **মূলধনের অভাব:** অধিক মূলধন নিয়ে পোশাক শিল্পের ব্যবসা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই মূলধনের স্বল্পতা এই শিল্প বিকাশের অন্যতম সমস্যা।

২. **কাঁচামালের অভাব:** দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত কাঁচামাল না পাওয়ায় উদ্যোক্তাদের আমদানি নির্ভরশীল থাকতে হয়। সময়মতো কাঁচামাল না পাওয়া, কাঁচামালের স্বল্পতা এবং বেশি দামে কাঁচামাল ক্রয় করায় ব্যবসায়ীরা বিপাকের সম্মুখীন হয়।

৩. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব:** দক্ষ শ্রমিক উৎপাদনের সহায়ক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম থেকে চলে আসা অদক্ষ শ্রমিকদের কোনো ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না করেই উৎপাদনে নিযুক্ত করা হয়।

৪. **উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব:** পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নিজ দেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত না হওয়ায় বেশি দামে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় এবং এর ফলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা
Problems of Readymade Garments Industry

৫. গুটি কয়েক দেশের সাথে বাণিজ্য: যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কতিপয় দেশ ব্যতীত অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য পরিচালিত না হওয়ায় এ শিল্পের প্রসারিত হয়নি। যার দরুন বিশ্বব্যাপী এই শিল্প বিস্তৃত হতে পারেনি।

৬. বিদ্যুতের অভাব: লোডশেডিং আমাদের দেশের প্রতিনিয়ত সমস্যা। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ উৎপাদনের সহায়ক নয়। তাই নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে প্রায়শই উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

৭. গ্যাসের স্বল্পতা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের সংযোগও এই শিল্পে নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে প্রায়ই শ্রমিকরা কর্মসময়ে অলস থাকে।

৮. ঋণের অসুবিধা: বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধার অভাব রয়েছে।

৯. অবাধ বাণিজ্যের প্রভাব: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অন্যান্য দেশ জেনারেলাইজড সিস্টেমস অব প্রেফারেন্স (GSP) সুবিধা পেলেও বাংলাদেশ এই সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশকে অবাধ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১০. পোশাকের গুণগত মান: প্রায়ই বিদেশি ক্রেতারা পোশাকের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং পোশাক নিতে অস্বীকার করায় পোশাক শিল্পের মালিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা
Problems of Readymade Garments Industry

১১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে প্রায়ই ধর্মঘটসহ বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হয়, যা উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

১২. শ্রমিক অসন্তোষ: শ্রমিকরা প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি, কর্মসময় নির্ধারণ ইত্যাদি দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরে নিযুক্ত হয় খা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির ওপর আঘাত হানে।

১৩. রপ্তানিতে বিলম্ব: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মাঝে মধ্যে শুল্ক ও জাহাজীকরণ জটিলতার কারণে প্রায়ই সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং রপ্তানি বিলম্বিত হয়।

১৪. স্বপ্ল আইটেমের পোশাক রপ্তানি: বাংলাদেশ ১০-১২টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে। কিন্তু চীন, ভারত, তাইওয়ান, হংকং প্রভৃতি দেশ প্রায় ১১৫-১২০টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে।

তাই বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।

উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহের জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের সস্তা শ্রম এবং সরকারের সহযোগিতা পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এ শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা হলো

১. কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ: পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে পোশাক শিল্পের মালিকরা সহজেই কাঁচামাল পাবে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে যথাযথ উৎসাহ দানপূর্বক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

২. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি: পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ: প্রতিটি ফার্মে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সরকারকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে এবং উদ্যোক্তাদের আশা প্রদান করতে হবে। তাহলে অচিরেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

৪. পণ্যের মান নির্ধারণ: পণ্যের সঠিক মান নির্ধারণের জন্য উন্নত কাঁচামাল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

৫. কোটা সুবিধা: যেসব দেশে রপ্তানি ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা প্রচলিত আছে সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশকে কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতে হবে।

৬. ঋণের সহজলভ্যতা: ঋণের সহজলভ্যতা হলে উদ্যোক্তরা উৎসাহ পাবে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সুদের হার এই শিল্পের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সুষ্ঠু পোশাক নীতি: সকল সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে সঠিক পোশাক শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৮. বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ: বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ প্রদান করলে এদেশে পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে এবং এই শিল্প আরও বিকশিত হবে।

৯. গবেষণা: এই শিল্প কীভাবে আরও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারবে অথবা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষজ্ঞ টিম দিয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

১০. আইটেম বৃদ্ধিকরণ: বিদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী এদেশ সকল ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। তাই অধিক আইটেমের পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশিদের চাহিদার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

১১. আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ: পোশাক শিল্পের ওপর প্রায়ই বিশ্বমানের সেমিনার বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সেমিনারে দেশীয় শিল্প মালিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিকরণ: তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহৎ একটি সমস্যা হলো শ্রমিকের কম মজুরি প্রদান। অথচ আমাদের তৈরি পোশাকে যতটা মূল্য সংযোজন হয় তার প্রায় ৬০ ভাগেরও বেশি শ্রমিকের শ্রম থেকে আসে। অথচ এই মূল্য সংযোজনের মাত্র ২৫ ভাগ শ্রমিকদের দেওয়া হয়। এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা
Prospects of Readymade Garments Industry

দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগই এই খাত থেকে অর্জিত হয়। নিচে পোশাক শিল্পের সম্ভাবনার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. পর্যাপ্ত শ্রমিক: এদেশে সস্তায় পর্যাপ্ত শ্রমিক এখন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। তাই জনবহুল এই দেশে শ্রমিকনির্ভর শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ।

২. সরকারি প্রণোদনা: সরকার এই শিল্পের প্রতি সব সময় সুনজর দিয়ে আসছে যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

৩. নারীদের অংশগ্রহণ: বিপুল সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ এই শিল্প নিশ্চিত করতে পেরেছে, যা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

৪. বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিশ্চয়তা: সরকার সব সময় এ খাতে বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদানে আগ্রহী থাকে। যা অধিক উৎপাদনে অতি প্রয়োজনীয়।

তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা
Prospects of Readymade Garments Industry

৫. বিদেশি বিনিয়োগ: পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বিধায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সবসময় এই খাতে বিনিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে।

৬. সরকারের উদার শিল্পনীতি: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের আর একটি কারণ হলো সরকারে উদার শিল্পনীতির আশ্রয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং, কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল ।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল
Import Substituion Industrialization Strategy

আমদানি না করে কোনো দেশের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন করে দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই হলো আমদানি বিকল্প শিল্প। সুতরাং বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য নিজের দেশে উৎপাদন করতে শিল্প কলকারখান স্থাপন করাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

আন্তজার্তিক বাজারে তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদিত প্রাথমিক দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে যে ঘাটতি দেখা দেয় সে ঘাটতি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা হয়।

সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করার নীতিকে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে।

অন্যভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে যেসব দ্রব্য আমদানি করা হয়, সেসব দ্রব্য আমদানি না করে দেশীয় প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে ঐসব দ্রব উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ দেশের অভ্যন্তরে স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল
Import Substituion Industrialization Strategy

এ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্প স্থাপন করা।

তাছাড়া লেনদেনের ভারসাম দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দাতাগোষ্ঠীর অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়।

এজন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা হলো আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অধিকহারে শুল্ক ও করারোপ করা, কোটা প্রবর্তন ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। ফলে পণ্যের আমদানি হ্রাস পায় এবং দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে ঐসব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকেই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল
Import Substituion Industrialization Strategy

আমদানি বিকল্পন শিল্পের বৈশিষ্ট্য: আমদানি বিকল্পন শিল্পের কতকগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে ।

i. আমদানি বিকল্পন শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো অথবা তার নিকট বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

ii. এ শিল্পে দ্রব্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করা হয়।

iii. এ শিল্পে যতদূর সম্ভব দেশীয় কাঁচামাল, নিজস্ব প্রযুক্তি ও শ্রমনিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় যাতে এ শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়।

iv. এ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, অর্জন নয়।

v. প্রয়োজনে এ শিল্প সরকার প্রদত্ত সংরক্ষণ সুবিধা পেয়ে থাকে।

vi. এ শিল্প দেশে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা
Advantages of Import Substitution Industrialization Strategy

বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। তাই দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. রপ্তানি বৃদ্ধি: আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করা হলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

২. আমদানি হ্রাস: বাংলাদেশ প্রতি বছর ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানি করে। ফলে এর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। যদি দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পকারখানা স্থাপন করা হয় তবে আমদানি ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

৩. নির্ভরশীলতা হ্রাস: এ শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করা হলে নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। দেশে ভোগ্যপণ্য ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধীরে ধীরে শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা
Advantages of Import Substitution Industrialization Strategy

৪. লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণ: বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি বলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। তাই শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশেই আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ হবে এবং লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীভূত হবে।

৫. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি: এ শিল্পায়ন কৌশলের মাধ্যমে দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়। ভোক্তা স্বল্পমূল্যে দেশীয় উন্নতমানের পণ্য ভোগ করতে পারে। ফলে ভোক্তার স্যয় বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন গঠিত হয়। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৬. দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ: বিদেশি শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় নবীন শিল্পসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদেশি পণ্য আমদানি বন্ধ বা নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে দেশীয় শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ফিরে আসবে এবং দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশের নাগরিকদের ব্যবহারের উপযোগী হবে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা
Advantages of Import Substitution Industrialization Strategy

৭. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ। দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হলে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

৮. **দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন:** আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশের অভ্যন্তরে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কৃষি ও শিল্প উভয় খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

সুতরাং, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি পরনির্ভরশীলতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলসমূহের অসুবিধা
Disadvantages of Import Substitution Industrialization Strategy

আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি এর কতকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. মূলধন নিবিড় কৌশল: আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ব্যবস্থায় মূলধন নিবিড় কৌশল ব্যবহৃত হয়। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এমতাবস্থায় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে বেকার সমস্যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাতে পারে।

২. বিশ্ববাজারে প্রবেশের বাধা: বিশ্বায়নের এ যুগে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবেশাধিকার ও সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায়, এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করা। এতে বিশ্ববাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

৩. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি: এ কৌশল অনুসরণ করা হলে ভোগ্যপণ্যের আমদানি হ্রাস পায়। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও মূলধনসামগ্রীর আমদানি বৃদ্ধি পায়। তাই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল আমদানি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।

আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলসমূহের অসুবিধা
Disadvantages of Import Substitution Industrialization Strategy

৪. নিম্নমানের পণ্যঃ আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের অন্যতম অসুবিধা হলো নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় অব্যাহতভাবে সংরক্ষণ সুবিধা ভোগ করে। তাছাড়া এরূপ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও খুব সংকীর্ণ। এমতাবস্থায় পণ্যের মানোন্নয়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বলে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হয়।

৫. নেশা জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে: নেশাজাতীয় দ্রব্যের আমদানি ঠেকানোর জন্য এ ধরনের দ্রব্যের শিল্প স্থাপিত। দেশের জনগণ এসবের প্রতি আসক্ত হবে। যার দ্বারা জাতীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

৬. বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস: এ শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস পায়। কারণ শিল্পায়ন কৌশলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে আমদানি নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক দেশ আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করছে। এতে ধীরগতিতে হলেও এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

২০১০ সালের শিল্পনীতির পর সাম্প্রতিক শিল্পনীতি ২০১৬ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক শিল্পনীতিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো-

১. **উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার:** শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. **তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার:** সংযোগ শিল্পের বিকাশে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. **কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন:** কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক বীজ প্রজনন, উৎপাদন, বর্ধন ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একই সাথে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. **ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি (SME) শিল্প উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

৫. কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন: কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন এবং এর ক্রমবিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. অর্থকরী শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা: দেশে যেসব প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে বিশেষ করে গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর এবং বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে বিদ্যমান সিলিকন, মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল, ঝিনুক, মুক্তা, প্রবাল, জীবাশ্ম, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদির যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে নতুন নতুন অর্থকরী শিল্প স্থাপন সম্ভব হয়। সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. পণ্যের সংরক্ষণ: বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায় সে লক্ষ্যে হিমায়িত, পাস্তুরিত, কৌটাজাত কিংবা শুষ্ক খাদ্য হিসেবে শিল্পজাত বা প্রক্রিয়াজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন: দেশে ব্যাপকভিত্তিতে সৌরশক্তি ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল গার্বেজ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

৯. শিল্প এলাকা স্থাপন: অধিকতর কাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবিড় শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উপকরণের সহজলভ্যতা এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০. মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন: আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনসহ অধিকতর মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি শিল্পপণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চাৎসংযোগকারী শিল্পপণ্য উৎপাদনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১১. শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগঃ দেশে ইতোমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বেশ কিছু শিল্প-কারখানা বেসরকারি মালিকানায় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব শিল্প-উপখাতে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পপার্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টি: শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টিতে সর্বাত্মক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

১৩. প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি: শিল্পখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৪. আমদানি বিকল্প শিল্পকে উৎসাহ প্রদান: স্থানীয় বাজারে শিল্পপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে অধিকতর শক্তিশালী ও উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৫. বেসরকারিকরণ: রাষ্ট্রীয় খাতের অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত এবং পর্যায়ক্রমে বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার: বন্দর সুবিধা, শক্তিখাত, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এসব খাতে নির্মাণ, পরিচালনা ও স্বত্ব গ্রহণ এবং নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর পদ্ধতিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

১৭. রুগ্ন বা অলাভজনক শিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন: শিল্পক্ষেত্রে অলাভজনক রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় বাজারে রুগ্নশিল্প উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে রুগ্নশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কার্যকর ব্যয় পদ্ধতি প্রয়োগসহ গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮. পরিবেশ উন্নয়ন: শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনে বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য অপসারণ এবং সর্বোপরি দূষণমুক্ত পণ্য উৎপন্ন করার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

১৯. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি: আঞ্চলিক ও উপ-অঞ্চলকে সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০. গবেষণা ও উন্নয়ন: গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে বাজারমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
Government Policy of Industrial Development

২১. বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান: প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২২. এমআইএস (MIS) চালু করা: শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ) সহ একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালু করা এবং এ তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৩. শিল্পোন্নয়নে বিদেশি সংস্থার সাথে চুক্তি: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর বিভিন্ন চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, "শিল্পনীতি-২০১৬' এর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

পটভূমি:

সরকার ও ব্যক্তিমালিকানার যৌথ প্রয়াস নিয়ে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় (Public Private Partnership-PPP) গঠিত হয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করে থাকে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার ও ব্যক্তিমালিক যৌথভাবে উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে।

বাংলাদেশের সরকার ১৯৯৬ সালে থেকে নীতিগতভাৰে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG) জারি করে পিপিপি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করে।

উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) চুক্তি একটি পুরোনো ধারণা। স্বাধীনতার পূর্বে প্রকল্প বিনিয়োগ বাস্তবায়নে এমন অংশীদারিত্ব ছিল। বর্তমানে এর ধারণাগত চিন্তাভাবনার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার পর এ অঞ্চলে পিপিপি'র অধীনে অনেক শিল্প হয়েছে। শিল্পসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভালো ভূমিকা রাখছে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

সংজ্ঞা:

দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership. PPP) বলা হয়। PPP হলো চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। এরূপ অংশীদারিত্ব বা পরিকল্পনা বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে।

ইদানিং পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এগিয়ে চলছে। যেমন— বিদ্যুৎ উৎপাদন, টোল সড়ক ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে যেমন— ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর, সিভিল এভিয়েশন, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর, স্থলবন্দর, রেলওয়ে, সেতু, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি খাতে বেসরকারি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

উদ্দেশ্যসমূহ:

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

১. উন্নয়নের গতিপথকে যৌথ অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিক সুদৃঢ়করণ ও বিনিয়োগকে বর্ধিতকরণ।

২. এ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভবিষ্যতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা।

৩. জনসাধারণকে টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিতকরণ এবং সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।

৪. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫. অর্থ, কর্মের চাহিদা ও যোগানের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করা।

৬. দেশের জনসেবাকে অধিকতর যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে জনকল্যাণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

উদ্দেশ্যসমূহ:

৭. দেশে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা করা

৮. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি ও সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৯. অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অতি জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ ও উন্নয়নে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা।

১০. দীর্ঘমেয়াদি আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১১. ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগকে শক্তিশালী করা এবং যৌথভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি বহন করা।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

পিপিপি অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রকারভেদ:

সরকারি খাত এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে চুক্তির প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা—

১. যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি;

২. মূলধনায়িত চুক্তি;

৩. সেবামূলক চুক্তি;

৪. ব্যবস্থাপনা চুক্তি;

৫. ইজারা চুক্তি,

৬. বিশেষ সুবিধা বা অধিকার চুক্তি।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
Public Private Partnership (PPP)

সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি) প্রকল্পে উন্নয়ন প্রক্রিয়া

১. এখন দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সাধারণভাবে সরকার একদিকে নিজের ইচ্ছামতো অবকাঠামোগত অথবা অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পকে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে, বেসরকারি সেক্টরের জন্য শুধু অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফার সংস্থান করার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

২. যেকোনো প্রকল্পে অর্থায়ন দুইভাবে হতে পারে। যথা: সরকারি অর্থায়নে গঠিত সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বেসরকারি অর্থায়নে গঠিত বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প। সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন, মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত সরকার নিজেই নিয়ে থাকে। আবার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এত বড় অঙ্কের অর্থায়ন প্রায় অসম্ভব। তাই এসব প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা থেকে ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব Public Private Partnership (PPP)

পিপিপির সুবিধা-অসুবিধা: নিচে পিপিপির সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো—

ক. সুবিধা (Advantages)

১. প্রকল্পের সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে ব্যয়ের পরিমাণকে সমন্বয় সাধন করা।

২. সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে অর্থের মূল্যের প্রাধান্যতা প্রকাশ করা যায় ।

৩. পিপিপি-র কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ বেসরকারি অংশীদার নিজের স্বার্থেই সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করে থাকে।

৪. প্রকল্পের সময় ও ব্যয়ের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব Public Private Partnership (PPP)

খ. অসুবিধা (Disadvantages)

১. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য অধিক লেনদেন ব্যয় করতে হয়, যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য কঠিন হয়।

২. সরকারি কর্মকর্তা যারা চুক্তির সাথে জড়িত, তাদের দৌরাত্ম্যের কারণে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসতে চায় না

৩. ব্যবসা ও চুক্তির বিষয়ে সরকারি খাত উদাসীন থাকে।

৪. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য মেয়াদভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষে বিষয়টি রাজি করানো কঠিন কাজ।

৫. সীমিত নমনীয়তা যা বাংলাদেশের মতো দেশে বড় সমস্যা হয়।



জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থানসমূহ





জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থানসমূহ
Population, Human Resource and Self-employment

মানুষ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর মানুষের সমষ্টিই হলো জনসংখ্যা।

জনসংখ্যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। যেমন— মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)।

কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় বেশি হয় তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

আবার এ জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে রূপান্তর করা হয়, তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

এ কারণে জনসংখ্যা যেমন দেশের জন্য অভিশাপ তেমনি আশীর্বাদও বটে।

কোনো দেশের জাতীয় আয় প্রধানত প্রকৃতি ও মানুষের ওপর নির্ভরশীল।

কেবল প্রাকৃতিক সম্পদই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না, এ পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব পূরণের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

তাই দক্ষ জনশক্তি বা মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার।

***Human Development Index (HDI)**

জনসংখ্যার পরিমাপ
Measurement of Population

এ পৃথিবীতে জনসংখ্যার ইতিহাস খুব প্রাচীন। একটি দেশের জনসংখ্যার প্রভাব উক্ত দেশের জনসংখ্যার কাঠামো তথ্য জনসংখ্যার গঠন, আয়তন, আকার ও পেশাগত বন্টনের ওপর নির্ভর করে।

আর এসব স্তরের পরিমাপকেই জনসংখ্যার পরিমাপ (Measurement of Population) বলে।

অর্থাৎ **যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো স্থানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে জনসংখ্যার পরিমাপ বলা হয়।**

জনসংখ্যার পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর তথ্যসমূহ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির নীতি নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ
Measurement of Density of Population

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশের প্রতি বর্গমাইল বা বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে বোঝায়।

কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে ঐ দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

নিচের সূত্রের সাহায্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়, $DP = \frac{TP}{TA}$

এখানে,

DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population)

TA= মোট আয়তন (Total Area)

সুতরাং **জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে মোট জনসংখ্যার সাথে মোট আয়তনের অনুপাতকে বোঝায়।**

কোনো দেশের ঘনত্ব দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জমির উর্বরতা, শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ও পরিবহণ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ
Measurement of Density of Population

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ

২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো ১৬,২৭,৬৯,৭১০ জন এবং আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকি:মি।

এ তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে-

জনসংখ্যার ঘনত্ব সূত্র, $DP = \frac{TP}{TA}$

সুতরাং, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব = $\frac{\text{১৬,২৭,৬৯, ৭১০}}{\text{১,৪৭,৫৭০}}$ = ১১০৩ জন

অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০৩ জন লোক বাস করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ
Cause of High Density of Population in Bangladesh

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। **১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৫৫ জন।** কিন্তু ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। **বর্তমানে (২০১৯) প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১১০৩ জন।** অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী —

১. ভূ-প্রকৃতি: **জনসংখ্যার ঘনত্ব ভূ-প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।** পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে সমতল ভূমিতে মানুষের জীবিকা নির্বাহের অনুকূল পরিবেশ, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা, জীবনধারণের ব্যয় কম বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল, তাই এখনাকার জনসংখ্যাও অধিক ঘনবসতিপূর্ণ।

২. জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় এ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা কম বয়সেই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে এবং **তাদের প্রজনন ক্ষমতা শীতপ্রধান দেশের তুলনায় বেশি থাকে**। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ
Cause of High Density of Population in Bangladesh

৩. জন্মনিয়ন্ত্রণে অনীহা: সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে গণ্য করা হয়। এজন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ এদেশের সাধারণ মানুষের নিকট এখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এর ফলে বাংলাদেশে জন্মহার তেমন কমানো যাচ্ছে না।

৪. ভূমির উর্বরতা: বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল গঙ্গাবিধৌত পলল সমভূমি দ্বারা গঠিত। পলিযুক্ত সমভূমি কৃষি কাজের জন্য অধিক উপযোগী বলে এদেশে ফসলের উৎপাদন বেশি হয়, যার ফলে প্রত্যেকটি কৃষি পরিবার অধিক ছেলে সন্তান কাম্য মনে করে। আর এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

৫. পুত্র সন্তান কামনা: বাংলাদেশে মূলত পুরুষশাসিত সমাজ বিদ্যমান। ফলে সবাই পুত্র সন্তান কামনা করে। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের আশায় অধিক সন্তান হয়ে পড়ে। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।।

৬. খাদ্যে শ্বেতসারের আধিক্য: খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্বেতসারের আধিক্য থাকলে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সন্তান জন্মদানের উপযোগী হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ
Cause of High Density of Population in Bangladesh

৭. শিল্পায়ন: যেসব অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে ঐসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়। এজন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি। এছাড়া নাগরিক সুবিধা বেশি থাকার কারণে এসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে।

৮. বহুবিবাহ প্রচলিত: বহুবিবাহ প্রচলিত আইনের প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। এদেশের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থরা একাধিক বিবাহ করাকে আর্থিক সচ্ছলতা ও পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করে। আর এ কারণে জন্মহারও অধিক হয়।

৯. জন্ম ও মৃত্যুহার: বাংলাদেশে মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার অনেক বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

১০. জীবনযাত্রার নিম্নমান: বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। যার ফলে সন্তানসন্ততি প্রতিপালনের খরচ খুবই কম। সুতরাং অল্প বয়সে বিয়ে করে অধিক সন্তান জন্ম দিতে কারো তেমন আপত্তি থাকে না।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ
Cause of High Density of Population in Bangladesh

১১. নিরাপত্তা: যেসব অঞ্চলে জানমালের নিরাপত্তা বেশি সেখানে লোকবসতি বেশি। বাংলাদেশ সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা লাভের সুযোগ বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

১২. বাল্যবিবাহ: এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো বাল্যবিবাহ । এদেশের ছেলেমেয়েরা অল্পবয়সে বিবাহ করে, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়।

১৩. চরম দারিদ্র্য: সাধারণত দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ডি ক্যাস্টো তার বিখ্যাত “Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৯৭৬ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরাও ক্যাস্টোর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে চরম দরিদ্রতা বিরাজমান থাকায় জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত এসব কারণই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার জন্য দায়ী। তাই বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

একটি দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার সাংখ্যিক পরিমাপকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে। এসব নির্ধারকের সাহায্যে কোনো দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাত্ত বা তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায়। এসব নির্ধারকসমূহের মধ্যে জীবনযাত্রার মান, রয়েছে জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিট অভিবাসন। এ সব ছাড়াও রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, দেশের আয়তন, অর্থনৈতিক উন্নতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

জন্মহার: Birth rate

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে সে দেশের জন্মহার বলে। কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে গুণ করলে ঐ বছরের জন্মহার পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত উপায়ে একটি দেশের জন্মহার নিরূপণ করা হয়—

$$\text{জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

উদাহরণ:

যদি ১ বছরে কোনো দেশে জীবিত শিশুর সংখ্যা ৩০ লক্ষ হয় এবং মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হয় তাহলে ঐ দেশে প্রতি হাজারে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে—

জন্মহার $= \frac{৩০০০০০০}{১০০০০০০০০} \times$ ১০০০ জন = ৩০ জন।

অর্থাৎ কোনো দেশের জন্মহার ৩০ জন হলে ঐ দেশে নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১০০০ জনে ৩০ জন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

মৃত্যুহার: Death Rate

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে সে দেশের মৃত্যুহার বলে।

কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে ঐ বছরের মৃত্যুহার পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে মৃত্যুহার নিরূপণ করা যায়—

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

উদাহরণ:

যদি একটি দেশে ১ বছরে মোট ১৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এবং মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হয় তাহলে ঐ দেশে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার হবে-

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{১৫০০০০০}{১০০০০০০০০} \times ১০০০ \text{ জন} = ১৫ \text{ জন।}$$

অর্থাৎ কোনো দেশের মৃত্যুহার ১৫ জন হলে ঐ দেশে নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১০০০ জনে ১৫ জন লোক মৃত্যুবরণ করে জন্মহার যখন মৃত্যুর হারকে অতিক্রম করে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উন্নত দেশে জন্মহার < মৃত্যুহার না হলেও জন্মহার = মৃত্যুহার হয়ে থাকে।

আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার > মৃত্যুহার হয় যা অধিক জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার: Normal Growth Rate of Population

প্রতি হাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারকে সাধারণত শতকরা হার হিসেবে দেখানো হয়। সূত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিরূপণ করা যায়-

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

উদাহরণস্বরূপ, জন্মহার ৩০ এবং মৃত্যুহার ১৫ হলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ-

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{৩০ - ১৫}{১০০০} \times ১০০ = ১.৫$$

বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১.৭%। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এ হার ২% এর অধিক এবং উন্নত দেশগুলোতে এর হার গড়ে ০.৬% মাত্র।

তাৎপর্য: জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের মাপকাঠি।

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণাত্মক হলে হ্রাস পায়।

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: Growth Rate of Population

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের সাথে দেশান্তরের শতকরা হার বিয়োগ করে যে হার পাওয়া যায়, তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

এক দেশের মানুষ যেমন বিদেশে যেতে পারে আবার বিদেশি নাগরিকও সেদেশে আগমন করতে পারে ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপণের জন্য দেশের জন্ম ও মৃত্যুহারের সঙ্গে বহিরাগমন ও বহির্গমন হারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, জন্মহার ও বহিরাগমন হারের সমষ্টি থেকে মৃত্যুহার ও বহির্গমন হারের সমষ্টিকে বিয়োগ করে ঐ বিয়োগ ফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করে এবং ১০০ দিয়ে গুণ করে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়।

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{(\text{জন্মহার} + \text{বহিরাগমন হার}) - (\text{মৃত্যুহার} + \text{বহির্গমন হার})}{১০০০} \times ১০০$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

উদাহরণ:

ধরা যাক, কোনো দেশের জন্মহার ৩০, মৃত্যুহার ১৫, বহিরাগমন হার ২ এবং বহির্গমন হার ৪ হয় তবে ঐ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে নিম্নরূপ –

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{(৩০+ ২) - (১৫+ ৪)}{১০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{৩২ - ১৯}{১০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{১৩}{১০০০} \times ১০০$$

$$= ১.৩$$

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
Determinants of Population

সারণি: বাংলাদেশে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার		
সাল	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৭৪	৭.১৪	২.৭১
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১২.৯২	১.৪৮
২০১১	১৫.১৭	১.৩৭
২০১৯	১৬.৩৭	১.৩৭

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি
Zero Population Growth

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো জন্মহার ও মৃত্যুহারের সমান অবস্থা। সুতরাং,

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পরিমাণ সমান হলে তাকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth) বলা হয়।

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, $ZPG = CBR - CDR = 0$

যেখানে, ZPG = শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth)

CBR = স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate)

CDR= স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate)

সুতরাং, একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি জানার জন্য উপরের নির্ধারকসমূহ জানা অপরিহার্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল ।

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি
Zero Population Growth

কোনো বছরে মোট জীবন্ত শিশু জন্মের সংখ্যা এবং সেই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যার অনুপাতকে স্থূল জন্মহার বলে।

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{এক বছরে জীবিত শিশুর সংখ্যা}}{\text{এক বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

স্থূল মৃত্যুহার - প্রতি হাজার জন মানুষ পিছু একবছরে যত জন লোক মারা যায়, তাকে স্থূল মৃত্যুহার বলে।

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মৃতের সংখ্যা}}{\text{এক বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

নিট অভিবাসন
Net Immigration

অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে নির্দেশ করে।

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোট আগমন ও মোট নির্গমনের পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে।

জীব পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এ উপাত্ত পাওয়া যায়।

নৌবন্দর, বিমান বন্দর ও স্থল পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গমনকারী সকল যাত্রীদের পরিসংখ্যান রাখা হয়।

তখন পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ থেকে তথ্য পাওয়া যায়।

যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বহিরাগতের সংখ্যা এবং স্থায়ীভাবে বহির্গামীর সংখ্যা E এবং

জনসংখ্যা P হয় তবে উক্ত স্থানের নিট অভিবাসন হার নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় $= \frac{I-E}{P} \times$ ১০০০

নিট অভিবাসন
Net Immigration

উদাহরণস্বরূপ, যদি মোট জনসংখ্যা P = ২৩.৫৭ মিলিয়ন

= ২৩.৫৭ × ১০,০০,০০০

= ২,৩৫,৭০,০০০ জন।

যদি স্থায়ীভাবে বহিরাগত সংখ্যা ৫,৮০,০০০ জন এবং বহির্গামীর সংখ্যা = ২,৫০,০০০ জন হয় তবে

নিট অভিবাসনের হার$= \frac{I-E}{P} \times$ ১০০০

$= \frac{\text{৫,৮০,০০০} - \text{২,৫০,০০০}}{\text{২,৩৫,৭০,০০০}} \times$ ১০০০

=১৪ জন প্রতি হাজারে

মন্তব্য: দেশটির স্থায়ীভাবে বহিরাগমনের হার বহির্গমনের হারের চেয়ে বেশি। উন্নত দেশে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে এ হার বেশি।

নিট অভিবাসন
Net Immigration

অন্য দেশ থেকে কোনো দেশে চলে আসাকে বহিরাগমন বলে।

দেশের বাইরে অর্থাৎ অন্য দেশে লোকজন চলে গেলে তাকে বহির্গমন বলে।

Migration = movement of people from one place to another
***migration includes 2 things: immigration and emigration*

- **Immigration** = **coming to** live permanently in a foreign country

"I immigrated to Canada"

- **Emigration** = **leaving** one's home country permanently

"I emigrated from Sri Lanka."

Push and pull factors = factors/issues that cause people to migrate

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ
Cause of High Birth Rate in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জন্মহার অনেক বেশি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজারে জন্মহার হলো ১৫ জন, কানাডায় ১৬ জন, জাপানে ১৪ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ জন। সেখানে বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার হলো প্রতি হাজারে ১৮.৫ জন। নিচে বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

১. ভৌগোলিক পরিবেশ: বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। এরূপ জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। ফলে তারা অল্প বয়সেই বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেয়।

২. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ: এদেশে নানা কারণে সন্তান-সন্ততিদেরকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়। ফলে সন্তান উৎপাদন বেশি হয়। বাল্যবিবাহ ছাড়াও এ দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তাই পুরুষরা একই সময়ে বহুবিবাহ করতে পারে। বস্তুত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা আমাদের দেশে উচ্চ জন্মহারের অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ
Cause of High Birth Rate in Bangladesh

৩. শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাই তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। **বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার হলো ৭২.৩%।** উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ লোক অপরিণামদর্শী। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা তারা বোঝে না। তাই তারা অধিক সন্তানের জন্মদানকে ক্ষতিকর মনে করে না।

বাংলাদেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ % ভাগ। ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ । ইত্তেফাক

৪. নারী শিক্ষার অভাব: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যেদেশে নারী শিক্ষার হার যত বেশি, সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত কম। এর কারণ এই যে–

১. শিক্ষিতা মহিলাদের পড়াশোনায় অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় সাধারণত তাদের দেরিতে বিয়ে হয়।

২. শিক্ষিতা কর্মজীবী মহিলাদেরকে সংসারকর্মের বাইরেও ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তারা কম সন্তানে আগ্রহী।

৩. শিক্ষিতা মহিলারা জীবনযাত্রার মান পরিবারের সুখ-সুবিধা, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ প্রভৃতি ব্যাপারে সচেতন বলে তারা কম সন্তান কামনা করে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এটি আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ
Cause of High Birth Rate in Bangladesh

৫. জীবনযাত্রার নিম্নমান: বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। তাই সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় খুব বেশি নয় বলে অধিক সন্তান জন্ম দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না।

৬. সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার: শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অদৃষ্টবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে অধিক জন্মহারের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৭. দারিদ্র্য: বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। সাধারণত দরিদ্র জনগণ নিজেদের সন্তানদের উচ্চ মান সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারে না। তাই তারা অপরিকল্পিতভাবে অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

৮. খাদ্যাভ্যাস: বাংলাদেশের লোকেরা বেশি পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, আমিষ জাতীয় খাদ্য খুবই কম ভক্ষণ করে। আর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে প্রজনন ক্ষমতা কমে। তাই অতিরিক্ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণের কারণে বাংলাদেশে অধিক জন্মহারের সৃষ্টি হয় ।

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ
Cause of High Birth Rate in Bangladesh

৯. চিত্তবিনোদনের অভাব: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগণের চিত্তবিনোদনের আধুনিক কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। ফলে গ্রামের দরিদ্র লোকদের জন্য আর কোনো চিত্তবিনোদনের সুযোগ না থাকায় তারা স্ত্রীর সঙ্গ বেশি কামনা করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জন্মহার বেশি হয়।

১০. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা: সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে বাংলাদেশে এখনো পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়নি। আবার অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণকে ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করে। ফলে জন্মহার দ্রুতই বেড়ে চলছে।

এসব কারণের ফলে বাংলাদেশের জন্মহার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ
Cause of High Death Rate in Bangladesh

বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়ার এখানে অন্যান্য দেশ থেকে মৃত্যুহারের পরিমাণ অধিক। **১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১৩ জন। বর্তমানে এ বিশাল মৃত্যুহার কমে দাঁড়িয়েছে ৫.১ ভাগে।** কিন্তু বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এদেশে মৃত্যুহার অনেক বেশি। বাংলাদেশের এরূপ উচ্চ মৃত্যুহারের কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. দরিদ্রতা: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। দারিদ্র্যের কারণেই তারা উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে বাংলাদেশের লোকেরা অনাহারে, অর্ধাহারে, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান প্রভৃতি কারণে সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২. সুচিকিৎসার অভাব: বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের উন্নত দেশের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের। অধিকাংশ জনগণ উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে যে সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল রয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের নাগালের বাইরে। অশিক্ষিত গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার গ্রাম এলাকায় চিকিৎসার একমাত্র আশা-ভরসা। এর ফলে বহু লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ
Cause of High Death Rate in Bangladesh

৩. নিম্ন জীবনযাত্রার মান: দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক খুবই নিম্নমানের জীবনযাপন করে। জনগণ অত্যধিক দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করতে পারে না এবং চিকিৎসার ওষুধ ও পথ্য যোগাতে অক্ষম হয়। অর্ধাহারে, অনাহরে এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকে বলে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায় এবং অকালে মৃত্যুবরণ করে।

৪. পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব: বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র বলে তারা পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। আর এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশের জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৫. নারী মৃত্যুহার: বাংলাদেশের উচ্চ মৃত্যুহারের মধ্যে নারী মৃত্যুহার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। নারীদের অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার, প্রসবকালীন শিক্ষিত ধাত্রীর অভাব প্রভৃতি কারণে অনেক নারীই মৃত্যুবরণ করে। এ সকল কারণের জন্য বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক বেশি।

বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমানোর উপায়সমূহ
Ways of Reduction of High Death Rate in Bangladesh

বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমাতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত জনগণের মধ্যে একটি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে হবে। যেসব উপায়ে বাংলাদেশের উচ্চ মৃত্যুহার কমানো সম্ভব সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. সচেতনতা বৃদ্ধি,
২. দারিদ্র্য দূরীকরণ,
৩. উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা,
৪. বাল্যবিবাহ রোধ,
৫. পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ,
৬. নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা,
৭. শিশু মৃত্যুহার কমানো,
৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন,
৯. নারী মৃত্যু হার কমানো,
১০. যানবাহন দুর্ঘটনা রোধ ইত্যাদি ।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Population and Economic Development

একটি দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যা একাধারে যেমন উন্নয়নের পথে সহায়তা করে তেমনি প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে।

কোনো দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আবার এ জনসংখ্যাকেই যদি জনসম্পদে অর্থাৎ দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এমন অনেক দেশ আছে যাদের জনসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নত।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন।

তাই জনসংখ্যা যেমন দেশের উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ তেমনি অভিশাপও বটে। দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তি দ্বারা সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

অর্থাৎ একমাত্র জনসংখ্যাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Population and Economic Development

দেশে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি সম্পদের তুলনায় জনশক্তি কম থাকে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী, কোনো দেশের জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইতিবাচক। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের সম্প্রসারণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

অপরদিকে, কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি সে দেশের সম্পদের তুলনায় অধিক হয় তবে ঐ জনসমষ্টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, খাদ্য ঘাটতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি বহুমুখী চলমান প্রক্রিয়া, যার দ্বারা জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ে এবং সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানও বাড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে বোঝানো হয়।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Population and Economic Development

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে অধিক উৎপাদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টনের পরিবর্তন নির্দেশিত হয়।

জনসংখ্যার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক হলো— জনসংখ্যা অধিক হলে তা উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে, আর কাম্য হলে তা উন্নয়নে সহযোগী। সুতরাং **জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার প্রভাব:

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই-ই হতে পারে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Population and Economic Development

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব:

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. বেকার সমস্যা;
২. সঞ্চয় হ্রাস;
৩. বিনিয়োগ ও মূলধন হ্রাস;
৪. আয়-বন্টনে অসমতা;
৫. সামাজিক অস্থিরতা;
৬. মাথাপিছু আয় হ্রাস;
৭. খাদ্য ঘাটতি;
৮. পরিবেশ বিপর্যয়;
৯. মুদ্রাস্ফীতি;
১০. অদক্ষ মানবসম্পদ;
১১. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি;
১২. কৃষির ওপর বিরূপ প্রভাব;
১৩. নিম্ন জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Population and Economic Development

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যার ইতিবাচক প্রভাব:

জনসংখ্যা কেবল একটি দেশের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ বা সম্পদও বটে। কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। নিচে জনসংখ্যার ইতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করা হলো—

১. শ্রমের যোগান;
২. মূলধনের বিকল্প উৎস;
৩. মানবসম্পদ রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
৪. বাজারের বিস্তৃতি;
৫. কলকারখানায় শ্রমবিভাগ প্রবর্তন;
৬. বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ।

এভাবে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি, পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি, বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
Effects of Population Growth

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দুষ্প্রাপ্যতা: কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. নিম্ন মাথাপিছু আয়: কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। **বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার।** উন্নত দেশের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। **দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলার হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা বছরে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮৭৩ টাকা। ১৭ মে ২০২১, প্রথম-আলো।**

৩. বেকারত্ব: বাংলাদেশে সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক বলে **মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বেকার** এবং **কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের শতকরা ২৫ ভাগ প্রচ্ছন্ন বেকার।**

৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা: এদেশে প্রায় ১৬ কোটি ৩৭ লাখ লোকের বসবাস।` জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য সে তুলনায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর তার বিশাল চাপ পড়ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
Effects of Population Growth

৫. স্বাস্থ্য: অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও নাজুক অবস্থা। পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতাল নেই, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার। যারা আছে তারা তত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। সুতরাং, চিকিৎসার অভাবে আমাদের রোগাক্রান্ত ও নির্জীব জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

৬. খণ্ড-বিখণ্ড জমি: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের জমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে। ফলে কমসংখ্যক জমি চাষ করে তারা লাভের মুখ দেখছে না, তাই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জমির এ অবস্থায় কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৭. জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার: বাংলাদেশে প্রতি হাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অত্যধিক। **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে শতকরা ১.৩৭ ভাগ।**

৮. আয়তন: বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। অথচ লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৩৭ লাখ। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় এত কম জায়গায় অধিক লোক পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
Effects of Population Growth

৯. খাদ্যঘাটতি: বাংলাদেশে প্রকট খাদ্যঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি) সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৩৮.৩৩ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। খাদ্যঘাটতির এ কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা।

১০. বাসস্থানের সমস্যা: বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থানের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। আবার চরম দারিদ্র্যের কারণে অনেকের পক্ষে গৃহনির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না।

১১. মূলধন গঠনের হার হ্রাস: বাংলাদেশের জনগণ খুবই দরিদ্র। ভরণ-পোষণের পর জনগণের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে সীমিত আয়ের লোকদের সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার কম।

১২. শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত: ক্রমবর্ধমান জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক খাদ্য আমদানি করতে হয়। একমাত্র আমদানিতেই বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হয়। ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
Effects of Population Growth

১৩. পরনির্ভরশীলতা: এদেশের পরনির্ভরশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য অতিমাত্রায় বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এরূপ পরনির্ভরশীলতা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। জনাধিক্যের কারণে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব ক্ষতিকারক। এসব ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে।

জনসংখ্যা তত্ত্ব
Theory of Population

জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাস খুব প্রাচীন। মানব সভ্যতার প্রায় সকল মহৎ চিন্তাবিদই জনসংখ্যা বিষয়ে কিছু মতবাদ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে **জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত রয়েছে।** যেমন-

১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব;

২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

নিচে এ দুটি তত্ত্ব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো—

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

থমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus) (১৭৬৬ – ১৮৩৪) রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং জনসংখ্যা তত্ত্বের ক্ষেত্রে একজন প্রভাবশালী ব্রিটিশ ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ছিলেন।

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তার 'An Essay on the Principle of Population' বা 'জনসংখ্যার নীতির ওপর প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে জনসংখ্যা সমন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি তার নামানুসারে 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

এ তত্ত্বের অনুমিত শর্তসমূহ হলো—

১. মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু এর যোগান সীমিত,

২. নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ প্রয়োজনীয়, নিয়ন্ত্রিত এবং শাশ্বত,

৩. শিশুধারণ এবং জীবনযাত্রার মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ,

৪. কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য,

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

৫. জমি ও উৎপাদন ক্ষমতা স্থির,

৬. কৃষিই একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও

৭. উৎপাদন প্রযুক্তি স্থির।

তার মতে, খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ কখনো শেষ হবে না।

আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে এবং একই জমি থেকে ক্রমাগতভাবে উন্নত মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব হবে।

যদি দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক নিরোধ এবং বিলম্ব বিবাহ, নৈতিক সংযম প্রভৃতির মতো প্রতিরোধমূলক নিরোধ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিহত না হয়, তবে সময়ের গতিতে যেকোনো মুহূর্তে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, **উত্তর আমেরিকায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, আবার কোথাও ১৫ বছরেও দ্বিগুণ হয়েছে।**

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ... এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,...।

ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় খাদ্যোৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না।

ম্যালথাসের মতে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে পারে না। এর ফলে এমন এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় এবং দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

তত্ত্বটি সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা:

বছর	১	২৫	৫০	৭৫	১০০	১২৫	১৫০	১৭৫	২০০	-	৩০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১১২	২৫৬	-	৪০৯৬
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	-	১৩

ম্যালথাস ২৫ বছর সময়কে একক হিসেবে গণ্য করেন। সূচিতে দেখা যায়, প্রথম ২৫ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বাড়ে একইভাবে। কিন্তু ২৫ বছর পর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন- ১০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ৫ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ১৬ গুণ। ২০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ৯ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ২৫৬ গুণ। ৩০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ১৩ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ৪০৯৬ গুণ।

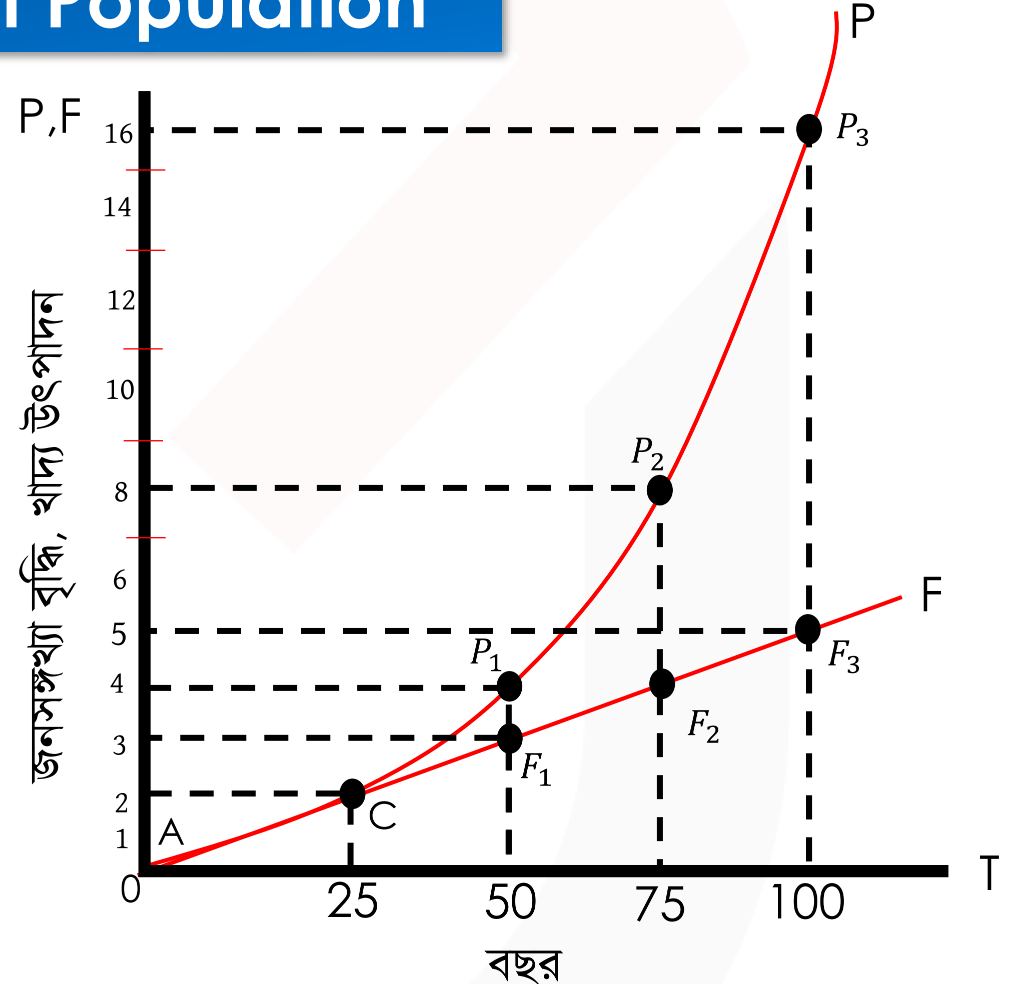
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

চিত্রের সাহায্যে তত্ত্বের ব্যাখ্যা:

চিত্রে ভূমি অক্ষে সময় (T) বছর এবং লম্ব অক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (P) এবং খাদ্য উৎপাদন (F) দেখানো হলো।

প্রতি ২৫ বছর পর পর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে যা A, C, F_1 ,F_2 ও F_3 বিন্দুর সংযোগে প্রাপ্ত AF রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, প্রতি ২৫ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে যা চিত্রে A, C, P_1 ,P_2 ও P_3 বিন্দুর সংযোগে প্রাপ্ত AP রেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

চিত্রে ১০০ বছর সময়ের মধ্যে AF এবং AP রেখার মধ্যে CF_3P_3, ব্যবধান সৃষ্টি হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিকের জন্য এ ব্যবধান হয়। **যখন এ ব্যবধান বেশি হয় তখন খাদ্যের অভাব হয়।**



চিত্র: খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

ম্যালথাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে দুইটি উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন-

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Check) ও

খ. প্রাকৃতিক নিরোধ (Positive Check)।

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: বিলম্বে বিবাহ, যৌন সংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ, কৌমার্য (কুমারীত্ব; অবিবাহিত জীবন) অবলম্বন ইত্যাদি পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। ম্যালথাস বলেছেন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকলে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দেবে।

খ. প্রাকৃতিক নিরোধ: মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়। এসব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে ম্যালথাস দেশের জনগণকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population

ম্যালথাসীয় চক্র (Malthusian Cycle) :

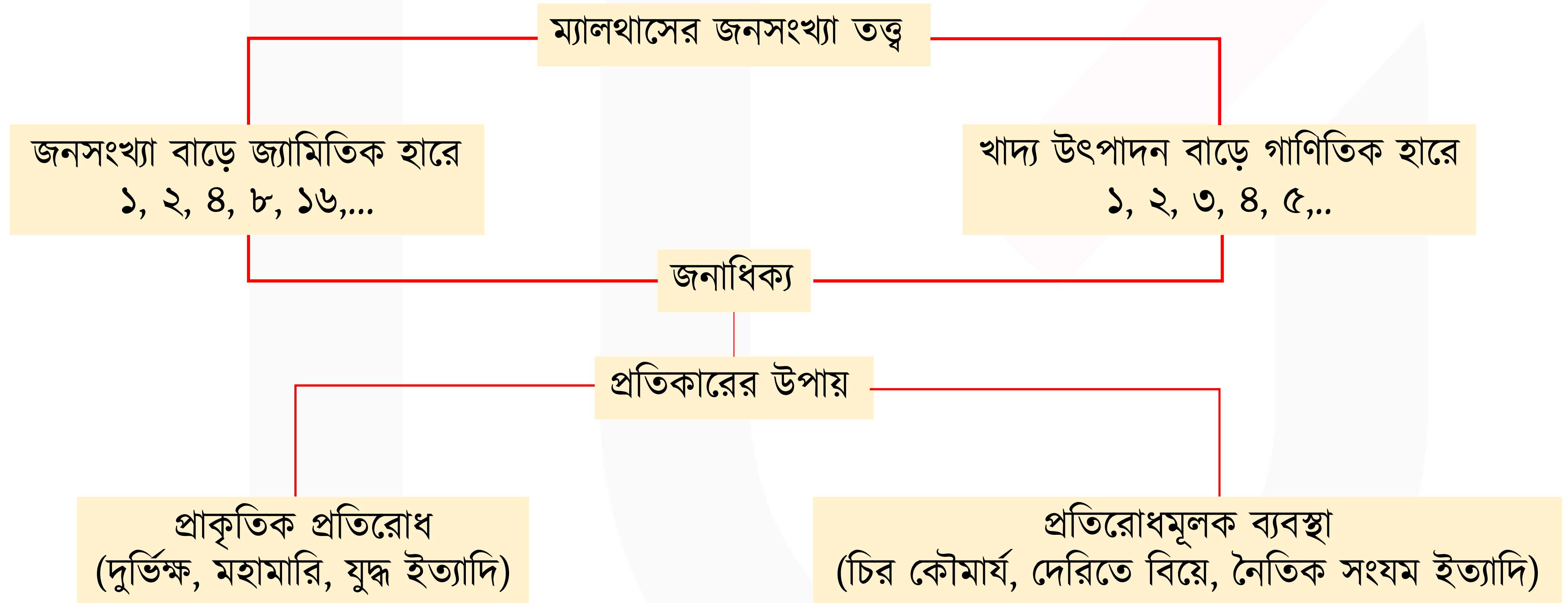
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি চক্রাকার চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো: ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় বলে একে ম্যালথাসীয় চক্র নামে অভিহিত করা হয়। পাশের চিত্রে দেখা যায়,

প্রথমে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে অচিরেই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে জনাধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় পুনরায় প্রাকৃতিক প্রতিরোধ কার্যকরী হয় এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এ ভারসাম্য অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ফলে জনাধিক্য এবং প্রাকৃতিক প্রতিরোধের চক্রাকার আবর্তন চলতেই থাকে। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি ছকে দেখানো হলো



চিত্র: ম্যালথাসিয়ান চক্র

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
Malthusian Theory of Population



ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা
Criticism of Malthusian Theory

আধুনিককালে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটিকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নিচে এ তত্ত্বের সমালোচনার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো:

১. ঐতিহাসিক অসত্যতা: সমসাময়িক সময়ে এ তত্ত্বটি কিছুটা সত্য প্রমাণিত হলেও বর্তমানে এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহের জনসংখ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং ম্যালথাসের তত্ত্বটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়।

২. বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী: ম্যালথাস যখন তত্ত্বটি প্রচার করেন তখন সবেমাত্র ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে উন্নত দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা ম্যালথাস অনুধাবন করতে পারেননি। এ কারণে **ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।**

৩. খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হার ভুল প্রমাণিত হয়েছে: ম্যালথাস ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ওপর ভিত্তি করে খাদ্যোৎপাদনে গাণিতিক হারের মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে নতুন উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করেছে তাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে।

ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা
Criticism of Malthusian Theory

৪. জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারণা সঠিক নয়: ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। পাশ্চাত্যের বহু উন্নত দেশ বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৫. জনসংখ্যার সাথে শুধু খাদ্যদ্রব্যের তুলনা: ম্যালথাস জনসংখ্যাকে কেবল খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু তিনি খাদ্য উৎপাদন ছাড়া দেশের অন্যান্য সম্পদের কথা বিবেচনায় আনেননি।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই খারাপ নয়: ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সর্বদাই খারাপ বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ মানবশিশু কেবল ক্ষুধার্ত উদর নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না; সে দুইখানা হাতও নিয়ে আসে এবং এ হাত দুটো খাদ্যোৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। ফলে কোনো কোনো সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা
Criticism of Malthusian Theory

৭. জনসংখ্যা নয় বরং সম্পদের সুষম বণ্টনই মূল সমস্যা: অধ্যাপক সেলিগম্যান -এর মতে, 'জনসংখ্যা কেবলই সংখ্যাগত সমস্যা নয় বরং তা দক্ষ উৎপাদন ও ন্যায়সংগত বন্টনেরও সমস্যা'। বস্তুতপক্ষে জনসংখ্যা যদি দক্ষ হয় এবং রাষ্ট্রের সম্পদ সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগতভাবে বণ্টন করা হয়, তাহলে জনসংখ্যা সমস্যা দেখা দেয় না।

৮. জনসংখ্যার গুণগত দিক উপেক্ষিত: ম্যালথাস-এর নিকট জনসংখ্যার গুণগত দিকটি উপেক্ষিত ছিল। কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা অশিক্ষিত, অদক্ষ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে তা দেশের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আবার ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মঠ হয় তাহলে তা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। ম্যালথাস তার তত্ত্বে জনসংখ্যার এ গুণগত দিকটি বিবেচনায় আনেননি।

সুতরাং, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি তার সময়ে সঠিক তথ্য দিলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের নিকট ম্যালথাসের তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মৌলিক সত্যতা অনস্বীকার্য ।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ
Bangladesh in the Context of Malthusian Theory

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করলে বাংলাদেশে আমরা যেসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই সেগুলো হলো:

১. জনসংখ্যা ও খাদ্য বৃদ্ধি: বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। বর্তমানে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ০.৬৫% ।

২. খাদ্য ঘাটতি: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদন হয় ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

৩. মাথাপিছু জমি: বাংলাদেশে একজন লোকের ভরণ-পোষণের জন্য ১.২ হতে ১.৮০ একর জমির প্রয়োজন। অথচ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমি পরিমাণ ছিল ০.২৮ একর। বর্তমানে ০.২৫ একর।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি দেখা যায়। যা ম্যালথাসের তত্ত্বকে সত্যতা দান করে।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ
Bangladesh in the Context of Malthusian Theory

৫. স্বাস্থ্যহানি: অনাহার, অর্ধাহার, রোগব্যাধি, মহামারি বাংলাদেশের জনগণের নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. জন্ম ও মৃত্যুহার: বাংলাদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অধিক। প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ১৮.৫ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৫.১ জন।

৭. বেকারত্ব: বাংলাদেশে বর্তমান মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বেকার।

৮. জীবনযাত্রার মান: বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় মাত্র ১৯০৯ মার্কিন ডলার।ফলে জীবনযাত্রার মান এখনও নিম্ন। এখানে শতকরা প্রায় ২১.৮ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

ম্যালথাস বর্ণিত জনসংখ্যা সমস্যার সকল লক্ষণই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োগশীলতা বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে লক্ষ করা যায় ।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ
Bangladesh in the Context of Malthusian Theory

জেনে রাখো:

বিভাগ	প্রতিষ্ঠিত	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা ঘনত্ব	বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যাসহ)
ঢাকা	১৮২৯	৩৬,০৫৪,৪১৮	২০,৫৩৯	১,৭৫৫	ঢাকা (৭,০৩৩,০৭৫)
চট্টগ্রাম	১৮২৯	২৮,৪২৩,০১৯	৩৩,৭৭১	৮৪১	চট্টগ্রাম (২,৫৯২,৪৩৯)
রাজশাহী	১৮২৯	১৮,৪৮৪,৮৫৮	১৮,১৯৭	১,০১৫	রাজশাহী (৪৪৯,৭৫৬)
খুলনা	১ অক্টোবর, আ৯৬০	১৫,৬৮৭,৭৫৯	২২,২৭২	৭০৪	খুলনা (৬৬৩,৩৪২)
বরিশাল	১ জানুয়ারি, ১৯৯৩	৮,৩২৫,৬৬৬	১৩,২৯৭	৬২৬	বরিশাল (৩২৮,২৭৮)
সিলেট	১ আগস্ট, ১৯৯৫	৯,৯১০,২১৯	১২,৫৯৬	৭৮০	সিলেট (৪৭৯,৮৩৭)
রংপুর	২৫ জানুয়ারি, ২০১০	১৫,৭৮৭,৭৫৮	১৬,৩১৭	৯৬০	রংপুর (৩৪৩,১২২)
ময়মনসিংহ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	১১,৩৭০,০০০	১০,৫৮৪	১,০৭৪	ময়মনসিংহ (৪০৭,৭৯৮)

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অধ্যাপক অ্যাডউইন ক্যানান, কার স্যান্ডার্স, ডালটন, রবিন্স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের একটি বিকল্প তত্ত্ব প্রচার করেন। এটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো মাথাপিছু আয় যে পর্যায়ে সর্বোচ্চ হয়, জনসংখ্যার আয়তন সে পর্যায়ে কাম্য বা বাঞ্ছনীয় হয়। কাম্য জনসংখ্যা হলো জনসংখ্যার আদর্শ আয়তন।

কে. ই. বোল্ডিং (K. E. Boulding) এর মতে, ‘যে জনসংখ্যার দ্বারা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

১. কল্যাণভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে **কার স্যান্ডার্স (Carr Saunders)** বলেন, 'যে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করে তাই কাম্য জনসংখ্যা।

২. আয়ভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে **অর্থনীতিবিদ ডালটন (Dalton)** বলেন, 'কাম্য জনসংখ্যা হলো তা যা সর্বাধিক মাথাপিছু আয় প্রদান করে।

৩. উৎপাদনভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে **অধ্যাপক রবিনসন্স (Robinsons)** বলেন 'কাম্য জনসংখ্যা সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব করে।'

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা সেখানে উৎপাদন, আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে, কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে।

যদি কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে তাকে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ বলে।

জনসংখ্যার এ আয়তন প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অপ্রতুল এবং এ অবস্থায় শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধাগুলো বিশেষভাবে উপভোগ করা যায় না।

তাই প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয় না।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

আবার জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যখন শ্রমের যোগান বাড়ে, শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর কলাকৌশলের ব্যবহার ঘটে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়, তখন মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে থাকে।

অবশেষে জনসংখ্যা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার করে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। তখন জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ বৃদ্ধি না পাওয়ায় মাথাপিছু আয় কমে যায়। এ পর্যায়ের জনসংখ্যাকে অধিক জনসংখ্যা বলে।

তাই দেখা যায়, নিম্ন বা অধিক জনসংখ্যা কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়।

কেবল **জনসংখ্যার যে আয়তনে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়, তাই হলো কাম্য জনসংখ্যা** ।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

অধ্যাপক ডালটন বলেন, কাম্য জনসংখ্যা হলো তা যা সর্বাধিক মাথাপিছু আয় প্রদান করে।

বীজগাণিতিকভাবে:

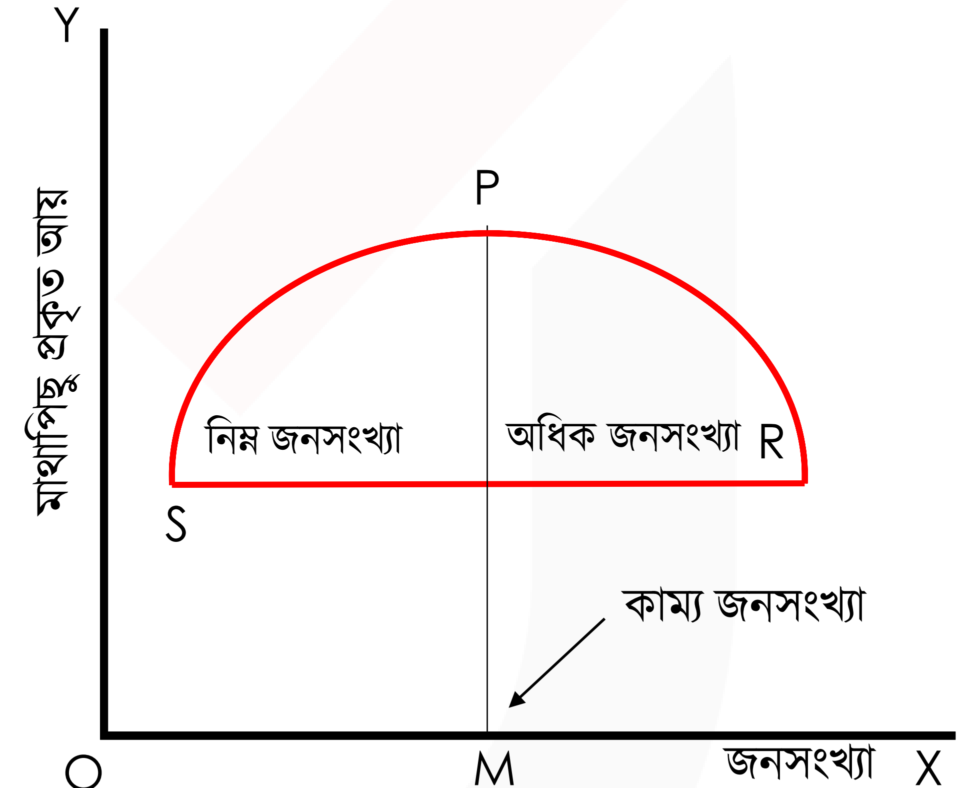
ডাল্টনের সূত্র মতে, $M = \frac{A-O}{O}$, এখানে

M= অসামঞ্জস্যের পরিমাণ,

O = কাম্য জনসংখ্যা,

A = প্রকৃত জনসংখ্যা, তাৎপর্য-

১. M = 0 (শূন্য) হলে দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যার মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই।



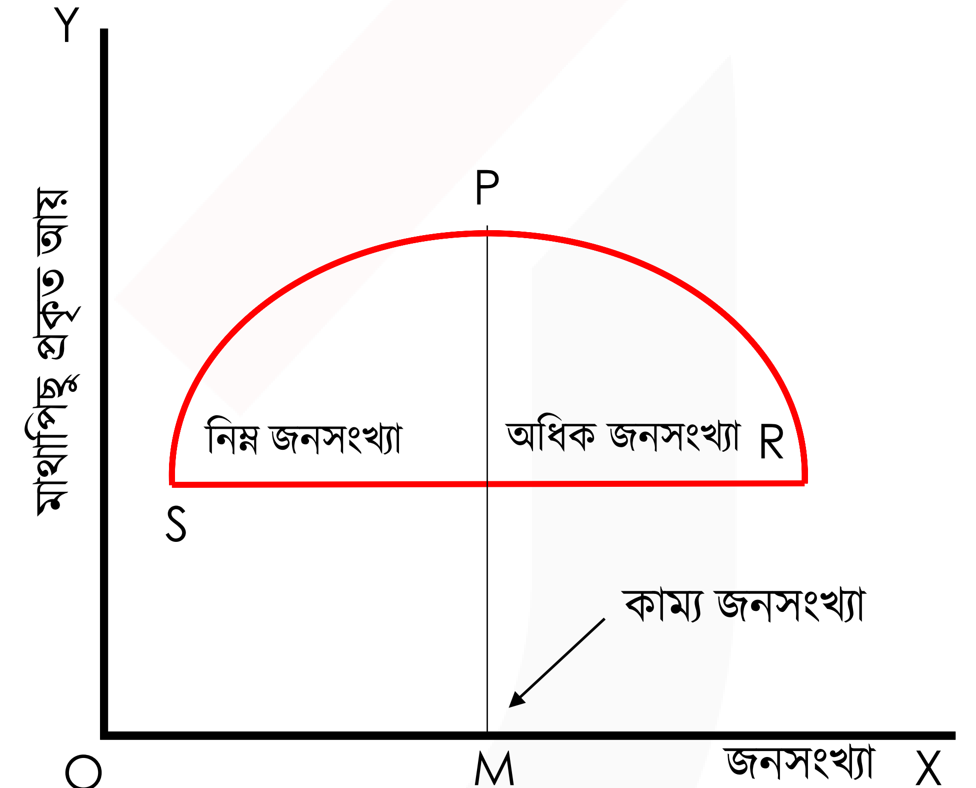
চিত্র: কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

বীজগাণিতিকভাবে:

২. M> 0 (শূন্য) অর্থাৎ ধনাত্মক হলে দেশটি জনবহুল এবং M< 0 অর্থাৎ ঋণাত্মক হলে দেশটিতে জনবিরলতা বিদ্যমান।

কে. ই. বোল্ডিং এর কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ধারণাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড সার্ভে (Alfred Survey) তার 'The General Theory of Population' গ্রন্থে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন।



চিত্র: কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

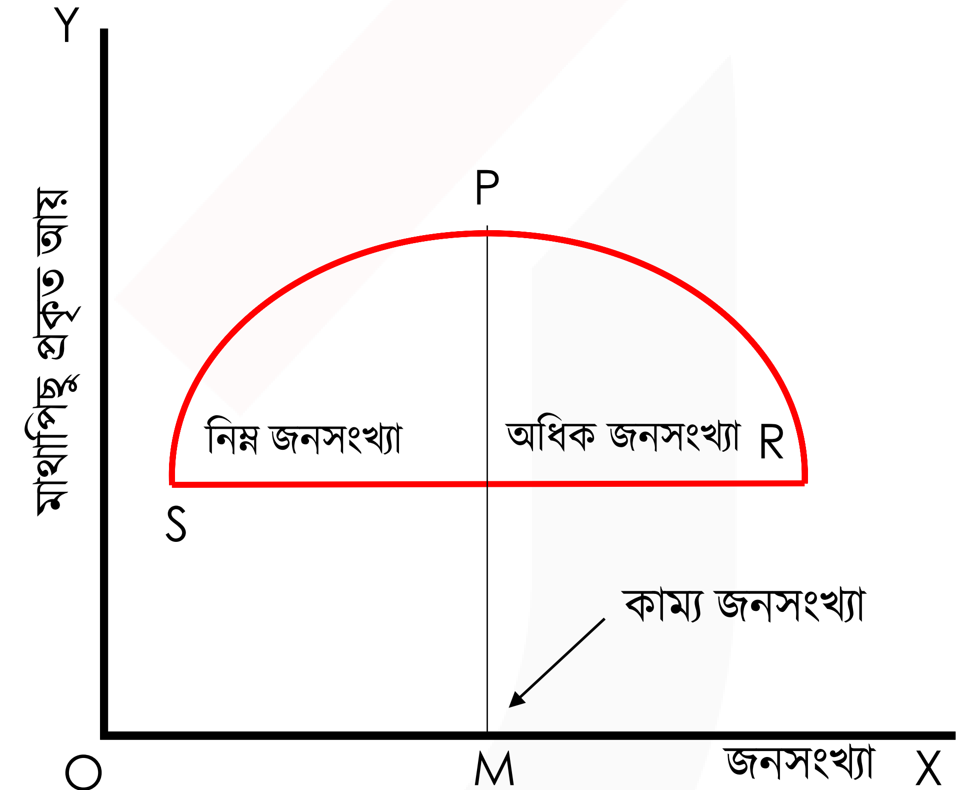
চিত্রে OX অক্ষে জনসংখ্যা এবং OY অক্ষে মাথাপিছু প্রকৃত আয় নির্দেশ করা হয়েছে।

SPR হলো মাথাপিছু প্রকৃত আয়রেখা চিত্র থেকে বোঝা যায়, জনসংখ্যার আয়তন শূন্য (0) থেকে বেড়ে OM স্তরে পৌঁছা পর্যন্ত মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

OM স্তরে জনসংখ্যার প্রকৃত মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়ে MP-তে পৌঁছায়। সুতরাং OM জনসংখ্যাই হলো কাম্য জনসংখ্যা।

চিত্রের S বিন্দুটি নিম্ন জনসংখ্যা এবং R বিন্দুটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা নির্দেশ করছে।

OM-এর পরে জনসংখ্যা আরও বাড়লে মাথাপিছু আয় কমে যায়।

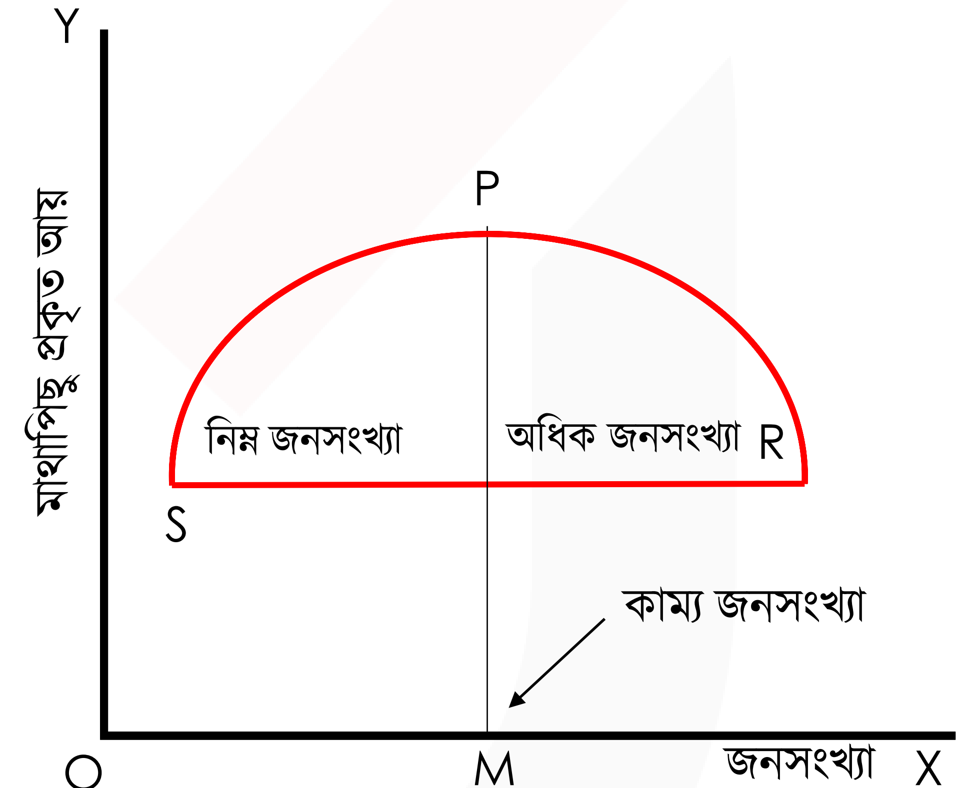


চিত্র: কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

জনসংখ্যার আয়তন OM-এর চেয়ে কম হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং বেশি হলে অধিক জনসংখ্যা বোঝায়।

গাণিতিক ব্যাখ্যা: মাথাপিছু আয়ের উপর জীবনযাত্রার মান (S) নির্ভর করে এবং তা আবার জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে।



চিত্র: কাম্য জনসংখ্যা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
Optimum Population Theory

গাণিতিকভাবে S = f(P)

১. যদি $\frac{dS}{dP} > 0$ হয় অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন ধনাত্মক হয়, তবে জনসংখ্যা কাম্য স্তরের কম হবে।

২. যদি $\frac{dS}{dP} = 0$ হয় অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন শূন্য হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু আয় না বাড়ে, তখন প্রকৃত মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হবে এবং কাম্য জনসংখ্যা স্তর অর্জিত হবে।

৩. যদি $\frac{dS}{dP} < 0$ হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঋণাত্মক হয়, তবে জনসংখ্যা কাম্য স্তরের চেয়ে বেশি হবে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা
Criticism of Optimum Population Theory

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ক্রটিমুক্ত নয়। নিচে তত্ত্বটির ক্রটিগুলো তুলে ধরা হলো:

১. কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় অসুবিধাজনক: তত্ত্বটি দ্বারা কোনো দেশের কাম্য জনসংখ্যার আয়তন নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন প্রভৃতির পরিবর্তন সর্বদাই ঘটে ফলে কাম্য জনসংখ্যার আয়তনও সর্বদা পরিবর্তিত হয়।

২. মৌলিক তত্ত্বের অভাব: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনো তত্ত্বমূলক ধারণা পাওয়া যায় না। কারণ এটি অল্প (কম) সময়ের জন্য প্রযোজ্য। তত্ত্বটিতে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রবণতা, কারণ ও ফলাফল, জন্ম ও মৃত্যুর হার হ্রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই স্থান পায়নি।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা
Criticism of Optimum Population Theory

৩. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে অসমর্থ: এ তত্ত্বে জনসংখ্যার আয়তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামো, দক্ষতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

৪. মাথাপিছু আয়ের সঠিক পরিমাপ অসম্ভব: কোনো দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন পরিমাপ করা বেশ কঠিন। কারণ মাথাপিছু আয়ের উপাত্ত প্রায়ই ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং অনির্ভরযোগ্য হয়।

৫. তত্ত্বটি খাঁটি জড়বাদী: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি জড়বাদীকে গ্রহণ করেছে, যা শুধু সমাজের মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতি পরিমাপ করে। সম্পদের মধ্যে এটি বিস্তৃত নয় বরং এটি কেবল পরম এককের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিছু দোষত্রুটি থাকলেও কাম্য জন্যসংখ্যা তত্ত্বটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। তত্ত্বটি আমাদেরকে ম্যালথাসীয় তত্ত্বের হতাশাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা
Comparison between Malthusian Population Theory and Optimum Population Theory

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যাবে এ দুইটির মধ্যে কোনটি উন্নত। এ দুইটি তত্ত্বের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, ম্যালথাস তার জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তুলনা করেছেন। অন্যদিকে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যাকে দেশের সামগ্রিক সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি গতিশীল। একটি দেশের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট মেয়াদে কী হারে বৃদ্ধি পায় এবং এ বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা এ তত্ত্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নিশ্চল ও স্থির রাজনৈতিক জগতেই প্রযোজ্য, গতিশীল অর্থনীতিতে এর অস্তিত্ব কম।

তৃতীয়ত, ম্যালথাস তার তত্ত্বে জনসংখ্যার পরিমাণগত দিকটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যার সংখ্যাগত দিকটিই শুধু বিবেচনা করা হয়নি, জনসংখ্যার গুণগত দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে ।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা
Comparison between Malthusian Population Theory and Optimum Population Theory

চতুর্থত, ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও বাস্তবজীবনে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যার সাথে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ম্যালথাসের মতে, 'দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও খাদ্যাভাব দেখা দিলেই বোঝা যাবে দেশে জনাধিক্য দেখা দিয়েছে।' কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের অনুসারীরা মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও খাদ্যাভাব না থাকলেও বিভিন্ন কারণবশত দেশে জনাধিক্য দেখা দিতে পারে।

ষষ্ঠত, ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী অতিরিক্ত জনসংখ্যাই সমস্যা। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং নিম্ন জনসংখ্যা দুইটিই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তমত, ম্যালথাস তার জনসংখ্যা তত্ত্বে নৈরাশ্যবাদের কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, দেশের মোট সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই ।

অষ্টমত, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা
Comparison between Malthusian Population Theory and Optimum Population Theory

সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এটি মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখলেই শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে যদি মাথাপিছু আয় বেড়ে চলে, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কাম্য বলে গ্রহণ করা যায়।

অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে ম্যালথাসীয় নৈরাশ্যবাদের পরিবর্তে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেয় ।

জেনে রাখো:

রেভারেন্ড থমাস ম্যালথাস ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ সৃষ্টি করে দুনিয়ার ধ্বংস ডেকে আনবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ৭০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে বলছেন যে, ২০৫০ নাগাদ জনসংখ্যা ৯০০ কোটিতে পৌঁছাবে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, শিল্প বিপ্লবই আমাদেরকে ম্যালথাসের অনুমানকৃত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামো অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যার কাঠামো বিশ্লেষণে বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক বণ্টন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো

১. বয়স অনুসারে জনসংখ্যা:

কোনো জনসংখ্যার বয়স কাঠামো থেকে সে দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা এবং জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অনুপাত জানা যায়। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হয় । **বাংলাদেশে ১৫ বছরের নিচে এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকদেরকে অনুপার্জনক্ষম ও পরনির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হয়।** বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার ৩৬.৭% এবং শ্রমশক্তির হার ৫৭.৮৮%। ফলে দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম লোক কর্মক্ষম। নিচে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বণ্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

বছর	(০-১৪) বয়সের জনসংখ্যা (%)	(১৫-৫৯) বয়সের জনসংখ্যা (%)	(৬০-ঊর্ধ্ব) বয়সের জনসংখ্যা (%)
১৯৬১	৪৬.১	৪৮.৭	৫.২
১৯৭৪	৪৮.০	৪৬.৩	৫.৭
১৯৮১	৪৬.৫	৪৮.৪	৬.১
১৯৯১	৪৫.১	৪৯.৫	৫.৪
২০০১	৪৫.৫	৪৯.০০	৫.৫
২০১১	৩৪.৬৪	৫৭.৮৮	৭.৪৮
২০১৯	২৮.৮	৬৩.৩	৭.৯

বয়স অনুসারে জনসংখ্যা বণ্টনের এরূপ অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

২. লিঙ্গ (নারী : পুরুষ) অনুযায়ী জনসংখ্যার কাঠামো:

বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অনুপাত হলো ১০০ : ১০৩.৮; অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারীর স্থলে প্রায় ১০৪ জন পুরুষ রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুষ-মহিলার অনুপাত ছিল ১০০.৫ :১০০ যা বর্তমানে (২০১৯) ১০০.২ : ১০০ জন। নিচে লিঙ্গ অনুযায়ী জনসংখ্যা বন্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

সাল	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০১৯
নারী ও পুরুষের অনুপাত	১০০:১০৭.৭৬	১০০:১০৭.৭	১০০:১০৬.১৪	১০০:১০৫.৮৬	১০০:১০৩.৮	১০০:১০০.৫	১০০:১০০.২

৩. গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যা কাঠামো:

গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সাধারণত উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহে মোট জনসংখ্যার বেশির ভাগই শহরে বাস করে।

পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামে অধিক লোক বাস করে।

World Development Report 2000-01 অনুযায়ী বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যার হার ১৯৯১ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ২০.১% যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪% হয়। একই সময়ে গ্রামের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৭৯.৯% এবং ৭১.৬%।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গ্রাম ও শহভিত্তিক বণ্টনের একটি সারণি দেওয়া হলো

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

বছর	গ্রাম (%)	শহর (%)	মোট
১৯৭৪	৯১.২	৮.৮	১০০
১৯৮১	৮৪.৮	১৫.২	১০০
১৯৯১	৭৯.৯	২০.১	১০০
২০০১	৭৬.৩	২৩.৭	১০০
২০১১	৭১.৬	২৮.৪	১০০
২০১৫	৬৫.৭	৩৪.৩	১০০

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

৪. পেশাভিত্তিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত রয়েছে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অন্যের উপর নির্ভরশীল। ২০১৯ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের নিয়োজিত কর্মক্ষম মোট জনসংখ্যার ৪০.৬% কৃষি খাতে এবং ৩৯.০% সেবা খাতে এবং ২০.৪% শিল্প খাতের সাথে জড়িত। নিচে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির পেশাভিত্তিক বণ্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

বছর	কৃষি শ্রমশক্তি (%)	অকৃষি শ্রমশক্তি (%)
১৯৬১	৮৩.০	১৭.০
১৯৭৪	৭৭.০	২৩.০
১৯৮১	৬১.৩	৩৮.৭
১৯৯১	৫৪.৭	৪৫.৩
২০০১	৬২.৩	৩৭.৭
২০০৭	৫১.৬৯	৪৮.৩১
২০১১	৪৫.১	৫৪.৯
২০১৯	৪০.৬	৫৯.৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

৫. ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯৯ ভাগ লোকের ভাষা বাংলা। কেবল ১% জনগণ আরবি, উর্দু, ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষাভাষী ।

৬. উপজীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যা: ২০১৭ সালের বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৬.৩৫ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩%। চাকরিজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১% ও ১১.৫%।

৭. জেলাভিত্তিক জনসংখ্যা: জেলাভিত্তিক বিবেচনায় ঢাকা জেলা সর্বাধিক জনবহুল। পক্ষান্তরে বান্দরবান জেলা সবচেয়ে কম জনবহুল।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার, গঠন ও পেশাগত বৈশিষ্ট্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের অধিক জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি গুণগত দিক থেকেও এখানকার জনশক্তির দক্ষতা নিম্নমানের। এছাড়া আমাদের জনসংখ্যার প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি নির্ভরশীলতার হার বেশি, শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কম এবং শিক্ষিতের গরও কম। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন, প্রকৃতি ও গুণগত মান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

জনসংখ্যার আকার ও গঠন:

কোনো দেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন বলতে জনসংখ্যার আয়তন, ঘনত্ব বৃদ্ধির হার শিক্ষিতের হার, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দেশককে বোঝানো হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই নির্দেশকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. জনসংখ্যার আয়তন:

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০০১ সালে ছিল ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ এবং ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। নিচের সারণিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দেখানো হলো-

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১০	২০১১	২০১৯
জনসংখ্যা	৫.০৮	৭.৬৪	৮.৯৯	১১.১৪	১৩.১৫	১৬.৪০	১৪.৯৮	১৬.৩৭

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

২. জনসংখ্যার ঘনত্ব:

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ২০০১ সালে এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৪ জন। ২০১১ সাল নাগাদ জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০৩ জন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যার ঘনত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০১৯
জনসংখ্যার ঘনত্ব	৩৬৫	৪৯৭	৬০৫	৭৫৫	৮৩৪	১০১৫	১১০৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। যেখানে উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০% থেকে ১.০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১.৪৮% এবং যা ২০১৯ সালে ১.৩৭% এ দাড়িয়েছে। নিচে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০১৯
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.১২	২.৭০	২.৩৬	২.১৭	১.৪৮	১.৩৬	১.৩৭

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

৪. নির্ভরশীল জনসংখ্যা:

সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদেরকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলা হয়। এরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি পরনির্ভরশীল। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ৫১.৩৮%, ৫-১৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ২৮.৫৬%, ০-৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ১৬.৭৭% এবং ৬৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকসংখ্যা হলো ৩.২৯%। এ বিপুল সংখ্যক পরনির্ভরশীল জনসংখ্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বল্পসংখ্যক কর্মরত জনগণকে বহন করতে হয়। যার ফলে পারিবারিক সঞ্চয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ২০১৮ সালের হিসাবে দেশের প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধী ৯ জন ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

৫. শিক্ষিতের হার:

বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। শিক্ষার হার কম হওয়ার জন্য বাংলাদেশের শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা কম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার হলো শতকরা ৪২.৪ ভাগ। তন্মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৩৮.৯ ভাগ এবং মহিলা শিক্ষিতের হার ২৫.৫ ভাগ। এরপর ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫.৩%, ২০১১ সালে ৫৭.৯০%। উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। নিচে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের একটি তালিকা দেওয়া হলো

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০১৯
জনসংখ্যা	১৭.৪	২০.২	২৬.০	৪২.৪	৪৫.৩	৫৭.৯	৭২.৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

৬. জন্মহার ও মৃত্যুহার:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার হলো ১৭.৯০ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার হলো ৩.৭০ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার হলো ১৯.২ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার হলো ৫.৫ জন। যা উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এ হার অনেক বেশি। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহারের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০১৯
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	৫১.৩	৪৭.৪	৩৬.০	৩৬.০	১৭.৯০	১৯.২	১৮.৫
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	২৯.৭	১৯.৪	১৩.০	১৩.০	৩.৭	৫.৫	৫.১

বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো
Population Structure of Bangladesh

৭. প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল:

উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও উন্নত দেশের তুলনায় তা কম। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৭৪ বছর, যুক্তরাজ্যে ৭৩ বছর, জাপানে ৭৯ বছর এবং জার্মানিতে ৭২ বছর। পক্ষান্তরে, ২০১৯ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল হলো ৭২ বছর। নিচে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কালের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

সাল	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০০৭	২০০৯	২০১৯
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বয়স)	৪৪.৭২	৪৬.৫০	৫৪.৮০	৫৬.১০	৬১.৮০	৬৫.১	৬৭.২	৭২

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ বসবাস করে শহরে। ১৯৫০ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় ১১তম স্থানটি দখল করেছে ঢাকা। ২০১৪ সালে শহরটির জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখের বেশি ছিল। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৮ লাখের মতো। **বর্তমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জনবহুল শহর জাপানের রাজধানী টোকিও। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল শহরের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লির।**

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
Trend of Population of Bangladesh

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করছে। দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের পূর্বে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ছিল মন্থর। ১৯২১ সালের পর হতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি বাড়তে থাকে। কিন্তু ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১% -এর বেশি হয়নি। তবে ১৯৫১ সালের পর থেকে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫০% সেখানে ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.২৬%।

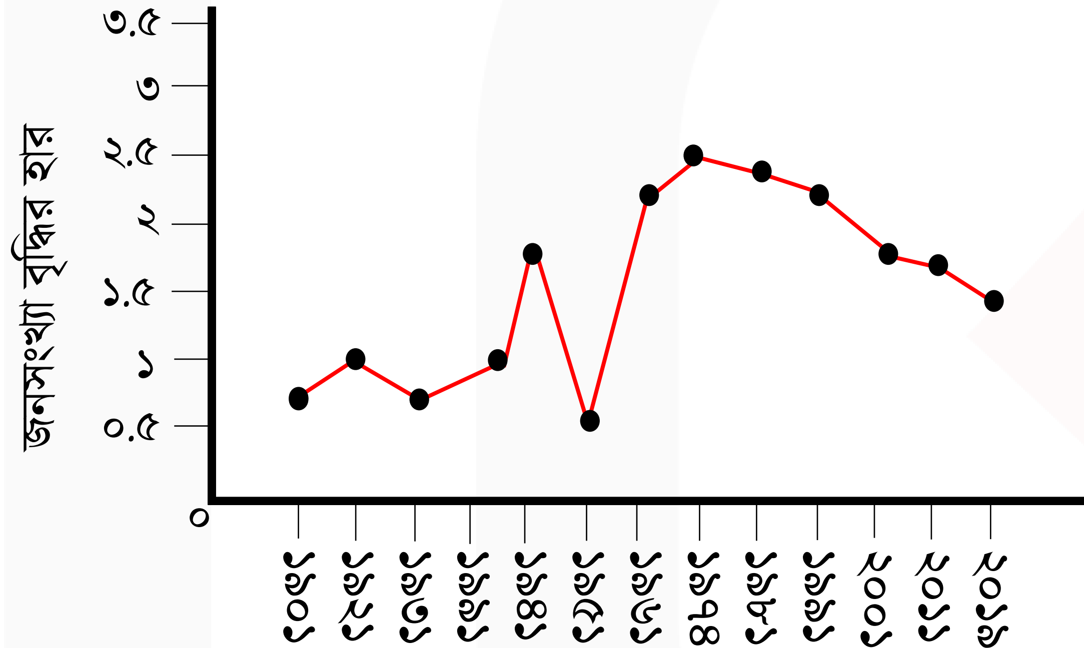
বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
Trend of Population of Bangladesh

১৯৫১ হতে ১৯৬১ সালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণের কারণে মৃত্যুহার কমতে থাকে বলে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বাড়তে থাকে। যেখানে ১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি এবং ১৯৫১ সালে ছিল ৪.৪২ কোটি সেখানে ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০৮ কোটিতে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭.৬৪ কোটি। কিন্তু ১৯৮১ সালে তা দাঁড়ায় ৮.৯৯ কোটিতে এবং ১৯৯১ সালে ১১.১৪ কোটিতে। আর ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.১৫ কোটিতে। নিচে ১৯০১ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার দেওয়া হলো। যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি জানতে সাহায্য করবে। যা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
Trend of Population of Bangladesh

সাল	জনসংখ্যার পরিমাণ(কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার(%)
১৯০১	২.৮৯	০.৭২
১৯১১	৩.১৬	০.৯৪
১৯২১	৩৩৩	০.৬০
১৯৩১	২.৫৬	০.৭৪
১৯৪১	৪.২০	১.৭০
১৯৫১	৪.৪২	০.৫০
১৯৬১	৫.০৮	২.২৬
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১৩.১৫	১.৫৯
২০১১	১৪.৯৮	১.৫৭
২০১৯	১৬.৩৭	১.৩৭

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
Trend of Population of Bangladesh



চিত্র: বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সুতরাং চিত্রানুযায়ী, **১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১%-এর কম**। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি (২.৪৮)। আবার ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। জনসংখ্যা অতিদ্রুত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণতির দিক নির্দেশ করে। কারণ এ বিশাল জনগোষ্ঠীর মুখে আহার তুলে দিতে গিয়ে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যার মতো ভয়ঙ্কর সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো—

১. ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২. হেলথ এডভোকেসি এবং মাতৃ ভাউচার স্কিম এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

৩. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারা দেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে ।

৪. জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৫. বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্গম এলাকার সেবা প্রদানকারীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬. স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও-র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো—

১. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন: জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খল এবং যথাযথভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে জনসংখ্যা সমস্যাকে মোকাবিলা করা সহজ হবে।

২. পরিবার পরিকল্পনা: পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য গ্রাম্য জনগণের একাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথাকে এখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

৩. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এতে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

৪. যথাযথ আইন প্রয়োগ: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা রোধ করতে হলে আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একই সাথে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. শিক্ষার প্রসার: শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে করে। তাছাড়া দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ যাবে এবং তাতে জনসংখ্যার সমস্যা হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হয় তাহলে লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির ধারণক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে নিয়োগ প্রদানের, শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের অবস্থান্তর ঘটবে, যার ফলে জন্মের হার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে।

৭. ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ: জনসংখ্যা সমস্যা রোধকল্পে জনগণের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

৮. নারী, শিক্ষার প্রসার: কর্মক্ষেত্রে নারীদের কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণ: উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ থেকে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে। এতে অধিকাংশ লোক অপরিণামদর্শী বিবাহের দায়িত্ব ও ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে জন্মহার কমবে।

১০. আন্তর্জাতিক স্থানান্তর: অনেক সময় ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হতে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে পাঠানো যেতে পারে। এতে ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। অতীতে পাক-ভারত উপমহাদেশ হতে বহু লোক ইংল্যান্ড, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Activities in Bangladesh

১১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: **কর্মসংস্থান সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র।** ডি. ক্যাস্ট্রো তার বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। তাই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং সেখানে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে চিত্তবিনোদনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জন্মহার হ্রাস পাবে।

১৩. নারীর ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের মর্যাদা কম। এ কারণে অনেক সময় তাদের মতের বিরুদ্ধেও তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। জনসংখ্যা রোধকল্পে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং, উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

মানবসম্পদ
Human Resources

সাধারণ অর্থে কর্মক্ষম মানুষ অথবা শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলে।

কিন্তু অর্থনীতিতে মানবসম্পদ ধারণার সাথে দক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতা জড়িত। কাজেই একটি দেশের উৎপাদনশীল ও দক্ষ শ্রমশক্তি বা জনশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়। অর্থনীতিতে জনসংখ্যাকে একই সাথে সম্পদ ও দায় হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা জনসংখ্যা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধারও সৃষ্টি করে।

কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখে তখন জনসংখ্যা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

আবার কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তখন জনসংখ্যা দায় হিসেবে গণ্য হয়।

মানবসম্পদ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ মাইকেল পি. চৌড়ানো বলেন, 'একটি দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলা হয় বিধায় তার প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।

সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমশস্তিকে যদি দক্ষ করে তোলা যায়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, তাহলে সেই শ্রমশক্তিকেই অর্থনীতিতে মানবসম্পদ বলে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন
Human Resources Development

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। মানবসম্পদ বলতে মূলত জনশক্তিকে বোঝায়। আর কোনো দেশের জনশক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়। বস্তুত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাকেই মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জে ডি সেথি বলেন, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক, কারিগরি, উদ্যোক্তীয় এমনকি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বোঝায়। এটি নতুন নতুন সামর্থ্য সৃষ্টি বোঝায়।

সুতরাং, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলার নিয়মকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক
Index of Human Resources Development

মানবসম্পদ উন্নয়নে তিনটি মৌলিক সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ তিনটি মৌলিক সূচক হলো—
(১) আয়ুষ্কাল,
(২) শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন এবং
(৩) জীবনযাত্রার মান। নিম্নে এ তিনটি সূচকের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. আয়ুষ্কাল:

মানুষের কর্মক্ষম জীবনকাল তার আয়ুষ্কালের উপর নির্ভর করে। যার আয়ুষ্কাল যত বেশি, তার কর্মক্ষম জীবনকালও তত বেশি। কোনো দেশের জনগণের আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয় জনগণের জীবন প্রত্যাশা দ্বারা। যদি কোনো দেশের জনগণের জীবন প্রত্যাশা বাড়তে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নত দেশের মানুষের আয়ুষ্কাল অনুন্নত দেশের মানুষের আয়ুষ্কালের চেয়ে বেশি হয়।

২. শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন:

মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সূচক হলো শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন। জ্ঞান পরিমাপ করা হয় বয়স্ক শিক্ষার হার এবং স্কুল শিক্ষার গড় বয়স দ্বারা। এখানে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব হলো ২/৩ এবং স্কুল শিক্ষার গড় বয়সের গুরুত্ব হলো ১/৩।

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক
Index of Human Resources Development

৩. জীবনযাত্রার মান:

কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়লে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিমাপে মানুষের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে ক্রয়ক্ষমতা বা জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক নির্ণয় করা হয়।

এছাড়া অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল (Gunar Myrdal) মানবসম্পদ উন্নয়নে আটটি অপরিহার্য উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো-

১. খাদ্য,
২. বস্ত্র,
৩. বাসস্থান,
৪. শিক্ষা,
৫. স্বাস্থ্য সুবিধা,
৬. জনসংযোগ মাধ্যম,
৭. পরিবহণ ও
৮. শক্তি ভোগ ।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব
Importance of Human Resources Development in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান ও জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো—

১. **দক্ষতা বৃদ্ধি:** উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুবিধা দিয়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপান্তর করা গেলে, জনগণ দেশের আপদ না হয়ে সম্পদ হবে।

২. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** কেবল দক্ষ মানবসম্পদই পারে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে উৎপাদন করতে। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি দূর হবে, দেশও স্বাবলম্বী হবে।

৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করতে পারলে বেকারত্ব দূর হবে । কারণ আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রকট।

৪. **জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান:** বাংলাদেশ একটি অধিক জনবহুল দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ নয় বরং দায়। তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হবে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব
Importance of Human Resources Development in Bangladesh

৫. দক্ষ উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি: মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার করা যায়।

৬. প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ: মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। ফলে দেশকে দ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা সহজ হবে।

৭. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা: কৃষকদের উন্নত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর হবে।

৮. বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ: মানবসম্পদের উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি বাড়বে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমবে । ফলে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে অন্যদিকে আমদানি ব্যয় কমবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দূর হবে।

৯. জনশক্তি রপ্তানি: মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি ও মেধাকে বিদেশে রপ্তানি করে দেশে বেকারত্বের প্রকোপ হ্রাস করা যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব
Importance of Human Resources Development in Bangladesh

১০. সঞ্চয় ও মূলধন গঠন: মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণ অধিক উৎপাদনশীল কাজে জড়িত হয়ে তাদের আয় বাড়িয়ে সঞ্চয়, মূলধন ও বিনিয়োগের হার বাড়াতে পারে।

১১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ।** কারণ দক্ষ জনশক্তিই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

১২. আয় বৈষম্য দূর: বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকট আয় বৈষম্য বিরাজমান। এক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা গেলে মানুষের আয় বাড়বে। ফলে সমাজে আয় বৈষম্য কমবে।

১৩. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র দূরীকরণ: শিক্ষিত, দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ দ্বারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা সুতরাং, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি। তখন সহজ হবে বাংলাদেশের জনগণ বোঝা না হয়ে বরং সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

জেনে রাখো: মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। **HDI অনুযায়ী ২০১৮ সালে ১৮৯টি দেশের মধ্যে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ছিল ১৩৯তম।**

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়
Way to Develop Human Resource in Bangladesh

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হলেও এদেশে শ্রমের যোগান কম। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলো সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নিচে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করা হলো—

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ,
২. কারিগরি শিক্ষার প্রসারতা,
৩. উৎপাদন বৃদ্ধি,
৪. কৃষি শিক্ষার প্রসার,
৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নতি,
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ,
৭. পরিবেশের উন্নয়ন,
৮. বাসস্থান সমস্যার সমাধান,
৯. সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন সৃষ্টি,
১০. পরিকল্পনা,
১১. সরকারি উদ্যোগ,
১২. নারী শিক্ষার প্রসার,
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়
Way to Develop Human Resource in Bangladesh

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-এর উপাদানগুলোর উন্নয়ন যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেগুলোই হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান। **অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।** যেমন—

১. **খাদ্য ও পুষ্টি:** খাদ্য পুষ্টিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ যদি অধিকমাত্রায় সুষম খাদ্য গ্রহণ করে উচ্চমানের ক্যালোরি গ্রহণ করতে পারে তাহলে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

২. **বস্ত্র:** **বস্ত্র হলো মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা।** প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় বস্ত্রের ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেয়।

৩. **আবাসন বা বাসস্থান:** **বাসস্থান হলো মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক চাহিদা।** দেশের সকল লোকের জন্য নিরাপদ বাসস্থান থাকা মানব উন্নয়ন সূচককে বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়
Way to Develop Human Resource in Bangladesh

৪. স্বাস্থ্য: স্বাস্থ্য হলো সকল সুখের মূল। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. শিক্ষা: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি মানেই সমৃদ্ধ জাতি। তাই শিক্ষার হার বৃদ্ধিকে মানব উন্নয়ন সূচকের উপাদানে হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. পরিবহণ সুবিধা: এটি হলো জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অন্যতম প্রধান সুবিধা।

৭. গণসংযোগ মাধ্যম: গণসংযোগের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা যায়।

৮. শক্তি ভোগ: দেশের জনগণ মাথাপিছু কত পরিমাণ বিদ্যুৎ ও অন্যান্য উৎসের শক্তি ভোগ করে থাকে তাকে শক্তি ভোগে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

সুতরাং, এসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় নারী উন্নয়ন-২০১১ এবং শিশু নীতিমালা-২০১১ গৃহীত হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে এদেশের মানুষ আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে এক উদীয়মান মানবসম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

তাই এ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ক. শিক্ষা: বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মুখ্য উপাদান হলো শিক্ষা। সরকার শিক্ষা বিস্তারে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তা হলো-

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

১. ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ১০০% সরকার বহন করছে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে।

৪. কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৫. নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য SESDP, SEDP, SESIP, SSFAP, TQI-II, EEQEP ইত্যাদি প্রকল্পের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

৮. শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

১০. কোমলমতি শিশুদের ভর্তি পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য ১ম শ্রেণিতে লটারির কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

১১. সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করে ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

১২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪. স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

খ. স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। দুর্বল ও অসুস্থ লোক দ্বারা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক উপাদান হলো- সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কিন্তু এগুলোর কোনটি এদেশে সহজলভ্য নয়। তাই এদেশের মানুষ দুর্বল, ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারি ফলে তারা কর্মবিমুখ ।

এজন্য দেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বাংলাদেশের মানুষের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার।

এ লক্ষ্যে সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে— বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে এ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হলে স্বাস্থ্যসেবা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছে। যার অন্যতম হলো-

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ

Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

১. কমিউনিটি মেডিকেল সেন্টার চালু করা হয়েছে।

২. প্রতি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ ৯ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ডাক্তার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪. অনেকগুলো হেলথ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৫. মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে।

৬. বেসরকারি খাতে আধুনিক হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে—

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

ক. জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবাদিদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;

খ. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস;

গ. রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা;

ঘ. এইচপিএন সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা;

ঙ. এছাড়া তিন স্তরবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

গ. নারী শিক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৫০% হলো নারী। নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদিত হয়েছে। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১ গৃহীত হয়েছে। নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যথা—

১. অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন,

২. খাদ্য নিরাপত্তাহীন মহিলাদের উন্নয়ন,

৩. বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প,

৪. গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদি।

বর্তমানে সরকার নারী শিক্ষার হার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যথা—

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান ।

২. বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৩. শিক্ষকতায় অধিক হারে নারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৪. বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৫. ইভটিজিং বন্ধে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এসব পদক্ষেপের ফলে নারী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা ও ক্ষমতায়ন বেড়েছে। এতে মানবসম্পদ উন্নয়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ বা কর্মসূচিসমূহ
Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh

ঘ. আবাসন: জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA) ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ৩.১০ মিলিয়ন গৃহের ঘাটতি প্রাক্কলন করেছে। আবার ২০০০ সালে ৫ মিলিয়ন গৃহ এককের ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমানে সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরে (সদরে) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এসব ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ এবং এগুলোর সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা মানবসম্পদ হিসেবে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জেনে রাখো:

যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর তাদেরকে যুবশক্তি বলা হয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Not in education, employment or training.' (সংক্ষেপে একে NEET বলে)। অর্থাৎ যখন এই যুবকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই, কোনো প্রশিক্ষণে নেই কোনো কর্মসংস্থানেও নেই, তখন বলা হয় যুবশক্তির অপচয়।

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা
Concept of Self-employment

আত্ম শব্দের অর্থ নিজ, কর্মসংস্থান অর্থ নিয়োগ। কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান বলে। আত্ম-কর্মসংস্থানের সমার্থক শব্দ হলো স্বকর্মসংস্থান।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে (২০১৯) এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬.৩৭ কোটি।

এদেশে প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রায় ১৮ লক্ষ নতুন লোক প্রবেশ করছে। এ দেশে ৮ কোটি কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ২ কোটি বেকার।

অফুরন্ত শ্রম সরবরাহের অভাবে এদেশের অর্থনীতিতে ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্ব বিদ্যমান। মূলধন, বৈদেশিক মুদ্রা ও দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাই দারিদ্র্য বিমোচন করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। এ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থান একান্ত অপরিহার্য।

স্বকর্মসংস্থান হলো এমন এক ধরনের কর্মসংস্থান, যা স্বল্প মূলধন ও সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে পরনির্ভরশীলতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়।

আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ:

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা
Concept of Self-employment

১. দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না,

২. প্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে,

৩. অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলায় একমাত্র আত্মকর্মসংস্থান সমাধান করতে পারে এবং

৪. নারী বেকারত্বের হার হ্রাস।

আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ

আত্ম-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১. নিয়োগকর্তা: নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু অন্যদের দিয়ে কাজ সম্পাদন করেন।

২. নিজেই কর্মী: নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিজেই কাজ সম্পাদন করেন।

৩. সমিতির সদস্য: সমিতি গঠন করে কতিপয় ব্যক্তি যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে সদস্যগণ কর্মী হতে পারেন বা অন্যদের দ্বারা কাজ সম্পাদন করাতে পারেন।

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা
Concept of Self-employment

নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার দেখানো হলো:

ক্ষেত্র	শতকরা হার %
পারিবারিক কর্ম	১১.৫
আত্ম-কর্মসংস্থান	৪৪.৩
নিয়মিত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত	৩৯.৯

তাই বলা যায় যে, আত্ম-কর্মসংস্থান আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এজন্য এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

আত্মকর্মসংস্থানের কর্মক্ষেত্র
Work Sources of Self-employment

এদেশের অধিকাংশ কুটিরশিল্পই স্বকর্মসংস্থানমূলক।

১. পারিবারিক পরিবেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প, চরকা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, রেশম শিল্প প্রভৃতি।

২. মৃৎ শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প, কাঠ শিল্প, বিড়ি শিল্প, শঙ্খ শিল্প, ঝিনুক শিল্প প্রভৃতি ।

৩. লবণ শিল্প, জুতা, মানিব্যাগ, পুতুল ও ফুলের টব তৈরি, উলের কাজ প্রভৃতি।

৪. ইমিটেশন ও অলঙ্কার শিল্প।

৫. নার্সারিতে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তৈরি এবং তা বিক্রি প্রভৃতি কর্ম।

একজন গ্রামীণ যুবক বা দরিদ্র কর্মক্ষম মহিলা এসব কর্ম স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্ত হতে পারে।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়
Necessary Step for Self-employment

আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নিজের জন্য বিভিন্ন করণীয় দিকসমূহ হলো—

১. সকল কাজের প্রতি সম্মানবোধ জানানো এবং কোনো কাজই অপমানজনক নয়।

২. কাজটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. কাজটির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। কারণ ঝুঁকিতে টিকে থাকতে হলে ঝুঁকির প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। যেকোনো কাজেই ঝুঁকি বিদ্যমান। ঝুঁকি হলো কোনো কর্মে বিপদ বা আপদ বা ক্ষতি বা কোনো কিছু হারানোর ভয়।

ঝুঁকি হলো তিন ধরনের । যথা—

ক. ব্যবসায়ে ঝুঁকি: ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় জড়িত ঝুঁকিকে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বলে ।

খ. আর্থিক ঝুঁকি: অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে।

গ. খাঁটি ঝুঁকি: ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকি ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নি, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকিকে খাটি ঝুঁকি বলে।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়
Necessary Step for Self-employment

৪. এসব ছাড়াও ব্যক্তি যে কাজটি আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বেছে নিতে চায় তার সকল দুর্বল দিক, সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিতে হবে এবং কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

৫. কাজটির আর্থিক প্রাপ্তি এবং আর্থিক ব্যয় এবং এদের পার্থক্য নিরূপণ করে স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে হবে।

৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭. কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের উপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

বিদেশে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি তরুণ সাবিরুল, "ইন্সপায়ার ওয়ান মিলিয়ন' আন্দোলনে বলেন, "অনেকের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছাড়া কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। আসলে ডিগ্রি অর্জন করাটা জীবনের একটা দিক, কিন্তু এটাই জীবন নয়।" সাবিরুল আরও বলেন, "সাফল্যের সংজ্ঞাটা একেক মানুষের কাছে একেক রকম। সাফল্যের ক্ষেত্রে আমি ৭P-এর ধারণায় বিশ্বাসী। এই ৭P সেই ১৪ বছর বয়স থেকেই আমাকে সাহায্য করছে, যখন আমি প্রথম আমার ব্যবসা চালু করেছিলাম।" সাবিরুলের ধারণাগুলো হলো

১. ইতিবাচক মনোভাব (Positivity): যেকোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দাও।

২. ভালো লাগা (Passion): অন্য কারও মতো নয়, নিজের ভালো লাগার কাজটি করো।

৩. কঠোর অধ্যবসায় (Perseverance): কঠোর পরিশ্রম করো এবং কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ মনোযোগ দাও।

৪. লেগে থাকা (Persistence): কঠোর পরিশ্রম করে দিনের কাজ দিনে শেষ করো। জীবনে ধারাবাহিকতা খুবই

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

৫. উদ্দেশ্য (Purpose): জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করো এবং বিশ্বাস করো যে তুমি ব্যতিক্রমী কিছু করতে সক্ষম।

৬. ধৈর্য (Patience): সাফল্য ধরা দিতে সময় নেয়। কখনো তাড়াহুড়ো করো না এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চেষ্টা করো। কারণ এটাই হয়ে উঠবে তোমার জন্য সাফল্যের গল্প ।

৭. মানুষ (People): মানুষকে সব সময় বিশ্বাস করো। তুমি যা-ই অর্জন করতে চাও, তোমার চারপাশে এমন কেউ না কেউ আছেন, যিনি তোমাকে সেটা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন।

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে যে পাঁচটি বিষয় মানতে হবে

সাবিরুল: আসলে উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা যেকোনো ক্যারিয়ার বেছে নেয়ার আগেই মানুষকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমত নিজেকে জানাটা খুবই জরুরি। আমার মতে পাঁচটি ধাপে এটি করা সম্ভব—

১. আত্মবিশ্বাস: নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বাসী থাকা এবং এ মনোভাব ধরে রাখা যে আমি পারব।

২. আত্মনিবেদন: প্রতিদিন সকালে হাসিমুখে ঘুম থেকে ওঠা এবং আনন্দের সঙ্গে প্রতিটি কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. দূরদৃষ্টি: নিজের পথচলা নিয়ে দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। ১০ বছর পর একজন নিজেকে কোথায় দেখতে চান, তার উচিত সেভাবে কাজ করা।

৪. সাহায্য: সাহায্য চাইতে ভয় পাওয়াটা অনেক মানুষের স্বপ্নকে থমকে দিয়েছে। আমি সবাইকে বলি, তোমার জন্য সাহায্য আছে, শুধু তুমি সঠিক জায়গায় গিয়ে সেটাকে খুঁজে নাও।

৫. সহজ কর্মপরিকল্পনা: প্রতিদিনই তোমার কোনো পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তুমি যেভাবে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, সেভাবেই কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে।

DOWNLOAD THE APP

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

10 MINUTE SCHOOL

একটি স্বনির্ভরশীলতার গল্প

মোহাম্মদ ইয়াকুত আলী একজন সফল খামারী।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে সরকারি চাকরির পেছনে না ঘুরে আত্মকর্মসংস্থানে মনোযোগী হন।

পৈত্রিক ৯ একর জমিতে শুরু করেন মাছ ও সবজি চাষ।

৮ একর জমিতে ছোট বড় ৬টি পুকুরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আর ১ একর জমিতে রয়েছে তার সবজি খামার।

উচ্চ শিক্ষিত যুবক মোহাম্মদ ইয়াকুত আলী মৎস্য খামার থেকে বছরে প্রায় ১০ লাখ এবং সবজি থেকে ২ লাখ টাকা আয় করছেন।

এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু যে তিনি নিজে স্বনির্ভর হচ্ছেন তা নয়।

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

একটি স্বনির্ভরশীলতার গল্প

তার খামারে প্রতিদিন কাজ করছেন গ্রামের ৬ জন দরিদ্র শ্রমিক।

দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে তারাও তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন।

এ ব্যাপারে ইয়াকুত আলী বলেন, ৪ বছর পূর্বে শুরু করা মাছ চাষে প্রথম বছর আমার তেমন একটা লাভ না হলেও পরবর্তী বছর থেকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে।

তাছাড়া আরও ১ একর জায়গায় সবজি চাষ করছি।

সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সবজি যেমন- আলু, শিম, ঢেঁরস, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি চাষ করে বছরে আমার প্রায় ২ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে।

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

এভাবে দুইটি প্রকল্প থেকে আমার বছরে কমপক্ষে ১২ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। তাছাড়াও আমার বাড়িতে বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা গ্যাসের ব্যবস্থা করেছি। বসতবাড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ রোপন করে বার মাস ফল উৎপাদন করছি। এসব ফল নিজের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করছি।

মৎস্য চাষ প্রকল্পে প্রথম দিকে যে সময় দিতে হতো এখন আর আমার তেমন একটা সময় দিতে হয় না।

শ্রমিকরা নিয়মিত কাজ করে চলছেন। আমি মাঝে মাঝে তদারকি করি।

ইয়াকুত আলী আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান বাড়েনি।

সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ
Case Study of Successful Self-employer

চাইলেই একজন শিক্ষিত ছেলে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান করতে পারছে না।

পদ সংখ্যার চেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ কারণে আমার কাছে মনে হলো চাকরি পাওয়ার আশায় সময় নষ্ট না করে স্বনির্ভর হওয়ার রাস্তা খোজাটা অনেক ভালো।

আমি চাই আমার মতো এলাকার অন্য শিক্ষিত বেকার যুবকরা চাকরি খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে মৎস্য চাষের মতো লাভজনক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ুক।

আমি তাদের সব রকম পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

বেকার যুবকরা নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে যেমন নিজে স্বাবলম্বী হবে তেমনি অনেক গরিব অসহায় মানুষেরও কর্মসংস্থান হবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
আদমশুমারি	কোনো নির্দিষ্ট দেশের বা স্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশনার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় আদমশুমারি আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি হলো- প্রত্যক্ষ গণনা, পরোক্ষ গণনা, প্রকৃত গণনা এবং বৈধ গণনা।
জনসংখ্যা	একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে জনসংখ্যা বলে।
জনসংখ্যার পরিমাপ	কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ের জনবিজ্ঞানজনিত তথ্যসমূহ বিন্যস্ত করা বা সাজিয়ে হিসাব করাকেই উক্ত দেশের ঐ সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপ (Measurement of Population) বলে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে ঐ দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। নিচে একটি স্থানের সাহায্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশ করা যায়: $DP=\frac{TP}{TA}$ এখানে, DP– জনসংখ্যার ঘনত্ব, TP= মোট জনসংখ্যা, TA মোট আয়তন
স্থূল জন্মহার	যেসব উপাদানের ওপর কোনো স্থানের জনসংখ্যা নির্ভরশীল, সেসব উপাদানকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে।
স্থূল মৃত্যুহার	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তালিকাভুক্ত জীবিত মোট জনসংখ্যা ও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে স্থূল জন্মহার পাওয়া যায়। জন্মহার ধনাত্মক হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণাত্মক হলে হ্রাস পায়।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
অভিবাসন	স্থূল মৃত্যুহার হলো নির্দিষ্ট বছরের মধ্য সময়ে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত। জন্মহার যখন মৃত্যুহারকে অতিক্রম করে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত দেশে জন্মহার = মৃত্যুহার হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার > মৃত্যুহার হয়ে থাকে।
নিট অভিবাসন	অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে নির্দেশ করে। এটি মূলত এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা এবং মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে ঐ দেশের নিট অভিবাসন বলা হয়। $\text{নিট অভিবাসন} = \frac{\text{অভিবাসীর সংখ্যা} - \text{দেশান্তরের সংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
জনসংখ্যাতত্ত্ব	জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন- বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, তার ফলাফল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যে তত্ত্বে আলোচিত হয়, তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলে। **জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত রয়েছে**- ১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব; ২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।
প্রাকৃতিক নিরোধ	মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়। এসব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ম্যালথাস দেশের জনগণকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন ।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
কাম্য জনসংখ্যা	কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন একটি জনসংখ্যার স্তর নির্দেশ করে যেখানে উৎপাদন এবং আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ যে জনসংখ্যার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।
পরিবার পরিকল্পনা	পরিবার পরিকল্পনা বলতে বোঝায় প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে বিদ্যমান মাথাপিছু সম্পদ ও সুযোগের প্রেক্ষিতে পরিবারের আয়তনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উদ্যোগী হওয়া। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান সন্ততির সংখ্যা কমিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় ।
প্রজননশীলতা	প্রজননশীলতা হচ্ছে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা। সন্তান জন্মদানে সক্ষম স্ত্রী, পুরুষ বা উভয়ের জীবিত সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকে প্রজননশীলতা বলে ।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	
মানবসম্পদ	যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দক্ষ জনসমষ্টিকে মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধরনের জনগণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার যোগ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সূচক হলো- ১. আয়ুষ্কাল ২. শিক্ষার্জন এবং ৩. জীবনযাত্রার মান।
আত্ম কর্মসংস্থান	আত্ম শব্দের অর্থ 'নিজ' এবং কর্মসংস্থান অর্থ 'নিয়োগ'। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে তাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বলে। আত্ম-কর্মসংস্থানের সমার্থক শব্দ হলো স্বকর্মসংস্থান।



আন্তর্জাতিক বাণিজ্য





আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
International Trade

পৃথিবীতে সব দেশের উপকরণ ও সম্পদ সমভাবে বিন্যস্ত নয়। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা চাহিদামাফিক পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষাপটেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

সময়ের পরিবর্তনে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারায় পরিবর্তন ঘটে।

বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি পরিবর্তন হয়।

বিশ্বায়নের এ যুগে বৈদেশিক সাহায্যের মান ও গতিধারায় পরিবর্তন ঘটে।

এ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ও পরিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপায়, বিশ্বায়নের ধারণা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা
Concept of International Trade

আধুনিক বিশ্বে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শীর্ষে অবস্থান করলেও কোনো দেশই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাণিজ্যবাদীদের চিন্তাধারা থেকে বাণিজ্য' ধারণার উদ্ভব হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত ঘটে আফ্রিকা থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় দাস (Slave) বিক্রির মাধ্যমে।

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন পণ্য ও উৎপাদন কৌশল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ।

প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

এজন্য যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধা বেশি, সে দেশ সে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে।

পক্ষান্তরে, যেসব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা কম সেগুলো আমদানি করে।

এভাবে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা
Concept of International Trade

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুটি দিক আছে। যথা:

১. রপ্তানি বাণিজ্য:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যদি অন্য কোনো দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে।

যেমন– বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক বিক্রি করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে এ পোশাক বিক্রি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য।

২. আমদানি বাণিজ্য:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যদি অন্য কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে।

যেমন- বাংলাদেশ ভারত থেকে চাল ক্রয় করে থাকে। ভারত থেকে এ চাল ক্রয় বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা
Concept of International Trade

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

অবাধ বাণিজ্য (Free Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর কোনোরূপ সরকারি বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলা হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ, কোটা, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade)।

সংরক্ষিত বাণিজ্য (Trade Protection):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য বলা হয়।

অর্থাৎ বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর সরকার বিধি-নিষেধ আরোপ করলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য (Trade Protection) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা
Definition of International Trade

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকে বোঝায়।

অর্থাৎ যদি কোনো দেশ তার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে এক বা একাধিক দেশের সাথে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আদান প্রদান করে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

অধ্যাপক কিন্ডল বার্জারের মতে, "দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।"

Oxford Dictionary of Economics অনুসারে, 'বহির্বিশ্বে পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়ই হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, জনগণের দক্ষতা, কৃষ্টি ও কালচার প্রভৃতি কারণে কোনো বিশেষ দেশ কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে অন্য দেশের তুলনায় দক্ষ হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা
Definition of International Trade

যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে দক্ষ বা বেশি সুবিধা লাভ করে সে দেশ ঐসব পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে।

পক্ষান্তরে, যেসব পণ্য উৎপাদনে কম দক্ষ বা আপেক্ষিক সুবিধা কম সে সকল পণ্য আমদানি করে।

এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

অতএব পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার পার্থক্যের কারণে যে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের সৃষ্টি হয় এবং ফলশ্রুতিতে যে বাণিজ্য হয় সেটাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। যেমন- বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি সুবিধা পায় আর জাপান গাড়ি উৎপাদনে বেশি সুবিধা পায়, সে কারণে বাংলাদেশ জাপানে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে এবং জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করে।

সুতরাং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি
Base of International Trade

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই বিদ্যমান সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তখন যে দেশটি তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করে, বিনিময়ে সে তার উদ্বৃত্ত দ্রব্যটি আমদানিকারক দেশের কাছে বিক্রি করে। এভাবে পারস্পরিক চাহিদার ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক দেশ বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত আবশ্যক –

১. একটি নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য;
২. কমপক্ষে দুটি স্বাধীন দেশ ও এক বা একাধিক পণ্য প্রয়োজন;
৩. পৃথক পৃথক ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা বিদ্যমান;
৪. পণ্যসেবা বিনিময়ে লিখিত চুক্তি আবশ্যক;
৫. দুটি দেশে পৃথক বাণিজ্যনীতি বিদ্যমান ।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
Domestic Trade

একই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

অর্থাৎ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়।

যেমন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় সেটা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

উদাহরণস্বরূপ, **বগুড়ায় উৎপাদিত আলু ও কলা ঢাকায় বিক্রি হয়।**

আবার ঢাকায় উৎপাদিত কাপড় বগুড়ায় বিক্রি হয়।

এভাবে বগুড়া এবং ঢাকার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Domestic Trade and International Trade

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। যে কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য চলে। সেই একই কারণে এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য হয়। কিন্তু তারপরেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো-

১. একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যখন কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন— বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জেলার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

পক্ষান্তরে, কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন— ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে তা হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

২. **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নগদ অথবা ধারে ক্রয়-বিক্রয়** হয়। যেমন— একজন কাপড় বিক্রেতা ঢাকার ইসলামপুর থেকে কাপড় কিনে চট্টগ্রামে বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের তেমন কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না।

অন্যদিকে, **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।**

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Domestic Trade and International Trade

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় অবাধে চলে। কারণ একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলোর মধ্যে ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ইত্যাদি প্রায় অভিন্ন থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক দেশের দ্রব্যসামগ্র অন্যদেশে অবাধে বিক্রি হয় না। কারণ দেশভেদে মানুষের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ইত্যাদিতে তারতম্য দেখা যায়।

৪. একটি দেশের ভেতরে অভিন্ন বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হয় বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তেমন বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যনীতি প্রযোজ্য হয় বলে আমদানি-রপ্তানির ওপর নানা ধরনের বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।

৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনো তারতম্য ঘটে না। কারণ একই দেশের ভেতরে কারখানা আইন, শ্রম ও রাজস্বনীতি, উৎপাদন কলা-কৌশল, বণ্টন নীতি ইত্যাদি প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, উপরের বিষয়গুলো দেশভেদে ভিন্ন ধরনের হয় বলে আন্তর্জাতিক বাণিজো বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Domestic Trade and International Trade

৬. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি সংকোচন, আমদানির ওপর বিধি নিষেধ আরোপ ইত্যাদি যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয় তাতে এ বাণিজ্য বেশ জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে।

৭. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা তেমন জটিল নয়। যে কেউ এ ধরনের বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা অত্যন্ত জটিল বলে যে কেউ এটি পরিচালনা করতে পারে না।

৯. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো দলিলপত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের দলিলপত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।

১০. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পাইকারি ও খুচরা উভয় প্রকারের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সাধারণত পাইকারি ভিত্তিক হয়ে থাকে। এ জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অর্থনীতিবিদরা একটি পৃথক বাণিজ্য তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of International Trade

সভ্যতার গোড়া থেকেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে আসছে। একসময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি (Engine of Economic Growth) বলা হতো। বর্তমানেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন আঞ্চলিক অর্থনৈতিকগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক বাণিজ্যগোষ্ঠীর উদ্ভবই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization-WTO), ইউরোপীয় মুক্তবাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association EFTA), দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থা (SAPTA) প্রভৃতি আঞ্চলিক বাণিজ্যগোষ্ঠীর উদ্ভব অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব বহন করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো :

১. আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্য পরিচালিত হলে দেশের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এর ফলে তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায় সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of International Trade

২. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা:

কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ তার প্রয়োজনীয় অনুৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজেই বিদেশ হতে সংগ্রহ করতে পারে।** যেমন: তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাট উৎপাদিত হয় না। অপরপক্ষে, বাংলাদেশে তেল উৎপাদন না হলেও প্রচুর পাট জন্মে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট রপ্তানি এবং তেল আমদানি করতে পারে।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:

কোনো দেশ যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সে দেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগণকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ইত্যাদি বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই বিদেশ হতে আমদানি করতে পারে।

৪. উদ্বৃত্ত পণ্য (Surplus products) বিদেশে রপ্তানির সুযোগ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা অন্য কোনো দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব। এভাবে একটি দেশ তার উদ্বৃত্ত পণ্যকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of International Trade

৫. কম মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করা যায়:

যেসব দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করা ব্যয়বহুল তা কম দামে অন্য কোনো দেশ হতে ক্রয় করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ নিজের দেশের ব্যয়বহুল দ্রব্য উৎপাদন না করে তা কম দামে বিদেশ হতে আমদানি করে দেশীয় মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

৬. দেশীয় উৎপাদকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়:

বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়।

৭. প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরত দেশগুলোর শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। ফলে ঐসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ব্যয় হ্রাস পায়। কেননা আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পায়নের আকারও বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of International Trade

৮. আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়। এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৯. দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনকারীর উৎপাদন ক্ষমতা এবং মুনাফা উভয় বৃদ্ধি পায়।

১০. কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশ থেকে কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়তা পেতে পারে এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় মূলধন দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষজ্ঞরা উন্নত দেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
Importance of International Trade

১১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন:

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যয় সংস্থান করা যাবে না। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো তার অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে।

সুতরাং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল বৈদেশিক ঋণ নির্ভর না হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of International Trade of Bangladesh

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আমদানি নির্ভরতা:

বাংলাদেশ যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিদেশ হতে আমদানি করে থাকে। ভারত হলো এ দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি দ্রব্যের দেশ।

২. পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি:

বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমান পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বাংলাদেশে জন্মে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাস অর্থাৎ জুলাই-ফেব্রুয়ারি মেয়াদে পার্ট ও পাটজাত খাতের পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৪ লাখ ডলার। মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরানসহ বিভিন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা আছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of International Trade of Bangladesh

৩. শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি:

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। যেমন: কলকব্জা, লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।

৪. জনশক্তি রপ্তানি:

বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৫. খাদ্যশস্য আমদানি:

খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়।

প্রতি বছর গড়ে ২৫-৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করে থাকে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of International Trade of Bangladesh

৬. প্রতিকূল ভারসাম্য:

বাংলাদেশ প্রধানত কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে। বৈদেশিক বাজারে এ সব দ্রব্যের চাহিলা স্থিতিস্থাপক। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ বিদেশ হতে প্রধানত শিল্পের প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে। এসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এর ফলে সর্বদা প্রতিকূল ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে।

৭. প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক:

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, মিয়ানমার প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য সম্প্রতি:

বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of International Trade of Bangladesh

৯. নৌপথে বাণিজ্য:

বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

১০. ওয়েজ আর্নার্স স্কিম:

বিদেশে কর্মরত প্রবাসী ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার্স স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা হয়।

১১. বিলাসদ্রব্যের আমদানি হ্রাস:

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার বিলাসদ্রব্যের আমদানি যথাসম্ভব হ্রাস করেছে। আমদানি তালিকায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী, শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, কল কারখানার যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২. বিদেশিদের প্রভাব:

বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্য বিদেশি ব্যাংক, বিমা, কোম্পানি বা ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব
Theory of International Trade

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। প্রত্যেক দেশের সরকারই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে **পৃথক ও স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে।** এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক তত্ত্বের জন্ম দেয়।

প্রাচীনকাল থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। তাই তখন থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন হয় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে—

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বাণিজ্যরত দেশগুলো লাভবান হবে কিনা? কোন দেশ কতটুকু লাভবান হবে? এসকল প্রশ্নের উত্তর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরে আলোচনা করা হয়।

সুতরাং অর্থনীতির যে তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ও বাণিজ্য থেকে কতটুকু লাভবান হবে এ সকল সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সমাধানের দিকনির্দেশনা দেয়া হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব বলে ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব
Theory of International Trade

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন দেশ কেন করবে সে বিষয়ে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম থিম এবং ডেভিড রিকার্ডো । অ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন, কোনো পণ্য উৎপাদনে একটি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ণ সুবিধা পেতে পারে। আর কোনো দ্রব্য উৎপাদনে যে দেশ পূর্ণ সুবিধা পায় সে দেশের সেই পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে কোনো দেশ কোনো পণ্য উৎপাদনে পূর্ণ সুবিধা না পেলে তারা ওই পণ্য উৎপাদন না করে অন্যদেশ থেকে তা আমদানি করা উচিত। এই তত্ত্বকে পরম/ চরম/অনাপেক্ষিক সুবিধা (Absolute Advantage) তত্ত্ব বলা হয়।

কিন্তু পরম সুবিধা ছাড়াও বাণিজ্য হয়। দুটো দেশ দুটো পণ্য উৎপাদনে সক্ষম, অথচ তারপরেও কেন বাণিজ্য হয় এর ব্যাখ্যা দেন ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর (David Ricardo) মতে, যেহেতু একেকটি দেশ একেকটি সম্পদে সমৃদ্ধ সেহেতু উৎপাদন ব্যয়ে (Cost of Production) ভিন্নতা থাকে অর্থাৎ একেকটি দেশ একেকটি পণ্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে। আর তুলনামূলক সুবিধা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা হয় বলে এই তত্ত্বকে আপেক্ষিক সুবিধা Comparative Advantage) তত্ত্ব বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব
Comparative Cost Theory of International Trade

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। অ্যাডাম স্মিথ সর্বপ্রথম তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন।

১৮১৭ সালে ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গ ও মার্জিতরূপে উপস্থাপন করেন।

মূল বক্তব্য:

ডেভিড রিকার্ডো তার "The Principles of Political Economy and Taxation' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনে উৎপাদন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা, পরম সুবিধা নয়।

তার মতে,

"কোনো দেশ সেই সব দ্রব্য উৎপাদন করবে যার উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি।"

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব
Comparative Cost Theory of International Trade

শর্তের ভিত্তিতে উপরের মূলনীতি প্রমাণ করেন:

১. দুটি দেশের মধ্যে কেবল দুটি দ্রব্যের বাণিজ্য চলবে।

২. শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান এবং শুধু শ্রমব্যয়ের ভিত্তিতে উৎপাদনের আপেক্ষিক ব্যয় নির্ধারিত হবে।

৩. শ্রম একটি সমজাতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় স্থির থাকবে।

৫. উৎপাদন ক্ষেত্রে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি কার্যকর

৬. দ্রব্যের কোনো পরিবহণ খরচ থাকবে না।

৭. অবাধ বাণিজ্য চালু থাকবে ও

৮. দ্রব্য ও উৎপাদনের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব
Comparative Cost Theory of International Trade

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা:

আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বিবেচনা করা যাক।

যদি আমেরিকার শ্রমিক বাংলাদেশের শ্রমিকের তুলনায় চরমভাবে (Absolutely) দক্ষ হয় তাহলে আমেরিকা কি কোনো কিছুই আমদানি করবে না?

কিংবা বাংলাদেশ কি তার বাজারকে 'সংরক্ষণ' করবে Tariff এবং Quota এর মাধ্যমে?

এটা কি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ঘোরে জ্ঞানীর কাজ হবে?

এসব প্রশ্নের জবাব দেন ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব
Comparative Cost Theory of International Trade

নিচের টেবিলে তুলনামূলক খরচ দেখানো হলো:

দ্রব্য উৎপাদনে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ		
দ্রব (১ একক)	প্রয়োজনীয় শ্রমিক (শ্রম ঘণ্টা)	
	আমেরিকা	বাংলাদেশ
খাদ্য (কেজি)	১	৩
কাপড় (গজ)	২	৪

উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, উভয় দ্রব্য উৎপাদনে আমেরিকা বেশি দক্ষ। তথাপিও আমেরিকার তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage) রয়েছে খাদ্য উৎপাদনে এবং বাংলাদেশের রয়েছে কাপড় উৎপাদনে। কারণ **আমেরিকায় কাপড়ের তুলনায় খাদ্য সস্তা।** আর **বাংলাদেশে আমেরিকার তুলনায় কাপড় কম ব্যয়বহুল।** এই সত্য থেকে রিকার্ডো প্রমাণ করেন যে, উভয় দেশই লাভবান হবে যদি তারা ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন করে যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে তাদের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে।

কীভাবে উভয় দেশই লাভবান হবে তা বাণিজ্যের পূর্বের অবস্থান এবং বাণিজ্যের পরের অবস্থান বিবেচনা করলেই উপলব্ধি করা যাবে।

বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যরত প্রতিটি দেশ কিছু পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে এবং কিছু পণ্য ও সেবা আমদানি করে। বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো পণ্য রপ্তানি করে আয় করে, আর আমদানির জন্য ব্যয় করে। রপ্তানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে সেগুলোকে দৃশ্যমান রপ্তানি বলে। অপরদিকে, আমদানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে তাকে দৃশ্যমান আমদানি বলে। এ সকল দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্যের হিসাবকে বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade) বলে সুতরাং দৃশ্যমান আমদানির (Visible Imports) মোট মূল্য ও দৃশ্যমান রপ্তানির (Visible Exports) মোট মূল্যের পার্থক্যের বিবরণকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে।

দৃশ্যমান রপ্তানি আয় দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলে তাকে অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য (Favourable Balance of Trade) বলা হয়।

আর দৃশ্যমান রপ্তানি আয় দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম হলে তাকে প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য (Unfavourable Balance of Trade) বলা হয়।

বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade)

অতএব বাণিজ্যের ভারসাম্য তিন ধরনের হতে পারে

১. ভারসাম্য বাণিজ্য: দৃশ্যমান রপ্তানি আয় = দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এক্ষেত্রে $X - M = 0$

২. অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য: দৃশ্যমান রপ্তানি আয় > দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এ অবস্থায় $B_t = (X-M) > 0$

৩. প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য: দৃশ্যমান রপ্তানি আয় < দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এ অবস্থায় $B_t = (X-M) < 0$

লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment)

বিভিন্ন দেশ শুধু বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীই আমদানি রপ্তানি করে না। অদৃশ্যমান সামগ্রীও (সেবা) আমদানি ও রপ্তানি করে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বস্তুগত দ্রব্য ছাড়াও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান হয়ে থাকে। যেমন— বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রের খরচ, বৈদেশিক ঋণের সুদ ইত্যাদি।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্য ও সেবাকর্ম আমদানির জন্য যে অর্থ প্রদান করে তাকে দেনা বলা হয়।আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্য ও সেবাকর্ম রপ্তানি করে যে অর্থ পায় তাকে পাওনা বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ মোট পাওনা ও দেনার হিসাবের বিবরণকেই লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়। লেনদেনের ভারসাম্য হলো কোনো দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment)

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সি. পি. কিন্ডেলবার্গের মতে

"একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের জনগণের সাথে অন্যান্য দেশের জনগণের সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের সুবিন্যস্ত হিসাবকেই ঐ দেশের লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়।"

অর্থনীতিবিদ বেনহামের মতে,

"একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি দেশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে আর্থিক লেনদেন হয় তার হিসাবকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।"

অতএব, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্যের হিসাবের বিবরণকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।

লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment)

লেনদেনের ভারসাম্যে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলো হলো

১. বাণিজ্য ভারসাম্য (Balance of Trade)

২. অদৃশ্য বাণিজ্য (Invisible of Trade)

৩. অপ্রত্যাশিত রপ্তানি আমদানি (Unexpected Trade)

৪. মূলধন আমদানি-রপ্তানি (Capital Transfer) এবং

৫. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Foreign Exchange Reserve)

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Balance of Trade and Balance of Payment

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হল -

নং	পার্থক্যের ভিত্তি	বাণিজ্যের ভারসাম্য	লেনদেনের ভারসাম্য
১।	**সংজ্ঞাগত**	দৃশ্যমান আমদানির মোট মূল্য ও দৃশ্যমান রপ্তানির মোট **মূল্যের পার্থক্যের বিবরণকে** বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে।	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানি ও রপ্তানির মোট **মূল্যের হিসাবের বিবরণকে** লেনদেনের ভারসাম্য বলে।
২।	**পরিধিগত**	বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের **একটি অংশ** মাত্র। সুতরাং **বাণিজ্যের ভারসাম্য হলো আংশিক চিত্র।**	লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের **সামগ্রিক হিসাব** প্রদান করে। সুতরাং **লেনদেনের ভারসাম্য সামগ্রিক চিত্র।**

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Balance of Trade and Balance of Payment

নং	পার্থক্যের ভিত্তি	বাণিজ্যের ভারসাম্য	লেনদেনের ভারসাম্য
৩।	ভারসাম্যের অবস্থা	বাণিজ্যের ভারসাম্য থেকে ভারসাম্যের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না।	লেনদেনের ভারসাম্য থেকে ভারসাম্যের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।
৪।	সম্পর্ক	বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূল হলেও লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল হতে পারে।	বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রতিকূল হলেও লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূল হতে পারে।
৫।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থান নির্ণয়	বাণিজ্যের ভারসাম্য হতে একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না।	লেনদেনের ভারসাম্য দ্বারা একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Balance of Trade and Balance of Payment

নং	পার্থক্যের ভিত্তি	বাণিজ্যের ভারসাম্য	লেনদেনের ভারসাম্য
৬।	**উপাদান**	বাণিজ্যের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার শুধু সক্রিয় উপাদান বিবেচিত হয়।	লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় প্রকার উপাদান বিবেচনা করা হয়
৭।	**হিসাব গত ক্ষমতা**	বাণিজ্যের ভারসাম্য হিসাবগত অর্থে সব সময় ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ কদাচিৎ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।	লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবগত অর্থে সর্বদাই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Balance of Trade and Balance of Payment

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের আংশিক চিত্র এবং লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের অবস্থান তার লেনদেনের ভারসাম্য দ্বারাই নির্ণীত হয়, বাণিজ্যের ভারসাম্য দ্বারা নয়।

বাণিজ্য থেকে লাভ (The Gains from Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক লাভ অর্জন।

নিজ মূল্যের চেয়ে অনুকূল মূল্যে করতে পারলে কোনো দেশ বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়।

অভ্যন্তরীণ মূল্য এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের ব্যবধানের মাধ্যমে বাণিজ্য থেকে লাভ-লোকসান নিরূপণ করা যায়।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যে পরিবর্তন এবং দেশীয় বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তনের ফলে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর তিনটি পণ্য রপ্তানি হতো। এগুলো হলো- পাট, চা ও চামড়া। ৭০-এর দশকে রপ্তানি আয় ছিল ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আর এখন সামগ্রিক রপ্তানি আয় প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৬৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭,৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

এ সময়ে প্রধান দুটি পণ্য— তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নিটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১,৬৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১,৪৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৪.৮৪ শতাংশ ও ১৩.৫০ শতাংশ।

অন্যান্য পণ্যের মধ্যে হিমায়িত খাদ্য (২.৮৭ শতাংশ), পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৬২ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (২৭.২৭ শতাংশ) এবং প্রকৌশল দ্রব্য (০.৮৮ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে কাঁচাপাট (– ১৯.৪৪ শতাংশ), পাটজাত পণ্য (২৫.১২ শতাংশ) এবং চামড়াজাত পণ্য (– ৭.১৪ শতাংশ) রপ্তানি প্রভৃতি দ্রব্য হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়:

দেশভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, **২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র।**

আলোচ্য সময়ে মোট ৪৫৯৩.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে যা দেশের মোট রপ্তানির ১৬.৬৭ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ হলো- তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি।

বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১৫.৬০%), যুক্তরাজ্য (২০.০৭%) ও ফ্রান্স (৫.৩৪%)।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

আমদানি পরিস্থিতি:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের (সিআইএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮৮৬৫ মিলিয়ন মার্কিন লার, সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি।

পণ্যভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, **জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সময়ে গম আমদানি হয়েছে ৯৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।** মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী পণ্যের আমদানি হয়েছে ৩৯৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়:

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৯.৪৩ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪৯ শতাংশ) ও সিঙ্গাপুর (৩.৬২ শতাংশ)।

তাছাড়া জাপান (৩.৫৯ শতাংশ) ও মালয়েশিয়া (২.৪৬ শতাংশ)।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের আমদানি বাবদ মোট ৪০,৮৯৫ লিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮,৮৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

সারণীতে দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ শতকরা হার	৫৯৮৫ ৫৫৮৮ ৫৭২২ ৬৩৩৬ ৮৯৪১ ৫৫১৫ ১৩.৪৯	৭৫৫০ ১১২৬৮ ১১৫৮২ ১৩২৯২ ১৫৯৩ ৭ ১২০৩ ৬ ২৯.৪৩	২৪০৭ ২৮৯৪ ১২০৩ ২১১৩ ২২৫৫ ১৪৭৯ ৩.৬২	১২৯১ ১৮১৬ ২০৭৫ ২০৩১ ২৪২২ ১৪৬৯ ৩.৬২	৭৬২ ৮৮১ ৮২৭ ৭২৬ ৬৭৬ ৪৪১ ১.০৮	৮৯৭ ১০৬০ ১০০৪ ৯৯০ ১১২৯ ৭৩৬ ১.৮৭	১১৮২ ১৪১৭ ১৪১৭ ১৪৮৩ ১৯০৭ ১০৮৭ ২.৬৬	৭৯২ ৮৮০ ১১৩৪ ১৩৫৮ ২১৬০ ১৭৩৫ ৪.২৪	২০৮৪ ১৩৬১ ১১৮৪ ১০৪০ ১৩৪২ ১০০৭ ২.৪৬	১৭৭৮২ ১৩৫৩৯ ১৫৯৭৪ ১৭৬৩৬ ২২০৯৬ ১৫৩৬৩ ৩৭.৫৭	৪০৭৩২ ৪০৭০৪ ৪৩১২২ ৪৭০০৫ ৫৮৮৬ ৫ ৪০৮৯৫ ১০০

সারণী: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

নিচে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

১. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কিছুকাল পূর্বেও পাট, চা, চামড়া, প্রভৃতি কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হলো তৈরি পোশাক। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার অপ্রচলিত পণ্য যেমন— টাটকা ফল ও শাকসবজি, পান-সুপারি, তামাক, তাজা ফুল, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হচ্ছে। এতে করে রপ্তানি বাণিজ্যের কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছে।

২. শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি: বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর হলেও সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন— তৈরি পোশাক, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। এখন দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৯৫.৯২ ভাগ শিল্পজাতপণ্য থেকে আসে।

৩. অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি: বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের তুলনায় অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

৪. বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস: বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এ খাতে আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

৫. মূলধনী দ্রব্যের আমদানি: দেশকে শিল্পে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মূলধনী দ্রব্যের আমদানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৬. ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের প্রচলন: **১৯৭৫ সালে এ স্কিম চালু করা হয়।** স্কিমে বিদেশে কর্মরত চাকরিজীবীদের উপার্জিত অর্থ আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে এ স্কিমের আওতায় আমদানি পণ্যের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

৭. জনশক্তি রপ্তানি: বর্তমানে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জনশক্তি রপ্তানি আয়ের একটি অন্যতম উৎসে পরিণত হয়েছে।

৮. বৈদেশিক বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকরণ: বর্তমানে পশ্চিমা দেশসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা
The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh

৯. সার্কভুক্ত দেশের সাথে বাণিজ্য: সার্ক গঠিত হওয়ার পর থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

১০. বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা: কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। বর্তমানকালে খাদ্য ও কৃষি উপকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে বেসরকারি খাতে বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১১. নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা: বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। আমদানি নীতি ১৯৯৭-২০০২ এ কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সুতরাং সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানেও পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ পরিবর্তন আশানুরূপ শুভ প্রভাব নিয়ে আসতে সক্ষম হলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতানুগতিক ধারার লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে।

যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্য দেশের পণ্য ও সেবা ক্রয় করে তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে।

বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যসামগ্রীসহ বিভিন্ন শিল্পজাত মূলধনা দ্রব্য আমদানি করে থাকে।

নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যসামগ্রীর চিত্র তুলে ধরা হলো-

ক. প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ:

সরাসরি কৃষি থেকে প্রাপ্ত পণ্যসমূহই হলো প্রাথমিক দ্রব্য।

বাংলাদেশের আমদানিকৃত প্রাথমিক দ্রব্য সমূহের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ই বেশি।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে (জুলাই - ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ৩৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ প্রাথমিক পণ্য আমদানি করে। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

১. চাল: চাল বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য। চাল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বিধায় প্রতি বছর চাল আমদানি করতে হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চাল আমদানি করে।

২. গম: দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে দেশে চালের পরেই গমের স্থান। চালের তুলনায় বাংলাদেশে গমের উৎপাদন কম হয়। সে কারণে চালের চেয়ে বেশি গম আমদানি করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৯৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ গম আমদানি করে।

৩. তৈলবীজ: বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে তৈলবীজ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তৈলবীজের চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ তৈলবীজ আমদানি হয়ে থাকে।

৪. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম: জ্বালানি হিসেবে দেশে পেট্রোলিয়াম আমদানি বাধ্যতামূলক। তাই দেশের আমদানি পণ্যসমূহের মধ্যে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি অন্যতম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করে।

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

৫. কাঁচা তুলা: বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটায় এখানে সুতা ও বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গত কারণেই দেশে তুলা আমদানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কাঁচা তুলা আমদানি করে।

খ. প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ:

বাংলাদেশ এখনো শিল্পায়িত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। তাই শিল্পজাত পণ্যের আমদানির পরিমাণ দিনদিন বাড়ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি দাঁড়ায় ৮,৫৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ।

শিল্পজাত পণ্য আমদানির বিবরণ উল্লেখ করা হলো:

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

১. ভোজ্য তেল: খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ভোজ্য তেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভোজ্য তেল আমদানি করা হয়।

২. পেট্রোলিয়াম পণ্যসামগ্রী: বাংলাদেশকে সবসময়ই পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করতে হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

৩. সার: কৃষিখাতে সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সর্বদাই সার আমদানি করতে হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সার আমদানির পরিমাণ ১১৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪. ক্লিংকার: ক্লিংকার আমদানির পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৬৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫. স্টেপল ফাইবার: বাংলাদেশ বিদেশ থেকে স্টেপল ফাইবার আমদানি করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্টেপল ফাইবারের আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

ক্লিংকার

সিমেন্টের উপাদানসমূহ হচ্ছে ক্লিংকার, জিপসাম,স্লাগ, ফ্লাইএ্যাশ ,লাইমস্টোন।

এরমধ্যে প্রধান উপাদান ক্লিংকার বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট মূলত জমাট বাধার কাজ করে, এটি শুধু নিজে জমে না বরং তার সাথের সকল উপাদানকে নিয়েই জমে।

Staple fiber:

ফাইবারের দৈর্ঘ যখন কম হয় তখন তাকে স্টেপল ফাইবার বলে। স্টেপল ফাইবার লম্বায় কম থাকার ফলে এটি সাধারণত: প্রাকৃতিক ফাইবারের সাথে বেশী সম্পর্কিত। একমাত্র সিল্ক ব্যতিত সকল প্রাকৃতিক ফাইবার স্টেপল ফাইবার হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। কিছু কিছু কৃত্রিম ফাইবারও স্টেপল ফাইবার হিসাবে তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

৬. সুতা: দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটায় বস্ত্র শিল্পে সুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সুতা আমদানি বাবদ মোট ব্যয় হয় ১৬৯৫ মার্কিন ডলার।

গ. মূলধনী যন্ত্রপাতি:

"কৃষিখাতের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রয়োজনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। এগুলোর মধ্যে ভারী যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, কলকব্জা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে আমদানি বাবদ ৩৯৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়।

ঘ. অন্যান্য পণ্যসামগ্রী:

উল্লিখিত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ কাপড়, ওষুধ, বাস, ট্রাক, রাবারজাত দ্রব্য, সুতি ও শিল্পবস্ত্র, ইলেক্ট্রনিকস দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রং প্রভৃতি পণ্য আমদানি করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে আমদানি বাবদ ২৪৪৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন

1. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods)
2. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Non-Traditional Export Goods)

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods) :

বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসৰ পণ্য বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকেই প্রচলিত পণ্য বলা যায়।

এসব পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods) :

১. কাঁচাপাট:

বাংলাদেশে প্রচলিত রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে কাঁচাপাট অন্যতম। দেশে মোট কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫ লাখ বেল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা হচ্ছে ৬৩ লাখ বেল। যা মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ। পাশাপাশি বিদেশে কাঁচাপাট রপ্তানি হচ্ছে বছরে ১২ লাখ বেল। অবশিষ্ট ৭ থেকে ১০ লাখ বেল ব্যবহার হচ্ছে গৃহস্থালি কাজে।

কাঁচাপাট উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, আইভরি কোস্ট, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, জার্মানি, স্পেন, ইংল্যান্ড, মিশর, চীন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে।

বিশ্বের প্রায় ৪০টিরও বেশি দেশে কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods) :

২. পাটজাত দ্রব্য:

রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে আসে। দেশের ৭৭টি পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, কার্পেট, সুতলি প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্যের বার্ষিক রপ্তানি প্রায় ১৪ থেকে ১৮ লক্ষ বেল। ইরাক, ইরান, সুদান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের ক্রেতা।

৩. চা:

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে চা এর স্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশে ১৬৭টি চা বাগান আছে এবং ২ লাখ ৭৯ হাজার ৫০৬ একর জমিতে চায়ের চাষ করা হয়। ২০১৮ সালে সাড়ে ৮ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল। উৎপন্ন চায়ের বেশির ভাগ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods) :

৪. চামড়া:

বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হলো চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য। বাংলাদেশের চামড়ার মান উন্নত বলে বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ পণ্যের উল্লেখযোগ্য ক্রেতা দেশ হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি

৫. পেট্রোলিয়াম উপজাত পণ্য:

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্যের মধ্যে ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন উল্লেখযোগ্য। দেশের চাহিদা মেটানোর পর এগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারী) এ খাত থেকে রপ্তানি আয় ১৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

কাঁচাপাট রপ্তানি		পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি		চা রপ্তানি		চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি	
অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৩-১৪	১২৬	২০১৩-১৪	৬৯৯	২০১৩-১৪	৪	২০১৪-১৫	৩৯৮
২০১৪-১৫	১১২	২০১৪-১৫	৭৫৭	২০১৪-১৫	৩	২০১৫-১৬	২৭৮
২০১৫-১৬	১৭৩	২০১৫-১৬	৭৪৭	২০১৫-১৬	২	২০১৬-১৭	২৩৩
২০১৬-১৭	১৬৮	২০১৬-১৭	৭৯৪	২০১৬-১৭	৪	২০১৭-১৮	১৮৩
২০১৭-১৮	১৫৬	২০১৭-১৮	৮৭০	২০১৭-১৮	৩	২০১৮-১৯	১১৭
২০১৮-১৯	৮৭	২০১৮-১৯	৪৭৪	২০১৮-১৯	২		

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

খ. অপ্রচলিত পণ্য (Non-Traditional Export Goods):

যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করত না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করে এসব পণ্যকে সাধারণভাবে অপ্রচলিত পণ্য বলা হয়। নিচে প্রধান প্রধান অপ্রচলিত পণ্যের বিবরণ দেওয়া হলো:

১. তৈরি পোশাক (নিটওয়্যারসহ):

বর্তমানে তৈরি পোশাক অন্যতম রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং আমেরিকায় বাংলাদেশি পোশাকের চাহিদা প্রচুর। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে এ খাতে আয় হয়েছে ৩০,৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩৪,১৩৩ মিলিয়ন ডলার ।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

খ. অপ্রচলিত পণ্য (Non-Traditional Export Goods):

২. হিমায়িত খাদ্য:

বাংলাদেশ হতে টাটকা লোনামাছ, হিমায়িত গলদা চিংড়ি, হিমায়িত ইলিশ, ব্যাঙের পা এবং বিভিন্ন মাছের শুঁটকি রপ্তানি করা হয়। মোট রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি হতে বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩৯৪ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৩. হোসিয়ারি দ্রব্য:

নিটওয়্যার তৈরি পোশাকের মতো হোসিয়ারি দ্রব্য যেমন— গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, সুতি পায়জামা, টাইডস প্রভৃতি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। এদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে হোসিয়ারি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে আয় হয়েছিল ১৬,৮৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

খ. অপ্রচলিত পণ্য (Non-Traditional Export Goods):

৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য:

বাংলাদেশ কাঠ, বাঁশ, বেত, দড়ি, পাট ও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ দ্বারা হাতে তৈরি জিনিস রপ্তানি করে। বিশ্ব বাজারে এ ধরনের শৌখিন ব্যবহার্য দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসব তব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

৫. কৃষিপণ্য:

বাংলাদেশ থেকে কতকগুলো কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— শাকসবজি, ফুল, ফল, গোল আলু, মশলা, পান-সুপারি প্রভৃতি। এসব পণ্যের ক্রেতা দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সব কৃষিপণ্য থেকে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৪৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

খ. অপ্রচলিত পণ্য (Non-Traditional Export Goods):

৬. রাসায়নিক দ্রব্য:

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কিছু পরিমাণ পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সার এবং কিছু রাসায়নিক তা রপ্তানি করা হয়। ভারতসহ প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ এসব রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রেতা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

৭. অন্যান্য শিল্প পণ্য:

বাংলাদেশ আরও কিছু সংখ্যক নতুন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের মধ্যে কিছু প্রথমিক পণ্য ও কিছু শিল্পজাত দ্রব্য রয়েছে। অপ্রচলিত অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে গুড়, দিয়াশলাই, পারটেক্স, রেয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, বইপুস্তক ও সাময়িকী, ফিচারফিল্ম ইত্যাদি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সব দ্রব্যাদি রপ্তানি করে মোট ১৯৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়।

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতি বছরই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে ফলে দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রপ্তানির প্রতি মনোযোগী হয়ে আমদানি হ্রাস করতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির হার আরও বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
Main Import Goods of Bangladesh

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রপ্তানি সংক্রান্ত: জাতীয় কমিটি দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাবলির তাৎক্ষণিক সমাধান এবং রপ্তানি সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পুনর্গঠন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী কর হয়েছে। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো রপ্তানি পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, রপ্তানি নীতি নির্ধারণ, সরকারকে পরামর্শ দান ও রপ্তানির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

৩. টাকার মূল্যমান যৌক্তিকীকরণ: রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য টাকার বাস্তবভিত্তিক মূল্যমান নির্ধারিত হওয়া দরকার। সে উদ্দেশ্যে বর্তমানে টাকা রূপান্তরকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

৪. আমদানি নীতি উদারীকরণ (Liberalization) : রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি নীতি পূর্বাপেক্ষা সহজতর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়
Means of Extension of Export of Bangladesh

- Liberalization is lessening of government restrictions and regulations on important elements of economy regarding production,distribution, export and import in exchange for greater participation by private entities

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়
Means of Extension of Export of Bangladesh

৫. ট্যাক্স হলিডে: দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৬. আয়কর রেয়াত: পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানিদ্রব্যের আয়ের ওপর সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

৭. রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প: রপ্তানি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ভূমিকাকে আরও জোরদার করার জন্য এর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয়েছে। ফলে রপ্তানিকারীদের জন্য ঋণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. দ্রব্যের মান উন্নয়ন: দ্রব্যের মান উন্নয়নের ফলে এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এতে করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

৯. বাণিজ্যিক ভ্রমণের সুবিধা: রপ্তানি পণ্যের বিপণন প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে নবাগত রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়
Means of Extension of Export of Bangladesh

১০. রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি: রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ যোগানের জন্য ঋণ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঋণের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে এবং রপ্তানি ঋণ তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি বিশেষ রপ্তানি কোর্স চালু রয়েছে।

১১. পশ্চাৎ সংযোগ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্প স্থাপন: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখতে হলে পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা—সূতা, লেবেল, বোতাম, জিপার ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই রপ্তানি আরও ব্যাপক হারে বাড়বে।

১২. রপ্তানি দ্রব্যের প্রচার: সরকার ও রপ্তানিকারকগণ রপ্তানিজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা করতে পারে। এতে রপ্তানিজাত দ্রব্যের প্রসার ঘটে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়
Means of Extension of Export of Bangladesh

১৩. রপ্তানি মেলা: আন্তর্জাতিক রপ্তানি মেলাতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগেও রপ্তানি মেলার আয়োজন করতে পারে।

১৪. রপ্তানি প্রশিক্ষণ: রপ্তানি বাণিজ্যের সব আঙ্গিক ও পর্যাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদেরকে অবহিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রশিক্ষণ জোরদার করা হচ্ছে।

১৫. রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধি: রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন, উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বিপণন তথা রপ্তানির সার্বিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য এই তহবিল থেকে ঋণ ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

১৬. পুরস্কার ঘোষণা: রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদক, সিপিআই পদক উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বায়নের ধারণা
Concept of Globalization

ইংরেজি 'Globe' থেকে Globalization শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বিশ্বায়ন।

এটা একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

জাতি-রাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

বাণিজ্যকে বাধাহীনভাবে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাই হলো বিশ্বায়ন।

আবার বিশ্বায়ন বলতে সারা বিশ্বে পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহকে বোঝায় । Globalization বা বিশ্বায়ন আজ বাস্তবতা।

উৎপাদনের সকল উপকরণের আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মিল-বন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা করাকে বিশ্বয়ন বলা হয়।

বিশ্বায়নের প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি।

বিশ্বায়নের ধারণা
Concept of Globalization

১৯৪৭ সালে জেনেভায় GATT চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেটি হলো গ্লোবালাইজেশন। বলা হয়ে থাকে,

গোটা বিশ্বের বাসিন্দারা পরস্পরের সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংযুক্ত। তথ্যসংবলিত অর্থনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলাচল করতে সক্ষম। বিশ্বের এক প্রান্তে তৈরি পণ্য ও সেবা প্রযুক্তি অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে ক্ষণিকের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও চলাচল আগের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে অর্থনীতি।

বিশ্বায়ন বলতে সাধারণত অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকেই বোঝায়।

বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

ম্যাক-লোহানের মতে, বৈশ্বিক পল্লি ধারণার পরিবর্তিত প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্বায়ন।'

রোনাল্ড রবার্টসন-এর মতে, "বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা হলো বিশ্বায়ন।"

বিশ্বায়নের ধারণা
Concept of Globalization

এন্থনি গিডেল-এর মতে, "বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের প্রগাঢ়করণ।"

সুতরাং, বিশ্বায়ন হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ, বিনিয়োগের আন্তর্জাতিককরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ এবং সীমানাবিহীন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা।

তাই এটি হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বিশ্ব ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কিত এবং আন্তঃযোগাযোগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরোনো কাঠামো ও অবলুপ্ত হচ্ছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে এক বিশ্বসীমানা ও বিশ্বসম্প্রদায়।

সুতরাং, বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অন্যান্য আংশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতাই হচ্ছে বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
Nature and Characteristics of Globalization

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবাহিত হচ্ছে। **বিভিন্ন দেশের বাজার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করাই বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য।** বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো

১. পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ:

বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য ও শ্রম চলাচল করতে পারে বিধায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. পুঁজির অবাধ প্রবাহ:

পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ বা মূলধনের অবাধ প্রবাহ বিশ্বায়নের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অদ্যাবধি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্প ও ব্যবসায়। প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতার পথ সম্প্রসারিত করছে।

বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
Nature and Characteristics of Globalization

৩. বাজার উন্মুক্তকরণ:

বাজার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালু করাই হলো বিশ্বায়নের অন্যতম লক্ষ্য।

৪. তথ্যের অবাধ প্রবাহ:

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সম্ভব হচ্ছে। উপগ্রহ সম্প্রসারণ প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিশ্বজুড়ে এক ব্যাপক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোনো কাঠামো ও সীমানা অবলুপ্ত করে একটি বৈশ্বিক অবকাঠামো তৈরি করাই হলো বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের পরিভাষাগুলো ‘'বিশ্বপল্লি’, ‘মুক্ত বাজার', 'সীমান্ত উন্মোচন' তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে লোভনীয় হয়ে ওঠে।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক হারে প্রবেশের মাধ্যমে বাজার থেকে পুঁজি আহরণ, বিনিয়োগ প্রভৃতির জন্য তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাণিজ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিনিয়োগের নিয়মনীতি শিথিল করেছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাদের পুঁজিবাজার সম্প্রসারিত করে অধিক হারে মুনাফার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এসব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানার মেশিনপত্র, সেবা খাতের যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎকেন্দ্র।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

পাম্প হাউস, জেনারেটর, তেল-গ্যাস উত্তোলনের মেশিন প্রভৃতি সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করেছে।

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তার।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্লোবাল কোম্পানি সমূহের সম্পদের এক বিশাল অংশই নিজ দেশের (Home Country) গ্লোবাল কোম্পানির বিক্রির সিংহভাগই অনুষ্ঠিত হয় বহির্বিশ্বে।

বাইরে অবস্থিত এবং কোনো কোনো বিশ্বের প্রতিটি দেশে অর্থনীতি বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত।

৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়।

কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

১. উন্নত প্রযুক্তির বিকাশ:

বিশ্বায়নের ফলে বহির্বিশ্বের নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে এদেশের মানুষ পরিচিত হচ্ছে। এতে অনেকে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ।

২. দেশীয় শিল্পের বিকাশ ব্যাহত:

বাংলাদেশের বাজার বিদেশি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় এ দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

৩. রপ্তানি হ্রাস:

বিশ্বায়নের ফলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। রপ্তানি হ্রাস পেয়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

৪. মেধা পাচার:

বিশ্বায়নের ফলে উন্নত জীবনযাপনের মোহে এদেশের দক্ষ ও মেধাবী জনগণ বিদেশে গমন করছে। এ **মেধা পাচারের (Brain drain) ফলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়বে।**

৫. ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি:

বিশ্বায়নের ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। ধনীরা সুবিধা পাচ্ছে এবং দরিদ্ররা সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্ররা নিঃস্ব হচ্ছে।

৬. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি:

বিশ্বায়নের ফলে দেশে দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

৭. অর্থনৈতিক মন্দার বিশ্বায়ন:

বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, 'বিশ্ব মন্দায়' রূপ নিয়েছে, যা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসছে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর বিরূপ প্রভাব:

অভ্যন্তরীণ অসুবিধা এবং বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক। শিল্পে বর্তমানে চীন, ভারত, হংকং, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প গভীর সংকটে পড়তে পারে ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব
Impacts of Globalization on the Economy of Bangladesh

৯. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন:

বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গনে আজ বিদেশি অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অবস্থায় এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা পাবে না।

সুতরাং, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের সুফলগুলো মূলত বিশ্বের উন্নত "দেশগুলোই বেশি ভোগ করছে।

এদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। তবে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে ইতিবাচক প্রভাব কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

বৈদেশিক সাহায্য
Foreign Aid

বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থা থেকে যে ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়। এ সাহায্য ওষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ভাবেই হতে পারে।

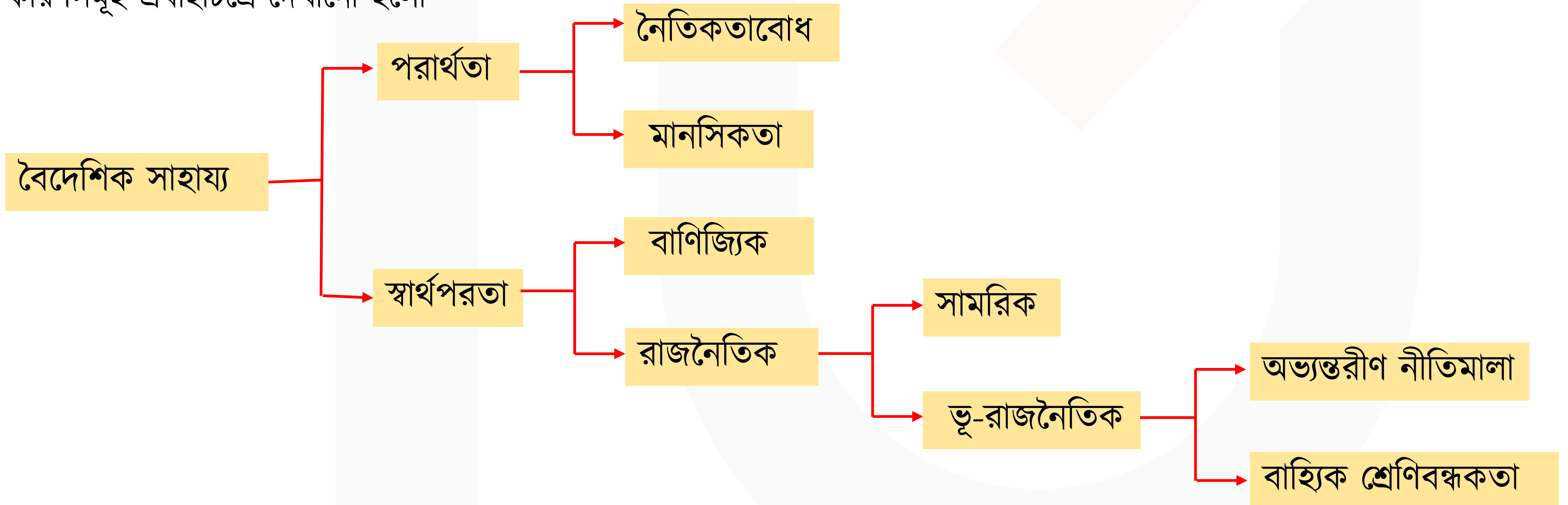
তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং আমদানি-রপ্তানি অপরিহার্য হয়ে পড়ায় জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এদেশের জাতীয় আয়ের উৎস থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা প্রায় অসম্ভব। তাই উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিশেষ সুবিধা প্রদান সাপেক্ষে একদেশ থেকে অপরদেশে সম্পদ হস্তান্তরকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

ব্যাপক অর্থে বৈদেশিক সাহায্য বলতে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থ সম্পদ ও কারিগরি সহায়তাকে বোঝায়।

বৈদেশিক সাহায্যের কারণ
Causes of Foreign Aid

বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের কারণ মূলত তিনটি। যথা— ১. বাণিজ্যিক স্বার্থ, ২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ৩. অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্য। যে মানবিক কারণে দেওয়া হয় না তাতে কোনো সংশয় নেই। বৈদেশিক সাহায্য দেওয়ার সমর দাতাদেশ গ্রহীতাদেশের ওপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে কিংবা দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার হরে। বৈদেশিক সাহায্যের কারণসমূহ প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো—



বৈদেশিক সাহায্যের কারণ
Causes of Foreign Aid

১. বাণিজ্য ব্যবধান দূর করা:

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের জন্য একটি দেশে আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানির প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি আয় কম অথচ চলতি আমদানি ব্যয় সৃষ্টি হয়। এই ব্যবধান দূর করার জন্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বাহ্যিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের মেয়াদি ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ করা।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ:

অনেক সময় কোনো দেশ আকস্মিকভাবে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানির বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য তারা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

৩. খাদ্য ঘাটতি পূরণ:

অনেক দেশ আছে যাদের নিয়মিতভাবে খাদ্য ঘাটতি থাকে। এই খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য এসব দেশ বিদেশ থেকে খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্যের কারণ
Causes of Foreign Aid

৪. কারিগরি ব্যবধান দূর করা:

অনুন্নত দেশে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি তুলনামূলকভাবে কম। অথচ দ্রুত অর্থনৈতিক ধানের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন কৌশলও আধুনিক ও যুগোপযোগী নয়। এজন্য এসব দেশ কারিগরি ব্যবধান দূর করার জন্য বিদেশ থেকে কারিগরি সাহায্য নিতে পারে।

৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের অর্থসংস্থান:

দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। এই লক্ষ্যেও কিছু দেশ বিভিন্ন বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

৬. সঞ্চয় বিনিয়োগ ব্যবধান দূর করা:

উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কম । অথচ বিনিয়োগ চাহিদা বেশি। বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় এসব দেশে কম হয়। একেই সঞ্চয় বিনিয়োগ ব্যবধান বলে। এই ব্যবধান দূর করার জন্য অনুন্নত দেশ বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্যের কারণ
Causes of Foreign Aid

৭. দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি:

বৈদেশিক মূলধন (সাহায্য) প্রবাহের মাধ্যমে সম্পদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জিত হয়।ফলে সাহায্য গ্রহণকারী দেশে উৎপাদন বাড়ে।

৮. সম্পদের কাম্য ব্যবহার:

অনেক উন্নয়নশীল দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। মূলধনের অভাবে এসব সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। বিদেশি সাহায্য বা ঋণ এরূপ সম্পদ উত্তোলন এবং কাম্য ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে।

৯. বিনিয়োগ প্রসার:

উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীর ক্ষমতা সীমিত। তাই বৈদেশিক বিনিয়োগ এখানে যথেষ্ট প্রয়োজন । দেশীয় বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগ করার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

১০. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

দ্রুত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা সাহায্য। একটি দেশ তার বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও প্রচুর বিদেশি সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা
Importance of Foreign Aid in Bangladesh

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ, আবিষ্কার ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিদেশি প্রযুক্তির প্রতি আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কারিগরি ব্যয় মেটানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের প্রয়োজন হয়।

২. যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সেতু, কালভার্ট মেরামত অথবা নতুনভাবে তৈরির প্রয়োজন হয়। এসবের জন্য বিদেশি মুদ্রা এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে, যা বাংলাদেশে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়াও যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন মটর যান, জাহাজ, রেল, বিমান ইত্যাদির চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও বছরে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করার প্রয়োজন হয়। এই বিপুলসংখ্যক পণ্য আমদানির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা নেই বলেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৪. বিজ্ঞানের যুগে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষ জনশক্তি থাকা প্রয়োজন। এদেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণের বিনিময়ে বিদেশে জনশক্তি প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।এরূপ বিনিয়োগকে মূলধনী বিনিয়োগ বলে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা
Importance of Foreign Aid in Bangladesh

৫. কৃষিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সবুজ সার ও গোবর সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। বাংলাদেশে কৃষিকার্যে রাসায়নিক সার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে বিধায় বিদেশ থেকে আমদানি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে হয়। কখনো এসব মূল্য পরিশোধের জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের প্রয়োজন হয়।

৬. মূলধন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। তাই এখাতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় না বলেই বিদেশ থেকে তা আমদানি করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ মূল্যে যন্ত্র আমদানি অসম্ভব। তাই ঋণের মাধ্যমে এসব সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৭. বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় গড়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য জরুরি কাজ সুষ্ঠভাবে করার জন্যই বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হয়।

৮. স্বাধীনতা লাভ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান লাভ করেছে তার বেশির ভাগ অপচয় কিংবা অমূলধনী খাতে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ওপর সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ
Types of Foreign Aid

বৈদেশিক সাহায্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

ক. অনুদান বা অনুদানিক সাহায্য

খ. রিলিফ সাহায্য এবং

গ. ঋণ

অনুদানের কোনো অর্থ ফেরত দিতে হয় না। এটা উন্নয়ন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রদান করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, অপ্রচলিত প্রযুক্তি স্থানান্তর কিংবা মানবিক কারণেও অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। আবার রিলিফ সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ঋণের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তযুক্ত থাকে। ঋণের সুদ ও আসল দুটিই নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের আরও শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করা হলো:

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ
Types of Foreign Aid

১. প্রকল্প সাহায্য:

একটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যে সাহায্য গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তা বোঝায়। যেমন- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প ইত্যাদি।

২. পণ্য সাহায্য:

পণ্যের আকারে যে বৈদেশিক সাহায্য গৃহীত হয় তাকে পণ্য সাহায্য বলা হয়। যেমন— কাঁচামাল, খাদ্য, ওষুধপত্র ইত্যাদি।

৩. কারিগরি সাহায্য:

উন্নত দেশসমূহ অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কারিগরি সাহায্য প্রদান করে থাকে। অনুন্নত দেশে দক্ষ কারিগর প্রেরণ, কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাহায্য দেয়া ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। এ ধরনের সাহায্যকে কারিগরি সাহায্য বলা হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ
Types of Foreign Aid

৪. অর্থ সাহায্য:

দাতা দেশসমূহ যদি অর্থের আকারে সাহায্য প্রদান করে থাকে তাহলে তাকে অর্থ সাহায্য বলা হয়। এ সাহায্যের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ অনেক সময় খাদ্য সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্য গ্রহণকারী দেশ এসব খাদ্যদ্রব্য দেশের মধ্যে বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ব্যয় করে থাকে। এ ধরনের সাহায্যকে টাকা বা অর্থ সাহায্য বলা হয়।

৫. সামরিক সাহায্য:

কোনো দাতা দেশ কর্তৃক গ্রহীতা দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে যেসব সাহায্য প্রদান করে থাকে তাকে সামরিক সাহায্য বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ বিশেষত আমেরিকা এবং রাশিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক সামরিক এবং প্রতিরক্ষা খাতে সাহায্য প্রদান করে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ
Types of Foreign Aid

৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ:

অনেক সময় উন্নত দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তা ও পুঁজিপতিগণ অনুন্নত দেশে প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি বিনিয়োগ (FDI) করে অথবা শিল্পের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করে পরোক্ষভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুঁজি বিনিয়োগকে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বলা হয়।

৭. শর্ত মুক্ত ও শর্তযুক্ত সাহায্য:

যে সাহায্যের সাথে নমনীয় বা কঠিন শর্তযুক্ত থাকে তাকে শর্তযুক্ত সাহায্য এবং যে সাহায্যে সাথে কোনোরূপ শর্ত যুক্ত থাকে না তাকে শতমুক্ত সাহায্য বলে।

বাংলাদেশে বিদেশি ঋণদাতাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশ, বহুজাতিক অর্থসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিকরণ হয় সাহায্যের শত উৎস ও ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হলো ঋণ ও অনুদান, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সাহায্য, খাদ্য সাহায্য পণ্য, সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস
Sources of Foreign Aid

বাংলাদেশের জন্য প্রধান প্রধান বৈদেশিক সাহায্যের উৎস হলো জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি।

এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইইসি, জাতিসংঘ, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, ওআইসি, ওপেক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ইত্যাদি।

তবে বাংলাদেশ আরও অনেক বন্ধু দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ উল্লিখিত দেশ বা সংস্থাগুলো থেকে প্রায় ৬৩.৬৯.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০৭৯.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে।

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস
Sources of Foreign Aid

উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			
দেশ/সংস্থা	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
আইডিএ	১৩৯৯.৭৮	১৪২২.৬৫	১১৫৫.৫৩
জাপান	৬৪৫.৭১	১৫৪৪.২২	৬৫৯.৭৩
এডিবি	৭৫৭.১১	৯৩৮.২১	৭৩৩.৮৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩.০০	০০	০০
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ	১০৩.২১	১০৫.৯৭	৭৫.৭১
কানাডা	৮.৬৩	৬.৩৬	০০
জার্মানি	৪৪.৮১	৩৮.৬১	৪.৭১
যুক্তরাজ্য	২১.৮৬	১১.১৮	৪.৭৩
সৌদি আরব	২৯.৯৩	১৮.৬৯	১৫.৪৭
ডেনমার্ক	১৪.৯৪	৯.৩৪	২.৭৬
ফ্রান্স	১২.৩২	৬৭.৫৪	৫.৮৯
ইউনিসেফ	৪৬.৭৭	৭৭.৬০	৪৫.৩৯
ভারত	৮০.২৩	৫০.০৭	৭৭.০২

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস
Sources of Foreign Aid

উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			
দেশ/সংস্থা	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
আইজিবি	৩৯.৮৩	৩৬.২১	১.৭৩
ইফান	৪৯.০৮	৩৮.০৪	১২.৩৯
কুয়েত	৩২.০১	১৮.৫৩	২২.৫১
ওপেক	২৯.৯৫	১৫.৮৪	২১.২৬
দক্ষিণ কোরিয়া	৩১.০১	৪১.৩৫	৪০.৬৭
চীন	৩৬.৩৯	৯৭৮.৬০	৪২৪.৫২
রাশিয়া	৯২.৪১	৮৩৭.৯১	৭৪৬.২৮
অন্যান্য	২৪৭.৩৯	১৫০.১৭	৪১.৯২
মোট	৩৬৭৭.২৯	৬৩৬৯.৩৭	৪০৭৯.৫৪

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস
Sources of Foreign Aid

জেনে রাখো:

স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মোট এডিপি বন্টনের তিন-চতুর্থাংশ ছিল বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট। ১৯৯০ সালের দিকে অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো চালু করতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমে যায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় গড়ে ৫১ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে অর্থায়ন করা হতো। ১৯৯১-২০০০ পর্যন্ত ভাগ এবং ২০০১-২০১০ পর্যন্ত ৩৭ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এটিপিতে প্রকল্প সহায়তা বাবদ বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ছিল মোট আকারের ৩০.৫৪%।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Foreign Trade and Foreign Aid

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। তার বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের দুটি পথ রয়েছে। এদের একটি হলো বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যটি বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করার পূর্বে এ দুইয়ের ধারণা দেওয়া যাক।

বৈদেশিক বাণিজ্য হলো দুই বা ততোধিক স্বাধীন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবাসমূহের বিনিময় যা আর্থিক বা দ্রব্যের আকারে হতে পারে। তা অবশ্যই নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

আর বৈদেশিক সাহায্য হচ্ছে একটি দেশ অন্য দেশকে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন বা উভয়ই শর্তের প্রেক্ষিতে দ্রব্য, সেবা, আর্থিক, অ-আর্থিক সহযোগিতা এবং এটি সর্বদাই একমুখী হয়। এই দুটো ধারণা থেকে পার্থক্য উল্লেখ করা যায় ।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Foreign Trade and Foreign Aid

১. দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়ার জন্য দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে শর্তহীন ও শর্তযুক্তভাবে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করে তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বিমুখী। কাজেই দুটি দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠিত হয়।

পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্য মূলত একমুখী। এক্ষেত্রে দাতা দেশ সাহায্য গ্রহণকারী দেশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানান শর্ত চাপিয়ে দেয়।

৩. বাণিজ্য মূলত নির্দিষ্ট সময়ের লেনদেনের ব্যাপার। অন্যদিকে, আর্থিক সাহায্য শুধু দেনার দিক।

৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ অর্থনৈতিক। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দুটি দেশে ভিন্ন হলেই তাদের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠিত হয়।

পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্যের কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য হতে ভিন্ন। কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ নয়, রাজনৈতিক ও মানবিক কারণেও দাতা দেশ বা সংস্থা বৈদেশিক সাহায্য করতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য
Difference between Foreign Trade and Foreign Aid

৫. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও তা গৌণ। কিন্তু সাহায্যের বেলায় এটি অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় এর প্রমাণ মিলে। এ কারণে সাহায্যের উদ্দেশ্য বাণিজ্যের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত বলা যায়।

৬. বাণিজ্যের কোনো মানবিক দিক নেই। এক্ষেত্রে কোনো দেশ দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি করলে বিদেশ থেকে আয় উপার্জন করতে পারে। আবার বিদেশ থেকে পণ্য ও সেবা আমদানি করলে দেশকে এর জন্য ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সাহায্যের মানবিক দিক আছে। যেমন কোনো গরিব দেশকে অনেক ধনী দেশ সাহায্য বা অনুদান দিতে পারে।

৭. বৈদেশিক বাণিজ্যে অসংখ্য লোক জড়িত থাকে কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য আদান-প্রদান মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানসহ গুটিকয়েক লোক সংশ্লিষ্ট থাকে।

অতএব, বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেরূপ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়, বৈদেশিক সাহায্যে তা সম্ভব হয় না। বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমুখী চুক্তিভিত্তিক বিষয়, সাহায্যের ক্ষেত্রে তা ততটা নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

তাই আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

ফলে এসব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে দুটি বিকল্প পথ রয়েছে। যথা:

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য

খ. বৈদেশিক সাহায্য

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য না বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হলো:

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

ক. বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতার সুবিধা

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কখনো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে হলে এসব দেশকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। নিচে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতার সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. প্রাকৃতিক সম্পদের সদব্যবহার:

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। দেশের জনসাধারণ এসব প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য কম দামে ক্রয় করতে পারে। ফলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি হ্রাস পায়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

২. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়:

বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশের জনগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. রপ্তানি আয়:

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করা যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

৪. স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন:

বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল হলে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি দেশ নিজের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। কেননা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হলে সাধারণত সাহায্য প্রদানকারী দেশের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বাধীনভাবে খরচ করা যায় এবং দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৫. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:

বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপকারী দেশসমূহের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিদেশিরা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ফলে দেশে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

৬. একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ:

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ করে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ফলে পণ্যের গুণগত মান উন্নত হয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

তাছাড়া ভোক্তাগণ স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা ভোগ করতে পারে।

৭. আত্ম-নির্ভরশীলতার মনোভাব:

বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

এতে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজস্ব ভূখণ্ডের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী হয়। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

খ. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার অসুবিধা

একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অতিমাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার অসুবিধা আলোচনা করা হলো:

১. বিদেশিদের স্বার্থ সংরক্ষণ:

বিদেশি দাতা সংস্থা বা দেশগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

তাছাড়া বিদেশি উদ্যোক্তাগণ তাদের অর্জিত মুনাফা নিজ দেশে প্রেরণ করে।

ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের এক বৃহৎ অংশ মুনাফা আকারে বিদেশে চলে যায়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

২. কঠিন শর্ত:

বিভিন্ন দাতা বা সংস্থাসমূহ তাদের ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন শর্তারোপ করে।

অনেক ক্ষেত্রে এসব শর্ত সাহায্য গ্রহণকারী দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩. উচ্চ সুদের হার:

বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশসমূহ ঋণ সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে উচ্চ হারে সুদ প্রদান শর্ত জুড়ে দেয়। ফলে ঋণের বিপরীতে সুদের হারও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণ গ্রহণকারী দেশের পক্ষে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের সুদ ছিল ০.৭৫%। কিন্তু ২০১৮ সাল থেকে উক্ত ঋণের সুদ হয়েছে ২.০%।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

৪. সম্পদের অপব্যবহার:

বিদেশি উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। তাই তারা যথেচ্ছাভাবে সম্পদের ব্যবহার করে। ফলে সম্পদের অপচয় বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৫. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা:

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা আনয়ন করে।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনেক সময় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া দেশের বাজেটের একটি বিরাট অংশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য সময়মতো ও যে পরিমাণ প্রত্যাশা করা হয় তা পাওয়া যায় না। ফলে বৈদেশিক সাহায্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য
Trade Vs Foreign Aid

৬. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি:

বৈদেশিক সাহায্যের নামে অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত অর্থ আগমনের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

৭. পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি:

বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে দেশটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

তবে দীর্ঘমেয়াদে সাহায্য নয়, বাণিজ্যই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পর নির্ভরতা বৃদ্ধি করা উচিত।

অর্থনীতি ২য় পত্র

সেট-২

Solve

অর্থনীতি ২য় পত্র

সেট-১

Solve